হৃদবাংলা
আসুক যতই দুঃসময় সুসাহিত্য সুখময়
বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ
World Bangla Literary Conference
২০২১
উত্তর আমেরিকা
বাংলা সাহিত্য
পরিষদ
North America Bengali Literary Society, Inc.

হৃদবাংলা

বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ ২০২১

স্মারক সঙ্কলন

হৃদবাংলা

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

প্রধান সম্পাদক

আশফাক স্বপন

সম্পাদক

উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য পরিষদ

বইয়ের হাট পাবলিকেশন্স

সম্পাদকীয় সহযোগী
আনোয়ার ইকবাল, কাজী রহমান,
গাজী আবদুর রশীদ,
দীপেন ভট্টাচার্য, নিরুপমা রহমান,
ফারজাহান রহমান শাওন, রশ্মি ভৌমিক

প্রচ্ছদ
তাজুল ইমাম

লেআউট ও ডিজাইন
আশফাক স্বপন

প্রি-প্রেস ফাইল প্রস্তুত
রিটন খান

মুদ্রণ তত্ত্বাবধায়ক
সৈয়দ আহসান হাবীব

হৃদবাংলা ২০২০ ও ২০২১ ফজলে মতিন, এমডি-এর অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত

বইয়ের হাট পাবলিকেশনস, আটলান্টা, জর্জিয়া

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ১০
লেখক পরিচিতি ১৩

৪০ কবিতা ৩৪

অমিত চক্রবর্তী ২৫, অশোক কর ২৬
আনিস আহমেদ ২৭, আবু জুবায়ের ২৯
এরশাদ খান ৩০, এহসান নাজিম ৩২
কাজী রহমান ৩৩, কামরুন জিনিয়া ৩৫,
গাজী আবদুর রশীদ ৩৮, জাহান রিমা ৪০
দালান জাহান ৪১, দেব বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২
ধনঞ্জয় সাহা ৪৮, নিঘাত করিম ৫০
বিদিতা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী ৫১, ময়নূর রহমান বাবুল ৫৩
মৃদুল রহমান ৫৫, মোস্তফা সারোয়ার ৫৬
রতন কুণ্ডু ৫৭, রাকীব হাসান ৫৮
রাজ হামিদ ৫৯, রুদ্র শংকর ৬০,
রুমানা গণি ৬১, লুৎফর রহমান রিটন ৬২,
শীলা মোস্তাফা ৬৪, শুক্লা গাঙ্গুলি ৬৬,
শৈবাল তালুকদার ৬৭, সুব্রতশঙ্কর ধর ৬৮,
হাসান মাসুম ৭০, হোসনে আরা জেমী ৭২

৪০ নাটক ৩৪

সুদীপ্ত ভৌমিক   সুন্দর-অসুন্দর ৭৫

৪০ গল্প ৩৪

অদিতি ঘোষদস্তিদার   জীবনের আরেক নাম ৮৯
অমিতাভ রক্ষিত   স্বপ্নের যে ডানা থাকে! ৯৭
আনিস হক   অন্যগ্রহে ১০৩
আমীনুর রহমান   সাদাকালো মুখগুলো ১১০
আলোলিকা মুখোপাধ্যায়   মায়া দর্পণ ১১৭

৬০ গল্প ৩২

এশরার লতিফ যাত্রা ১২৪
কানিজ পর্ণা অগস্ত্য যাত্রা ১২৯
কেয়া ওয়াহিদ চিরকুটে জলের হরফ ১৩২
খায়রুল আনাম তোতা ও পাখি, তোতাপাখি ১৪০
চকোরী মিত্র মুখোমুখি ১৫১
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত তৃণাদপি ১৫৪
তাসনীম হোসেন এলিয়েন ১৫৯
দীপেন ভট্টাচার্য আমেনহোতেপের সময় ১৬৬
নাহার মনিকা প্যাঁচানো ১৭৩
পূরবী বসু মহাজীবন ১৮১
প্রবীর বিকাশ সরকার কোনো এক বর্ষার গল্প ১৮৮
ফেরদৌসী পারভীন চিঠি ১৯১
বন্যা হোসেন অদৃশ্য পেন্সিল ১৯৮
বাসবী খাঁ ব্যানার্জী শেষ যাত্রা ২০৮
বিপাশা বাশার অনুরণন ২১১
মল্লিকা ধর কৃষ্ণারণ্য ২১৭
মোস্তফা তানিম ভবিষ্যতের গল্প ২২৬
মোস্তাফিজুর রহমান টিটু পৌনঃপুনিক ২৩০
মোহাম্মদ ইরফান মাশাল্লা রাজকন্যা ২৪০
মোহাম্মদ সাইফূল ইসলাম তৃতীয় ভূবনে ২৪৬
মৌ মধুবন্তী ইউটার্ন হলো ফেরা হলো না ২৫০
রশ্মি ভৌমিক কর্কট ২৫৫
রেজা শামীম নো ম্যানস ল্যান্ড ২৫৯
লুনা রাহনুমা মিতুলের প্রাতঃভ্রমণ ২৬৭
শাহজাহান চঞ্চল বিষাদে নীল হলদে পাখি ২৭৪
সামা আকবর অর্জুনের সন্ধ্যা ২৭৯
হাসান মাহমুদ হুটুটু! ২৮৮
হূমায়ূন কবির বলরামের শেষ দিন ২৯০

৫০ প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা ০২

অতনু চক্রবর্ত্তী — আনন্দমোহন চক্রবর্তীর জীবন্ত পেটেন্ট ২৯৯
আনোয়ার ইকবাল — কালো আর ধলো বাহিরে কেবল... ৩০৩
আমীরুল আরহাম — স্বপ্নে ও বাস্তবতায় কবি ফার্নেন্দো পেশোয়া ৩০৮
আরিফ মাহমুদ — খাওয়ার জন্য বাঁচা, না বাঁচার জন্য খাওয়া? ৩১৮
আহমাদ মাযহার — বাংলাদেশের বাইরে বাঙালি জনসমাজে সংস্কৃতি চর্চার মনস্তত্ত্ব ৩২১
চয়ন মল্লিক — বেহাগের বাহারে ৩২৬
জমির হোসেন — ইতালিয়ান লাল পাসপোর্টের গল্প ৩৩৩
নাভিদ সালেহ — ধরিত্রীর উষ্ণায়ন এবং জল দূষণ: আলাস্কার আদিবাসীদের জীবনে এর প্রভাব ৩৩৬
নাহার তৃণা — হৃদমাঝারে থাকেন তিনি ৩৪১
নিরুপমা রহমান — আমার নজরুল, আমার গানের বুলবুলি ৩৫১
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় — বাঙালি ইমিগ্রেন্ট-কথা অমৃতসমান ৩৫৮
প্রণব বর্ধন — দারিদ্রের স্বরূপ অন্বেষণে ৩৬৫
ফারজাহান রহমান শাওন — ফুলপ্রান্তর ও অন্যান্য ৩৭১
বিজন সাহা — সত্যের সন্ধানে ৩৭৪
ভক্তি মজুমদার — সাহিত্য এবং শিল্প: সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ৩৮০
মুসলেমা পারভিন — নির্বাসিত জীবনের দিনলিপি ৩৮৬
রিটন খান — পড়তে শেখার গল্প ৩৯১
লিয়াকত হোসেন — প্রথম মহিলা নোবেল লরিয়েট সেলমা লর্গালফ ৩৯৯
শামীম আজাদ — অভিক্রমণে ভাষা ৪০৪
শাহাব আহমেদ — শৈশব ও নাগেরহাটের অন্নদা পাগলিনী ৪০৭
শুভশ্রী নন্দী — শ্রীচরণেষু বাবা... ইতি তোমার শ্রেণীশত্রু কন্যা ৪১১
সেজান মাহমুদ — সমালোচনা সাহিত্যে উপন্যাসের অপরিহার্য উপাদান ও ইউলিসিসের শতবর্ষ: একটি মুখবন্ধ ৪২০
স্বপন বিশ্বাস — ভেগা সেন্ট্রাল ও নেরুদার কবিতাপাঠ ৪২৭

সম্পাদকীয়

গত কয়েক দশকে মূল বাংলাভাষাভাষী ভূখণ্ডের বাইরে বসবাসকারী বাঙালির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিনদেশে তো বটেই, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াতেও বিশাল বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী বসতি গেড়েছে।

এদের হাত ধ'রে বাংলা সংস্কৃতিচর্চাও কালাপানি পার হচ্ছে। প্রবাসে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর নিজের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় লালন ও বিকাশের বড় অবলম্বন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আড়ম্বরের সাথে নানান ছোট-বড় অনুষ্ঠান অভিবাসী সমাজজীবন মুখরিত করে।

বাঙালি পরিচয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক সাহিত্য। বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর আয়তনবৃদ্ধির সাথে সাথে পত্রিকা, সাময়িকী আর অনলাইনে বাংলা লেখালেখির চল বাড়লেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাঙালির অবসরজীবন যতটা অধিকার করে রাখে, সেই তুলনায় সাহিত্যের উপস্থিতি অতটা দৃশ্যমান নয়। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কয়েক বছর আগে উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য পরিষদ গঠিত হয়। শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যকে কেন্দ্র করে মূল বাংলাভাষাভাষী ভূখণ্ডের বাইরে নানান দেশে ছড়িয়ে থাকা যে সব বাঙালি সাহিত্যচর্চা করেন, যারা সাহিত্য ভালোবাসেন, তাদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে পরিষদের জন্ম। এই পরিষদের নানান কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রধান উদ্যোগ প্রতিবছর বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশের আয়োজন। প্রথমবার ২০১৯ সালে আটলান্টায় এই সমাবেশ আয়োজিত হয়, তারপর অতিমারির কারণে আর কোন স্থানে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এইবার নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের শার্লট-এ সমাবেশ আয়োজনের প্রাথমিক পরিকল্পনাও অতিমারির কারণে বাতিল হয়েছে। গতবছরের মতো এবারও অনলাইনে সমাবেশ আয়োজিত হয়েছে।

এই নিয়ে তৃতীয়বার বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ উপলক্ষে সাহিত্য সঙ্কলন হৃদবাংলা বের হলো। উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য পরিষদের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। সংগঠন যেহেতু উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত, অধিকাংশ লেখা যে যুক্তরাষ্ট্রের বসবাসকারী বাঙালিদেরই হবে, সেটা আশ্চর্য নয়। যেটা বিস্ময়ের আর আনন্দের, সেটা হলো প্রতিবারের মতো এবারও পৃথিবীর নানান দেশে বসবাসকারী বাঙালিদের লেখা এই বার্ষিক সঙ্কলনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পাঁচটি মহাদেশের নানান দেশ - অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, ইরান, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, লিবিয়া, সৌদি আরব, লেসোথো - এসব স্থানে বসবাসকারী লেখকরা লিখেছেন। এঁরা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা লিখেছেন- সেই সাথে এবারের নতুন সংযোজন নাটক।

সঙ্কলনে গ্রন্থিত রচনাসম্ভারই সঙ্কলনের পরিচয় দেবে, সেখানে সম্পাদকের মন্তব্য বাহুল্য। তারপরও এবার সঙ্কলন সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিছু বিবেচনা কাজ করেছিল, সেই বিষয়ে পাঠককে অবহিত করতে চাই।

সঙ্কলনে লেখা সন্নিবিষ্ট করার সময় আমার মনে কয়েকটা দিকে নজর দেবার ইচ্ছা ছিল। আমাদের সংগঠন মূলত বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙালি দ্বারা পরিচালিত হলেও আমাদের সাথে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বন্ধুরাও আছেন – এবং সাংগঠনিক দিক থেকে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভৌগলিক বা রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সকল বাংলা সাহিত্যপ্রেমিকের জন্য সংগঠনের দ্বার অবারিত। তবে দীর্ঘ প্রবাসজীবনের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বেদনাদায়ক সত্য হলো প্রবাসজীবনে দুই বাংলার বাঙালিরা যেন একধরনের benign apartheid মেনে চলেন। প্রত্যক্ষ কোন বিবাদ নেই, কিন্তু কোথাও যেন একে অপরকে এড়িয়ে চলার একটা প্রবণতা রয়েছে। এমন একটা সমৃদ্ধ সাহিত্যের যৌথ উত্তরাধিকার সত্ত্বেও কেন দুইটি সম্প্রদায় পরস্পরের সাথে দূরত্ব বজায় রাখে, সে এক রহস্য বটে। তারই প্রেক্ষিতে লেখা সংগ্রহের সময় আমার একটা অন্যতম লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত আরো বেশি লেখকের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা। আমি অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে এতো উষ্ণ সাড়া পেয়েছি, যে এই বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও উদ্যোগ গ্রহণ করলে সেটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

লেখা সংগ্রহের সময় আমার মনে আরেকটা চিন্তা কাজ করেছিল। আমার মনে হয় একটি সঙ্কলনের সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো নতুন লেখক আবিষ্কার করা। নতুন লেখক বলতে আমি আনকোরা লেখক বলছি না, আমি বলছি আমাদের পরিচিত মহলের বাইরে আরো অভিবাসী লেখক আছে কি যাদের লেখা ঢাকা কি কলকাতার পত্রপত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, বা বই প্রকাশিত হচ্ছে? এজন্য আমাকে খুব বেশি খোঁজ নিতে হয় নি। এবার বেশ কয়েকজন লেখকের রচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে যারা এর আগে হৃদবাংলার জন্য লেখেননি। এঁদের অনেকেই নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় লেখেন, দেশে একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। এদের লেখা এবারের সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আমি অত্যন্ত প্রীত।

আরেকটি বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল। সাহিত্যের সঙ্কলনে গল্প, ছড়া, কবিতা তো থাকবেই এবং তারই প্রাধান্য থাকবে। সেটা মাথায় রেখেই আমি এবার প্রবন্ধ সাহিত্যের ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হয়েছি। গল্প কবিতা ছাড়াও নানান বিষয়ে বাংলার চর্চার বৃদ্ধি সাহিত্যের দিগন্তকে প্রসারিত করে। দেশের বাইরে বিজ্ঞানচর্চা বা মানববিদ্যা চর্চায় কত বাঙালি পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কত বিষয় নিয়ে লিখতে পারেন। এবারের সঙ্কলনে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতি নিয়ে লিখেছেন। National Science Foundation-এর অনুদান নিয়ে এ্যালাস্কার পরিবেশ দূষণ নিয়ে কাজ করছেন এক

প্রকৌশলী অধ্যাপক, তিনি লিখেছেন এ্যালাস্কা সম্বন্ধে। এক তরুণ বিজ্ঞানী ইম্যুনোলজিতে ডক্টরেট করছেন, তাঁর নেশা অজানা বাঙালি বিজ্ঞানীদের খোঁজ বের করে করে তাদের পাঠকসমাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তিনি লিখেছেন একজন অজানা বিজ্ঞানীকে নিয়ে। এবিষয়ে রুচিবাগীশ সাহিত্যামোদীদের যদি ভ্রুকুঞ্চিত হয়, আমি সবিনয়ে বলব যে বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে আরেকটু প্রসারিত করা বাঞ্ছনীয়। ইংরেজিতে যাকে non-fiction বলে, সেই অঙ্গনে বাংলা ভাষা ততটা সমৃদ্ধ নয়। বিশ্বায়নের যুগে যখন অঙ্গুলিমেয় কয়েকটি ভাষার চাপে বাংলা ও অন্যান্য ভাষা কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে, এমন সময়ে সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহার উৎসাহিত করা জরুরি। সর্ববিষয়ে বাংলার চর্চায় বাংলা সাহিত্য লাভবান হবে, সমৃদ্ধ হবে।

লেখা বাছাইয়ের ব্যাপারে আমরা খানিকটা উদার হয়েছি। বিশ্বের নানান স্থান থেকে বহুবিচিত্র কণ্ঠস্বরকে সাধ্যমতো এই সঙ্কলনে স্থান করে দিয়েছি। প্রথিতযশা লেখকের উত্তম লেখার পাশাপাশি সৌখিন লেখকের লেখাও এখানে জায়গা করে নিয়েছে। মনে করেছি, লেখার পালিশে যদিবা কিছুটা খামতি থাকে, মৌলিক অভিজ্ঞতার অনন্যতা সেটা পুষিয়ে নেবে।

আমি প্রতিটি লেখককে পরিষদের পক্ষ থেকে লেখা দেবার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাতে চাই। প্রধান সম্পাদক জ্যোতিপ্রকাশ দত্তকে নানান বিজ্ঞ পরামর্শের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ আহবায়ক পূরবী বসুকে তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয়ের জন্য। সেই সাথে উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য পরিষদকে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে এই গুরদায়িত্ব দেবার জন্য। সম্পাদকীয় সহযোগীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া হৃদবাংলা প্রকাশিত হতো না। ফারজাহান রহমান শাওন একগুচ্ছ গুণী লেখকদের খোঁজ দিয়েছে। বাংলাদেশে মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করেছেন সৈয়দ আহসান হাবীব। শুধু মুদ্রণ নয়, সমস্ত বই ডাকে আমেরিকা পাঠাবার ব্যবস্থাও তাঁর। বই ডেস্কটপে তৈরি এক জিনিস, আর তার মুদ্রিত রূপ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কী অপূর্ব কাজ উনি করেছেন, সেটা যারা মুদ্রিত কপি দেখবেন, তারা বুঝবেন। এঁদের সবার জন্য ধন্যবাদ আর ভালোবাসা।

আন্তরিকতা আর শ্রমের কোন কমতি ছিলনা, কিন্তু তারপরও হয়তো কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেল। সম্পাদক হিসেবে তার দায়িত্ব এককভাবে আমি নিলাম। এজন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এই সঙ্কলন যদি পাঠকদের আনন্দ দেয় তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

আশফাক স্বপন
লরেন্সভিল, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

লেখক পরিচিতি

অতনু চক্রবর্ত্তী যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।ইমিউনোলজিতে পিএইচডি করছেন অবার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে।গবেষণার পাশাপাশি আগ্রহ সাহিত্য ও সঙ্গীতে।বাঙালি বিজ্ঞানীদের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস তুলে ধরবার আগ্রহ থেকে শুরু করেছেন 'মেঘে ঢাকা তারা: বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি বিজ্ঞানী' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

অদিতি ঘোষদস্তিদার যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। গণিতের অধ্যাপিকা। নেশা লেখালেখি। লেখা বেরিয়েছে 'সানন্দা,' 'আনন্দবাজার পত্রিকা,' 'বাংলা লাইভ', 'পরবাস,' সহ নানান দেশের পত্রপত্রিকায়। 'অভিব্যক্তি নিউ জার্সি' পত্রিকার সম্পাদিকা। মিশিগান থেকে প্রকাশিত 'উদ্ভাস' পত্রিকা এবং কলকাতার কাফে টেবিলের 'অবসর' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে আছেন। প্রিয় বিষয় ছোট গল্প, অণুগল্প।

অমিত চক্রবর্তী যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। ক্যানসাস স্টেট ইউনিভারসিটি-তে কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের ডিন। ছাত্রজীবনে কলকাতার নানান পত্রপত্রিকায় রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কবিতা মার্কিন দেশে নানা বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।নিউ জার্সি থেকে প্রকাশিত 'অভিব্যক্তি' -এর কবিতা বিভাগের সম্পাদক। প্রথম কবিতার বই 'অতসীর সংসারে এক সন্ধ্যাবেলা' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

অমিতাভ রক্ষিত যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। প্রযুক্তিবিদ্যায় পিএইচডি।আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শরীর ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিষয়ে নিজস্ব ব্যবসায় সংযুক্ত। মার্কিন দেশে এসে ৩৫ বছর লেখায় ছেদ পড়ে ।সম্প্রতি লিখতে শুরু করেছেন।পাঁচটা মৌলিক নৃত্যনাট্য এবং তিনটি মৌলিক নাটক লিখেছেন এবং মঞ্চস্থ করেছেন। কল্পবিজ্ঞানের বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। প্রকাশিত এবং প্রকাশিতব্য বইয়ের সংখ্যা সাত।

আনিস আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।বাংলাদেশে গণজাগরণ মঞ্চের উত্থানের সময় স্বাদেশিক অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লেখা শুরু করেন।বেতার সম্প্রচারক হিসেবে বিবিসি লন্ডনে কাজ করেছেন, এখন ভয়েস অফ আমেরিকায় আছেন। ২০১০ সালে ভয়েস অফ আমেরিকায় স্বর্ণ পদক লাভ করেন । বাংলাদেশের এবং প্রবাসের পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ।তাঁর প্রকাশিত কবিতার বইয়ের সংখ্যা সাতটি । তাঁর একটি গদ্য গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

আনিসুল হক জার্মানিতে থাকেন। পেশায় সফটওয়্যার প্রকৌশলী।তাঁর ভ্রমণ কাহিনী, ছোট গল্প ও জার্মান সাহিত্য থেকে বাংলায় কিছু অনুবাদ বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে।

আনোয়ার ইকবাল যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। পেশায় স্থপতি।স্নাতকোত্তর পড়াশোনার বিষয় নগর পরিকল্পনা ও ব্যবসায় প্রশাসন।আশির দশকের শুরুতে মার্কিন দেশে আসেন।লেখালেখি করেন শখে, প্রায় পাঁচ দশক ধরে। পত্রপত্রিকা, সামাজিক মাধ্যম ও বিভিন্ন সাময়িকীতে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। 'বুয়েটামি' ও 'আহমেরিকা' তার দুটি প্রকাশিত বই।

আবু জুবায়ের ফ্রান্সে থাকেন। কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ ও বিজ্ঞান বিষয়ক ২০টির বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্যারিস থেকে প্রথমবারের মত আয়োজিত বাংলা আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবের আহবায়ক। 'লা ফনেট দ্য প্যারি' আন্তর্জাতিক সাহিত্যপত্রের সম্পাদক। 'প্যারিসের জানালা' -এর প্রধান সম্পাদক। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা, গবেষণা ও গ্রন্থনা করেছেন।প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

আমীনুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার থেকে সাংস্কৃতিক সংশ্লেষ বিষয়ে পিএইচডি ।বর্তমানে শিক্ষকতা করছেন ভার্জিনিয়ার জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ে। দক্ষিণ এশিয়াগামী আমেরিকান কূটনীতিকদের প্রশিক্ষণে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আছেন । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যানচেস্টার মেট্রপলিটান বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া এবং ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন-মেডিসন-এ শিক্ষকতা করেছেন। মূলত গদ্য লেখেন, মাঝে মাঝে টুকরো কবিতাও।

আমীরুল আরহাম ফ্রান্সে থাকেন। চলচ্চিত্রকার, চিত্রনাট্যকার, প্রযোজক ও কবি।তার নির্মিত উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে 'Antemanha,' 'The Devil's Water,' 'A Banker for the Poor,' 'The Lost Souls of Bangladesh,' অন্যতম ।তাঁর বই 'Shamsur Rahman: La plume contre le fusil' শামসুর রাহমানের কবিতার ফরাসী অনুবাদ। প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ The Forgotten Mother Language। তাঁর রচনা 'কৃত্তিবাস,' 'নৌবত,' 'কেয়াপাতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।
আরিফ মাহমুদ যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফাইনান্সিয়াল এইড পরিচালক হিসেবে কর্মরত। গল্প ও রম্যরচনা লেখেন।তাঁর ছোট গল্প 'প্রথম আলো' গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেছে এবং টিভি নাটক হিসেবে সম্প্রচারিত হয়েছে।

আলোলিকা মুখোপাধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। 'বসুমতী' ও 'কৃত্তিবাস'-এ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতার 'বর্তমান' পত্রিকায় ২৬ বছর 'প্রবাসীর চিঠি' কলাম লিখেছেন, যা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার'-এ গল্প প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত গল্প সঙ্কলন 'পরবাস', 'এই জীবনের সত্য', 'মেঘবালিকার জন্য', 'আরোহন,' ও 'দেশান্তরের স্বজন।' বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য একাধিক সম্মাননা পেয়েছেন।

আহমাদ মাযহার যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। প্রাবন্ধিক, গবেষক, শিশুসাহিত্যিক, অনুবাদক ও সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছেন।ছোটদের জন্য গল্প,কবিতা ও প্রবন্ধ দিয়ে যাত্রা শুরু। পরবর্তী কালে সমাজ-চিন্তা ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ, সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা ও সমালোচনা লিখছেন।রচিত-অনূদিত-সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা ষাটের অধিক। 'বইয়ের জগৎ' নামে বই-সমালোচনা বিষয়ক ত্রৈমাসিক সম্পাদনা করেছেন।

এরশাদ খান যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। দীর্ঘ প্রবাস জীবনের অনেকটা সময় লেখালেখি থেকে দূরে ছিলেন। এখন নিয়মিত বাংলা এবং ইংরেজি কবিতা লিখছেন প্রায় চার বছর। সমাজের নিপীড়িত মানুষের কথা, ফেলে আসা শৈশব, অভিমানী প্রেম, কবিতার বিষয়বস্তু। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কাচঘর'।

এশরার লতিফ যুক্তরাজ্যে থাকেন। তিনি উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও ছড়া লেখেন॥ তাঁর ছোট গল্প বাংলাদেশ, ভারত এবং ইউরোপে পুরস্কারপ্রাপ্ত। প্রকাশিত বই 'স্ফটিক বাড়ি ও অন্যান্য গল্প' (গল্প

সঙ্কলন), ‘গোধূলি রিসোর্ট’ (উপন্যাস), ‘অলাতচক্র’ (উপন্যাস), ‘বর্ণ-পরমাণু’ (উপন্যাস) ‘প্র পঞ্চভুজ’ (উপন্যাস) এবং 'গল্পদ্রুম' (গল্প সঙ্কলন)।

এহসান নাজিম যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। পেশায় প্রকৌশলী। ছাত্রজীবনে প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই ‘বিচ্ছিন্ন স্বদেশ বিষণ্ণ তুমি’। ২৬ বছর পর প্রকাশিত কবিতার বই ‘কোনোদিন তুমি বর্ষা বর্ষা। প্রবাসে দ্বিতীয় প্রজন্মের বাচ্চাদের জন্য ‘সৃজন পাঠশালা’-এর সাথে যুক্ত।

কাজী রহমান যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। কবিতা ও ব্লগ লিখতে ভালবাসেন । কর্মজীবনে আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা, ইলেক্ট্রনিক্স ও কারিগরি ব্যবস্থাপনায় কাজ করেছেন। প্রকাশিত কবিতার বই ‘তারাধুলো, জল ও নস্টালজিয়া’ এবং ‘'তুমি আমার বুকের ভেতর থাকো’ । মুক্তমনা ব্লগ সহ অনলাইনে লেখালেখি করেছেন।

কানিজ পর্ণা যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।পেশায় চিকিৎসক।কবিতা দিয়েই লেখালেখি শুরু।অবসরে গান গাইতে পছন্দ করেন। সুদীর্ঘ একটা সময় সব কিছু থেকে দূরে রয়েছেন।

কামরুন জিনিয়া যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স ও মাস্টার্স l সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থা আকাশলীনা'-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট l বাৎসরিক বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্য সঙ্কলন ‘Akashleena : A Literary Anthology of the Bangladeshi Diaspora--Poems, Essays and Short Stories’-এর সম্পাদকl এটি পেপারব্যাক, কিন্ডেল ই-বুক এবং অডিও বুক হিসেবে প্রকাশিত।বর্তমানে ডক্টরেটের জন্য পড়াশোনা করছেন।

কেয়া ওয়াহিদ কানাডায় থাকেন। ব্যাঙ্ক অব মন্ট্রিঅল-এ কর্মরত। লেখালেখি ছোটবেলা থেকে। তার লেখা দৈনিক পত্রিকা, সঙ্কলন ও লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। একটি যৌথ কবিতার বই তার প্রথম প্রকাশিত বই। একক বই প্রকাশে আগ্রহী।

খায়রুল আনাম যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। প্রকৌশলী ও লেখক। বাংলাদেশে কর্মজীবন কর্ণফুলি পেপার, শিল্পব্যাংক ও ইস্টার্ন রিফাইনারীতে। প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ে পরামর্শদাতা। প্রকাশিত বই ছয়টি। গল্প, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও ভ্রমণ কাহিনী লেখেন। ভারত, বাংলাদেশ ও আমেরিকার পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বেঙ্গলি লিটারেচার গোজ গ্লোব্যাল ও নর্থ আমেরিকা বেঙ্গলী লিটারেরি সোসাইটি-এর সঙ্গে জড়িত।

গাজী আবদুর রশীদ ইরানে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে। ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থার বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা বিভাগে কর্মরত। সাহিত্যচর্চা ছোটবেলা থেকে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখা ও আবৃত্তির অঙ্গনে বিচরণ। নানা পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতার বই ‘পান্থ হৃদয়’ প্রকাশিতব্য।

চকোরী মিত্র যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। নৃত্যে তাঁর বিশেষ ঝোঁক। পারিবারিকভাবে সমৃদ্ধ সাহিত্য এবং থিয়েটারের উত্তরাধিকার পেয়েছেন। সাহিত্য পাঠ করেন নিয়মিত। সামাজিক কাজে নিরুপায় মানুষের পাশে থাকতে চান।

চয়ন মল্লিক কানাডায় থাকেন। খুব ছোটবেলা থেকেই বই পড়া আর গান গাওয়ার অভ্যাস। পেশায় ইংরেজির শিক্ষক। তাঁর আগ্রহ রহস্য গল্প, ভ্রমণ আর রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে তাঁর ভাবনা লিপিবদ্ধ করা। অনলাইন সাময়িকী ‘পেন্সিল’-এ প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বই প্রকাশ তাঁর একটি স্বপ্ন।

জমির হোসেন ইতালিতে থাকেন। চাঁদপুর জেলার ‘দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ’ , ঢাকার ‘আজকের কাগজ,’ ‘মানবজমিন,’ ‘দিনকাল,’ ‘খবরপত্র’ এবং ‘দৈনিক যুগান্তরে’ কাজ করেছেন। প্রবাসী সংবাদকর্মী

হিসেবে প্রায় এক যুগ ধরে নিয়মিত সংবাদ লিখছেন। নিউজ-২৪ ডটকমের ইতালি প্রতিনিধি। ২০১৬ সালে 'দৈনিক চাঁদপুর কন্ঠ' পাঠক ফোরাম সম্মাননা পেয়েছেন।প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রবাসে মেঘ-জ্যোৎস্না'।

জাহান রিমা যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। পেশায় দন্তচিকিৎসক, নেশায় লেখক। জন্ম বাংলাদেশের সন্দ্বীপ উপজেলায়।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ, ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। ঢাকা থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা। যুক্তরাষ্ট্রে মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয় কলাম্বিয়া থেকে সাংবাদিকতায় ডক্টরেট। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছাড়াও কাজ করেছেন জন ওয়াইলি প্রকাশনা সংস্থায়। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৫০-এর বেশি। সাহিত্যে অবদানের জন্য একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরষ্কার, সমকাল-ব্র্যাক ব্যাঙ্ক পুরষ্কার, অন্যদিন-এক্সিম ব্যাঙ্ক পুরস্কারসহ বহু সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন।

তাসনীম হোসেন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং টেক্সাস টেক থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির পর দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন আইবিএম-এ। অবসরে শখের লেখালেখি শুরু ২০১০ থেকে, সচলায়তন.কম ওয়েবসাইটে।

দালান জাহান সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে থাকেন। কবিতা লিখতে ভালোবাসেন। প্রতিবাদ তাঁর কণ্ঠস্বরের প্রধান প্রবণতা। তাঁর কবিতা বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে ।প্রকাশিত চারটি কবিতার বইয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ব্লাড ফায়ার'।

দীপেন ভট্টাচার্য যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। জ্যোতিঃপদার্থবিদ। বড় হয়েছেন ঢাকায়। উচ্চতর শিক্ষা রাশিয়ার মস্কোয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে। ঢাকা থেকে তাঁর চারটি উপন্যাস এবং তিনটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখায় সময়, মানব অস্তিত্বের দর্শন এবং ভবিষ্যতের সামাজিক ও কারিগরি পরিবর্তনের চিন্তা প্রাধান্য পায়।

দেব বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। পদার্থবিদ্যার গবেষক। পাশাপাশি লেখালেখি ও স্থিরচিত্র গ্রহণ করেন। তাঁর কবিতা, অনুবাদ, গল্প ও প্রবন্ধ দেশ বিদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উত্তর আমেরিকার একাধিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যুক্ত ।

ধনঞ্জয় সাহা যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। কবি, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী। নিউ ইয়র্কে আলবার্ট আইনস্টাইন মেডিকেল কলেজে মেডিসিনের অধ্যাপক। প্রকাশিত কবিতার বই 'প্রেম পাথরের কারখানা' এবং ছড়া সঙ্কলন 'সোনামণিদের ছড়া'। শিশুদের জন্য আরও ছড়ার বই প্রকাশের পথে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে লেখা গল্পের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কার পেয়েছেন।

নাভিদ সালেহ যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস, অস্টিন-এ পরিবেশ প্রকৌশল অনুষদে অধ্যাপনা করেন। National Science Foundation-এর অনুদানে আলাস্কায় পরিবেশ দূষণ নিয়ে গবেষণা করছেন। কার্নেগী মেলন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্য সাময়িকী 'শৈলী' এবং বিতর্ক বিষয়ক লিটল ম্যাগাজিনে লেখালেখি করতেন। প্রকাশিত বই 'দর্শন ভাব' সমসাময়িক সমাজ চিন্তা, দর্শন, সংস্কৃতি, এবং পরিবেশ বিষয়ে লেখা নিবন্ধ সঙ্কলন ।
সমসাময়িক সমাজ চিন্তা, দর্শন, সংস্কৃতি, এবং পরিবেশ বিষয়ে লেখা নিবন্ধ সংকলন

নাহার তৃণা যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। মূলত গল্প লেখায় ঝোঁক। পাশাপাশি অনুবাদ, প্রবন্ধ, সিনেমা- সাহিত্য সমালোচনা লেখেন। 'অবসর,' 'পরবাস,' 'গল্পপাঠ,' '৪নম্বর প্ল্যাটফর্ম,' 'ঐহিক,' 'ইরাবতী,' 'মেঘচিল,' ওয়েবজিন এবং 'শব্দঘর,' 'অনন্যা,' 'প্রথম আলো,' 'বাংলা একাডেমি অনুবাদ জার্নাল,' 'নবান্ন' -তে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। 'গল্পপাঠ,' 'পড়ুয়া' এবং 'শিশুকাগজ' ওয়েবজিনের সঙ্গে জড়িত। প্রকাশিত গ্রন্থ 'স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট' ও 'এক ডজন ভিনদেশি গপ্পো'।

নাহার মনিকা কানাডায় থাকেন। ক্যুবেক প্রদেশে সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগে কর্মরত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত বই 'মন্থকূপ' (উপন্যাস), 'বিসর্গ তান' (উপন্যাস), 'দখলের দৌড়' (গল্প), 'জাঁকড়' (গল্প), এবং 'পৃষ্ঠাগুলি নিজের' (গল্প) এবং 'চাঁদপুরে আমাদের বর্ষা ছিল' (কবিতা)।

নিঘাত করিম যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। ছোট্ট বয়সে প্রথম ছড়া যখন 'ফুলকুঁড়ি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।তাঁর কবিতা 'বেগম', 'যায় যায় দিন' সহ দেশ-বিদেশের বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'গোধূলির ছোঁয়া' ও 'প্রতিবিম্বের কাছাকাছি' তাঁর দুটি প্রকাশিত বই। গল্পের বই 'শেষ কদম ফুল' প্রকাশিতব্য। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত। আবৃত্তি ও ছবি তোলা তাঁর শখ।

নিরুপমা রহমান অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদে অধ্যাপনার পাশাপাশি উচ্চতর ও বৈশ্বিক শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন আর তার প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি দীর্ঘদিন উপমহাদেশখ্যাত গুরুদের কাছে সঙ্গীতে তালিম নিয়েছেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আর বাংলা গানের সাধনা করে চলেছেন। বাংলা ভাষা-সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি বাংলা গানের বাণী ও সুরের মেলবন্ধনের খোঁজ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। জীববিজ্ঞানী থেকে পেশা বদলে বহু বছর সার্বক্ষণিক মানবাধিকার কর্মী। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানচেতনা বিষয়ে লেখালেখির বাইরেও তাঁর লেখার বিষয়বস্তু স্মৃতি ও প্রেম। 'ঘটিকাহিনি' এবং 'যে কলকাতাকে ভালোবেসেছি' তাঁর দুটি স্মৃতিগ্রন্থ। প্রথম কবিতার বই 'মেঘভাঙা রোদ্দুরে মাতাল কবির দল' ।'Music Box and Moonshine' তাঁর অনুদিত বাংলা ছোটগল্পের সঙ্কলন।

পূরবী বসু যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। বিজ্ঞানী ও লেখক। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৫৫। বাংলা সাহিত্যে মৌলিক অবদানের জন্যে তিনি 'অনন্যা' ও 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা মুন্সীগঞ্জ শহরে। তিনি নিউ ইয়র্ক ও কলোরাডো অঙ্গরাজ্যে দীর্ঘদিন বসবাস করার পর সম্প্রতি পোর্ট সেইন্ট লুসি, ফ্লোরিডায় বাসা বেঁধেছেন।

প্রণব বর্ধন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির এমেরিটাস প্রফেসর। দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিক্স, দিল্লির ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউট আর এম আই টি -তেও শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৮২ সালের গাগেনহাইম ফেলো। তার প্রবন্ধ বিশ্বের নানান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর স্মৃতিকথা 'স্মৃতিকণ্ডূয়ন' 'দেশ' সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। 'দারিদ্র্য নিয়ে কনফারেন্স ও অন্যান্য প্রবন্ধ' তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন। বর্তমানে 3quarksdaily.com-তে ব্লগ লেখেন।

প্রবীর বিকাশ সরকার জাপানে' থাকেন। সাহিত্যচর্চার শুরু ১৯৭৬ সালে। জাপান, জাপান-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক গবেষণার প্রিয় বিষয়। প্রকাশিত বই 'উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে', 'অবাক কাণ্ড', 'জানা অজানা জাপান' (তিন খণ্ড), 'রবীন্দ্রনাথ ও জাপান: শতবর্ষের সম্পর্ক', 'সূর্যোদয়ের দেশে সত্যজিৎ রায়'। অধুনালুপ্ত 'মাসিক মানচিত্র' ও 'মাসিক কিশোরচিত্র' -এর সম্পাদক।

ফারজাহান রহমান শাওন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।বর্তমানে ডক্টরেট পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে আছেন। তিনি লিখতে ভালোবাসেন কবিতা, বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ এবং জীবন অভিজ্ঞতা। এ পর্যন্ত তার রচনা কয়েকটি অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ।তাঁর পরিকল্পনা রয়েছে নিজের জীবনের গল্প নিয়ে একটি বই প্রকাশের।

ফেরদৌসী পারভীন ইরানে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স ও মাস্টার্স। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে ১৫ বছর শিক্ষকতা করার পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকে সাহিত্য ভালোবাসেন।

বন্যা হোসেন কানাডায় থাকেন। সামাজিক সমস্যা, নারীর আটপৌরে জীবন নিয়ে গল্প লিখতে পছন্দ করেন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, দর্শন ও ঐতিহাসিক পটভূমিসম্বলিত গল্প তাঁর প্রিয়। তাঁর গল্প 'পেন্সিল বর্ষপূর্তি সংকলন ২০১৯,' 'কানাডার সংকলন ২০১৯' এবং 'আমাদের গল্প ' ২০২১ সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত বই 'মাইনী নদীর বাঁকে' (উপন্যাস), 'বনসাই জীবন' (গল্প সঙ্কলন), 'নিভৃতি' (উপন্যাস)।

বাসবী খাঁ ব্যানার্জী জার্মানিতে থাকেন।পেশায় শিক্ষাবিদ, অধ্যাপিকা ও লেখিকা।'আনন্দবাজার', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ,' 'এশিয়ান এজ,' 'কালান্তর' পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী ও জার্মানে গবেষণামূলক লেখা করলেও ৩০ বছর বাংলায় লেখা হয়নি। ২০১৮ সাল থেকে আবার নানা পত্রিকা, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ই-ব্লগে বাংলায় লেখা শুরু করেন। মানুষের সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েন ও ছিন্নমূল মানুষের কথা লেখেন।

বিজন সাহা রাশিয়ায় থাকেন। পদার্থবিদ। বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজ নিয়ে লেখেন। 'আজকের পত্রিকা', 'প্রগতির যাত্রী,' 'জ্বলদর্চি,' 'The Wall', 'বিজ্ঞান ভাবনা' প্রভৃতি পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত বই 'আকাশ ভরা সূর্য তারা - কসমোলজির সেকাল একাল', 'একাত্তরের সাত সতেরো'।

বিদিতা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। কিশোরী বয়সে প্রথম কবিতা লেখেন ।তার আগেই বাবা-মায়ের হাত ধ'রে কবিতার সাথে আত্মীয়তা। কলকাতায় দীর্ঘদিন আবৃত্তিকার হিসেবে কাজের সুবাদে সেই আত্মীয়তা গাঢ় হয়েছে। কলকাতা আর মার্কিন দেশের পত্রপত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সেই সব কবিতা একত্র করে বই প্রকাশের ইচ্ছা আছে।

বিপাশা বাশার যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। পেশায় চিকিৎসক, ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। অনলাইনের সাহিত্য আসরে রহস্য-রোমাঞ্চ, ছোট গল্প এবং সমকালীন উপন্যাস লেখেন। তাঁর প্রথম রহস্য উপন্যাস 'মায়াজাল' প্রকাশিত হয়েছে। একটি প্রেমের উপন্যাস প্রকাশনার অপেক্ষায়।

ভক্তি মজুমদার যুক্তরাজ্যে থাকেন। পশ্চিমা দেশগুলোতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত ভিন্নতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় কীরূপ প্রভাব ফেলে সেই বিষয়ে আলোকপাত করতে পছন্দ করেন। এ বিষয়ে এ্যাবারডিন ইন্টারন্যাশনাল এবং মাল্টিকালচারাল সেন্টারসমূহ থেকে প্রকাশিত সাময়িকীতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন গীতিকারের গানগুলোর পটভূমি পর্যালোচনামূলক একটি বই এবং স্বকণ্ঠে সে গানগুলোর একটি এ্যালবাম প্রকাশের চেষ্টা করছেন।

ময়নূর রহমান বাবুল যুক্তরাজ্যে থাকেন। উদীচী, কুহেসাস, বাংলাদেশ লেখক শিবির, সমস্বর সহ নানা সাংস্কৃতিক সংগঠনে দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছেন । সত্তর দশক থেকে তাঁর লেখালেখি শুরু।বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং সঙ্কলন সাময়িকীতে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বহু প্রকাশিত বই-এর মধ্যে 'প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি' (গল্প), 'স্বদেশ আমার মা আমার' (কবিতা), 'ভালোবাসায় আগুন জ্বলে' (কবিতা), 'ছড়া ডুইছড়া' (ছড়া) 'চোখের দেখা প্রাণের কথা' (প্রবন্ধ) অন্যতম।

মল্লিকা ধর যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। লেখালিখির সূচনা ছোটবেলা থেকে। তাঁর ছোটগল্প ও কবিতা 'দেশ', 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা থেকে দু'টি নভেলা ও একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে ।

মুসলেমা পারভীন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি। মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি-তে অধ্যাপনা করেন।আর্গন ন্যাশনাল ল্যাব এবং ন্যাশনাল সুপারকন্ডাক্টিং সাইক্লোট্রন ল্যাব-এ কাজ করেছেন। বিশ বছরের বেশি সময় ধরে লেখালেখি করছেন। প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই 'আঁধারের গায়ে গায়ে জোনাকি জীবন' এবছর প্রকাশিত হয়েছে।

মৃদুল রহমান যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনে অনার্স ও মাস্টার্স।লেখালেখি করেন আত্মসুখ এবং দায়বোধ থেকে।

মোস্তফা তানিম যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। পেশায় তথ্য-প্রযুক্তিবিদ। লেখক ও কলামিস্ট। তিন দশক ধরে গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, রম্য রচনা এবং নন-ফিকশন লিখছেন। তাঁর কল্পবিজ্ঞান ও শিশু সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পনের। 'প্রথম আলো' উত্তর আমেরিকা সংস্করণের নিয়মিত লেখক।

মোস্তফা সারওয়ার যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। পেশায় ভূ-পদার্থবিজ্ঞানী। প্রকাশিত কবিতার বই 'প্রার্থিত নির্বাসনের উন্মাদ পদাবলী' 'বিনষ্ট রূপান্তরের বিকারতত্ত্ব', 'অনুলিপি: অন্তরঙ্গ মুহূর্তে'। কলাম ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' দৈনিকে এবং অনলাইনে বিডিনিউজ২৪-এ। নিউ ইয়র্কের বাংলা কেবল টিভি চ্যানেল টিবিএন২৪-এর রাজনৈতিক ভাষ্যকার। এছাড়া ঢাকার একাত্তর টিভি, নিউজ২৪-এর অনুষ্ঠানেও ভাষ্যকার। ইংরেজি নিবন্ধ যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুরের ও ঢাকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

মোস্তাফিজুর রহমান অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন।পেশায় সফটওয়্যার প্রকৌশলী। ছাত্রজীবনে লেখালেখির শুরু, মাঝে দীর্ঘ বিরতির পর আবার নিয়মিত লেখালেখি করছেন। একটি গল্পগ্রন্থ ও তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে ।

মোহাম্মদ ইরফান যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। ছোটগল্প লেখেন। সাহিত্য নিয়ে আড্ডা, আলাপে প্রবল উৎসাহ তাঁর।

সাইফুল ইসলাম লিবিয়াতে থাকেন। কল্পবিজ্ঞান লেখক। ঢাকা থেকে 'প্রজেক্ট প্রজেক্টাইল', 'ও-টু' ও 'লোলার জগৎ' এবং কলকাতা থেকে গল্প সংকলন 'ঈশ্বরের গণিত ও অন্যান্য' তার প্রকাশিত বই। তাঁর আরো দুটি প্রকাশিত বই।'আর্কোইচ কসমস' ও 'মহাবিশ্বের মহাবিন্দু ও আরও একটি'।

মৌ মধুবন্তী কানাডায় থাকেন। নির্যাতনের বিরুদ্ধে লিখতে অভ্যস্ত। ভালোবাসেন নিরীক্ষাধর্মী লেখা লিখতে। বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকসহ ,ভারত, আমেরিকা ও কানাডার পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে ১১টি বই, ইউরোপ থেকে একটি ইংরেজি বই, তিনভাষায় রচিত একটি কবিতার বই, আরো দুটি ইংরেজি কবিতার বই এবং ৫০০ হাইকু নিয়ে একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে।

রতন কুণ্ডু অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও অস্ট্রেলিয়া ফেডারেল সরকারের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। কবিতা, নিবন্ধ, গল্প, সংবাদ ও উপন্যাস সিডনি ও বাংলাদেশে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। প্রকাশিত বই স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা 'মীরামঙ্গল' (উপন্যাস)। 'এক প্রতিবন্ধীর জবানবন্দি' (উপন্যাস), 'বিবর্ণ বিকেল' (গল্প সঙ্কলন) ও 'নিশি জাগরণ' (কবিতা সঙ্কলন) প্রকাশিতব্য।

রশ্মি ভৌমিক যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। RICOH Corporation-এ কাজ করেন। বাংলায় ও ইংরেজিতে ছোট গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর লেখা ঢাকার 'Daily Star' দৈনিকে ও bdnews24.com অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি যোগ-ব্যায়ামের শিক্ষকতা করছেন।

রাকিব হাসান কানাডায় থাকেন। চিত্রশিল্পী। 'আরব্ধ' ছোট কাগজ সম্পাদনার মধ্য দিয়ে লেখালেখি শুরু। আফ্রিকার চিত্রকলায় আকৃষ্ট হয়ে ১৯৯১ সালে কেনিয়ায় পাড়ি জমান। ফাইন আর্টস-এ পড়া শেষ করে সেখানে পেশাদার শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলেন চিত্রশালা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পঁচিশটি একক এবং বহু

যৌথ প্রদর্শনী করেছেন। ২০০০ সালে মন্ট্রিঅল-এ গড়ে তোলেন নিজস্ব চিত্রশালা। ছবি আঁকার পাশাপাশি কবিতা এবং চিত্রকলা বিষয়ে লেখেন।

রাজ হামিদ যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। বাংলাদেশে ডাক্তারি পাস করে মার্কিন দেশে জনস্বাস্থ্য নিয়ে পড়াশোনা করতে আসেন। দীর্ঘদিন হোটেল ম্যানেজমেন্টে কাজ করেছেন। অল্প বয়স থেকে কবিতা লেখেন। কলেজ জীবনে কবিতা পুরস্কৃত হয়েছে।

রিটন খান যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। তথ্যপ্রযুক্তিবিদ। বাংলা বইয়ের প্রচারের লক্ষ্যে Facebook-এ 'বইয়ের হাট' গ্রুপ স্থাপন করেন। গ্রুপে সারাবিশ্বের প্রায় ১ লক্ষ সদস্য, এবং সেখানে ৪০,০০০-এর বেশি বাংলা বই লভ্য। 'বইয়ের হাট' Amazon kindle-এ ৮০টির বেশি বাংলা বই প্রকাশ করেছে।

রুদ্র শংকর যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে অণুজীববিজ্ঞানের অধ্যাপক। কবি ও গীতিকার। তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতার বই ঢাকা এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
রুমানা গনি যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনে স্নাতক ও মাষ্টার ডিগ্রি রয়েছে। প্রকাশিত কবিতার বই 'হৃদয়ের অনন্ত অম্বরে', 'মন সরোবরে নিভৃত অবগাহন,' ও 'শিকড়ের টান' । ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন।অনলাইন সাহিত্য সংগঠনে মাঝে মাঝে লেখেন ।প্রকৃতি, মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা নিয়ে লিখে আনন্দ পান।

রেজা শামীম যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। মূলত কবিতা লেখেন। ম্যাজিক রিয়েলিজম ও সুরিয়েলিজম আগ্রহের বিষয়।'অনন্যা,' 'শব্দঘর,' 'ঘুঙ্গুর,' 'প্রথম আলো' সহ বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা ও ছোট কাগজে কবিতা ছাপা হয়েছে। 'করপুটে বৃষ্টিজল' প্রকাশিত কবিতার বই। ২০২২ সালে আরেকটি কবিতার বই বের হবে । তাঁর রচিত গান এস আই টুটুল, ইউসুফ খান, এপি শুভ, ফেরদৌস ইমন, লুতফর হাসান ও কণা গেয়েছেন।

লিয়াকত হোসেন সুইডেনে থাকেন। সুইডিশ জার্নালিস্ট ইন্সটিটিউট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অনুবাদে অবদানের জন্য স্টকহোম স্থানীয় সরকার ও সুইডিশ রাইটার্স ইউনিয়ন কর্তৃক পুরস্কৃত। সুইডিশ সাহিত্যের কালজয়ী কিছু বই বাংলায় অনুবাদ করেছেন। প্রায় ১৬টি বই প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বই 'ঘর হতে দুই পা ফেলিয়া'।

লুৎফর রহমান রিটন কানাডায় থাকেন। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা শতাধিক। তাঁর রচনা শিশুকিশোর ও তরুণদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারসহ অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। বাংলাদেশে ছোটদের পাঠ্য বইতে তাঁর কবিতা অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে 'ছোটদের কাগজ' ও 'আসন্ন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কর্মজীবনে সাংবাদিকতা ছাড়াও জাপানে বাংলাদেশ দূতাবাসে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোক্তা সদস্য। বাংলাদেশে টিভি উপস্থাপক হিশেবে সুপরিচিত।

লুনা রাহনুমা যুক্তরাজ্যে থাকেন। কবিতা ও গল্প লেখেন ও অনুবাদ করেন। তার লেখা বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক, দুই বাংলার সাহিত্য পত্রিকা ও ওয়েবজিনে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দুইটি। একটি গল্পগ্রন্থ এবং একটি অনুবাদ গল্পসঙ্কলন প্রকাশনার কাজ চলছে।

শামীম আজাদ যুক্তরাজ্যে থাকেন। কবি। গ্রন্থ সংখ্যা ৩৭। 'The New Yorker' সহ নানা দেশের পত্রিকায় তাঁর কবিতা ও অনুবাদ ছাপা হয়েছে। এডিনবরা ফ্রিঞ্জ ফেস্টিভ্যাল ও বৃটেনের কালচারাল অলিম্পিয়াড-এ কবিতা ও গল্প পরিবেশন করেছেন। ইউকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা।২০১৯-এ এথেন্সের-এ 'পোয়েটস আগোরা' থেকে আবাসিক কবির সম্মাননা এবং ২০২০-এ যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল লটারি থেকে 'আর্টিস্ট ইন দা কমিউনিটি' সম্মাননা পেয়েছেন।

শাহজাহান চঞ্চল সৌদি আরবে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ মাষ্টার্স ডিগ্রি রয়েছে। রিয়াদ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য সাময়িকী 'রাইটার্স' সম্পাদনা করেন। ঢাকার 'দৈনিক আজকের সত্যের আলো'-

এর প্রবাস সম্পাদক। যুক্তরাজ্যের কম্যুনিটি টেলিভিশন 'দ্য গ্লোবাল টিভি'-এর মধ্যপ্রাচ্য সমন্বয়কারী। বাংলাদেশে ও প্রবাসের পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন । প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'মিথিলা মহুয়া', 'অরুন্ধতী মেঘ', 'প্রাগৈতিহাসিক কাসুন্দি', 'প্রিয়তির জলনূপুর'। 'অহনা চলে গেছে' তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ।

শাহাব আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। রাশিয়ায় ডাক্তারি পাশ করেন। বর্তমানে শিশু চিকিৎসক। গল্প, কবিতা, ভ্রমণ সাহিত্য ও উপন্যাস লেখেন। প্রকাশিত বই 'অদৃশ্য মূষিক এক', 'লেনিনগ্রাদের চিঠি', 'কলেজের দিনলিপি', 'দশজন দিগম্বর একজন সাধক', 'হিজল ও দ্রৌপদী মন', 'তিথোনোসের তানপুরা', 'যত্র বয় কুরা নদী', 'লেনিনগ্রাদ থেকে ককেশিয়া' ও 'ককেশিয়ার দিনরাত্রি'।

শীলা মোস্তাফা যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। নব্বই দশকে তাঁর লেখা কাব্যময় কথোপকথন 'বিনাশ ও বিন্যাসে' শমি কায়সার ও মাহিদুল ইসলামের কণ্ঠে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। প্রবাসজীবনে লেখালেখিতে দীর্ঘ বিরতি। ২০১৬ সালে সাংবাদিক মুন্নী সাহার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন কভার করার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্ব রাজনীতি, ভ্রমণ এবং সাংবাদিকতা নিয়ে মুন্নী সাহার সাথে যৌথভাবে লেখা প্রকাশিত বই 'পলিট্যুরিজম'। তাঁর লেখা 'প্রথম আলো', 'ঘুংঘুর', 'অপার বাংলা', 'বাঙ্গালী'-তে প্রকাশিত হয়েছে।

শুকলা গাঙ্গুলি যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। ভারতের পুণে থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা 'প্রবাসী সাথী' ও 'সমভাষের' প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক। ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে অনগ্রসর মহিলাদের নিয়ে অরাসায়নিক রং, সুতি কাপড় ও নকশি কাঁথার উপর কাজ করেন। ভারত, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের পত্রিকার সাথে কবি হিসেবে যুক্ত। একাধিক বিদেশি ভাষায় তাঁর কবিতা অনুদিত হয়েছে।

শুভশ্রী নন্দী যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। আকাশবাণীর শিল্পী ও প্রতিষ্ঠিত বাচিকশিল্পী। বাচিকশিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'শব্দকল্পদ্রুম' এবং 'আটলান্টা আবৃত্তি ও ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র'-এর শিক্ষয়িত্রী। উত্তর আমেরিকার বঙ্গসম্মেলন ও বাংলা পডকাস্টের উপস্থাপিকা। 'দেশ', 'আনন্দবাজার', 'এইসময়' 'এবেলা' ও 'আজকাল' পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। কলকাতার 'তারা টিভি' ও 'রূপসী বাংলা' সহ নানা চ্যানেলে অনুষ্ঠান করেছেন।

শৈবাল তালুকদার যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। অরাকল-এ কাজ করেন। ছোটবেলায় বাংলাদেশে 'সংবাদ'-এর 'খেলাঘর'-এর পাতা, 'ইত্তেফাক'-এর শিশুদের পাতা, 'আজাদী'-এর ছোটদের পাতায় লিখে হাতে খড়ি। চলিষ্ণু মানব জীবন তাঁর কবিতার বিষয়।'কৃত্তিবাস'-সহ অন্যন্য পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

সামা আকবর যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। পেশায় ব্যবসায়ী। ইংরেজি আর উর্দুতে লেখালেখি করছেন বহুদিন। সম্প্রতি বাংলায় লেখা শুরু করেছেন। সাহিত্য আর শিল্পকলার প্রতি ভালোবাসা থেকেই সাহিত্যচর্চা,করেন তবে তাঁর শক্তি আর অনুপ্রেরণার উৎস তাঁর তিন সন্তান। সামাজিক মাধ্যমে Remembering My Inner Child পেজের প্রতিষ্ঠাতা, সেখানে নিয়মিত লেখেন। McGill's Book of Simple Reminders এবং 365 Days of Angel Prayers by Sunny Dawn Johnston-এ তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

সুদীপ্ত ভৌমিক যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। বাংলা নাট্যকার। তাঁর নাটক বাংলা ছাড়াও একাধিক ভাষায় অনুদিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত ও বাংলাদেশে মঞ্চস্থ হয়েছে এবং বিশ্বের নানান পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । তাঁর চারটি নাট্য সঙ্কলন কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকে অবদানের জন্য একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন।

সুব্রতশংকর ধর যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। পিএইচডি করেছেন হাওয়াই ও অস্ট্রেলিয়া থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। বর্তমানে 'গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন'-এ কর্মরত। প্রকাশিত বই 'বাংলাদেশের সংবাদপত্র'। তাঁর আগ্রহের বিষয় সমাজ, সমকাল, শিক্ষা, ইতিহাস এবং আত্মপরিচয়। তাঁর লেখা পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা লেখেন কদাচিৎ, সমকালের ঘটনায় তাড়িত হয়ে।

সেজান মাহমুদ যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। ইউসিএফ কলেজ অব মেডিসিন-এর অধ্যাপক। কথাসাহিত্যিক, গীতিকবি, চলচ্চিত্রকার, কলামিস্ট ও ছড়াকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ৩৫টি, প্রকাশিত গান শতাধিক। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমী পুরস্কার, আওয়ার প্রাইড এওয়ার্ড, রিচমন্ড ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল এওয়ার্ড পেয়েছেন। তাঁর লেখা বাংলাদেশের জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত। চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রকাশিত গবেষণাপত্র, নিবন্ধ শতাধিক।

স্বপন বিশ্বাস কানাডায় থাকেন। লেখার প্রিয় বিষয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা।তাঁর প্রবন্ধ ঢাকার 'দৈনিক 'সংবাদ' ও সাপ্তাহিক 'সন্ধানী' -সহ নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বই 'ঘরবাড়ি', 'সাদাকো ও হাজার সারস' (অনূদিত) ও 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়াস' (ড: তপন বাগচী সহযোগে সংকলিত ও সম্পাদিত) অন্যতম। ভ্রমণ বিষয়ে বই প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।|

হাসান মাসুম আফ্রিকার লেসোথোতে থাকেন। পেশায় চিকিৎসক। লেসোথোয় বাংলাদেশ পোয়েট্রি কর্নার-এর সমন্বয়কারী। কয়েক দশক ধ'রে কবিতা লেখেন ও আবৃত্তি করেন। প্রকাশিত কবিতার বই 'যুবকের খেরোখাতা যুবতীকে', 'আন্ডার দ্যা ব্লু রুফ' । বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কাব্যসঙ্কলনে কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ২০২০ সালে ফেইসবুক লাইভে চার মাসব্যাপী আবৃত্তি সিরিজ-এর যৌথ সঞ্চালক। অনুষ্ঠানে ১১০ জন কবির ৫০০টিরও বেশি নুতন কবিতা আবৃত্তি করা হয়।

হাসান মাহমুদ কানাডায় থাকেন। সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার কর্মী, শারিয়া-গবেষক। তাঁর প্রকাশিত বই 'শারিয়া কি বলে, আমরা কি করি', 'অতঃপর, শারিয়া কি বলে?', 'ব্যক্তি, সাংগঠনিক ও রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতা', 'অজানা একাত্তর' (উর্দু বইয়ের অনুবাদ), 'বাংলার কথা কই' (গল্পবদ্ধ বাংলার ইতিহাস), 'উদভ্রান্ত প্রলাপ' (কবিতার বই)। তাঁর শারিয়া নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যে 'নারী', 'হিল্লা', 'Sharia Conundrum' অন্যতম।

হুমায়ূন কবির যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। পেশায় চিকিৎসক। এপর্যন্ত ১০টি বই প্রকাশিত হয়েছে। চারটি বইয়ের - 'তীর্থযাত্রী তিনজন তার্কিক', 'একজীবনের কথা', 'পারস্য পরবাসে' এবং 'ঘুম নিয়ে কিছু কথা' - ভারতীয় সংস্করণও বেরিয়েছে। শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকী 'ঘুংঘর'-এর সম্পাদক। 'ঘুংঘুর'-এর বছরে চারটি সংখ্যার তিনটি নিউ ইয়র্ক, কলকাতা আর ঢাকার বইমেলায় বের হয়। তিনি নিউইয়র্কের 'মুক্তধারা', আটলান্টার 'সেবা লাইব্রেরি' ও লস এঞ্জেলেসের 'ক্রান্তি'-এর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

হোসনে আরা জেমী কানাডায় থাকেন। পেশা বুদ্ধি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদান। আশির দশক থেকে আবৃত্তির সাথে যুক্ত। প্রয়াত আবৃত্তি শিল্পী শফিক করিমের সাথে তাঁর তিনটি দ্বৈত আবৃত্তি এলবাম বেরিয়েছে। টরোন্টোতে আবৃত্তি সংগঠন 'বাচনিক'-এর সক্রিয় সদস্য।তাঁর প্রকাশিত দুটি কবিতার বই 'বৃষ্টি করে নেবে', ও 'চিত্রপট'। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে শিশুতোষ গল্পের বই 'বিজয়ের হাসি' ও সম্পাদিত কবিতার বই 'শত ভাবনায় বঙ্গবন্ধু'।

꧁ কবিতা ꧂

অমিত চক্রবর্তী

সম্প্রসার

‘আমি বড়ো মূর্খ, আমি নিরন্তর বিদায় বুঝিনি’ – আনন্দ বাগচি

একটা সম্প্রসার চলছে ক্রমাগত
প্রতিটি তারা, ছায়াপথ, নক্ষত্র অন্য তারা থেকে
দূরে চলে যাচ্ছে, এমন নয় যে বিষয়টা বোঝা শক্ত,
একরাশ স্টিকার মেরেছিল কেউ আধফোলা বেলুনে,
এখন তাকে ফোলাচ্ছে এক অজানা ফোর্স, আর
স্টিকারগুলি তাই
একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে।
এরই মধ্যে তুমি কিন্তু বাতিল করোনি আমায়
শুধু দূরে সরে গেছ কোন এক অজানা বলে, আবিষ্কারে,
অথবা সঙ্গী খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত ইদানীং।ধূসর হয়ে যাবে এই চকমকি পাহাড়,
একটা অস্থির এনার্জি ছাইবে আমার চাঁদোয়ায়, ক্যানাপিতে,
শুধু তাকেই ছেড়ে যেতে হয়,
দূরে যেতে হয়
কখনো সোজা হেঁটে কখনও বা লুকিয়ে।এদিকে
এমনই জ্ঞানশূন্য, এমনই আহাম্মক আমি যে তার চলে যাওয়াটা,
দূরে যাওয়াটা, কখনোই ঠিকমত, কখনোই স্বাভাবিক,
কখনোই একেবারে ঘরোয়া করে ফেলতে পারি না।

ম্যানহাটান, ক্যান্সাস, যুক্তরাষ্ট্র

অশোক কর

এক অন্যরকম সকাল

বৃষ্টি ঝরছে
চোখের পাতা চুঁয়ে নামছে নোনাজল
তারপরও একটানা ঝরঝর ঝরঝর অন্তর-বাহির
জলের ফোটাগুলো কী গাঢ় অহংকারী

চোখের ভাষা
অসহায় অভিমানে বড় বেশি নিঃশব্দ
শব্দ-ব্যাকরণ ভুলে এখন বড় বেশি সুরের কাঙাল
ছন্দ মায়ায় শব্দহীন, তবুও সরব

সে এক অন্যরকম সকাল
ভোরের স্তব্ধতা ভেঙে দেয় অথৈ অবকাশ

কেপ কোরাল, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

আনিস আহমেদ

বন্ধুর প্রতি

বন্ধু আমরা দু'জনই--
আমি এবং আমার অনুভূতি
আনন্দের উচ্ছ্বাসে স্পষ্ট উচ্চারণেই
দু'জনই কথা বলি ঘাস ফড়িঙের চঞ্চলতায়
অথবা প্রসন্নতাবিহীন বিষণ্ণতায়
ভাগ করে নিই বেদনার শুকনো রুটিটুকু ।
জিহ্বায় বড় বিস্বাদ লাগে কষ্টের কথাগুলো
পুজোর প্রসাদের মতো গিলে ফেলি চোখ বুজে।

ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি অনুভূতি থেকে
দেয়াল তুলি মেক্সিকান সীমান্তের আদলে
যাতে অনুভূতির অনুপ্রবেশ থেমে যায়
যাতে আবেগের বেগে পড়ে না যাই
এলোমেলো পথের কোন খানা-খন্দে।

কিন্তু বিচ্ছিন্ন করা যায় কী কখনও
আমার থেকে আমারই অনুভূতিকে
নিজেরই এক সত্তার সত্য থেকে
অনুভূতির অনুরণন না পাই যদি
তখন তো মৃত একত্রে দু'জনই যেন
একই কবরে শুয়ে থাকা উভয়েরই।

অনুভূতি তুমি আছো বলেই
আমার এই উচ্ছ্বসিত হাসি শোনে
বিশ্ববাসী প্রত্যহই সকাল সাঁঝে
অনুভূতি তুমি আছ বলেই শিশির-অশ্রু ঝরে।

অনুভূতি তোমাকেই আমি, শুধু তোমাকেই
জেনো ভালোবাসি
তোমাকে নিয়ে আজীবন এ সংসার আমার
তোমার জন্যই কান্না-হাসি।

গেইদার্সবার্গ, মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র

আবু জুবায়ের

তাপ বিরোধী সময়ে

দোকানপাট বন্ধ।চোখ রাঙায় না প্রমিথিউসের মূর্তি।
কয়েক জন লোক শহরের খালি রাস্তায় হাঁটছে
সোডা বাইকার্বোনেট, ইন্ডিয়ান টনিক আর ব্যাগেট
এইসব খাদ্য শব্দ খুব বেশি আওড়াই।
দারুচিনি এবং দুই চা চামচ আদার রস
এখন মাথা নিচু করে অতীতকে তিরস্কার করি
সব স্মৃতি মাখিয়ে তৈরি করি সুপার এন্টি অক্সিডেন্ট।
সামনের রাস্তায় উত্তাপের ঝাঁকুনি, ঝাপটায়
প্রণয় যোগ করে, প্রকৃতি হতে চাইছি
সেনাবাহিনীর ব্যারাকগুলি হয়তো ভাঙাচোরা,
সিগারেটের কারখানাগুলতে চলছে উন্নয়ন উৎপাদন
অভূতপূর্ব সময়ের মিশ্রণ, অনিয়মের শৃঙ্খলা।
আমার প্রিয় একটি পতাকা খুঁজে নিতে হবে
দোকান থেকে কিনে নিলাম এক খণ্ড সাদা কাপড়
কিছু রঙ, আর নানা আকারের তুলি।
সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, কল্পনা করছি, স্বপ্ন দেখছি
নিজেই বানাবো একটি পতাকা।
তাহলে তো এক খণ্ড জমি চাই, কিছু মানুষ
নদী থাকতে হবে সে দেশে, পাহাড়ের ভার
সীমান্ত নির্মাণ হবে বৃক লেস, কাটা তাঁর লেস
যেমন হয় ওয়ারলেস সেলুলার নেট ওয়ার্ক।
এমন একটি হাসপাতাল থাকবে সেখানে
যেখানে প্রেসক্রিপশনে লেখা হবে গোলাপ ফুল
সেনা ছাউনিতে পাহারায় তোমাকে রাখবো
রজনীগন্ধার অস্ত্র বানাবো,
রাইফেল পাঠাবো ইস্পাত কারখানায়।

প্যারিস, ফ্রান্স

এরশাদ খান

ট্রেন

অসম্ভব সুন্দর জামা মেয়েটার গায়ে
সাদার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে
অনেকগুলো নীল অপরাজিতা

ফুলের রঙের সাথে রঙ মিলিয়ে
বেণী করা চুলে ঝুলছে
দু'টো নীল ফিতা

হালিমা বেগম অনেক সময় নিয়েছেন আজ
মেয়ের তেলমাখা চুলে
বেণী আর ফিতা বেঁধে দিতে
কিছুটা বাড়তি ভালোবাসা মাখানো ছিল মনভুলে !

আট বছরের আয়েশা হাঁটছে
বাবার হাত ধরে
শ্রীপুর রেল স্টেশনের দিকে
বড় উজ্জ্বল দিনটা আজ
অপরাজিতার মতো আকাশটাও
আজ ঝকঝকে নীল...
কোনো অজ্ঞাত কারণে যেন
কলুষিত পৃথিবীর সাথে
স্বর্গের হয়েছে মিল !

আর কতদূর বাজান ?
এইতো রে মা,
ঐ যে দেখ ইষ্টিশন
কাঁপা আঙ্গুলে দেখালেন হযরত আলী
চোয়াল শক্ত যার, ভেতরে ভঙ্গুর মন

বাজান
টেরেনে সত্যিই যামু অনেক দূরে !
যা চাই তাই পামু আমি ?
আয়েশা জানতে চায় উৎসুক সুরে

হ্যাঁরে মা
আর কোন দুঃখ থাকবোনা রে
ধরা গলায় আটকে রাখে সে
চোখের জল
নিজেকে সামলে নিয়ে বারে
রেল লাইনের গা ঘেঁষে হাঁটছে তারা
কাছে এসে গেছে দ্রুতগামী ট্রেন
এক ঝটকায় মেয়েকে নিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়লো হযরত আলী
চুকিয়ে দিয়ে জীবনের সব লেনদেন...!

বা....জা....না....গো !
ছিল আট বছরে আয়েশার
শেষ আর্তনাদ
বাবার সাথে চলে গেলো সে
ভেঙ্গে দিয়ে জীবন নামের মৃত্যুফাঁদ !

রেল লাইনের ট্র্যাকের উপর
ছড়িয়ে ছিটিয়ে রক্ত মাংসের দলা
আটকে থাকা চুলের ফিতা
আর লাল হয়ে যাওয়া কিছু নীল অপরাজিতা !!!!!

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত)

Hazrat Ali, 45, along with his eight-year-old daughter Ayesha Akhter reportedly committed suicide by jumping before a running train near Sreepur Railway Station on April 29, having failed to get justice over an attempt by adversaries to violate the minor girl and grab his land.

(Source: Dhaka Tribune)

এ্যানাহাইম, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

এহসান নাজিম

ভালোবাসায় স্থবির - মূক ও বধির

প্রথম দেখাটাই শেষ দেখা হবে ভাবতেই পারিনি -
হয়তো সেদিন বোশেখের উত্তপ্ত কোনো দিন ছিল
কিংবা পৌষের বোতামে আটকে পড়া কুয়াশায় ছটফট করছিলো এই শহর -
বৃষ্টি ছিল নাকি আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ছটফটানো রোদের বিছানা ছিল ছড়ানো?
মনে করতে পারছি না কিছুতেই -
শহর জুড়ে কি মিছিল ছিল?
তাতে মিশে ছিল ইতিহাসের রক্তজমাট, যা অগুনতি মানুষেরই বোনা?
বইয়ের পাতার ঘন অক্ষরের মতো ছড়ানো যানজট নিশ্চয় ছিলো -
দোকানে দোকানে বিকিকিনির হৈচৈ, লোকদেখানো হাসি
আর সৃষ্টিহীন অহমিকায় বেঁচে থাকার চেষ্টা সেদিনও ছিল?

বাটার মোড় থেকে যেই রাস্তাটা চলে গেছে গাউছিয়া ছুঁয়ে
তার মাঝামাঝি কোনো এক জায়গায়,
তুমি হেঁটে যাচ্ছিলে কোথায় কে জানে?
যদিও বিরক্ত ছিলে ছড়ানো জঞ্জাল আর দখল হয়ে যাওয়া ফুটপাথ ধরে হাঁটতে।
সাথে কেউ কি ছিল নাকি নিঃসঙ্গ চাঁদের মত একাই ছিলে?
তোমার হাতে ব্যাগ কিংবা কলেজের বই ছিল?
মাথায় বেণী অথবা ফুল?
নাকি কবিতায় যেমন দূরন্ত হাওয়ায় উড়ে প্রেমিকার চুল তেমনি উড়ছিল তোমারও?
কোন দিকেই তোমার দৃষ্টি ছিলনা, কারণ তুমি জানতে তোমার
স্বাধীন ঠোঁট থেকে নিঃসৃত ভালোবাসার সনদের অপেক্ষায় পৃথিবী।

সেই দেখাই কি করে তোমাকে দেখা আমার একমাত্র স্মৃতি হয়ে রইলো?
আমি এখনও সেই বাটার মোড় থেকে গাউছিয়া যাবার রাস্তায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে -
এর মাঝে শহরের সব মিছিল আর প্রতিবাদ গেছে থেমে।
আমি না হয় রবি বাবুর প্রেমের কলংক মাথায় নিয়ে স্থবির নির্বাক দাঁড়ানো মূর্তি
কিন্তু শহর জুড়ে অন্য সবাই কি করে মূক ও বধির হলো?

অরেগন, যুক্তরাষ্ট্র

কাজী রহমান

চিঠি

নিস্তব্ধ রাতটার সাকি আজ সেই বেনিয়া জর্জের অতৃপ্ত প্রেতাত্মা।
বিদঘুটে পোশাক পরে ঢালছে সে ধীর চুমুকের খুব পুরোনো মদ।
পাহাড়টা ব্রাসটাউন বল্ড।বন।ঝুল বারান্দার কোণে মোমবাতি।
কাঠের কেবিন অরণ্যে কাঁপা শব্দগুলো নিয়ে রাত জেগে আছে
ভোরের অপেক্ষায়।আসবে চেরোকি গোলাপ ঠোঁটে ধুসর থ্র্যাসার।
তুমি বসে থাকলে অপেক্ষায়, আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে।জানি আমি।

কতটা কাছে এসেছিলাম তুমি জানো সেটা, শব্দ শুনেছিলে নিঃশ্বাসের,
শুনেছিলে হৃদপিণ্ডের কম্পন, খুব চেনা, ভালোবাসার।তুমি আসোনি।
তাই তুমি মাকড়সার জাল পেরিয়ে ছুঁতে পারোনি প্রিয় ভালোবাসাকে।
ব্যথিত আত্মসমর্পণে পরাজিত হয়েছিলে সেই আগের মতনই।

জানো তো, আজকাল তোমার আমার মত চিঠি লেখে না ভালবাসে যারা।
ঝাঁ দুপুর, জ্যোৎস্না রাত্রি, বর্ষা, মেঘ-মল্লার, সবটা এখন খাঁটি যান্ত্রিক।
সময় কোথায় দু''দন্ড? ভালোবাসাতে কবিতা লাগে না আর।সম্ভবত।
তোমাকে লেখা এই কবিতার কোন অস্তিত্ব নেই, তবু লেখা হয়ে যায়।

যে নদীর নাম কোয়েল, খুব কাছে বন, মহুয়া নেশার গল্প-মাতাল,
কিছুই যাওনি ভুলে, আমারই মতন, আজকেও।কিন্তু, তুমি আসোনি।
শূন্যতার যে ব্যাপ্তি, যাকে সময় বলে ওরা, গুনতে হয়নি আমাদের,
সিন্দুকে সময় করছিল বসবাস।আমি তুমি কেউ খুলতে যাইনি।
এমনটা করে ফেলে রাখা ছিল ইচ্ছে করেই, আমাদের কষ্টবিলাস।

ঝাউ, ঝাড়খণ্ডের ঘোলাটে জল, সব ছেড়ে অনেক দূর জলপ্রপাতে
গম্ভীর গুমগুম শব্দে যখন ভিজছিলাম, অসংখ্য জলকণা নিয়ে,
তখন তোমার জন্য কবিতা এসেছিল, নস্টালজিয়ার।তুমি আসোনি।
না এলেও খুব কাছে এসে তবু একাকার হয়েছিলাম কী অনায়াসে।

নায়াগ্রার কিচ্ছু হয়নি।তোমারও না।আর আমার? আজ থাক সে কথা।

আমি শুনেছি, আমায় খুঁজেছো তুমি শুনেছি সাঁওতাল গ্রামে, ঝাউবনে,
সমুদ্র, পাহাড় আর মরুতে।জানি আমি।আর আমিও খুঁজেছি তোমায়,
বড় শহরে অনেক করে।জানি গ্রাম ভালো লাগে না তোমার, গ্রামে তাই
আমি যাইনি তো দেখতে।উজ্জ্বল সব আলোদের ভিড়ে খুঁজেছি তোমাকে।
ভেবেছি পেলেই বলব, চলো, আবার দেখে শুনে নিই আরো একবার।

তোমাকে বলিনি, আলসে দুপুর মাখা সেই গ্রাম, বাঁধানো পদ্মপুকুর
জল পদ্ম, নিমগ্ন শ্যাওলারা যে'দিন ঝিলমিলে শহরে চলে যাবার
কথা শুনে যে আড়ি নিয়েছিল অভিমানে, সেই দিন থেকেই জানি আমি
দূরদেশী পাখির গল্প-কথার এক ঝলমলে শহরে মিলবে তুমি।
জেনেছিলাম শীতের দেশে খুঁজে পেলে বলতে হবে তখন সেই বার,
যাবে একসাথে, আরো একবার, আমি শীত দেশে রোদ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত
বল দেবে তো আবার তোমার বুকের রোদমাখা উষ্ণতা, আরেকবার?
নিবিড় হবে তো আবার? ছোঁয়াছুঁয়ি? হবে অপেক্ষা শেষ? খুঁজে বেড়াবার?

অসংখ্য কবিতারা জন্ম নিলো, বিরহ আর নস্টালজিয়ার কত কাব্য
হলো তৈরি, কবিতা এলো অবিরাম, যুগ যুগ ধরে অজস্র বহুবার।
তারপর হঠাৎ একদিন, কী অদ্ভুত, বিশাল ঝলমলে শহরেতে
খবর পাওয়া গেল তোমার।জেনে গেলে আমিও এসেছি নিঃশ্বাস কাছে,
শেষ হতে অপেক্ষার।এইবার বেদনা ঠিক পালাবে দূরে, বহু দূরে।
হল না।ভারী ও কষ্টবিলাসী বিদ্রোহী কবিতাদের হাতে বন্দি হলাম।

অনেকগুলো রাত পরপর গভীর কালো হয়ে গেল, কষ্টে নীল হল।
দুপুর বিকেল আর সন্ধ্যেগুলো শুকিয়ে গেল পার্থিব তাপ যন্ত্রণায়
ষড়যন্ত্রী কবিতারা চিৎকার করে বলে উঠল, বিরহের জয় হোক,
কবিতারা বেঁচে রইল ও তাদের অস্থির ছন্দে বেঁধে রাখল কবিকে।

ফন্টানা, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

কামরুন জিনিয়া

প্রহরগুলো মোম হয়ে গলে

সুখেন আর মহুয়া। দু'জন দু'জনকে ভালোবাসে, যদিও বর্তমানে ওদের অবস্থান পৃথিবীর দুই প্রান্তে। সুখেন ঢাকায় আর মহুয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাতে কি? ওদের কথা হয় প্রায় প্রতিদিনই। সে-কথাগুলোতে শুধু প্রগাঢ় ভালোবাসাই নয়, একজন আরেকজনকে কাছে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই নয় – উঠে আসে বর্তমানের অস্থির সময়, জটিল পারমাণবিক যুগ ও বৈশ্বিক রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সমাজচিন্তাসহ বর্তমান সময়ের একজন সচেতন আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে নিজেকে ভেঙেচুরে আবার নিজেকে নির্মাণের ইচ্ছাও। সুখেন ও মহুয়া এ সময়ের, একবিংশ শতাব্দীর। প্রায়শঃই ওরা একে অন্যের মুখোমুখি না হয়ে, মুখোমুখি হয় নিজের।
ওরা বোঝে, এই জটিল পারমাণবিক যুগে শুধুমাত্র 'আমি' ও 'তুমি'র বিলাপই ভালোবাসা নয়, প্রেম নয়--বর্তমান সময়ে প্রেমহীনতাকেও ওদের কাছে এক ধরণের প্রেম বলে মনে হয়।

<u>প্রহরগুলো মোম হয়ে গলে</u>

মহুয়া	ভালোবাসা দিবসে অসম্পূর্ণ কবিতা,
মন খারাপ, তাই লেখা খারাপ।
কিন্তু বললে না তো, কেমন লাগলো
আমার ভালোবাসার কবিতা পাঠ?

সুখেন	তোমার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই
আমার কানে শ্লোগান হয়ে যায়,
এক সময় বিমুগ্ধ বিস্ময়ে আবিষ্কার করি,
আমি বার বারই তোমার প্রেমে পড়েছি,
তোমাকে ভালোবাসি!
তবে, তার মানে এই না যে......

মহুয়া	শুনছি! তারপর?

সুখেন	তার মানে এই না যে,
তোমাকে না পেলে হয়ে যাবো সংসারত্যাগী
কোনো এক ব্রহ্মপুরুষ!
অথবা বেছে নেবো পথ আত্মহননের!

মহুয়া	তাহলে বলবে নিশ্চয়ই তার
সুস্পষ্ট কারণ? যদি থাকে কোনো!

সুখেন	তার কারণ, ধূলির সন্তান ধূলি নিয়ে খেলতে জানে,
তার কারণ, জাহান্নামের করিডোরে আমি ঘুমিয়েছি
হাজার বছর,
এবং মানুষ মূলতঃই প্রেমজীবী!

মহুয়া	আশ্চর্য! এতোটা স্বার্থপর আর আত্ম-প্রেমিক
ঠিক কবে থেকে হয়ে উঠলে তুমি?
'নার্সিসাস' নিশ্চয়ই পড়েছো পার্সি বিশী শেলীতে
এখন ও-নামেই ডাকবো তাহলে!

সুখেন	তোমাকে না দেখে দেখে আমি যেনো
ইদানিং হ্রদের জলে উবু হয়ে তাকিয়ে থাকা
সত্যিই এক স্বার্থপর আত্মপ্রেমিক–
নার্সিসাস যার নাম!

মহুয়া	তাহলে তো তোমার মতো একজন
নার্সিসাসের পরিণতি এরকমই হবে
সুধীন দত্তের ভাষায়--
‘'আমার মৃত্যুর দিনে কৌতূহলী প্রশ্ন করে যদি
সাধিলাম কী সুকৃতি, হব যার প্রাসাদে অমর?
মেনে নিও মুক্ত কণ্ঠে, নেই মোর পাপের অবধি;
সারা ইতিহাস খুঁজে মিলিবে না হেন স্বার্থপর'
এরপরও কি তুমি তোমাকে আত্ম-প্রেমিক
দাবী করবে?

সুখেন	হুমমম, আমার একলা পাখী নীড়ে না ফেরা
পর্যন্ত! বলো, কোথায় হারালে তুমি?

মহুয়া	আমিও কেমন না দেখে দেখে তোমায়--
জানো, হয়ে উঠছি ক্রমশ প্রতিশোধ-পরায়ণ।
ভাবছি, তোমার স্বার্থপরতার প্রতিশোধ নেবো--
প্রতিশোধ আমি ঠিকই নেবো, নিকারাগুয়ার

কবি এর্নেস্তো কার্দেনালের মতো!

সুখেন	আমার কিন্তু ভয় লাগছে, তবে কি আজ
শুধু প্রতিশোধ আর স্বার্থপরতার কথাই
বলে যাবো আমরা?
বেশ, তাহলে এবার এর্নেস্তো কার্দেনাল এবং
তোমার প্রতিশোধের কথাই বলো।

মহুয়া	আমার প্রতিশোধ হবে এরকম
একদিন তোমার হাতে ধরা থাকবে
বিখ্যাত এক কবির বই এবং তোমারই
জন্যে লেখা কবিতা পড়বে তুমি,
কিন্তু জানতে পারবে না!

ব্যাটন রুজ, লুইজিয়ানা, যুক্তরাষ্ট্র

গাজী আবদুর রশীদ

মনের 'মন' ভালো নেই

আমার মনের 'মন' ভালো নেই
জমেছে সেথায় আষাঢ়ের মেঘ
আঁধারে ঢেকেছে হৃদয় প্রাচীর
এই বুঝি সাত সকালেই নামবে বৃষ্টি।

মনের আর দোষ কি বলো
ভুলের অসুখে সে আজ ক্ষত ছেঁড়া
রক্তে বেঁধেছে জমাট কষ্টের অণু
কৈফিয়তের প্রশ্নবাণে আজ সে দিশেহারা।

হৃদয়ের পুরনো ঘা আজও শুকোয়নি
পচন ধরেছে স্নায়ুকোষের গহ্বরে
সোজা পথের দ্বার রুদ্ধ হয়েছে আজ
পুরনো পথে কাঁটা ঝাড়ের শেকল।

হৃদয়ের আকাশটা ধূসর কাতর
সর্পদংশনে দেহাবরণ যেমন হয় নীল,
অসম যুদ্ধে পরাজিত মনে আজ তাই
জমেছে আষাঢ়ের কালোমেঘ।

বৃষ্টি নামবে বুঝি ঘনঘোর
বানের স্রোতে ভেসে যাবে শেকড়
বাঁচার খড়কুটোটুকু ছুটছে আগেভাগে
নূন্যতম ফাঁকফোকর নেই নিঃশ্বাসের
মন আজ তাই বড় বিরহ-কাতর।

উদাস পথের দিকহারা এক পথিক আমি
হেঁটে যাই অচেনা-অজানা পথের দিকে
হঠাৎ, কে যেন ডাকে- এই যে, শুনছেন
শুনছেন মশাই,
কে যায় এই অচেনা পথে একাকী,
কে যায় নীরবে নিঃশব্দে?

কোনো উত্তর নেই; নেই পেছন ফিরে তাকানো
পাছে যদি চোখের কোণে বৃষ্টি নামে,
আমার মনের আজ 'মন' ভালো নেই
জমেছে সেথায় আষাঢ়ের কালো মেঘ।

তেহরান, ইরান

জাহান রিমা

সন্ধ্যার সান্নিধ্যে সে

সন্ধ্যার সাথে শত্রুতা আমার কোন কালেই ছিলোনা। তবু তার সান্নিধ্য আমাকে জাপটে ধরে প্রেমিক হারানো হাহাকারে। শূন্য শূন্য শূন্য মনে হয়। সন্ধ্যা নামলেই দো'তলার শুনশান কার্নিশ থেকে ঝুপঝাপ করে নামে বিষাদ। দেখি খুন কিংবা খুনি দুইয়ের একটা কিছু কাঁচভাঙ্গা জানালায়। দেখি, ওখানে পাখির শব। কখন মরেছে কে জানে!

সন্ধ্যা এলেই আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। সন্ধ্যা নামলেই আমি খুন হয়ে যাই। আমার মরদেহ ছুঁয়ে থাকে তার দেওয়া প্রেম। সফেদ কাফনে লেগে থাকে তার পৃথিবী ভুলানো আদর। হুরহুর করে কফিনের শরীর বেয়ে নামে তার দেহের লোবান।

সন্ধ্যা এলেই অন্ধকারের মতো সত্য আসে। সন্ধ্যা এলেই অনির্ণিত ভাবনারা আগর বাতির মতো ধোঁয়া উড়ায়। ভাবে; কে জানে আমার কবর হয়েছে কিনা তার বুকের আশেপাশে!

অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

দালান জাহান

পৃথিবী এক হাসপাতাল

শ্মশানঘাট পেরিয়ে নদীর ঘাটে যাই
নদীতে ভাসে মানুষ পোড়া ছাই।
অতীতে বা ভবিষ্যতে
কখনও এক পয়সার শত্রুকিনিনি
তবুও প্রতিরাতে শুনি রোদনধ্বনি-রক্তধ্বনি।
উন্মাদ ঘোড়ার শব্দে খুলে যায় কসমিক দুয়ার
হৃদপিণ্ডে ঝড় তোলে টর্নেডো-হ্যারিকেন
গাঙের বাতাস ধরে আসে খবরের ট্রেন
দীর্ঘশ্বাসে খোদাইকৃত শত বছরের শিল্পকর্ম
চিত্রের চোখে ফুটে যে গণিতের ফুল
শিম্পাঞ্জি হাসতে-হাসতে কয় তা বানরের বাল
পাথরের ঢেউ ভেঙে মাছেরা দেয় বাঁচার সাঁতার
অরণ্যের শেষ পাগলের বিবৃতি পৃথিবী এক হাসপাতাল।

বোয়ার, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক

দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

বেতার

জন্ম থেকে দেখছি তাকে
একটা সাদা সুতির কাপড়ে ঢাকা দেওয়া থাকত
লাল সুতো দিয়ে বোনা ঢেউ খেলানো ক্ষীণ বর্ডার
দুই তিনটে হলুদ বাসন্তীফুল।
হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করা বারণ থাকলেও
সামনে বসে তাকে শুনতে মানা ছিল না।
নীল রঙা চৌকো হাতল, ভাঁজ করা এন্টেনা
সামনের দিকটা পালিশ করা সেগুন
তার ওপর সেকেলে কারুকার্য,
বুকের কাছে মস্ত একটা বোতাম
সেটা ঘোরালে স্বচ্ছ কাঁচের ভেতর
লাল কাঁটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত
এক একটা দাগকাটা স্টেশন
কখনো কলকাতা ক, কখনো বা কলকাতা খ।

আমি ভাবতাম ওর মধ্যে
অদৃশ্য একটা ট্রেন আছে
যা বোতাম ঘোরালেই বেরিয়ে পরে
বাতাসে বাঁধা কোনো রেলপথ ধরে,
ধোঁয়া ছেড়ে কুউউউ ঝিক ঝিক...
আবার দাঁড়ায় কোথাও কোনো অজানা স্টেশনে

প্লাটফর্মের চেয়ারে বসে সেখানে হয়তো কেউ গান করে একা,
কেউ বা পড়ে স্থানীয় সংবাদ
তারপর বোতাম ঘোরালে আবার অন্য কোথাও
সেখানে হয়তো ঝুপ করে সন্ধ্যে নেমেছে
ঝিঁঝিঁ ডাকছে, তুলুসিতলায় বাতি দিতে যায় নববধূ ।
ঝুম ঝুম ঝুম
হঠাৎ পুকুরপার থেকে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ .....
গা ছমছম করে ওঠে তার..
ঘাটের জলকে ভয়ানক দুলিয়ে কিছু একটা ডুবে যায়
তালগাছের শুকনো পাতাগুলো এক সাথে খর খর করে ওঠে
পশ্চিমের ঘন গাছ-গাছালিগুলো থেকে
ডেকে ওঠে একটা আধবুড়ো শিয়াল
আউউউউউউ
আমি দুহাতে কান চেপে ধরি
তবু শোনা যায় আউউউউউউ
আমি বোতাম ঘুরিয়ে দিতে বলি বার বার
কেউ আমার কথা শোনে না ।
মা আমায় লুকিয়ে নেয় কোলের গভীরে ।

এসব শুনে একদিন এক বন্ধু খুব হেসে বলেছিল ..
ও এটাও জানিস না
ওগুলো কোনো রেল গাড়ির ষ্টেশন-ফেশান নয় রে বোকা
আসলে কাঁটা সরলেই ওই বাক্সের ভেতর
ওরা চলে আসে পুট করে ... ধুলোর মতো
গান বাজনা করে, গল্প বলে
তারপর টুপ করে চলে যায় অন্য বাড়ি,
এই ধর তোর বাড়ি, তারপর আমার, তারপর অপুদের বাড়ি।
তারপর থেকে আমি ওদের উপস্থিতি সত্যি অনুভব করতাম
ওদের গলা শুনে চেহারা আঁকতাম মনে মনে
গল্পদাদুকে ফাঁক ফোকর দিয়ে খোঁজারও চেষ্টা করিনি এমন নয় ।
মহালয়ার ভোরে বাবা তার সামনে ধূপ দিতেন
আমরা মশারির ভেতর থেকে সূর্য উঠতে দেখতাম

শুনতাম আর ঠিক কদিন পরে পুজো।
বীরেন্দ্রকৃষ্ণের গুরুগম্ভীর গলা শুনলেই
প্রথমে ছ্যাঁত করে উঠত বুক, শেষে কান্না পেত
ভাবতাম এপাড়া থেকে ওপাড়ায় গিয়ে
এবার আমার সবজান্তা বন্ধুকেও উনি কাঁদিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই ।

একবার খেলা শুনছি, আমি আর বাবা
১৯৮৬ সাল, শারজায় ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল ম্যাচ,
সকাল থেকে ভারত খুব ভালো খেলেছে
শ্রীকান্ত, গাভাস্কার, বেংসরকারদের ব্যাটে প্রচুর রান এসেছে
লাঞ্চের পর বাবার মেজাজ খুব ফুরফুরে
মা অনেকবার আমাদের হাঁক দিয়েছে
আর কতক্ষণ? এবার দোকান যাও
দরকারি কটা জিনিস আছে যে
আমাদের কানে কিছু ঢুকছিল না
দশ ওভার, পাঁচ ওভার পেরিয়ে ব’লে নেমেছে খেলা
যত বল শেষ হয়ে আসছে
বাবা তাকে কাঁধে নিয়ে তত কানের আরও আরও
কাছে চেপে ধরছেন
শেষ বল চার রান বাকি
আসছেন চেতন শর্মা, সামনে মিয়াঁদাদ
কিছু মুহূর্ত চুপ, তারপর খর খর আওয়াজ ।
কিছু বুঝছিনা কি হল, ছেঁড়া আওয়াজ আবার খর খর
হঠাৎ প্রচুর চীৎকারের মাঝে শোনা গেল ‘সিক্সার...সিক্সার
পাকিস্তান উইন্স এশিয়া কাপ। হুররে ওয়াট আ ম্যাচ’
খুব উত্তেজিত হয়েই একবারে চুপ করে গেলেন বাবা...
আমি কিছু বোঝার আগেই কাঁধ থেকে এক হাতে তুলে
তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সজোরে
দেখলাম উঠোনের বাম দিকে চৌবাচ্চার পারে গিয়ে পড়ল সে,
আমি ছুটে গিয়ে দেখলাম
নীল হ্যান্ডেলের একদিকটা খুলে এসেছে, বেঁকে গেছে এন্টেনা
খাপ খুলে ছ’ছটা ব্যাটারি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এধার ওধার

পালিশ করা কাঠের অংশটা ঘষে গেছে খানিক
বোতামটার গা ঘেঁষে একটা ফাটল,
সেখান দিয়ে বিকেলের
কমলা শেষ রোদটা চলে গেছে ধুলোর গভীরে।

পরের কটা দিন খুব কষ্টে গেল
গায়ে সাদা ঢাকা সরিয়ে দেখলে
সে মৃত না জীবিত ঠিক বুঝে উঠতে উঠতে পারছিলাম না
স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে প্রতিদিন খোঁজ নিই আর হতাশ হই
একদিন দুপুরে ঘুম থেকে উঠে দেখি মা বোতাম ঘোরাচ্ছেন
পাশে গিয়ে বসলাম, মা আমাকে বাম হাতে জরিয়ে
ডান হাত দিয়ে আবার বোতাম ঘোরাতে থাকলেন,
মাঝে মাঝে কাটা ছেঁড়া আওয়াজ পাচ্ছি
শ্যামল মিত্র কাঁপা কাঁপা গলায় শুরু করেই
হঠাৎ করে থেমে যাচ্ছেন
আবার চেষ্টা করছেন, পারছেন না
যেন অসহ্য ব্যথা ওনার গলায়। আবার সব চুপ।
শুধু জির জির শব্দ। যেন অঝোর এক বৃষ্টির ধারা।

সেদিন রাত্রে সবাই যখন ঘুমে আচ্ছন্ন
কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম
হাতে বাবার পাঁচ সেলের জোড়ালো এক টর্চ
ঢাকা সরিয়ে ফাটলে চোখ রেখে খুঁজছি
একটা ধুলো পোড়া গন্ধ চারিদিকে
কে আছে ভেতরে? কে?
ঠিক দেখা যাচ্ছিল না, ধুলো শুধু ধুলো,
টর্চের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে
হঠাৎ শুনলাম ঘড়ঘড় করে কি একটা
আমার দিকে এগিয়ে আসছে
ইস্পাতের বিশাল যন্ত্রের এক ধারালো শব্দ
বাতাসকে ফালাফালা করে দিচ্ছে
আমি একটা সেতুর ওপর, নীচের নদীরেখা অস্পষ্ট

জল দিয়ে মোছা স্লেটের রঙের ঘন মেঘ
হঠাৎ মনে হল কালী পুজোর রাতের মতো
তাজা বারুদ পোড়া গন্ধে জ্বলে যাচ্ছে নাক
ধোঁয়ার জটলা ভেঙ্গে আরও এগিয়ে এলো সে
ওটা যে একটা কামান ... হ্যাঁ একটা যুদ্ধকামান
কোথাও পালাবার নেই
নলটা একটু একটু করে নামছে, এবার আমারই দিকে নিশানা ।
আমি প্রাণপণে ছুটতে চাইছি, পারছিনা
পা জড়িয়ে যাচ্ছে লতায় পাতায়
সেতু ছেড়ে জঙ্গলের পথে
আমার খালি পা ছুলো যেন গরম মাটি
ভালো করে দেখতে পেলাম না কিছু
একটা গ্রাম জ্বলছে, মানুষের, পশুর চীৎকার
তীক্ষ্ণ স্বরে কান্নার রোল, মা মা বাঁচাও বাঁচাও,
যেদিকে ছুটি বারুদ পোড়া চামড়ার অসহ্য ঘ্রাণ,
ঘাসে চাপ চাপ রক্তে আমার পা লালচে হয়ে আসছে
বিকট জুতোর শব্দ সব কিছু ছাপিয়ে যাচ্ছে
আর দৌড়াতে পারছি না, তেষ্টায় গলা কাঠ
এ কোথায় এলাম আমি।

কতক্ষন ছুটেছিলাম ঠিক জানিনা,
চোখ খুলে দেখি তখনও আকাশ মেঘলা
ফালা ফালা সূর্যটা জল ছুঁয়ে আগলে রেখেছে নদীবুক
সেখানে বয়ে যায় হাজার হাজার লখিন্দরের দেহভার
ভেসে আসছে ভরাট এক কণ্ঠস্বর
'আকাশবাণী কলকাতা, খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
গতকাল রাত্রে ঢাকার মিরপুর, রায়বাজারসহ বিভিন্ন অঞ্চলে
পাকসৈন্যর হামলায় অগুণতি মানুষ প্রাণ হারান। পাশবিক অত্যচারের দৃশ্য অবর্ণনীয়।'
গুলিগোলা, জুতোর শব্দ, পশুপাখি, মানুষের আর্তনাদ
সব ছাপিয়ে আকাশে বাতাসে বেজে ওঠে সেই কণ্ঠস্বর।
ফাঁকা মাঠ, পুকুর পার, ভিজে তালগাছ থেকে
পোড়োবাড়ি ভেতরে খাটিয়া বিছানো

সেখানে হয়তো গুপ্ত কোনো ঘাঁটি,
সব কিছু গমগম করে ওঠে
কিছুক্ষণ আবার সব চুপ। থমথমে হয়ে আসে চারিদিক।
ঝুপ ঝুপ করে হাটে বাজারে নামে শান্তির জলধারা
বেহুলার অশ্রুর মতো গভীর
রক্ত বারুদ মেশানো মাটি ধুয়ে পরে তিতাস নদীর জলে
তিতাস হয়ে মেঘনা, মেঘনা হয়ে বঙ্গোপসাগরের গা বেয়ে
আরবসাগরে মেশে...

বহু বছর কেটে গেছে
ওদের উপস্থিতিও অনুভব করিনা আর
ও ছোট হতে হতে বাম পকেটে শুয়ে থাকে এখন
তার দেহ ক্ষুদ্র, কিন্তু পাঁজর অ্যালুমনিয়ামের
ধুলো পড়ে না সেখানে ধরে না ফাটল
সব কিছু দুর্বোধ্য, ঝাপসা হয়ে আসে...
আমি লাল সুতোর একটা ক্ষীণ বর্ডার খুঁজতে থাকি

(কবিতাট মুক্তিযুদ্ধের শব্দসেনা দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত)

এ্যান আরবর, মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র

ধনঞ্জয় সাহা

সোনামণিদের ছড়া: গণনা ১ - ১০

১ – ৩

ঝুমকি আমার একটা বিড়াল
মকমকিয়ে হাঁটে
লেপের নিচে দুইটা ইঁদুর
লুকায় দাদুর খাটে।

দাদু এলো খড়ম পায়ে
মোটা চশমা পরে
পাশের ঘরে তিনটা কুকুর
আনন্দে গান করে।

কুকুর ঘোরে পুকুর পাড়ে
পাহারা দেয় বাড়ি
বিড়াল ঘরে সুযোগ পেয়ে
ভাঙে দুধের হাঁড়ি।

কুকুর বিড়াল ঝগড়া করে
এটা লোকে বলে
এখন দেখি তারা সবাই
এক গাড়িতে চলে।

৪

বাইসাইকেলে দুটি চাকা
গাড়িতে থাকে চার
একটা চাকা খুলে গেলে
চলে না গাড়ী আর।

আমার সাথে রাগ করেছো
বলছো যাবে বাড়ী
সন্ধ্যা গিয়ে রাত্রি হলে
কোথায় পাবে গাড়ী?

বেশ তো আমি হেঁটেই যাবো
বলছি যে তিন সত্যি
আড়ি আমার তোমার সাথে
কথা নয় এক রত্তি।

৫ – ৮

চারটে মাছি উড়ে বেড়ায়
ভোঁ ভোঁ করে শব্দ
দাদা তাকে ধরতে গিয়ে
ভীষণ হলো জব্দ।

মাছির থাকে পাঁচখানা চোখ
মাথার চারিদিকে

যেখান দিয়েই ধরতে যাও
ঠিক পালাবে ফিকে।

ছয়, সাত, আট বার
চেষ্টা যতোই করো
ধরতে তুমি পারবে না তো
চালাক সে যে বড়ো॥

দড়ির গায়ে মিঠাই মেখে
ঝুলিয়ে দাও ঘরে
মিষ্টি খাওয়ার লোভে মাছি
হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

বুঝলে তুমি বুদ্ধি দিয়ে
কেমন কাজ হয়
ভাল কিছু করতে হলে
ধুম ধাড়াক্কা নয়।

শার্লট, নর্থ ক্যারোলাইনা, যুক্তরাষ্ট্র

৮ – ১০

তিনের পরেই আসে চার
চারের পরে পাঁচ
মাখনে ঘি, জানো তুমি
বালিতে হয় কাঁচ?

গুনতে আমি শিখছি এখন
দাদুর চারটা খরম
পড়া শেষে আম্মু দিবে
হরলিকস গরম গরম।

পাঁচের পর ছয় যে আসে
তার পরে সাত, আট, নয়
একের পরে শূন্য দিলে
সংখ্যাটা যে দশ হয়।

নিঘাত করিম

নৈকট্যে বৈপরীত্য

স্মৃতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় চন্দনের ঘ্রাণ
ছাই ধোঁয়ার নৈরাশ্যে মুক্তির স্বাদ,
মেঘের ভাঁজে ভাঁজে মন খারাপের আশ্রয়,
অনুভূতিতে বৈপরীত্যের মৃদল
শুরুতেই ছিলো ভীষণ অমিল
দুজনা ভিন্ন ভীষণ,
একজন খুব গোছানো, পাখির নীড়ের মত,
অন্যজন উচ্ছৃশৃঙ্খল কাল বৈশাখী যেন
ক্লান্ত দেহ, অবশ ইচ্ছে তারপরও
কই ক্লান্তি আসে নাতো?

অনুভবে উচ্ছ্বলতায় উদার ডাক দিয়ে যায়
নিজের মাঝে লালন করা অচিন পুরুষ,
অচিন প্রেমে দিকভ্রান্ত সে
তবুও মিশে থাকে রক্তের ফোঁটায় ফোঁটায়
অনুভবে সে প্রাক্তন
নিঃশ্বাসের স্পন্দনে সে যেনো জ্বলন্ত অগ্নি
পোড়ায় , পুড়িয়ে দিয়ে যায় অনুক্ষণ
জ্বলে মন, বিকল আকাঙ্ক্ষা তারপরও
কই ক্লান্তি আসে নাতো ?

হিউস্টন, টেক্সাস, যুক্তরাষ্ট্র

বিদিতা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী

ছাই রঙ জামা

ভুল করে ফেলে গেছ
ছাই রঙা জামা
এখনো লুকানো আছে
কাপড়ের ভাঁজে
সেই জানে ঝড় চেনে
কত ওঠানামা
কত ধুলো জমে থাকে
তার খাঁজে খাঁজে
সেই বোঝে
শব্দের ফাঁকে রাখা কথা
সেই চেনে
ছাই রং এ লেগে থাকা তাপ
সেই জানে
পড়ে থাকে কতটুকু চাওয়া
সময় ফুরিয়ে গেলে
কিছু পরিতাপ
কাঁধে মুখ না থাকুক
ঝরে থাকা কথা
কলারের কানে আসে
লাগা এহেসাসে
সুতোর বুননে গায়ে
রাত নেমে আসা

প্রিয় ঘুম সারারাত
জেগে বসে থাকে
কবেকার ভুলে যাওয়া
ছাই রঙা জামা
অভিমান ডেকে নেবে
ঘুম নামা রাতে
কাপড়ের ভিড়ে বসে
তোমার সে জামা
জামার শরীরে আজও
ঝড় লেগে আছে...
জামার শরীরে ঝড়...
আজও লেগে আছে।

পার্সিপ্যানি, নিউ জার্সি, যুক্তরাষ্ট্র

ময়নূর রহমান বাবুল

দৃশ্যত তোমার হৃদয়

আমি দেখেছি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত
মাইলের পর মাইল বিছানো নোনা বালি
হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে, পথ হয় না শেষ,
দেখতে দেখতে দেখতে, দেখা হয় না অবসান।

আমি দেখেছি সুন্দরবন, অনন্ত বৃক্ষরাজি
পা ফেলে পা তুলে, চলতে চলতে চলতে
চলা শেষ হয় না যে বনভূমির বুকচিরে-
শালবন, সুন্দরী গজারী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে
সীমানা পেরিয়েও অনন্ত সবুজের সমারোহ
কার যেন গুণ গায় ! হাজার অযুত বছর ধরে

আমি দেখেছি প্রশান্ত মহাসাগর
দিগন্তজোড়া নীল জল আর ঢেউ
দেখেছি সাহারার অথৈ বালিরাশি
প্রশস্ত বুক, আর বালির বহর-

আমি দেখেছি আকাশ -অনন্ত আকাশ
সীমাহীন মহাকাশ, হিমালয় দেখেছি,
শির উঁচুকরা আকাশ ছোঁয়া মাথা যার

আমি দেখেছি বাতাসের শক্তি
মাটির সহনশীলতা দেখতে দেখতে
কেটেছে আমার বাল্য শৈশব কৈশোর যৌবন

আমি দেখেছি তোমাকে বঙ্গবন্ধু, হে জাতির জনক
তোমার হিমালয় ডিঙ্গানো শির
তোমার সাহারার মত বুক
সাগরের মতো হৃদয়, আকাশের মতো মন
বাতাসের মতো শক্তি ও সাহস
পানির মতো সহজ সরলতা ...

আমি শুনেছি তোমার উদাত্ত আহ্বানঃ
'তোমাদের যার যা কিছু আছে
তা ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে'

আমি শুনেছি তোমার সাহসী ঘোষণাঃ
'এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'

দৃশ্যত: তোমার হৃদয়, মহান নেতা
- বিশ্ব নেতার মতো
তুমি বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতির পিতা।

লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মৃদুল রহমান

শিরোনামহীন কিছু সম্পর্ক

কিছু কথা থাক না গোপন,
থাকুক না হয় আগের মতোই
হৃদয়ের গহীন গহ্বরে অন্তরীণ;
যেমন করে সংগুপ্ত রেখেছি আজও
ছোট্ট ছোট্ট ভালোলাগার বিমূর্ত অনভবে
টুকরো টুকরো নিটোল ভালোবাসার গল্পগুলো ।

কিছু কথা থাক না গোপন;
ব্যক্ত অব্যক্ত কথাইতো আপন।
থাকুক গোপন বিমূর্ত অনুভব অনুভূতি যত;
খুব যতনে হৃদস্পন্দনে। কেউ না জানুক কল্পলোকে।

কিছু কথা থাক না গোপন;
মাঝে মাঝে ভেসে বেড়াক ইথারে
খণ্ড খণ্ড মেঘের মতো অব্যক্ত কথার দীর্ঘশ্বাস হয়ে।
মনের অজান্তে চোখের কোণে ভিজিয়ে দেওয়া
দু'ফোটা অশ্রু; থাকুক না হয় গোপন সাক্ষ্য হয়ে,
সম্পর্কটা তোমার আমার যেমন চলে মায়াডোরে।

কিছু কথা থাক না গোপন;
শিরোনামহীন সম্পর্কটাও না হয় গোপন থাকুক;
অবিচল থাকুক ঠিক আগের মতোই তেমন,
আপন সৌন্দর্য মহিমায় সমুজ্জ্বল ছিল যেমন।

কিছু কথা থাক না গোপন;
মনের সংগুপ্ত অভিসারে কবিতার অপ্রকাশিত সংকলনে
কিছু ব্যথা, কিছু ভালোলাগা ভালোবাসা গোপন থাকুক
কিছু অনুভব অনুভূতি চিরকালই যেমন থাকে অন্তরীণ।

তবুও বেঁচে থাকা সীমাহীন গভীরতায়, অশেষ নির্ভরতায়;
ব্যাখ্যাতীত সংগুপ্ত নিগূঢ় সম্পর্কের অদ্ভুত দ্যোতনায়।

রচেস্টার, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

মোস্তফা সারোয়ার

ছদ্মবেশী কনে

করোনা, তোমার ছবি
এক অভিমানী কদমের ফুল
রিমঝিম বরষায় রাজা।
উপবিষ্ট বিয়ের পিড়িতে
দিওয়ালীর বিচিত্র রঙে
কনে সাজা

আমার আবাহন
আপাততঃ সমাপন।
ছদ্মবেশী কনে সেজে
তুমি মূলতঃ এক ভ্রষ্ট পুরুষ।
ধর্ষণের উন্মাতালে
জমে আছে মানুষের নষ্ট কোষ।

মুখোশের কিঞ্চিত অস্বস্তি
আর টিকার আঁচড় আচরি
হারে রে রে ডাক দেয়
যীশুর বিভ্রান্ত বাঁশরী।

নিউ অরলিন্স, লুইজিয়ানা, যুক্তরাষ্ট্র

রতন কুণ্ডু

অচিনপুরের হলদে মেয়ে

অচিনপুরের হলদে মেয়ে
মন পবনের সিঁড়ি বেয়ে
আকাশ ছুঁতে চায়।
ঝর্ণা সুরে তাল মিলিয়ে
সর্ষে ফুলের হলুদ নিয়ে
অঙ্গেতে লাগায়।

এই মেয়ে তোর বাড়ি কোথায়?
সাঁঝ বিকেলে একলা হেথায়
কিসের খোঁজে এলি?
আমি হলাম বাহুবলি
নিঝুম বনের শাল পিয়ালী
জীবন নিয়ে খেলি !

একটু হলুদ আমায় দিবি?
বুকের মাঝে হৃদয় নিবি ?
মন পবনের ধামে !
আমার মনের রং তুলিতে-
নীল কাগজে রঙিন খামে
লিখবো চিঠি তোরই নামে।

সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

রাকীব হাসান

চাঁদবাজ

সুকান্ত চাঁদটাকেও দেখতে পারলো না
পূর্ণিমায় আর কার ক্ষিদে পায়!
যেদিকে চাই মেশিন চাঁদ বেলে
সন্ধ্যা নামলে এখানে সেখানে সকলে চাঁদ খায় –
তারা ঝলসানো রুটিতে জ্যোছনায় কবিতা পড়ে

অনেক বড় চাঁদ ওঠে দিনের আকাশেও
বুক পকেটে ঢুকেছে বুকের চাঁদ
টুয়েন্টি ফোর আওয়ারস্
অন্ধকার লাগে না চাঁদবাজ রমণ গায়ে মাখাতে
যখন যে চায় সব আছে, কারো সঙ্গে মন নেই –
চোখে চোখে ক্ষুধা নামে, এখন ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী কাব্যময়

ডিনার টেবিলে টাট্টুর মেঘ আকাশ হয়
অসংখ্য তারায় বাদ্য বাদনে প্রাণ বাজায় বাউল শহর
আর এভাবে কবে যেন হয়েছে
মেয়েদের ঠোঁটের লাল রঙ পুরুষের নীল বিষ -

দাঁড়িয়ে আছে পাড়ায় পাড়ায় চাঁদবাজ পাহাড়
নীচে ঘরের নদী, আর তার ছায়ামুখে জল বইছে
এতো ছোট্ট পরিসরে জীবন ভিক্ষা চায় দীর্ঘ অর্গাজম

কবিতায় গাড়ি চলে, বাড়ি দেখায় --
সাপের ঝুড়িতে ঘুমায়, কামড়ে মরে না আর ক্লিওপেট্রা
চাঁদবাজ চাদরে সব দাগ রূপের মেকআপে মুছে যায়

মন্ট্রিঅল, কানাডা

রাজ হামিদ

সমুদ্রের কথা

আমি সমুদ্রে সমুদ্র দেখি না ।
অবারিত ঢেউয়ের আড়ালে,
আমি এক পৃথিবী দেখি -
জন্ম-মৃত্যু-ভালবাসার বিস্তীর্ণ খেলা দেখি,
শক্তির অপরূপ এক স্নিগ্ধতা দেখি,

আমি সমুদ্রে সমুদ্র দেখি না -
তোমার নিদারুণ ভালবাসা দেখি,
সরস আলতো ছোঁয়া দেখি,
উড়ন্ত গাংচিলের মত -
সীমাহীন স্বপ্নের এক আকাশ দেখি,

আমি সমুদ্রে সমুদ্র দেখি না -
দিকহীন বিশালতায় তাকিয়ে থাকা,
তৃণভূমির উচ্ছাসে উদ্ভব -
এক নাবিকের দৃষ্টি দেখি,
চিকচিক রোদ্দুরে, ঢেউ বেলাভূমির নৃত্যে -
তোমার হাসির মসৃণতা দেখি,

অনি, আমি সমুদ্রে সমুদ্র দেখি না,
আমি সমুদ্রে তোমাকে দেখি ।

ক্যাস্ট্রো ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

রুদ্রশংকর

আমি চেয়েছিলাম

আমি চেয়েছিলাম সেই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে
আমার প্রেম বৃত্তাকারে ঘুরুক, যেমন পৃথিবী ঘোরে
রাত হলে চাঁদ থাকুক বা না থাকুক,
হাওয়া মৃদু হোক বা মন্দ
আমি চেয়েছিলাম
আমার চারপাশে এক পরিচ্ছন্ন প্রেম হোক,
কিন্তু আমার চৈতন্য নেই;
হাত বাড়ালেই আমাকে নিয়ে বৃত্ত বদল হয়।

আটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

রুমানা গণি

চলছে জীবন

সুখ দুঃখ, ভালবাসা-মায়ার এই পৃথিবী ....
দু'দিনের খেলাঘর মাত্র !
কত কত ঘটনাপ্রবাহ ...
প্রতিদিন হয় নির্বাহ !
কোথাও হচ্ছে নবজন্মের
আনন্দ উচ্ছ্বাস ,
কোথাও যুগল প্রেমের মিলনের
বিবাহ উৎসব ।
কোথাও বিয়োগান্তক দৃশ্যের
হৃদয় বিদারক অনুভব ।
সুখের মুহূর্তগুলো খুব ছোট ,
কষ্টের বিষয়গুলো নির্বাক , স্তব্ধ
করে জীবন, সময় ।
পাঠ্যক্রম শেষে চলে কোথাও
সাফল্যের পুরস্কার গ্রহণ ,
কর্মের স্বীকৃতিতে সন্মানিত হয় কেউ !
কেউ আসছে ভ্রমণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ,
অবলোকন করছে বিশ্ব সৃষ্টির
অরূপ সুষমা ,
কেউ কর্তব্য কর্ম শেষে
সমৃদ্ধ জ্ঞানে ফিরছে পূর্বে ।
ঘটনার বিচিত্রতায় ,
সংবেদনশীল চিত্তে চলে
নিরন্তর আঁকিবুঁকি !

মরেনো ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

লুৎফর রহমান রিটন

পেরিয়ে এসেছি

পেরিয়ে এসেছি গাঁয়ের সীমানা মেঠো পথ বিল নদী
ধানক্ষেত জুড়ে সবুজের ঢেউ বয়ে চলা নিরবধি
বিষাদের সুর ডাহুকের পুঁথি উদাসী বটের ছায়া
লাউয়ের মাচায় সেই ছোট পাখি টুনটুনিটার মায়া...

পেরিয়ে এসেছি টং দোকানের আড্ডার ভাঙা টুল
খুদে শশাদের মখমল রোম বিকেলের শিমফুল
শালিখের ঠোঁটে সকালের রোদ।মোরগের ডাকাডাকি
পেরিয়ে এসেছি মানুষ বৃক্ষ ঘাসফুল বকপাখি...

গাঁয়ের সীমানা পার হয়ে এসে শহরে নিয়েছি ঠাঁই
পাষাণ হৃদয় ইটের শহরে কোনো মায়া দয়া নাই
ডাস্টবিন ঘাঁটে কুকুর ও মানুষ জীর্ণ শীর্ণ দেহ
সবখানে ভিড় উপচে পড়ছে ফিরেও চায় না কেহ
অচেনা শহরে আমি নবাগত গ্রাম থেকে আসা ভীতু
শহরের এক বস্তিদালান তাতেই হয়েছি থিতু।

ঝাঁ চকচকে শপিংমলের চোখ ঝলসানো আলো
কতো যে ব্যস্ত এইখানে আসা মানুষেরা জমকালো
সবাই ছুটছে কিনছে ঘুরছে দ্রুততায় সংক্ষেপে
আমি উঠে গেছি সপ্ততলায় এস্কেলেটারে চেপে
মানুষেরা খায় পিজা-বার্গার নিশ্চয়ই সুস্বাদু
সেই সাত তলা পেরিয়ে এসেছি এলিভেটরের জাদু।
রাস্তার জ্যাম পদ্মার সেতু কতোকিছু পেরুলাম
তবুও আমার বুকের মধ্যে বাস করে সেই গ্রাম...

একদিন সেই শহর পেরিয়ে এসেছি অনেক দূরে
এখানে সবাই সবকিছু পায় সবকিছু ফুরফুরে
বিদেশে জীবন খুব ছকে বাঁধা আর খুব নিরাপদ
নাগালেই থাকে খানাখাদ্যের সম্ভার প্রিয় মদ
এখানে বৃক্ষ নদী ফুল পাখি পাহাড়ও তো আছে ঢের
গরিব ধনীর সম অধিকার নাই কোনো হেরফের
বাড়ি গাড়ি টাকা সবই পাওয়া যায় আছে উপচানো সুখ
তবুও এ বুকে হাহাকার থাকে তবুও ভরে না বুক।

আমি ঘুমুলেও বুকের মধ্যে জেগে থাকে সেই গ্রাম
যার নদী জলে টলটল করে এই অধমের নাম
আমার নামটা লেখা আছে যার মৃত্তিকা আর মাঠে
কচুরি ফুলের শাদা-বেগুনীতে সন্ধ্যার খেয়াঘাটে
টুনটুনি সেই ছোট্ট পাখিটা আমাকেই খুঁজে ফেরে
বাসন্তী রঙ শাড়ি পরা মেয়ে কেঁদে ওঠে গলা ছেড়ে
শরতের মেঘ লিখে রাখে নাম আকাশের গাঢ় নীলে
সিম্ফনি তোলে বৃষ্টির ফোঁটা বর্ষার ভরা বিলে
অশথের গাছ ডানকানা মাছ খুঁজে খুঁজে হয়রান
বুড়ো সে বাউল একতারা হাতে গাইছে আমারই গান
ফড়িঙের ডানা হাঁসেদের ছানা রয়েছে প্রতীক্ষায়
তারারাও ডাকে কোথা গেলি ওরে ফিরে আয় ফিরে আয়...

নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে এলো দূর দূর বহুদূর
পেরিয়ে এসেছি আটলান্টিক সাগর-সমুদ্দুর
পেরোতে পেরোতে পেরোলাম কতো! পেরোনোর নেই শেষ
পেরোতে পারিনি পেরোনো যায় না কখনো নিজের দেশ...

অটোয়া, কানাডা

শীলা মোস্তাফা

এ যুগের দ্রৌপদী

সাপের লেজে পা দিয়েছ বটে
দুর্যোধনের লেজ ,
সাপে কাটবে, ছোবলে ছোবলে নীল করে দেবে
তোমার মোমের মত শরীর।

নীল রক্তাক্ত বিপর্যস্ত শরীর নিয়ে
তবু উঠে দাঁড়াও।
মাথা উঁচু করে হাঁটো
হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে
হামাগুড়ি দিয়ে চলো,
তবু নিঃশ্বাস নাও
তবু বেঁচে থাক।

তারপর আবার উঠে দাঁড়াও
মাথা উঁচু করে
বুক টানটান করে
হেঁটে যাও
সবুজ পাহারাদারদের পেছনে রেখে
নপুংসক আদালতের মুখে
ঘৃণা ছুঁড়ে,
হেঁটে যাও এ যুগের দ্রৌপদী।

দেখুক পৃথিবী
একবিংশ শতাব্দীর বস্ত্রহরণ
দেখুক মোসাহেব দল
দুর্যোধনের ক্রোধ আর ক্ষমতার দৌরাত্ম্য কতদূর।

মাটি কামড়ে বেঁচে থাকো!

প্রশ্নবিদ্ধ করুক তোমার পোশাক,
তোমার দেহ, তোমার মন,
তোমার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ,
প্রশ্নবিদ্ধ করুক তোমার প্রতি লোমকূপ
তবু প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নাও।
আর
রাত গভীর হলে
চোখ বন্ধ করে
তোমার বসার ঘরের দেয়ালে টাঙানো
কবিগুরুর সেই ছবির চিত্রে একাগ্র মনে
প্রার্থনা কর
'বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

ওদের ক্লেদাক্ত বিচারের প্রহসনে
তোমাকে ঘিরে থাকুক কলঙ্কিত সবুজ বাহিনী
তার মাঝখানে উন্নত শিরে
জেগে থাক পদ্ম!

ভুলে যেও না
ভুলে যেতে দিও না
আগুন থেকে যার সৃষ্টি
সে বজ্রাহত হয় না
ওরা দেখুক ওরা জানুক
মোমের মত শরীরের ভেতরে বাস করে
এক অগ্নিকন্যা,
তাকে জ্বালানো যায়, পোড়ানো যায়,
ডোবানো যায়,ভাসানো যায়,
কিন্তু কোন ভাবেই
অস্বীকার করা যায় না।

এলিসো ভিয়েও, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

শুক্লা গাঙ্গুলি

প্রেম নেই

দূরালাপনিতে শুনি এক আর্তনাদ
অষ্টাদশীর পা থেকে জঙ্ঘা বুক, চোখ, মুখ
ডুবে যাচ্ছে মৃত্যুর শীতলতায়
কাছের জন সরে গিয়ে, শূণ্যের বুঁদবুঁদে বাঁচা যেন এক-

আমি শিউরে পুড়তে থাকি ভীষন ভাবে
মন পুড়ে ছাই হয়ে ওড়ে আকাশে
থমকে থাকি কিছুক্ষন -

আজন্ম প্রেমিক জন্মজেয় জানায়-
কী ভিষন সংকট! প্রেম নেই কোথাও
সংসার অথবা কিশোর বেলার প্রারম্ভে
শুধু হিসেবের চাঁদমারি সর্বত্র

মনের ভিতর মনেরই হাহাকার শুনি
শেঁকড বাকড় হাতড়ে ঢালি জল দু'হাতে
প্রাণপন চেষ্টায়- প্রেমাঙ্কুর ফোটাই

যা ছিল, আছে ও থাকবেই,আদি ও অন্তে...

কলাম্বিয়া, মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র

শৈবাল তালুকদার

সন্ধ্যা

কচি কলাপাতা গাছের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে,
বাড়ী ফিরছে সূর্য রঙের মায়ায়
পরিযায়ী হংস মিথুনের শেষ সারি উড়ে গেল কি -
সব কোলাহল শেষে স্কুলের খেলার মাঠটা এবার একদম এলিয়ে
দিনের ক্লান্তির ধুলো মাখা গন্ধ নিয়ে,
তার পাশ দিয়ে জড়ানো রাস্তাও ফিরছে এবার
হিজল আর তমালের জড়াজড়ি দেখে
যেখানে দিঘীটা ডুব দিলো,
তার ধার ঘেঁষে কিশোরীর লাল গাইটিও -
আরতির ঘন্টার সাথে আকুল করা ধুপের গন্ধ ভাসছে
হাইয়া আলাল ফালাহ - ভেসে যায় চরাচর
আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম -
আগন্তুক ছোঁয়ায় লজ্জাবতী ঝাড় ত্রস্তে নিজেকে মুড়ে নিলো ঘোমটায়
সন্ধ্যে নামুক মেঘ জড়োয়ায়
আজ রাত ভোর বৃষ্টি -

শিকাগো, ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র

সুব্রতশঙ্কর ধর

হিজিবিজি

গল্পটা তেমন জমলো না।
হিজিবিজি আঁকিবুঁকি সব।
আহা, গল্পে রাজা থাকে রানী থাকে
পাইক পেয়াদা সব থাকে।
আষাঢ় শেষ হলেই থেমে যায় গল্প?
এই বরষায় জমিয়ে বলবো সেই গল্প-
কত কী ভেবে রেখেছিলাম!
হলো কই? রানী আছে তো রাজার দেখা নেই
পাইক-পেয়াদা আছে কিছু,
নামহীন-গোত্রহীন।ছায়া ছায়া।
এভাবে কি চলে?
যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব আছে,
কিন্তু এই আগস্টে এমন আবছায়া, এমন কুয়াশা
কে যে লড়ে কার সাথে বোঝাই গেল না!
সেও ঠিক ছিল যদি একটাই হতো যুদ্ধ।
তা তো নয়!

একজন এসে বললেন, "বাবা ফুকো,
গল্পটার একটা কিনারা করে দাও বাবা।'
ফুকো বললেন, "সবাই গল্পটা
নিজের মতন করে বলে।
গল্প বলে ক্ষমতা-সম্পর্কটা নিজের মত করে
সাজাতে চায় হে!"
বোঝা গেল কিছু? নাহ!

এডাম স্মিথকে দেখা গেল টাকার বান্ডিল হাতে
ঝুঁকে বসে আছেন ক্যাসিনোর টেবিলে।
ক্যাসিনোর আয়নায় তাঁর দশ প্রতিবিম্ব।
দশ প্রতিবিম্বে দশমুখো স্মিথ থেকে থেকে হেঁকে ওঠে
"লে ছক্কা, লে ছক্কা!"
কে জেতে কে হারে বোঝা দায়।
উডি এলেনের ছবির মতন সব কিছু এলোমেলো।
রাগ লাগে!

ভাল গল্প তো সরল গল্প, সবাই বোঝে এমন।
গল্পটা তেমন হলোই না।সবকিছু হিজিবিজি।
ওদিকে আবার ফেসবুক লাইভে বাজছে,
"যো ওয়াদা কিয়া ও নিভানা পারে গা, নিভানা পারে গা।'
তো কে কী ওয়াদা করেছিলো, বলো!

নাহ! গল্পটা জমেনি। একদম হিজিবিজি।

উডব্রিজ, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

হাসান মাসুম

ধুলো ও পাখিদের গ্রাম

পশ্চিম আকাশে রাঙ্গা আবীর রং
ধুলোঝড় যে নেই তা নয়
এর ভেতরেও পাখ-পাখালি
ডানা মেলে
সিঁদুর রাঙ্গা দিগন্তে।

নিকষ ধুলো?
ধুলোর পছন্দ প্রবল
একবার
ভেসে ওঠা বাতাসে
কিন্তু ডানা নেই তাই
পতিত হয় এঁকেবেঁকে
চলে যাওয়া পথে।
পথই কি ধুলোর
শেষ গন্তব্য তবে?
রঙ্গিন ডানা পেলেও অস্থায়ী
ধুলো ওড়ে না আকাশে ;

কুয়াশা -
ধুলো নেই
পাখি ওড়ে
পাখি উড়ে যায়,
ঝিরিঝিরি বাতাস -
ধুলো নেই

পাখি ওড়ে
পাখি উড়ে যায়।

ধুলো পাখি
পাখি ধুলো
বাতাসে ধুলো
আকাশে পাখি
ধুলো ধুলোপাখি পাখি
ধুলো ধুলো
পাখি পাখি
ধুলো ধুলো
পাখি পাখি।

ধূসর ধুলো?
বাতাসে ভর করে
ভেসে ভেসে ভেসে
অবশেষে পপাত ধরণীতে,
কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ
ধুলোর যে ভারী পছন্দ!

আর পাখ-পাখালি
ডানা মেলে বিহংগ
আবীর রাঙ্গা দিগন্ত পানে,
ধুলো-পাখিদের গ্রাম
কেবল রয়ে যায়
ধুলোদের গ্রাম হয়ে।

মাসেরু, লেসোথো

হোসনে আরা জেমী

স্বপ্নঘোর

নাগরিক জীবন খোঁজে শেকড়ের সান্নিধ্য;
গল্পবলার দিন খোঁজে নানীবুড়ির কোল।
মন চলে যায় রূপকথার রাজপুত্র, পঙ্খীরাজ ঘোড়া,
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি, সেই অচিনপুরে।

বৈশাখীমেলার বাতাসা, সাজের হাতি-ঘোড়া,
গুড়ের গরম জিলিপি বড়ো সুমধুর।
কাঠের নাগরদোলা, মাটির ডুগডুগি গাড়ি
মায়ের আবদার, মাটির হাঁড়ি-সরা,
মাছধোয়ার খসখসে চাড়ি কত কি যে নাম তার।

যাত্রাপালার ছাউনিতে উঁকিঝুঁকি, পুতুলনাচ
তালপাতার পাখায় ভালোবাসার কথা;
গায়ের বধূর লজ্জাবনত মুখ
ধানশালিক, ডাহুকের ডাকে জীবনের গান
মাঝিকণ্ঠে ভাটিয়ালী সুরে, নাইওর যাওয়ার টান।

চিত্রপটে আঁকা মাটি পুতুল, কাঠের ঘোড়ায়,
বৈশাখের রুদ্রঝড়, আম কুড়ানো
সাদাশাড়ী লালপাড়, কবিতা গান
আলতা মাখা পা, খোঁপার বেলি ফুল
জীবনের হেঁটে যাওয়া স্বপ্নঘোর
নিয়ে যায় নতুন দিনের অভিষেকে।

দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন আমি এসব থেকে।

টরোন্টো, কানাডা

নাটক

সুদীপ্ত ভৌমিক

সুন্দর-অসুন্দর

চরিত্রলিপি

ভ্রমর	বয়স ২০-২১, নারী, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার
শাশ্বত	বয়স ৩০-৩২, পুরুষ
সুমিত্রা	বয়স ২৫-২৬ নারী, শাশ্বতের বোন

(মঞ্চ অন্ধকার। কেবল ভ্রমরের গলা শোনা যায়।)

ভ্রমর কেউ আছেন? কেউ শুনতে পারছেন? প্লীজ আমাকে হেল্প করুন। আমি কিছু দেখতে পারছি না। প্লীজ কেউ একটু আলোটা জ্বালান।

(কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ভ্রমর কিছুতে ধাক্কা খায়। একটা কিছু গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা যায়। ভ্রমর চিৎকার করে ওঠে।)

ভ্রমর দরজা খুলুন! দরজা খুলুন! আলো জ্বালান, প্লীজ আলো জ্বালান।

(ভ্রমর কেঁদে ফেলে। হঠাৎ একটা দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া যায়। তারপর দপ দপ করে কয়েকটা জোরাল আলো জ্বলে ওঠে, ঠিক যেমন ফটোগ্রাফি স্টুডিওতে থাকে। পেছনে একটা বড় সবুজ পর্দা ঝুলছে, যার সামনে একটা চেয়ার আর টেবিল। পাশে একটি ডেস্ক এবং চেয়ার, সেখানে একটা কম্পিউটার। ঘরের অন্যপাশে একটা বুক শেল্ফ। শাশ্বতকে প্রবেশ করতে দেখা যায়, ওঁর হাতে একটা ট্রেতে কিছু খাবার। খুব যত্ন করে সাজান রয়েছে। শাশ্বত ট্রেটা টেবিলে রাখে। দেখা যায় ভ্রমর দেয়াল ঘেঁষে মাটিতে বসে রয়েছে।)

শাশ্বত একি! মাটিতে বসে রয়েছেন কেন? পোশাক নষ্ট হয়ে যাবে যে। উঠে বসুন।

(কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়)

শাশ্বত আসুন, উঠে আসুন।

(ভ্রমর এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।)

শাশ্বত বসুন। এই চেয়ারে বসুন। আপনার জন্য অনেক খুঁজে পেতে এই চেয়ারটা জোগাড় করেছি। আপনাকে খুব মানাবে। আপনি বসুন – প্লীজ।

ভ্রমর আপনি কে?

শাশ্বত ওমা, সেকি? আমাকে আপনার মনে নেই? রেস্টোরান্টে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন - কফি খেলেন - এত কথা বললেন - এখানে আসতে রাজী হলেন -

ভ্রমর আপনার সঙ্গে দেখা করতে রেস্টোরেন্টে...? কক্ষণও না। আপনাকে আমি আগে কোনদিন দেখিনি।

শাশ্বত বুঝেছি। রাস্তায় ঝাঁকুনিতে গাড়ির ছাতে আপনার মাথা ঠুকে গিয়েই বোধহয় আপনার স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে। তবে চিন্তা করবেন না, আমার মনে হয় এটা টেম্পোরারি এম্নেসিয়া। কেটে যাবে।

ভ্রমর আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি কে? কেন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন?

শাশ্বত দিচ্ছি, আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি। এক এক করে দিই? প্রথমে বলি আমি কে। আমার নাম শাশ্বত। আমি আপনার অন্ধ ভক্ত – একেবারে যাকে বলে একনিষ্ঠ ফ্যান।

ভ্রমর আমার ফ্যান? আপনি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছেন।

শাশ্বত একদম নয়। যা বলছি, একেবারে খাঁটি সত্য কথা বলছি। যদি চান গীতা স্পর্শ করে শপথ নিয়ে বলতে পারি। আমি আপনার বিশাল বিশাল বড় ফ্যান। আর সেই কারণেই আপনাকে এখানে এনেছি – আপনার সঙ্গে কয়েকটা মুহূর্ত কাটাব বলে। আপনার কাছ থেকে কিছু শিখব বলে।

ভ্রমর দেখুন ওসব বাজে কথা বলে আমাকে ভোলাতে পারবেন না। আমি কে যে আপনি আমার ফ্যান হবেন? আমি কোন সেলিব্রিটি নই, সিনেমা থিয়েটারে অভিনয় করি না, আমাকে কেউ চেনে না – আর আপনি বলছেন আপনি আমার ফ্যান?

শাশ্বত কি বলছেন ম্যাডাম? ফেসবুকে আপনার ফ্রেন্ড সংখ্যা পাঁচ হাজার পেরিয়ে গেছে। একটা পেজও আছে। ইন্সটাগ্রামে সাড়ে বারো হাজার। টিক টকে প্রায় ১০ হাজার। আর আপনি বলেছেন আপনি সেলিব্রিটি নন?

ভ্রমর বাজে কথা বলবেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই কয়েকটা ফলোয়ার নিয়ে কেউ সেলিব্রিটি হয় না। হ্যাঁ ইনফ্লুয়েন্সার বলতে পারেন। আজকাল অবশ্য অনেকেই আমাকে প্রোডাক্ট প্রোমোট করতে বলছে। (থেমে) আপনি কি আমাকে সব প্ল্যাটফর্মেই ফলো করেন?

শাশ্বত	সব – সব জায়গায় – মানে সোশ্যাল মিডিয়ার সব কটা মাধ্যমেই আমি আপনার অনুগত ফলোয়ার।

ভ্রমর	আপনি টুইটার, স্ন্যাপচ্যাট, পিন্টারেস্টের কথা বললেন না তো, তাই বলছি।

শাশ্বত	টুইটারে থাকব না, তাই কখনো হয়? পিন্টারেস্টের আপনার একেকটা পোস্ট তো আমাকে মুগ্ধ করে রাখে। কি করে করেন আপনি? অমন সুন্দর সুন্দর পোস্ট? রোজ সকালে উঠে আমার প্রথম কাজ কি জানেন? আপনার প্রোফাইলে গিয়ে চেক করা নতুন কি পোস্ট দিয়েছেন আপনি। প্রায় প্রতি ঘণ্টায় আমি খোঁজ নিই, আপনি কি খেলেন, কোথায় গেলেন, কি পোশাক পড়লেন, কার কার সঙ্গে সেলফি তুললেন। ওই আপনি একটা পা সামান্য ভেঙে কোমরে হাত রেখে যখন ছবি তোলেন – আঃ মনে হয় যেন মরে যাই।

ভ্রমর	কি সাংঘাতিক! আপনি কি আমাকে স্টক করেন নাকি?

শাশ্বত	স্টক বলছেন কেন? ছবিগুলো আপনার ফলোয়ারদের জন্যই তো পোস্ট করেন? আমি তো তাই দেখি। আপনার সব বন্ধুরাই দেখে। তবে আমার মত আপনাকে কেউ ফলো করে না। আপনি দেখবেন, সবচেয়ে বেশি লাইক আমি দিই।

ভ্রমর	আপনি? আপনার আইডি কি?

শাশ্বত	আইডি বললে কি চিনবেন? একেক জায়গায় একেক রকম। যেমন ধরুন ফেসবুকে আমি লোণ রেঞ্জার। ক্রিস্টিয়ানো রোমানো নামেও একটা একাউন্ট আছে। ইন্সটাগ্রামে আমি হাবলা গোব্লা, অথবা বিউটি হান্টার। টিক টকে আমি স্যাসিতোতো –

ভ্রমর	ওসব কোন নাম আমার মনে পড়ছে না...

শাশ্বত	কি করে মনে পড়বে? আপনার হাজার হাজার ফ্যানের মধ্যে থেকে আমাকে মনে রাখবেন কি করে?

ভ্রমর	ঠিক আছে। আপনি আমার ফ্যান, আমি মেনে নিলাম। এখন আমাকে ছেড়ে দিন, আমি বাড়ি যেতে চাই।

শাশ্বত	না না তা কি করে সম্ভব। আসল কাজটাই তো হয়নি।

ভ্রমর	আসল কাজ? কি আসল কাজ? আপনি আমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছেন। আপনি খুব ভাল করেই জানেন যে সেই অপরাধে আপনার কঠিন সাজা হতে পারে। এখন আপনি যদি আমাকে ভালয় ভালয় ছেড়ে দেন, আমার ফ্যান বলে আমি আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনব না। তা না হলে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। আমার বাবার পুলিশের ওপর মহলে ভাল কানেকশান আছে। আমার ফিরতে দেরি হলে কিন্তু শহর তোলপাড় হয়ে যাবে বলে দিলাম।

শাশ্বত সে ব্যাপারে একদম চিন্তা করবেন না। আপনার বাবা মা জানেন আপনি কোথায়।

ভ্রমর ওরা জানে? ওরা জানে আপনি আমাকে ধরে এনেছেন?

শাশ্বত ওরা জানেন আপনি আপনার এক বন্ধুর ফার্ম হাউসে বেড়াতে গেছেন। আপনার সঙ্গে ফোনে কথাও হয়ে গেছে...

ভ্রমর কথা হয়ে গেছে? এসব কি বলছেন আপনি? কি করে কথা হলো? কখন কথা হলো?

শাশ্বত তখনই তো বললেন আপনার মনে নেই। ভুলে যাবার আগে আপনি বলেছিলেন। যাকগে, মোদ্দা কথা হল, আপনার বাবা মা মোটেই চিন্তা করছেন না – আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এখন তাহলে কাজের কথায় আসি?

ভ্রমর তার আগে বলুন কেন আপনি আমাকে –

শাশ্বত সেই কথাই তো বলছি। আপনাকে আমার এখানে অতিথি করে এনেছি আমার একটা ইচ্ছে পূরণ করতে – একটা দীর্ঘদিনের ইচ্ছে। আমি চাই, আপনি একটা দিন আমার এখানে থাকুন, এবং আমার সামনে বসে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটার পর একটা পোস্ট করুন – ফেস বুক, ইন্সটাগ্রাম, টিক টক – সারাদিন ধরে আপনার নানান এক্টিভিটি। আসলে আমি শিখতে চাই -

ভ্রমর আপনি কি পাগল? আমি এখানে বসে কি করে পোস্ট করব? আমার ফোন – *(ফোনটা খোঁজে)* আমার ফোন কোথায়? নিশ্চয়ই আপনি সরিয়েছেন?

শাশ্বত অবশ্যই সরিয়েছি। আমি চাইনা আপনি কোন ভাবে ডিস্ট্র্যাক্টেড হন। তবে পোস্ট করার জন্য আপনাকে ফোন ব্যবহার করতে হবে না। আমি আপনাকে একটা আই প্যাড দেব। সেটা ব্যবহার করেই আপনি পোস্ট করবেন।

ভ্রমর ঠিক আছে। আমি পোস্ট করব। আমাকে আইপ্যাড দিন, আমি এখুনি পোস্ট করব।

শাশ্বত থ্যাঙ্ক ইউ। আমি জানতাম আপনি রাজি হবেন। *(পাশের ডেস্ক থেকে একটা আইপ্যাড বার করে টেবিলে রাখে)* আপনার খাটনি বাঁচাতে আমি বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি। আপনাকে সব মিডিয়ায় আলাদা আলাদা করে পোস্ট করতে হবে না। আপনি এই অ্যাপটা তে লিখবেন, ছবি তুলতে চাইলে ছবি তুলবেন। সামনে এই ক্যামেরাটা দেখছেন? আপনি অ্যাপের এই বোতামটা টিপলেই ছবি উঠে যাবে। আপনি বললে আমি ক্যামেরা এ্যাঙ্গেল এ্যাডজাস্ট করে দেব। আর তারপর আমি আপনার পোস্টগুলিকে যথাযথ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পাঠিয়ে দেব - ইন্সট্যান্টলি, কেমন?

ভ্রমর আপনি পাঠাবেন কি করে? আমার ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড –

শাশ্বত	সেসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। ওসব আমার আগে থেকেই ব্যবস্থা করা আছে।

ভ্রমর	কি সাংঘাতিক! আপনি তো ক্রিমিনাল –

শাশ্বত	না! না, আমাকে ক্রিমিনাল বলবেন না। আমি কি আপনার পাসওয়ার্ড, ইউজার আইডি কখনো কোন অসৎ কাজে ব্যবহার করেছি? করিনি। আজও করব না। পোস্ট আপনি করবেন, আমি কেবল এডিটিং আর পোস্ট প্রোডাকশনের এর কাজটা করব মাত্র।

ভ্রমর	কিন্তু –

শাশ্বত	ঠিক ধরেছেন। একটু সেন্সারশিপও করতে পারি। আপনি যদি এমন কিছু পোস্ট করেন যা আপনার বা আমার দুজনের পক্ষেই ক্ষতিকারক, সেটা তো আমি হতে দিতে পারি না। তাই আপনার পোস্টগুলো একটু দেখেশুনে তারপর রিলিজ করব, কেমন?

ভ্রমর	না না, এই শর্তে আমি পোস্ট করব না। কিছুতেই করব না।

শাশ্বত	এই ভয়টাই পেয়েছিলাম। দেখুন ভ্রমর, পোস্ট আপনাকে করতেই হবে। পোস্ট না করলে আপনি ছাড়া পাবেন না। আপনার একজন ফ্যান হিসেবে আপনাকে আমি বিনীত অনুরোধ করছি, না করবেন না। করলে আপনার আমার কারও পক্ষেই ফল ভাল হবে না।

ভ্রমর	আপনি কি আমাকে থ্রেট করছেন?

শাশ্বত	না, করছি না। কেবল সিচুয়েশান্টা বোঝাতে চাইছি। আমি আপনাকে একটা সিম্পল রিকোয়েস্ট করছি। কেন সেটাকে খামাখা কমপ্লিকেটেড করছেন? কোন ব্যাপারে কমপ্লিকেশান হলেই ঝামেলা – সব কিছু কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায়। আর সেটা মোটেই ভাল কথা নয়। আসুন, এখানে বসে এখন আপনার প্রথম পোস্টটা করুন। আসুন আসুন দেরি করবেন না। আপনার ফলোয়াররা অপেক্ষা করে আছে।

(ভ্রমর তবু দাঁড়িয়ে থাকে। শাশ্বত হঠাৎ গর্জে ওঠে।)

শাশ্বত	বসুন!

(ভ্রমর ঘাবড়ে গিয়ে চেয়ারে বসে।)

শাশ্বত	আমি দুঃখিত। আমি গলা উঁচু করতে চাইনা, কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে ফেললে, নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। আসুন। আপনার প্রথম পোস্ট হবে এই খাবারের। আপনি সবাইকে জানাবেন কি আনন্দ সহকারে আপনি আমার ফার্ম হাউজে বসে, এই ফার্মের টাটকা অরগানিক খাবার এঞ্জয় করছেন, কেমন?

(শাশ্বত ক্যামেরাটা এ্যাজাস্ট করে)

ভ্রমর	এইবার বুঝেছি। আমাকে দিয়ে আপনার ফার্মের অরগানিক খাবার প্রোমোট করাতে চান এই তো? চলুন, কোথায় আপনার ফার্ম হাউজ?

শাশ্বত	ফার্ম হাউজ আসবে। আপনার পেছনে ওই গ্রিন স্ক্রিন দেখছেন? ওখানেই ফার্ম হাউজের ছবি ঢুকে যাবে। চিন্তা করবেন না, আমি সব ঠিক করে রেখেছি। নিন শুরু করুন। একটা ভিডিও দিয়ে শুরু করা যাক?

ভ্রমর	আমার ভিডিও?

শাশ্বত	অবশ্যই আপনার ভিডিও। আমি ক্যামেরা ঠিক করে দিচ্ছি। কোন এ্যাঙ্গেলে ধরব বলুন? লাইট নিয়ে চিন্তা করবেন না। সব ঠিক আছে –

ভ্রমর	আমি অন্যের ক্যামেরায় ভিডিও করি না –

শাশ্বত	আবার সেই এক কথা। বললাম তো, আপনার সব একাউন্ট ডিটেলস আমার কাছে আছে। আমার ক্যামেরা হলেও, একাউন্টগুলো তো আপনার। কেউ বুঝতে পারবে না। আসুন, আর সময় নষ্ট না করে শুরু করুন।

ভ্রমর	আপনার ফেস টিউন আছে তো?

শাশ্বত	ফেস টিউন?

ভ্রমর	ফেস টিউন জানেন না? ফেস টিউন হল beauty enhancer app। আমাদের মুখের, দেহের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য এই অ্যাপ একেবারে অপরিহার্য...

শাশ্বত	না ফেস টিউন নেই।

ভ্রমর	ইউ-ক্যাম পারফেক্ট আছে? ক্রিম ক্যাম? রিটাচ মি? আমি যদিও ফেস টিউনটাই পছন্দ করি, কিন্তু এগুলো হলেও কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।

শাশ্বত	না ওসব কিছুই নেই।

ভ্রমর	তাহলে কি করে হবে? ফেস টিউন ছাড়া আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার ছবি দিই না।

শাশ্বত	শুনুন ভ্রমর, আমার ক্যামেরা যথেষ্ট ভাল – খুব হাই রেজোলুশান। ভালো আলোর ব্যবস্থা করেছি – ছবি খুব ভাল উঠবে...

ভ্রমর	আঃ, হাই রেজোলিউশান বলেই তো আরও মুশকিল। স্কিনের সব ডিফেক্ট ধরা পড়বে। আপনি ফেস টিউন অ্যাপ ডাউনলোড করুন, তারপর আমি ছবি তুলছি।

শাশ্বত	*(বেশ রাগত স্বরে)* আপনি কেন ফেস টিউন, ফেস টিউন করে ক্ষেপে উঠেছেন বলুন তো?

ভ্রমর	কারণ ফেস টিউন আমার লাগবেই। ফেস টিউন ব্যবহার না করে ছবি পোস্ট করলে, কেউ আমাকে চিনতে পারবে না। বুঝেছেন?

শাশ্বত	আপনাকে যখন প্রথম দেখলাম, মানে রক্ত মাংসে সাক্ষাত দেখলাম, চিনতে একটু অসুবিধে হয়েছিল ঠিকই। ভাবতে পারিনি আমার সামনে যাকে দেখছি তিনিই সেই সুন্দরী যাকে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় পুজো

করি। ইন্সটাগ্রামে আপনার ছবি দেখতাম আর ভাবতাম, এতো সুন্দর মানুষ হতে পারে? মখমলের মত মসৃণ ত্বক, গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট – আর চোখ দুটো – দেখলে মনে হত স্বর্গের অপ্সরাদের চোখ কি এত সুন্দর?

ভ্রমর থাক আর বেশি বলতে হবে না। এখন বুঝতে পারছেন তো, কেন আমি ফেস টিউন ছাড়া আমার মুখ কাউকে দেখাতে চাই না?

শাশ্বত কিন্তু আমি চাই আপনার এই পিওর সিম্পল লুকটাই আপনার ফ্যানরা দেখুক। তারা আপনার সত্যি চেহারাটা এপ্রিশিয়েট করতে শিখুক।

ভ্রমর আপনি কি পাগল হয়েছেন? আমার স্কিন দেখেছেন? মুখের এই দাগগুলো? এই রকম কুতকুতে চোখ যার, তাকে কখনও ভাল দেখতে লাগে? আমার আইব্রাউ? দেখলে মনে হয় এক জোড়া ঝাঁটা। আর আমার ফিগার? কত ডায়েট করেছি জানেন? কিছুতেই জিরো ফিগার করতে পারছি না। না না – অসম্ভব। এই চেহারা আমি কিছুতেই মানুষকে দেখাতে পারব না। মেরে ফেললেও না।

শাশ্বত এই চেহারাই আপনাকে দেখাতে হবে। আমি চাই আপনার আসল রূপটাই মানুষের কাছে পৌঁছুক। আপনাকে আর আমি লোক ঠকাতে দেব না।

ভ্রমর দেখুন আপনি আমাকে জোর করতে পারেন না। তাছাড়া, এই চেহারায় আমি আপনার অরগানিক খাবার পোষ্ট করলে আপনারই ক্ষতি। লোকে ছ্যা ছ্যা করবে।

শাশ্বত চুলোয় যাক অরগানিক খাবার। আপনি ছবি তুলুন – আমি আপনাকে শেষ ওয়ার্নিং দিচ্ছি।

ভ্রমর কি করবেন আপনি? কি করবেন? আমাকে মারবেন? অত্যাচার করবেন? খুন করবেন? করুন, আমি পরোয়া করি না। আপনাকে বললাম তো, মরে গেলেও আমি আমার এই চেহারা ইন্সটাগ্রামে দিতে পারব না।

শাশ্বত *(চিৎকার করে ওঠে)* আপনারা কি? আপনারা কোন গ্রহের প্রাণী?

ভ্রমর চিৎকার করছেন কেন?

শাশ্বত কেন চিৎকার করছি? (পকেট থেকে ফোন বার করে একটা ছবি দেখায়।) কি দেখছেন?

ভ্রমর একটা মেয়ের ছবি। কে ও?

শাশ্বত সুমি – সুমিত্রা। আমার বোন। একটা বোকা মেয়ে।

ভ্রমর তা খুব একটা ভুল বলেননি আপনি। একটু বুদ্ধি করে যদি ফেস টিউন ব্যবহার করত, অনেক সুন্দর দেখাত ওকে। ওকে বলবেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে, আমি দেখিয়ে দেব কি করে ফেস টিউন ব্যবহার করতে হয়।

শাশ্বত	সেই ব্যবস্থাই করব। ওর কাছেই পাঠাব আপনাকে। কোথায় জানেন? পরপারে।

ভ্রমর	প... প... পরপারে মানে?

শাশ্বত	পরপারে মানে ওপরে।*(শাশ্বত একটা পিস্তল বার করে টেবিলে রাখে।)* বোকা মেয়েটা নিজেকে খুন করেছে - এই পিস্তল দিয়ে। মুখের ভেতর নলটা ধরে ট্রিগার চেপে দিয়েছে - মাথার খুলিটা ছিটকে দেওয়ালে গিয়ে লেগেছিল - ঘিলু সমেত।

ভ্রমর	ও মা গো -

শাশ্বত	কেন করেছিল জানেন? নিজেকে ঘেন্না করত মেয়েটা। নিজের চেহারা নিজেই সহ্য করতে পারত না।

ভ্রমর	কিন্তু তাই বলে -

শাশ্বত	কেন একটু আগেই তো আপনি বললেন, আপনার আসল চেহারা দেখাবার চেয়ে মরা ভাল?

ভ্রমর	না, মানে সেটা তো একটা -

শাশ্বত	আমার বোনের মৃত্যুর জন্য কে দায়ী জানেন? আপনি। আপনারা - যারা সৌন্দর্যের সংজ্ঞাকে এক অলীক অবাস্তব পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। আর সেই মিথ্যে রূপ দেখিয়ে প্রলোভিত করছেন হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে। আপনারা বাস্তবে নিজেদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, এক মেকি পরাবাস্তব ডিজিটাল জগতে বাস করতে ভালবাসেন। বেশ, তাই থাকুন। এই বাস্তব পৃথিবীতে আপনাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই -

ভ্রমর	এই শুনুন, ওই সব কঠিন কঠিন বাংলা শব্দ দিয়ে জ্ঞান দেবেন না তো। খুব আমাদের দোষ দিচ্ছেন তাই না? আপনারা সব সাধু? আপনি দেখেন কেন আমাদের ছবি, আমাদের পোষ্ট? হাজার হাজার মানুষ আমাদের ফলো করে কেন? আপনি নিজেই তো বললেন, সবচেয়ে বেশি লাইক আপনি দেন। আমি যদি আমার এই চেহারা দিয়ে পোস্ট করতাম, আপনি আমায় ফলো করতেন? লাইক দিতেন? দিতেন না।

(শাশ্বত চুপ করে থাকে)

ভ্রমর	কি এখন চুপ করে গেলেন কেন? আপনারা পুরুষ মানুষরা না, ডেঞ্জারাস জিনিস। নিজেরা সব সময় ফ্যান্টাসির জগতে থাকেন, আর তারপর দোষ দেন আমাদের - মেয়েদের। আপনারাই তো চান জিরো ফিগার, হাই চিক বোনস, গ্লোয়িং স্কিন, লার্জ আইজ, শার্প ফেস। চান না?

শাশ্বত	আপনারাই আমাদের এক্সপেক্টাশান পাল্টে দিয়েছেন। ক্রমাগত ওই সব ফলস ছবি ভিডিও দেখিয়ে আমাদের টেনে নিয়েছেন আপনাদের ফেক দুনিয়ায়। দিনের পড় দিন আমাদের ঠকিয়ে চলেছেন। আর আমরা বোকার

মত সেই ফাঁদে ধরা পরে লাইকের পড় লাইক দিয়ে চলেছি। ভুলে গেছি সত্যিকারের রক্ত মাংসের মানুষ এরকম হয় না, হতে পারে না। কিন্তু আর না। উই হ্যাভ টু স্টপ দিস ননসেন্স। আমি এক এক করে আপনাদের ধরে নিয়ে আসব, আপনাদের ওই বদ অভ্যাস ছাড়াব। আপনাকে দিয়ে আমার এই মিশনের শুরু। নিন শুরু করুন। ছবি তুলুন।

(শাশ্বত পিস্তল তুলে ধরে, ধমকে ওঠে।)

শাশ্বত কি বললাম? শুরু করুন।

(ঠিক এই সময়ে দরজা ঠেলে প্রবেশ করে সুমিত্রা।)

সুমিত্রা কিরে দাদা? এখানে কি করছিস - তখন থেকে তোকে খুঁজছি - *(ভ্রমরকে দেখে)* ইনি কে?

ভ্রমর আপনি - আপনি তো - সুমিত্রা -

সুমিত্রা হ্যাঁ আমি সুমিত্রা...

ভ্রমর কিন্তু উনি যে বললেন আপনি নেই - মানে আপনি সুইসাইড করেছেন... ওই পিস্তল দিয়ে -

সুমিত্রা সুইসাইড? কিরে দাদা? কি বলেছিস তুই?

শাশ্বত ও ফেস টিউন ব্যবহার করতে চাইছিল...

সুমিত্রা ও বুঝেছি। দাদা, তোকে আমি বারণ করেছিলাম, তবু তুই। *(ভ্রমরকে)* না না, আপনি বসুন - আপনাকে বলছি সব -

শাশ্বত না, তুই কিচ্ছু বলবি না। সব দোষ তোর।

সুমিত্রা আচ্ছা বেশ, সব দোষ আমার। আমি তো আগেই স্বীকার করেছি। কিন্তু তাই বলে তুই এই মেয়েটাকে ধরে আনবি?

শাশ্বত ওকে বুঝতে হবে - তা না হলে একদিন ওর কপালেও তোর মত দুঃখ আছে বলে দিলাম।

ভ্রমর আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমার খুব ভয় করছে...

সুমিত্রা না না ভয় পাবেননা - কি নাম বললেন আপনার?

ভ্রমর আমার নাম ভ্রমর...

সুমিত্রা ভ্রমর, আমি আপনাকে সব খুলে বলছি। দাদা, তুই অন্য ঘরে যা।

শাশ্বত না আমি যাব না। ভ্রমর আগে পোষ্ট করবে, তারপর...

সুমিত্রা তাহলে তোর সামনেই বলি? পরে কিন্তু আমাকে বকবি না। *(শাশ্বত চুপ করে থাকে। সুমিত্রা ভ্রমরকে বলে)* আমি তোমাকে তুমি করেই বলছি, কেমন? তুমি নিশ্চয়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব এ্যাকটিভ? তোমার অনেক ফলোয়ার, তাই তো? *(ভ্রমর চুপ করে থাকে)* এক সময়ে আমিও সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব এ্যাকটিভ ছিলাম। প্রচুর ফলোয়ার ছিল। ট্রোলার ও ছিল অনেক। আর হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ - তোমার মতো আমিও ফেস টিউন ব্যবহার

করতাম। আমার এই অতি সাধারণ, অসংখ্য খুঁতে ভরা চেহারাটাকে পরীর মত সুন্দর করে দিত ওই অ্যাপ। ফলে বুঝতেই পারছ, হাজার হাজার ছেলে আমার প্রেমে পড়তে লাগল - প্রপোজালে প্রপোজালে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম।

ভ্রমর যা বলেছেন। মাথা খারাপ করে দেয় একেবারে।

সুমিত্রা কিন্তু তাদের মধ্যেই একজনকে আমার ভাল লেগে গেল। খুব সেন্সিবল কথা বলত রাজীব। বুঝতাম ওর অনেক পড়াশোনা, অনেক গভীর ওর ভাবনা চিন্তা। ভীষণ রকমের সমাজ সচেতন। খুব ভাল লিখতও রাজীব। ওর কবিতা, ওর গল্প আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল।

শাশ্বত তুই পাগল ছিলি - বদ্ধ পাগল। আমি তোকে বারণ করেছিলাম, তুই আমাকে পাত্তা দিস নি।

সুমিত্রা বাজে কথা বলিস না। রাজীবের কথা শুনে তুইই তো বলেছিলি ব্যাপারটাকে ভার্চুয়াল না রেখে সামনা সামনি কথা বলতে।

শাশ্বত কেন বলেছিলাম বুঝতে পেরেছিস তো? ঘা না খেলে তো তোদের শিক্ষা হয় না।

সুমিত্রা অবশ্য আমাকে বিশেষ কিছু বলতে হয় নি, একটু হিন্ট দিতেই ও দেখা করতে রাজী হয়ে গিয়েছিল।

ভ্রমর তারপর?

শাশ্বত তারপর কী বুঝতে পারছ না? স্বপ্নভঙ্গ হলে কি হয়? দারুণ শক পেলে কি হয়?

সুমিত্রা একটা রেস্টুরেন্টে দেখা করার কথা ছিল। আমি বেশ কিছুটা আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। রাজীব এলো, দেখলাম ভেতরে এসে এদিক ওদিক আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখলও বার দুয়েক, কিন্তু চিনতে পারল না। আমি যখন হাত নেড়ে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম কি ভীষণ চমকে উঠেছিল রাজীব। ও হয়ত আশা করেছিল - হয়ত কেন, নিশ্চয়ই করেছিল - আমাকে আমার ওই ফেসবুক বা ইন্সটাগ্রামের মতই দেখতে হবে। আর আমিও কেমন বোকার মত ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি একজন অত্যন্ত সাদামাটা, রোগা শ্যামলা মেয়ে যার বাস্তবিক কোন চটক নেই - যার ত্বক গোলাপি উজ্জ্বল নয়, যার ভ্রূ ধনুকের মত নয়, যার ঠোঁট পাকা বিম্ব ফলের মত নয়। ওই হালকা মেকআপ কি আর ফেস টিউনের বিকল্প হতে পারে?

ভ্রমর রাজীব আপনার সঙ্গে দেখাই করল না?

সুমিত্রা না, এল। আমার সামনে বসল, কিন্তু বুঝলাম ও সচ্ছন্দ বোধ করছে না। আমাকে বলল, ওর তাড়া আছে - কদিন বাদে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

ভ্রমর যোগাযোগ করেছিল?

সুমিত্রা হ্যাঁ, পরদিনই আমাকে মেসেজ করেছিল। বলেছিল, ডিজিটাল মিডিয়া আর বাস্তবে যে এতোটা ফারাক হতে পারে ও কল্পনাও করতে পারেনি। বলছিল, ভুলটা ওরও - কারণ সহজ সারল্যে ওই মিথ্যেটাকেই সত্যি বলেই ভেবে নিয়েছিল ও। তারপর বলেছিল, আমার মত একজন হালকা সুপারফিশিয়াল মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

ভ্রমর ইসস...

সুমিত্রা আমি খুব ভেঙে পড়েছিলাম জানো। এতো অপমানিত লেগেছিল, এত ছোট মনে হয়েছিল নিজেকে - গভীর ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলাম। আর সেই সময়েই, একটা বিশ্রী কাজ করে ফেলেছিলাম প্রায়। ওই পিস্তলটা দিয়ে নিজেকে শেষ করে দেবার চেষ্টা করেছিলাম...

শাশ্বত *(চিৎকার করে ওঠে)* তাই করা উচিৎ ছিল! এই বাস্তব পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই তোর। তুই মরে গেলে কারও কিছু আসত যেত না। তোর ডিজিটাল অস্তিত্বটা নিয়ে মেতে থাকত তোর ডিজিটাল সমাজ - তোর বন্ধুরা।

(সুমিত্রা উঠে গিয়ে পাশের শেল্ফে রাখা একটা বোতল বা প্যাকেট থেকে একটা ওষুধের ট্যাবলেট আর এক গেলাস জল ঢালতে ঢালতে বলে)

সুমিত্রা আমার হাত থেকে পিস্তলটা কিন্তু তুইই কেড়ে নিয়েছিলি দাদা। (ভ্রমরকে) সেই সময়ে আমার মাথা খুব একটা কাজ করছিল না। দুদিন বাদে বুঝলাম কী ভয়ঙ্কর একটা কাজ করতে চলেছিলাম। আর বোঝামাত্র ঠিক করলাম, নিজেকে নয় - হত্যা করতে হবে আমার ডিজিটাল অস্তিত্বকে। সেই দিনই আমার সব একাউন্ট ডিলিট করে দিয়েছি আমি।

শাশ্বত ভুল ভুল! ডিজিটাল অস্তিত্ব কোনদিন মরে না। লুকিয়ে থাকে কেবল। সুযোগ বুঝে ঠিক একদিন বেরিয়ে আসবে। তখন কি করবি? পালাতে পারবি? (ভ্রমরকে) তুমিও পালাতে পারবে না। তোমার ওই ফেস টিউন বিকৃত ডিজিটাল তুমি, তোমাকে তাড়া করে ফিরবে সারা জীবন...

সুমিত্রা *(ওষুধটা শাশ্বতকে দেয়।)* এটা খেয়ে নে দাদা। খা।

(শাশ্বত ওষুধটা খায়। সুমিত্রা শাশ্বতের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে)

সুমিত্রা তারপর আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু দাদাটা যেন কেমন হয়ে গেল। সব সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোকে ওই সব অ্যাপ ব্যান করার দাবি জানিয়ে চিঠি লিখতে লাগল। নিজেও নানা রকমের ক্যাম্পেন করতে শুরু করল - কিন্তু কোন লাভ হলো না। তারপর যেসব মেয়েরা ওই অ্যাপ ব্যবহার করত, তাদের ফলোয়ার হয়ে - তাদেরও সাবধান করতে

লাগল। কিন্তু তাতে ফল হল উল্টো - তারা তো দাদার সতর্কবাণী শুনলই না, বরং উলটে ওকে ব্লক করে দিতে থাকল।

ভ্রমর হ্যাঁ, আমিও সেরকম...

শাশ্বত *(প্রায় ঘুম জড়ানো গলায়)* বোকা, বোকা - তোমরা সবাই বোকা...

সুমিত্রা কিন্তু দাদা যে এখন এই চরম পন্থা নিয়েছে সেটা আমার জানা ছিল না। দেখছিলাম, কদিন ধরেই এই ঘরে কী সব করছে। জিজ্ঞাসা করলে বলত, স্টুডিও তৈরি করছি - লাইভ ভিডিও করে সবাইকে জানাব।

ভ্রমর আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এভাবে আমাকে কিডন্যাপ করে এনে... কিভাবে যে এলাম সেটাও মনে নেই। আমার ফোনটা...

(সুমিত্রা এগিয়ে শেল্ফ থেকে একটা ফোন নিয়ে আসে।)

সুমিত্রা এই ফোনটা?

ভ্রমর হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই তো। (ফোনটা নিয়ে ডায়াল করে)
হ্যালো, মা।
- ফার্ম হাউজে ? তোমাকে বলেছি না?
- না খেয়াল ছিল না। ভাল খুব ভাল...
- ঠিক আছে রাখছি।

(সুমিত্রা এতক্ষণ ওর ফোনে কী দেখছিল। ফোনটা ভ্রমরের দিকে এগিয়ে এনে বলে।)

সুমিত্রা এই তো, তুমি একটা ফার্ম হাউজ থেকে তোমার ছবি পোস্ট করেছ। এটা তোমার একাউন্ট তো?

ভ্রমর হ্যাঁ এটাই তো। কিন্তু আমি তো...

সুমিত্রা তোমাকে বলেছি, আমার দাদা একজন ব্রিলিয়ান্ট কম্পিউটার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার? ওর কাছে এসব নস্যি। সুতরাং –

(ভ্রমর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে)

সুমিত্রা তুমি চাইলে এখন বাড়ি যেতে পার ভ্রমর। দাদাকে নিয়ে চিন্তা করো না। ওর সায়কায়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলব যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে। এখন চল, দাদা জেগে ওঠার আগেই তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। *(থেমে)* তবে তোমাকে একটা অনুরোধ - আজকের এই ঘটনার কথা তুমি কাউকে বলতে যেও না। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, তুমি প্রমাণও করতে পারবে না। কে জানে, হয়ত এটাও তোমার ডিজিটাল দুনিয়ার একটা অলীক গল্প? তাই না?

(ভ্রমর অবাক হয়ে একবার সুমিত্রা, একবার শাশ্বতর দিকে তাকায়। আলো নিভে যায়)

৯ গল্প ৎ

অদিতি ঘোষদস্তিদার

জীবনের আরেক নাম

'তুমি এবারও যাবে না দীপ? এত বড় সম্মান, বিদেশ থেকে কত মানীগুণী লোক আসছেন, নেবে না সম্বর্ধনা? আড়ালেই থাকবে সারাজীবন! মানুষ তোমাকে দেখতে চায় যে!'

'কেন বারবার এই প্রশ্ন তোল রাণু, বলেছি তো এই সম্মান পাবার যোগ্য আমি নই, সব জানো তুমি, তাও....'

'আমি কোনদিন জোর করিনি, কিন্তু আজ প্রশ্ন করছি, যাবে না কেন তুমি? অক্লান্ত পরিশ্রম আর ভালবাসায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছ তুমি আর তোমার সহকর্মীরা। তোমাকে দেখে কত মানুষ শিখবে, বুঝবে! এ সম্মান তোমার প্রাপ্য, কোনো সন্দেহ নেই তোমার যোগ্যতায়!'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে প্রদীপ্ত। ভাবে।

রণিতা বলে চলে, 'মানসী ফোন করেছিল, আমি বলেছি মাহিকে নিয়ে আসতে।অন্য জায়গায় হলে সম্ভব হত না, কনফারেন্স তো গোপালপুরের 'ওবেরয়'তেই হচ্ছে, ওদের বাড়ির কাছেই!'

চমকে ওঠে প্রদীপ্ত! মাহি! মাহি আসবে!

আস্তে আস্তে বলে, 'আমি যাব।সবার সামনে অপরাধ স্বীকার করব।'

'এ নিয়ে কথা বোধহয় আগে কয়েক কোটি বার হয়ে গেছে দীপ, তোমার কোন তো দোষ ছিল না, সবাই জানে ওটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিচ্ছু নয়।'

'আমি নিজে মানতে পারি না, কিছুতেই না! কিন্তু একবার না একবার তো আমাকে দাঁড়াতে হবেই মাহির সামনে, তাই না? এবারই হোক সেটা।গুছিয়ে নাও।যাচ্ছি।'

একটুখানি মেঘ এসে ঢাকল গনগনে সূর্যটাকে। কলসি আর বালতিটা হাত থেকে নামিয়ে আঁচলে মুখটা একটু মুছে নিল মাহি। একবার তাকাল আকাশের দিকে।নাঃ, সেরকম মেঘ নয়, বর্ষা আসতে এখন অনেক দেরি। তবুও একটুখানি শান্তি।আরো বেশ

খানিকটা পথ হাঁটতে হবে এখনও।পায়ের নিচে রুক্ষ মাটিও আগুন গরম। তবে পৌঁছে গেলে কড়কড়ে নোটগুলো হাতে হাতে পাওয়া যাবে। এই ছেলেমেয়েগুলো ভাল – যা পয়সা মাহি চেয়েছে তাতেই রাজি হয়েছে। দু'একটা বেশি টাকাও আবার হাতে গুঁজে দেয়।বালতি আর কলসি তুলে নিয়ে পা চালালো মাহি।

জুলাই মাসের প্রথম দিক।কলেজ ট্যুরে গোপালপুরে বেড়াতে এসেছে ওরা দশ জন। সঙ্গে স্যার আর তাঁর স্ত্রী।

গোপালপুরের ব্যাপারটা অবশ্য গোড়া থেকে ঠিক ছিল না। পুরী, কোনার্ক আর আশপাশ এই নিয়েই ছিল দশটি দিন ছুটি কাটাবার পরিকল্পনা।

দিন তিনেক আগে স্যারই হুজুগ তুললেন, 'চলো, গোপালপুর ঘুরে আসি।'

পুরীর হোটেলেই খাবার ঘরে সদ্য আলাপ হওয়া সদাশিববাবু'ই মাথায় ঢুকিয়েছেন স্যারের।

'এত কাছে এসে গোপালপুরটা বাদ দেবেন? সমুদ্রের জলের রঙ দেখে মশাই পাগলা হয়ে যাবেন! '

'ইচ্ছে তো করছে, কিন্তু থাকার জায়গার কিছুই তো ব্যবস্থা করা নেই! এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে শেষে বিপদে পড়ব!' চিন্তিত স্যার।

'কিচ্ছু ভাববেন না। বেরহমপুরে নেবে সোজা ওখানকার পোস্টমাস্টারবাবুর কাছে চলে যাবেন, চিঠি লিখে দিচ্ছি, উনি ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।আগে পাঠিয়েছি বেশ কয়েকজনকে।তারা অখুশি হয়নি।'

হেসে জবাব দিয়েছিলেন সদাশিববাবু।

সময়টা আশির দশকের শেষে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা তখনও আঁতুড়ঘরে।চিঠিই সবকিছু।

সদাশিববাবুর অভয়বাণী ভরসা করেই আসা হল। পোস্টমাস্টারটি সত্যি মানুষ ভালো।

'এই সময়টা ঠিক সিজন নয়, আপনাদের ভাল একটা জায়গাই সস্তায় জুটিয়ে দিতে পারব। এক রিটায়ার্ড নেভি অফিসারের বাড়ি।উনি আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।চারটে ঘরই ফাঁকা আছে।দেখবেন আপনাদের পছন্দ হবে।'

সত্যি পছন্দ হল।সবাই স্যারকে ধন্যি ধন্যি করতে লাগল।

বাড়িটা একদম সমুদ্রের পাশেই।সামনে দিয়ে ঘুরে গেলে রাস্তায় হেঁটে মিনিট সাত-আট লাগে, কিন্তু বাড়ির পেছনদিকটাতেই ধূ ধূ বালিয়াড়ি।সড়সড় করে নেমে গেলেই সমুদ্র।সামনেই একটা লাইটহাউস।

কারেন্ট যাওয়া এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। রাতে লোডশেডিং হলেই সবাই বসে বারান্দায়।স্যারের টেপ রেকর্ডারে কিশোর কুমারের গান বাজে, 'ঠান্ডি হাওয়া ইয়ে

চাঁদনী সুহানি!' লাইটহাউসের আলোটা ঘোরে, ছেলেমেয়েগুলো ভেসে চলে যায় স্বপ্নের দেশে।

প্রদীপ্ত এ দলের পান্ডা।স্যার আছেন ঠিকই, কিন্তু ট্যুর লিডার বলতে সে-ই।বাকিরা হল রাজীব, অমিত, দেবাশিস, সঞ্জয়, বিভাস, শ্যামল, কাকলি, দেবলীনা আর রণিতা।

প্রদীপ্ত আর রণিতা এই পরিবেশে এসে যেন একটু একটু বেশি কাছে আসছে।

মাঝে মাঝেই প্রদীপ্ত গদগদ স্বরে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠছে, 'দেখ দেখ রাণু, কী সুন্দর!'

'সত্যি রে দীপ!' রণিতা বলে ফিসফিসিয়ে সবার কান এড়িয়ে।

পোস্টমাস্টার আগেই জানিয়েছিলেন বাড়িটার সব ভালো শুধু একটাই অসুবিধে, জল। জলের বন্দোবস্ত নিজেদের করে নিতে হবে।

'খাবার জলের জন্যে একটা টিউবয়েল আছে।কিন্তু বাথরুমের জল পুরোটাই কিনতে হবে।জলের সমস্যা এই গঞ্জাম জেলায় মারাত্মক।কী যে কষ্ট! আশপাশের গ্রামের মেয়েরাই বাড়ি বাড়ি জল দেয়। এক এক বালতি দশটাকা! তবে বললে আমি আরো দু'একটা বাড়ি দেখতে পারি।'

'আপনি চিন্তা করবেন না, তিনটে দিনের তো ব্যাপার, জল আমরা কিনে নেব।'

স্যারের সিদ্ধান্ত।প্রদীপ্ত এক কথায় রাজি।বাকিরাও কেউ প্রতিবাদ করল না।সত্যি এ বাড়ি ছাড়ার কোন প্রশ্নই নেই।

'আচ্ছা ঠিক আছে, মাহি বলে একটি লোকাল মেয়ে আমার চেনা, ওই এনে দেবে নদী থেকে জল।'

পুরীতে জলে প্রচুর দাপাদাপি হয়েছে। তাই গোপালপুরে আর জলে নামার তেমন ঝোঁক নেই কারুরই তেমন। বেশ গরম।সকালের দিকটা মনোরম হলেও দশটা বাজতে না বাজতেই রোদ একেবারে গা পুড়িয়ে দেয়। ছেলেমেয়েরা স্নান সেরে নেয় এগারোটার মধ্যেই। তারপর খেতে যায় কাছাকাছি হোটেলে।

মাহি এসে তারপর কোন একটা সময় জল ভরে দিয়ে যায় চারটে চৌবাচ্চায়।বেশ কয়েকবার যাতায়ায় করতে হয় মাহিকে।

পরেরদিন বিকেলে ট্রেন। প্রদীপ্ত তাল তুললো সমুদ্রে দাপাবার।সঙ্গে শ্যামল, অমিত আর দেবাশিস। বাকিরা তখন গেছে টুকিটাকি কেনাকাটা সারতে।একেবারে খেয়ে ফিরবে।

যদিও এদিকের বীচ বেশ পাথুরে। ওরা চারজন একটু দূরেই চলে গেছিল।সারা গায়ে বালি।গনগনে রোদ্দুর। চারমূর্তি বাসায় পৌঁছল ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে।যথারীতি কারেন্ট নেই।ঘরটা বদ্ধ হয়ে আছে। দু'পাশের দরজা খুলে দিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল একসঙ্গে চারজন। পরনে এখন অন্তর্বাসও নেই।সব বালি কিচকিচে।

শুরুটা করল প্রদীপ্তই।আধ ভরা চৌবাচ্চা। মগে করে জল ছেটাল শ্যামলের দিকে।

সবাই-ই আসার সময় একটা করে মগ এনেছে।শ্যামলও ছুড়ল জল।

মিনমিনে গলায় দেবাশিস একটু প্রতিবাদ করে ,'পয়সা দিয়ে কেনা জল, এ ভাবে নষ্ট করিস না!'

'কিপটের মরণ! আচ্ছা তোর ভাগের জলের পয়সা আমি দিয়ে দেব!' বলেই আর এক মগ জল ছুঁড়ে দেয় প্রদীপ্ত।

হেসে ওঠে বাকিরা!

তাড়াহুড়োয় বাথরুমের দরজায় ছিটকি দিতে ভুলে গেছে। কখন যে সেটা খুলে গেছে খেয়ালও নেই তাদের। আদুড় গায়ে আপনমনে এ ওকে জল ছুঁড়ে যাচ্ছে।

বিকট একটা শব্দ হল সামনেই কোথায় যেন! চমকে সম্বিৎ ফিরে পেল সব কটা। তাড়াতাড়ি তোয়ালে পরে বাইরে বেরিয়েই দেখতে পেল দৃশ্যটা।

একটু আগেই বাকিরা ফিরেছে।শব্দটা কানে যেতে ছুটে এসেছে তারাও পাশের ঘর থেকে।

এদিকটা বাড়ির পেছন। দরজাটা খোলা দেখতে পেয়ে একটু কম ঘুরতে হবে বলে ওদিক দিয়েই জলের কলসি বালতি নিয়ে ঢুকেছিল মাহি।আলো অন্ধকার ঘর। একটু এগোতেই বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে আচমকা আসা জলের ঝাপটায় চমকে গিয়ে টাল সামলাতে পারেনি। মেঝের জমা জলে পা পিছলে পড়েছে সবশুদ্ধ নিয়ে।সারা ঘরে এখন জল থৈ থৈ। আর তার সঙ্গে মিশেছে গাঢ় রক্তের ধারা!

ভয়ে চোখ চাওয়াচাওয়ি করে সকলে। রণিতা আর কাকলি তাড়াতাড়ি এসে তোলে মাহিকে। ভালো করে দেখে! নাহ! চোট তেমন লাগেনি। কোথাও তো তেমন কাটে কোটেনি। তাহলে!

মাহিকে দাঁড় করাতেই দেখা গেল শাড়িটা রক্তে মাখামাখি!

স্যারের স্ত্রী বোঝেন ব্যাপারটা।

'শুইয়ে দাও ওকে বিছানায়! এক্ষুনি কোন ডাক্তার ডাকতে হবে।'

মাহি করুণ চোখে একবার তাকায় ভাঙা কলসি আর বালতির দিকে। তারপর জ্বলন্ত চোখে তাকায় চার নিথর যুবকের দিকে। ওড়িয়া ভাষায় যা বলে তার মানে দাঁড়ায়, 'জল নিয়ে তোরা খেলা করিস বাবু?'

'মাহির সে দৃষ্টি আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি রাণু। আমার মজার খেলার জন্যে একটা প্রাণ পৃথিবীতে আসতে পারলো না!'

'দেখো সব কিছুরই ভাল দিক আছে দীপ! ওই ঘটনাটা না ঘটলে হয়ত তুমি আজকের 'ওয়াটার সেভিয়ার' প্রদীপ্ত সেনগুপ্ত হতে না। কত কত মানুষের মুখে জল তোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছ তুমি।'

ঝামেলা তেমন হয়নি। ব্যাপারটা যে একটা নিছক দুর্ঘটনা সেটা মাহির স্বামী আর আত্মীয়স্বজনকে বুঝিয়েছিলেন পোস্টমাস্টার আর স্যার। মাহি নিজেও বলেছিল পা পিছলে পড়ে যাবার কথা। মাহিকে হাসপাতালে ভর্তি করে টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে দিয়ে নির্বিঘ্নেই সকলে ফেরত আসতে পেরেছিল।

মুশকিলটা হল প্রদীপ্তকে নিয়ে।

ঘটনাটা স্তব্ধ করে দিয়েছিল প্রদীপ্তকে। একটা চরম আত্মগ্লানিতে ভুগে নিজেকে একদম সরিয়ে নিয়েছিল সবার থেকে। খালি একটাই কথা!

'আমি একটা খুনি!'

বন্ধুরা সবাই পাশে ছিল। ছিলেন স্যারও। কিন্তু কারুর কোন কথাই কানে ঢুকছিল না প্রদীপ্তর। গোটা ঘটনাটার জন্যে সমানে নিজেকে দায়ী করে যাচ্ছিল।

বড় বড় মনোবিদদের সাহায্য নিলেন বাবা মা। আর রণিতা নিজের পড়াশোনা চালিয়ে বাকি সময়টুকুতে প্রাণ ঢেলে দিল প্রিয় সাথীর মনোবল ফেরাতে।

ব্যাপারটা সামলালেন রেবা। প্রদীপ্তর মাসি। পরিবেশবিদ।

'দেখ দীপ, তুই বাড়ি বসে মাথা কুটে ফেললেও যা হয়ে গেছে তা বদলাতে তো পারবি না।বরং বোঝার চেষ্টা কর সমস্যাটা! আমার সঙ্গে কাজে নাম।নিজের চোখে গিয়ে দেখ মানুষ এক আঁজলা জলের জন্যে কী কষ্টটাই না করে! জল কী করে বাঁচান যায়, ধরে রাখা যায়, বৃষ্টি কী করে বাড়ানো যায় এই সব নিয়ে আমাদের কর্মশালা, প্রকল্প। আয়, যোগ দে।'

সেই শুরু। আস্তে আস্তে আবার জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসে প্রদীপ্ত। শ্যামল, অমিত আর দেবাশিসকে নিয়ে শুরু হয় কাজ।পাশে ছায়ার মত রণিতা।

প্রথম প্রথম ছোটখাটো কাজ দিয়ে শুরু। এলাকার বাচ্চাদের বোঝানো।

রাস্তার ধারের অবিরাম জল পড়ে যাওয়া ভাঙা কলে নতুন ট্যাপ পরান, বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা, গাছ পোঁতার কর্মশালা।

মন্দ চলছিল না।কিন্তু গোলমাল বাধলো তারপরেই।

একটা বস্তির পাশেই উঠছিল একটা বড়সড় হাউসিং কমপ্লেক্স। প্রায় একশোটি ফ্ল্যাটের জল সরবরাহ করতে গিয়ে এলাকার টিউবয়েলগুলো গেল প্রায় সব অকেজো হয়ে। প্রদীপ্ত তখন একটা মোটামুটি টিম গড়ে ফেলেছে। তারা সব রকম চেষ্টা চালালো। কর্পোরেশন, বিধায়ক, থানা পুলিশ সব। কাজের কাজ কিছুই হলো না। হবে না জানাই কথা। প্রমোটর রইস আদমি। লম্বা হাত তাঁর সর্বত্র।

কাজ তো হলোই না, নানানভাবে আক্রমণ আর হুমকি আসতে লাগল।

হুমকি পেয়েও প্রদীপ্ত পিছিয়ে এলো না, বরং একটা জিদ চেপে বসলো।

মদত দিলো রণিতাও।

‘আরে একটু আধটু হুমকি টুমকি আসবেই! রেবা মাসি নিজেই তো গল্প করছিলেন! মেধা পাটেকারের সঙ্গে কাজ করেন উনি। প্রাণ হাতে নিয়ে লড়ে তো যাচ্ছেন! তুইও পারবি!’

সত্যিই পারল।

তৈরি হল ‘জল-জীবন।’ জল আর জীবন, পাশাপাশি দুটোই বাঁচানোর এই সংস্থার কাজ।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমে বেশ বড়সড় কাজ করল ‘জল-জীবন।’

এই সময়ই প্রদীপ্তর সঙ্গে আলাপ হয় ভারতের ওয়াটারম্যান রাজেন্দ্র সিংহজির সঙ্গে। জানতে পারে কিভাবে তিনি রাজস্থানের মত জায়গায় জল বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

এরপর একের পর এক ওয়ার্কশপ আর হাতে কলমে কাজ করে প্রদীপ্ত জানতে পেরেছে নদীকে বাঁচানোর মূলমন্ত্র। নদীর সেবাতেই ঝাঁপালো প্রদীপ্ত আর জল-জীবন। টিম এখন বেড়েছে অনেক।পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন অনেক এনজিও। সেই ব্যবস্থা করে চলেছে সমানে রণিতা।

মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ সব জায়গার মজে যাওয়া নদীর পুনরুদ্ধারের কাজ করার চেষ্টা করে চলেছে আপ্রাণ। এখন নানান জায়গায় গড়ে উঠেছে ছোট ছোট টিম।

তিরিশ বছর কেটে গেছে। প্রদীপ্তর নাম এখন এক ডাকে চেনেন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জল সংরক্ষণকারীরা। বছরে কনফারেন্স লেগেই থাকে।পিছিয়ে পড়া দেশগুলো শেখে জল সাশ্রয়, জল বাঁচানো আর ব্যবহারের নানান দিক।

মাহিদের এলাকাতেও প্রচুর কাজ করেছে জল-জীবন। গোটা গঞ্জাম জেলা আর তার আশে পাশে চেষ্টা করেছে এলাকার মেয়েদের লেখাপড়া আর হাতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করার।দীর্ঘ জলসঙ্কটের অনেকটা মোকাবিলা করেছে। গোটা গ্রীষ্মে বড় বড় ড্রামে করে সমানে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে ওরা নিজেদের উদ্যোগে।

‘ওয়াটার সেভিয়ার’, হ্যাঁ এই নামেই চেনে এখন লোক প্রদীপ্তকে। কত প্রাইজ কত সম্মান। কিন্তু কোন প্রাইজ নিতে কক্ষনো স্টেজে ওঠেনি প্রদীপ্ত।তার টিমের কোন ছেলে বা রণিতা নিয়েছে সেই প্রাইজ।

আজ পর্যন্ত কোন খবরের কাগজে বা টিভিতেও মুখোমুখি ইন্টারভিউ দেয়নি প্রদীপ্ত। টেলিফোনে বা লেখালেখিতেই সেরেছে।জীবনে এত সম্মান আর সাফল্য পেয়েও কিন্তু প্রদীপ্তর মনে গোপালপুরের সেই স্মৃতি এখনো জ্বলজ্বলে। এখনো একটা অপরাধবোধ তাকে কুরে কুরে খায়।

এবার এক বিরাট সম্মান। এতো বছর পর জল-জীবন পেতে চলেছে সরকারি স্বীকৃতি আর সাহায্য।উড়িষ্যা সরকার দিচ্ছেন সোনার পদক।প্রাইজ দেবেন স্বয়ং রাজেন্দ্রজি। কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রীও থাকবেন।

পৃথিবীর নানান দেশ থেকে আসছেন তাবড় তাবড় পরিবেশবিদরা। উপস্থিত থাকছেন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক আর টাইমসের মত পত্রিকার সাংবাদিকেরাও।সত্যিই আনন্দের দিন।

তাই রণিতা বিশেষভাবে চায় প্রদীপ্ত এবার অন্ততঃ স্টেজে ওঠে।

গোছাবার নামে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রণিতার। মিষ্টি হেসে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায়। কী ভেবে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে প্রদীপ্ত।

কী না করেছে রাণু! সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলো থেকে এক মুহূর্তের জন্যে হাত ছাড়েনি তার দীপের। পাশ করেছে, চাকরি নিয়েছে, নামমাত্র অনুষ্ঠান করে সামাজিকভাবে আরো কাছে এসেছে। সেই ঘটনার পর বেরহমপুরের সেই পোস্টমাস্টারের মাধ্যমে মাহির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে সমানে।প্রদীপ্তর তখন বেসামাল অবস্থা।ভুগছে গভীর অবসাদে। তবুও মাথা ঠান্ডা করে নীরবে সব কাজ করে গেছে রাণু।

ওই ঘটনার বছরদুয়েক পরে মাহির একটি মেয়ে হয়। তার বেড়ে ওঠার জন্য সবটুকু সাহায্য করে গেছে রাণু। সেই মেয়েই মানসী।জল-জীবনের উড়িষ্যা শাখার একজন কর্ণধার।

অনেকবার মাহি আর তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছে রণিতা। কিন্তু এতগুলো বছরে একবারও প্রদীপ্ত যেতে পারেনি।অনেক চেষ্টা করেছে, অনেক ভেবেছে, কিন্তু কুঁকড়ে গেছে।

এবার যাবেই।যেতে ওকে হবেই।

হোটেল ওবেরয়ের কনফারেন্স রুম।চারদিকে শুধু ক্যামেরার ঝলকানি।

রাজেন্দ্রজি পরিয়ে দিলেন সোনার মেডেল। বিশেষ অর্ডার দিয়ে তৈরী উড়িষ্যার তাঁতে বোনা সিল্কের শাল পরালেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী।

উচ্ছ্বাস গোটা হলঘর জুড়ে।

আস্তে আস্তে মাইকে নিজের বক্তব্য রাখতে শুরু করে প্রদীপ্ত।

‘আমি এই সম্মানের একদম যোগ্য নই, বলতে পারেন আজ পর্যন্ত আমি যা করেছি সব আমার প্রায়শ্চিত্ত।আজ বলব আপনাদের সেই কাহিনী...’

একটানা বলে চলেছে প্রদীপ্ত।চেয়ারে পাশাপাশি বসে আছে রণিতা, মানসী আর মাহি।মাহিকে উড়িয়া ভাষায় সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে মানসী প্রদীপ্তের বক্তৃতা।

‘আমি আজও ভুলতে পারিনা সেই দৃশ্য।আমার জল নিয়ে খেলার শিকার হয়ে এক নারী হারিয়েছে আসন্ন সন্তান।মাটিতে পড়ে আছে ধিক্কার জানাচ্ছে জল অপচয়ের!’

সারা সভাঘর স্তব্ধ। মন দিয়ে সবাই শুনছে এক অজানা কাহিনি।

হঠাৎ সবাই চমকে যায়। এক মহিলা দাঁড়িয়ে উঠে হাত পা নেড়ে উড়িয়া ভাষায় একটানা কী যেন বলছে!

রণিতা আর মানসী আস্তে আস্তে বুঝিয়ে মাহিকে স্টেজের কাছে নিয়ে আসে।

রণিতার অনুরোধে মানসী ইংরেজিতে বলতে শুরু করে, 'আমার মা -ই হচ্ছেন সেই মহিলা, মাহি! মা কী বলছেন জানেন স্যার? বলছেন, 'তোর কাজ দিয়ে সেদিনের সেই জলের দেনা তুই চুকিয়ে দিয়েছিস বাবু!'

হাততালিতে ফেটে পড়ছে চারদিক।

প্রদীপ্ত এসে মাহির সামনে দাঁড়ায়।জোড়হাত। দুজনেরই চোখে নামছে পুণ্য জলধারা।

মরিস প্লেইন্‌স্‌, নিউ জার্সি, যুক্তরাষ্ট্র

অমিতাভ রক্ষিত

স্বপ্নের যে ডানা থাকে!

আমাদের অবচেতনার দু একটা সুবিধে আছে। প্রথমতঃ, সে থাকে লুকিয়ে। মনের আনাচে-কানাচে বা মস্তিষ্কের খানা-খন্দে গিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজলেও তার দেখা পাওয়া মুস্কিল। কিছু কিছু মনস্তাত্বিকেরা অবশ্য দাবী করেন যে উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করেন বলে তাঁরা খুব সহজেই অবচেতনাকে শনাক্ত করতে পারেন। কেবল তাঁদের দক্ষিণাটা একটু মহার্ঘ হয় এই যা! অবচেতনার আরও একটা সুবিধে হচ্ছে যে বাস্তবতার প্রতি তার কোন দায়বদ্ধতা নেই। সে বেছে বেছে হানা দেয় দুর্বল কিছু স্বপ্নে গিয়ে, আর সেখানে অনুভূতির কিছু লাল-নীল ফুল ফুটিয়েই সে প্রজাপতির মত ডানা মেলে উড়ে যায় স্বপ্নান্তরে।

কাজেই দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের সিংহভাগ দায়িত্বটাই পড়ে "সচৈন্যতা"-র ওপরে। তাকে যে দৈনন্দিন চলা-ফেরার জন্য আবশ্যকীয় কোটি কোটি সিদ্ধান্তই শুধু নিতে হয় তা নয়, চারিপাশ থেকে ছুটে আসা আরও অগুন্তি সংকেতকেও তাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়। যদি কোনও সংকেত পরিচিত ছকে না পড়ে, বা তাকে সে ঠিকমতন শনাক্ত করতে না পারে, তখন অনেক সময় মরিয়া হয়ে সে অবচেতনার কাছেই সাহায্য চেয়ে বসে। কারন, বলা তো যায় না - সেগুলোর মধ্যে কোনো সংকেত যদি কোনওভাবে আমাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়ে? আর তখনই বোধহয় কিছু কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কারণ আর কিছু না হোক, লাগাম-ছাড়া অযৌক্তিক বিশ্লেষণে, আমাদের "অবচেতনা" বিশেষ ভাবে পারদর্শী!

আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ মানুষই নিজেকে মোটামুটি ভাবে উদারপন্থি বলে মনে করেন। তার মধ্যে গণ্য হতে পারি আমি নিজেও। কিন্তু ঘটনাচক্রে, সাম্প্রতিক কালে একদিন নিজের অবচেতনার সঙ্গে একবার সামনা-সামনি মোলাকাত হয়ে যাবার পরে মনে হল সেই উদারতা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহের অবকাশ আছে। অন্ততঃপক্ষে অবচেতনার আয়নায় সেদিন নিজের যে উলঙ্গ রূপ আমি দেখেছিলাম, তাতে যদি বলি 'আমি যারপরনাই লজ্জিত হয়েছিলাম, ' তবে তা আতিশয্য হবেনা।

মূল ঘটনাটা হল এই যে কিছুদিন আগে, আমেরিকা মহাদেশে বাঙালিদের অভিবাসনের ইতিহাস সম্পর্কিত একটি বই ও গুটিকয়েক প্রবন্ধ হঠাৎ আমার দৃষ্টি

আকর্ষণ করে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে আমরা, অর্থাৎ, ১৯৬০-এর দশক থেকে শুরু করে, বেশী সংখ্যায় অধুনা-আগত, অতি শিক্ষিত, এবং অধিক অংশে প্রযুক্তি বিশারদ বাঙালিরা কিন্তু এদেশে প্রথম পাকাপাকিভাবে পা ফেলার ইতিহাস তৈরী করি নি। সে গৌরব পুরোনো দিনের কিছু তথাকথিত অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বাঙালিদেরই প্রাপ্য। তাঁরা ভাগ্যান্বেষণে ১৮০০-শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করেই নানাভাবে আমেরিকায় আসতে শুরু করেছিলেন অল্প অল্প সংখ্যায়। তাঁদের পেশা ছিল বহুবিধ - দেশীয় কাঁচের চুড়ি বিক্রী করা থেকে শুরু করে কায়িক পরিশ্রম বা রেষ্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠা করা ও চালানো। এঁরা সবাই ছিলেন অবিবাহিত যুবক এবং এদেশে এসে শেষ পর্যন্ত অনেকেই আর্থিক ভাবে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু আর্থিক সাফল্য এলেও, তাঁরা সামাজিকভাবে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছিলেন তা বলা মুস্কিল। তৎকালীন বর্ণবাদী আমেরিকান সমাজে শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গদের মিলন হওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। আর ভারতীয় উপমহাদেশের তো আর প্রায় কেউ ছিলেনই না তখন! তাই বিবাহের সময় তাঁরা বেশীর ভাগই কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলাদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহন করেছিলেন। কিছু কিছু বিবাহ করেছিলেন পুয়ের্তোরিকান সুন্দরীদের।

বিগত ১০০ থেকে ১৭৫ বছরের প্রবাহ ধরে বিশ্লেষণ করলে আজ এই গোষ্ঠির বাঙালি বংশধরেদের মিলিত সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। স্বাভাবিক ভাবেই, বর্তমান কালের কিছু কিছু সমাজবিজ্ঞানীরা আজকের আমেরিকান সমাজে এঁদের অভিস্থান সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়েছেন। উপরে উল্লেখিত যে কটি গবেষণা পত্র ও বই আমার হাতে এসেছিল, তা সবই এই বিষয়ে গবেষণার ফল। বলা বাহুল্য যে বাঙালি হিসেবে এই গবেষণা আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। সবই ভাল লাগল, কিন্তু তবু একটা বিষয়ে আমার মনে খটকা লেগে রইল। গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমেরিকান আদমশুমারীর ফর্ম-বিন্যাসে দেশের বাসিন্দাদের সুযোগ দেওয়া হয় তাঁদের জাতি ও বর্ণ ঘোষণা করতে। তার আগেও আদমশুমারীতে জাতি-বর্ণ জানানোর পন্থা ছিল, তবে সেগুলোতে ভাল করে জাতি ও বর্ণের মিশ্রন জানানোর অবকাশ কম ছিল। যাই হোক, এই পদ্ধতিতেই স্বঘোষিত তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে সরকারী ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এবং তা থেকেই জানা যায় যে কোন কোন মিশ্রিত ও অবিমিশ্রিত জাতির এবং কোন কোন বর্ণের, কত জন করে লোক আমেরিকায় থাকেন। আমরা তো নিজেরা প্রতিবারই ঘোষণা করি যে আমরা এশিয়া থেকে উদ্ভূত ভারতীয় আমেরিকান। তেমন সুযোগ পেলে বলি, আমরা ভারত থেকে উদ্ভূত বাঙালি আমেরিকান, অথবা শুধু, বাঙালি-আমেরিকান। আমরা গর্বের সঙ্গে আমাদের ছেলে মেয়েদেরও সব সময় শিখিয়ে দিয়ে থাকি যে তারা আমেরিকান হলেও, মূলে বাঙালি। একটু অসুবিধে হয় যখন অ-ভারতীয়/অ-বাংলাদেশীয় কেউ পরিবারের সদস্য হয়ে যান। কিন্তু এটাই তো হল আমেরিকার বৈশিষ্ট! বিগত আড়াই শত বছরেরও বেশী ধরে, বহু জাতি, বহু দেশ থেকে এসে বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রনের মাধ্যমে এই নতুন আমেরিকান সংকর জাতির সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তা বলে তাঁদের কারুরই আদি পরিচয় চাপা পড়ে যায়নি। কোটি কোটি আমেরিকানরা আজ নিজেদের “ইটালিয়ান-আফ্রিকান”

বা "জার্মান-চাইনিজ" ইত্যাদি বলে সগর্বে পরিচয় দেন। কাজেই আমাদের বংশধরেদের মূল বাঙালি পরিচয় হারিয়ে যাবার কোনও আশঙ্কা নেই। "ফরাসী-আফ্রিকান-বাঙালি-আমেরিকান" ইত্যাদি বলে নিজেদের পরিচয় দিলে কাউকেই ভ্রুকটি দেখতে হবে না!

কিন্তু সেই ১৭৫ বছর আগে আসা এবং আফ্রিকান বিবাহ করা বাঙালিদের বংশধরেরা? তাঁরাও নিঃসন্দেহে নিজেদের আফ্রিকান (বা চিকানো)-বাঙালি-আমেরিকান হিসেবে পরিচয় দেবেন! অন্ততঃ সেটাই তো স্বাভাবিক হবে। কিন্তু, ওপরে যেমন উল্লেখ করেছি, তাঁদের সম্বন্ধে বই ও প্রবন্ধগুলোতে লেখা একটা জিনিস চোখে পড়ে আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়লাম। সেটা হল তাঁদের নিয়ে করা একটি জরিপের বিবরণ।প্রবন্ধটির লেখক একদল বাঙালি-আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলাদের নানা রকম ভাবে প্রশ্ন করে, তাঁদের মনোবৃত্তি জরিপ করে তার ফলাফল জানিয়েছেন ওই গবেষণা পত্রে। তিনি দেখিয়েছেন যে জাতি ও বর্ণ সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের উত্তরেই কিন্তু, ওই ঘরভর্তি বাঙালি-আফ্রিকানদের মধ্যে একজনও নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দেন নি। সে কী! স্বভাবতঃই আমার মনে অনেক প্রশ্ন এল, "কেন?" তাঁরা কি জানেন না যে তাঁদের আদি পুরুষ ছিলেন বাঙালি? নাকি, জানা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের বাঙালিত্ব স্বীকার করতে চান নি? আর, স্বীকার করতে না চাইলে, তার কারণ কী?

এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম কিছুদিন ধরে। এ যেন আমার খোদ বাঙালিত্বের ওপরেই কুঠার দিয়ে আঘাত হানা! বাঙালি হিসেবে আমাদের বেশীর ভাগেরই একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে। কিন্তু আমরা জানি যে যাঁরা বাঙালি নন, তাঁরা যে সবসময় সেই গর্বটাকে একই ভাবে অনুভব বা প্রশংসা করেন তা নয়। কিন্তু নিজেরা বাঙালি হয়ে? সেই মহিলারা কি বাঙালিদের গৌরবময় ইতিহাসের কথাটা জানেন না? আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে জরিপের ওপরে লেখাটার সঙ্গে সেই মহিলা দলের পুরোধা হিসেবে একজনের ছবি বেশ বড় করে ছাপা আছে। তাঁকে একঝলক দেখলেই মনে হয় তিনি যেন 'বাংলা মায়ের একান্ত আপন শ্যামলা মেয়ে' - আমার নিজের দিদিও হতে পারতেন খুব সহজেই। তিনিও? আমি তাঁর ছবির দিকে অবিশ্বাসের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে চেয়ে থেকেছি। যাঁকে আমি এক মুহূর্তের মধ্যে দিদি বলে মেনে নিতে পারি, তিনিও কি করে তাঁর মধ্যেকার বাঙালিত্ব অস্বীকার করেছেন! যেন তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই বলতাম, কেন?

শেষ পর্যন্ত একদিন সেই সুযোগ এসে গেল আমারই অবচেতনার দৌলতে। কোনও এক বর্ষার দিনের কোনও অলস মুহূর্তে, হয়ত বা কিছু না ভেবেই, আমি আঙ্গুল লাগিয়ে ফেলেছিলাম সেই মহিলার ছবির ওপরে। কিন্তু তাতেই কি করে যেন অকস্মাৎ সশরীরে গিয়ে পৌঁছোলাম ঠিক তাঁর সামনে, তাঁর নিজের বসবার ঘরের মধ্যে। এই ঘরে বসেই তোলা হয়েছিল তাঁর ছবিটা। ধরে নেওয়া যাক মহিলার নাম গোলাপ। গোলাপের ঘরে, মানে একেবারে তাঁর অন্দরমহলে, হঠাৎ এভাবে পৌঁছে যাবার কী কৈফিয়ত দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই চমকে থাকলেও, আমি নিশ্চয়ই আমতা আমতা করে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। আমাকে দেখে একজন

যথার্থ "দিদি"-র মতনই, গোলাপ সোফা ছেড়ে দু বাহু উন্মুক্ত করে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে খুবই আন্তরিক ভাবে আলিঙ্গন করলেন। যেন আমাকে তিনি আজন্ম ধরেই চেনেন! আমাকে তাঁর পাশের সোফায় বসতে দিয়ে এক এক করে অনেক রকম কুশল সংবাদ নিলেন। তারপরে, কিছুক্ষণ আস্তে আস্তে কিছু একটু ভেবে নিয়ে, সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হঠাৎ আজকে, কী মনে করে?' আমি ততক্ষণে তাঁর ঘরটা বেশ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছি। আসবাবপত্র দেখে মনে হয়েছে আমি যেন ১৯৪০ শতকের লুইজিয়ানা বা আমেরিকার দাক্ষিণাত্যের অন্য কোনও প্রদেশের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়িতে এসে পড়েছি। যেহেতু আতিথ্যটা পেয়েছি খুবই আন্তরিক, সেহেতু আমি আর দ্বিধা না করে বলেই ফেললাম, "আপনি তো নিজেকে একেবারেই বাঙালি বলে পরিচয় দেন না। কিন্তু আপনার ঠাকুরদাদা তো পুরোপুরি বাঙালি ছিলেন, তাই না"? গোলাপ প্রথমে চমকে উঠলেও, মুহূর্তে আত্মসম্বরন করে একটু মিষ্টি হেসে বললেন, "কেন জিগেস করছ ভাই?"

তাঁর মিষ্টি হাসির প্রশ্রয় পেয়ে যেন দীর্ঘ আলোচনা করবার সিংহদ্বারটা একেবারে খুলে গেল। আমি চর্যাপদের যুগ থেকে শুরু করে, বাঙালির রেনেসাঁ, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, অমর্ত সেন, অভিজিৎ ব্যানার্জী, আর আজকের আমেরিকার অতি সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালি সম্প্রদায় – সব কিছুই তাঁকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বললাম। কতক্ষণ কথা বললাম ঠিক জানিনা। আমার আবার খ্যাতি আছে ছোট গল্পকে বড় করে বলে ফেলবার। তবে যখন মনে হল যে আমার ইতিহাসের দখল, সমাজবিদ্যা, মনস্তত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদি বেশ ভাল করেই উগরে দিতে পেরেছি তাঁর ওপরে, তখন বেশ পরিতৃপ্তির হাসি দিয়ে তাঁকে বললাম, "এবারে বুঝলেন তো, আপনার আর নিজেকে বাঙালি বলে দাবী করায় কোনও ইতস্ততঃ থাকবার কথা নয়। এবার থেকে জরিপ হলেই গর্বের সঙ্গে বলবেন, আমি বাঙালি-আমেরিকান! অথবা, চাইলে বলতে পারেন বাঙালি-আফ্রিকান-আমেরিকান।" গোলাপ এতক্ষণ সবকিছু খুব চুপ করে মন দিয়ে শুনছিলেন। এবারে আবার সেই মিষ্টি করে হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ। আমার দলের মেয়েগুলোর সঙ্গে তাহলে একবার কথা বলে দেখি। আবার একটা জরিপ তাহলে করে নিচ্ছি এখনই। তুমি শুধু একটু বসো, বেশী দেরী হবে না। এই কফি আর কেক খেতে থাক ততক্ষণ।

আমি কফিতে চুমুক দিতে দিতে, এঁদের অজ্ঞতা দূর করতে পেরেছি বলে বিশ্বাস নিয়ে বেশ আত্মপ্রসাদে জারিত হলাম। কিছুক্ষণ পরে গোলাপ আবার ফিরে এলেন। আমার হাতে একটা চিরকূট ধরিয়ে দিয়ে মিষ্টি করে হেসে বললেন, "এইমাত্র আবার জরিপ করা হল, এই নাও তার ফলাফল..." আমি তাড়াতাড়ি চিরকূটটা খুলে দেখি, আজকের তারিখ দিয়ে তাতে লেখা আছেঃ 'আমাদের বর্ণ ও জাতি নির্বাচন সম্পর্কিত দ্বিতীয় জরিপ। সভাপতি গোলাপ রবিন্সন। উপস্থিত ১৮ জন। ভোট দিয়েছেন ১৮ জন। ভোটের ফলাফলঃ আফ্রিকান-আমেরিকান – ১৫ জন। চিকানো-আমেরিকান – ৩ জন। বাঙালি-আমেরিকান – ০ জন। অন্যান্য – ০ জন'

সে কী! আবার? আমি অস্ফুট আর্তনাদ করে মুখ তুলে কিছু বলতে গেলাম। কিন্তু গোলাপ ততক্ষণে পেছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমি এত করে বোঝালাম! তবুও? তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে চাইলেন না? কেন? আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে, "দিদি শুনুন, দিদি শুনুন..." বলে তাঁর দিকে ধাওয়া করতে গেলাম। কিন্তু আর এগোতে পারলাম না, বাধা পেলাম। যেন অবচেতনাই আমার পথ আটকে, রেলওয়ে গার্ডের মতন দুহাতে দুটো ফ্ল্যাগ উঁচু করে ধরে, নাড়িয়ে নাড়িয়ে আমাকে থেমে যাবার সিগনাল দেখাল। একটা ফ্ল্যাগ গোলাপের নামে, অন্যটা আমার। দুটো ফ্ল্যাগই টক্‌টকে লাল রং-এ জ্বলজ্বল করে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে যে সামনে এগোবার পথটা বন্ধ । আমার আর গোলাপের দেখা হবার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্ততঃ আপাতত নয়।

নিজের পরিস্থিতিতে ফিরে এসে, আমি কিছুদিন মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে থাকলাম। অন্যদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, কিন্তু কী কারনে, এত কিছু শোনার পরেও, অন্ততঃ গোলাপও নিজের বাঙালিত্বটা স্বীকার করতে চাইলেন না? যে ধমনীতে অফুরন্ত বাঙালি রক্ত প্রতিদিন বিরামহীন ভাবে বয়ে চলেছে, সেই ধমনী কি তাঁর নিজের নয়? তাহলে? আমি অনেক ভাবে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ প্রশ্নের জবাব আমি কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। মনের মধ্যেও অনেক হাতড়ে বেড়ালাম। উত্তর নেই। কেবলই প্রতিধ্বনিঃ 'আয়না দেখ, আয়না দেখ!'

আয়না দেখব? আমার মনের মধ্যে যে ঝড়টা বইছে, আয়নায় নিঃসন্দেহে তার কিছু প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। চোখের কোলে একটু কালি পড়েছে, কারন শান্তিতে ঘুম হচ্ছে না। দাড়িটা রোজ কামালেও, গালের কিছু কিছু জায়গা বাদ পড়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে বেশ অশোভন দেখাচ্ছে। কিন্তু আয়না দেখে দাড়ি কেটে, আর চুল স্যাম্পু করে স্নান করলেই কি আর ঝড়টা থামবে? নাকি তাতে সেই নিরন্তর প্রশ্নটা, আমাকে অন্তর থেকে কুরে কুরে খাওয়া বন্ধ করবে? তাহলে?

অবশেষে, এ নিয়ে আরও অনেক কিছু ভাববার পরে উপলব্ধি করলাম যে আসলে কাঁচের আয়না নয়, এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে আমার মনের আয়নাটাতে। অর্থাৎ, আমার নিজের ব্যবহারেই নিশ্চয়ই কোনও দোষ আছে, যে জন্য গোলাপ এবং তাঁর দলের অন্য মহিলারা তাঁদের বাঙালিত্ব স্বীকার করতে চান নি। কিন্তু কী দোষ? আমি কি বেশী কথা বলে ফেলেছি, নাকি তাঁদের ওপরে বেশী জবরদস্তি করবার চেষ্টা করেছি?

আসলে তা নয়। আমি গোলাপের জায়গায় এবারে নিজেকে বসিয়ে চিন্তা করে বুঝতে পারলাম, যে গোলাপেরা যদি এখন নিজেদের বাঙালি বলে দাবী করে এগিয়ে আসেন, তাহলে সবচেয়ে আগে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করব কিন্তু আমরা বাঙালিরাই – আমরা তথাকথিত শিক্ষিত, উদারপন্থী, আর্থিকভাবে সচ্ছল, আমেরিকান বাঙালিরাই! আমাদের মুখ থেকেই সর্বপ্রথম বেরোবে, 'এরা আবার বাঙালি হতে চায় কোন সুবাদে? না আছে শিক্ষা, না আছে কৃষ্টি, না জানে ভাষা! বেশীর ভাগেদেরই তো দেখতে আফ্রিকানদের মতন! এরা নাকি আবার বাঙালি! আমরা এত শিক্ষিত, এত সফল, এত কৃষ্টিবান বলেই

হয়ত তাঁরা এবারে আমাদের দলে ঢুকতে চান! এ যেন দাঁড়কাক হয়ে ময়ূরপুচ্ছ পরতে চাওয়া! ছিঃ, ছিঃ।'

গোলাপেরা এই মনোভাব উপলব্ধি করেন। তাঁরা জানেন যে এতদিন পরে শত চেষ্টা করলেও তাঁরা আমাদের মতন নব্য আমেরিকানদের কাছে সহজে গৃহীত হবেন না। অন্ততঃ এই প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের কাছে নয়। অতএব আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নেওয়াই ভাল। তাঁদের সামাজিক উৎস আফ্রিকান-আমেরিকান গোষ্ঠিতেই। যখন আর কোনও গোষ্ঠি তাঁদের স্থান দিতে চায়নি, তখন আফ্রিকান-আমেরিকান গোষ্ঠিই তাঁদের হৃদয়ে ধারন করেছে। তাই যতদিন না আমরা অধুনা বাঙালি আমেরিকানরা আমাদের নিজেদের মনটাকে পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দিতে পারব, ততদিন তাঁরা শুধু আফ্রিকান-আমেরিকান বলেই পরিচিত থেকে যাবেন। সে স্তরে পৌঁছতে পারলে তবেই আমাদের গোষ্ঠির সঙ্গে গোলাপদের সামাজিক সমতা নিয়ে অর্থবহ কোনও সংলাপের প্রশ্ন উঠবে, তার আগে নয়।

এই উপলব্ধিতে পৌঁছে আমার মনে বেশ শান্তি এল। সামনে তাকিয়ে দেখি, গোলাপ আর আমার যুগ্ম ফ্ল্যাগদুটো আবার সংকেত দিচ্ছে। এবারে তারা পুরোপুরি সবুজ।

অরোরা, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

আনিস হক

অন্যগ্রহে

জম্পেশ আড্ডা জমেছিল আজ বন্ধুদের নিয়ে। কবি আর কবিতা নিয়ে ধুন্ধুমার তর্ক ও সেইসাথে কাপের পর কাপ চা। বন্ধুরা সবাই কবি-সাহিত্যিক গোছের মানুষ। কেউ ভালো লেখে, কেউবা ততটা ভালো নয়। কিন্তু আড্ডার বেলায় সবাই সমান। এখানে কেউই পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। লিমন এদের মাঝে একটু চুপচাপ। খুব বেশি কথা বলে না। কিন্তু যখন বলে, বাকিদের মনোযোগ চায়। আধুনিক কবিতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আজ। অনেকের কথা শুনে লিমনও কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু কেউ একজন তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নেয়ায় রাগ করে চলে এলো সে। সবার জন্য আড্ডাটা জম্পেশ হলেও লিমনের জন্য তা আর সেরকম রইলো না।

রোদের রংটা হলদেটে হয়ে এলেও তার তেজ একেবারেই কমেনি। টিএসসি থেকে রিকশাটি নিয়ে রমনা পার্কের কাছাকাছি আসার পর রোদের মাঝেই হঠাৎ করে যেন কালো হয়ে উঠলো আকাশটা। প্রচণ্ড বাতাস শুরু হলো ঘূর্ণিঝড়ের মতো। রাস্তায় পড়ে থাকা শুকনো পাতা, কাগজ, প্লাস্টিক কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে শুরু করল আকাশের দিকে। কিছু না বলেই রিকশাচালক রিক্সা ফেলে ছুটলো অন্যদিকে। রিক্সাটি লিমন সহ বাতাসের চক্রে একটু উপরে উড়েই আবার আছড়ে পড়ল নিচে। রাস্তায় ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারালো লিমন।

জ্ঞান যখন ফিরলো, ভিড় জমেছে চারপাশে। কেউ একজন হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো। একটু সম্বিৎ ফিরে চারদিকে তাকিয়ে লিমন দেখলো রাস্তাঘাট আগের মতোই, সবকিছুই স্বাভাবিক। একটু আগে বয়ে যাওয়া ঝড়ের কোন চিহ্নই নেই। যে লোকটা তুললেন, তাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, 'ঝড় কোথায়। আজ সারাদিনই তো খটখটে রোদ। শরীর খারাপ হয়েছিল বলেই হয়তো এমন মনে হয়েছে আপনার'।

আরেকজন ষন্ডা গোছের লোক পাশ থেকে ফোড়ন কাটলো, 'হালায় কয় কি? মাল খাইছে নাকি?'

একটা রিকশা দাঁড়িয়েছিল কাছেই। কাউকে কিছু না বলে সেটি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো লিমন। পুরো রাস্তাতেও ঝড়ের কোনরকম চিহ্নই দেখতে পেল না। কিন্তু এই প্রচন্ড গরমের মাঝেও হিমশীতল বাতাস হয়ে গেল তার বুকের ভেতর। কিন্তু তাতে বাইরের

গরমটাই যেন আরো বেশি তীব্র হয়ে উঠলো। মনে হল এক্ষুনি রাস্তায় উল্টে পড়ে যাবে সে। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে হৃদপিন্ডের ধুকপুকানি স্বাভাবিকই মনে হল তার।
বাসায় ফিরে সরাসরি নিজের ঘরে ঢুকে পড়তে চাইলো সে। কিন্তু ঢোকার আগেই তার চেহারা দেখে চমকে উঠলেন রফিক ভাই। বললেন,
- কি হল তোমার? মারামারি করে এলে নাকি?
- না রফিক ভাই। আমি কি মারামারি করার মানুষ? বাতাসে রিকশা উল্টে গিয়েছিল।
- বাতাস! বাতাস পেলে কোথায়? সারাদিন তো গাছের একটি পাতাও নড়তে দেখলাম না।
- কী জানি!

কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল লিমন। হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। কপাল ভালো যে রাতে খাবার জন্য কেউ ডাকলো না তাকে।

অনুপমের বাড়ির আড্ডায় অনেকেই এল সেদিন। পরিপাটি করে সিঁথি কাটা কোঁকড়ানো চুলের অনুপম, চেহারাতেও চলনে কবিত্বের ছাপ। বেশ ভালো লেখে। একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও তার হাতে। বেশ শিক্ষিত ও পয়সা ওয়ালা বাবা মায়ের ছেলে অনুপম। ছেলেকে তার নিজস্ব স্বাধীনতা দিতে তাদের কোনই আপত্তি নেই। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কবিতা আড্ডা ছেলের শিক্ষা ও স্বাধীনতারই একটা অংশ হিসেবে দেখেন তাঁরা। এলো সায়েম। ভালো গান করে, মাঝে মাঝে গল্পও লিখে। আনিকা নামের মেয়েটিও এলো। সায়েমের সাথেই গান করে। ভার্সিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এদের দুজনেরই বেশ নামডাক। এলো শফিক আর ওসমানও। সাংস্কৃতিক জগতে পদচারণা এদেরও পছন্দ। লিমনের গানের গলাও বেশ ভালো, যদিও হারমোনিয়াম বাজাতে জানে না। চায়ের সাথে গল্প আর কবিতা নিয়ে নানা কথাবার্তার পর গান শুরু হল। বরাবরের মতোই ধরা হলো, কফি হাউজের আড্ডাটা আজ আর নেই। মাঝখানের বিরতির মাঝে লিমন খালি গলায় গেয়ে উঠলো, 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ'। শফিক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো,
- এটা কার গান রে, কখনো শুনিনি।
- কি আশ্চর্য! এই গানটা শুনিস নি? রবীন্দ্র সংগীত! বললো লিমন।
- রবীন্দ্র সংগীত? এটা আবার কি? তুই লিখেছিস?
- আমি কেন লিখতে যাবো? এটা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে? নতুন কোন লেখক?
যতটা না অবাক, তার চাইতে আরো বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে শফিকের মুখের দিকে তাকালো লিমন। কিন্তু পর পরই অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে রাগের সাথে হতাশাও বেড়ে গেল তার। শফিকের করা প্রশ্নটিই যেন লেপ্টে আছে সবার মুখে। সবার মুখে একই রকম অভিব্যক্তি দেখতে পেয়ে ভাবলো, সবাই মিলে তার সাথে মজা করবে বলে ঠিক করেছে। তাতে একটু আস্বস্ত বোধ করলেও, রাগ হলো তার। সায়েমের দিকে তাকিয়ে বললো,
- তুইতো এই গানটা খুব ভালো করিস। বাজনাটা ধর, সবাই মিলে গাই।

সায়েম বোকার মত একবার আনিকার দিকে তাকালো। তারপর লিমনের দিকে তাকিয়ে বললো,

- গানটা আমার সত্যি সত্যিই জানা নেই লিমন। কথাগুলো লিখে দে, তুই গা, আমি ঠিকই তুলে ফেলবো। খুবই সুন্দর এই গানটি। তুই এতো সুন্দর সুর কি করে করলি, সেটাই ভাবছি।

শুনে রাগ আর হতাশা আরো বেশি বেড়ে গেলো লিমনের। আশ্চর্য, কেউ বুঝতে পারছে না তার কথা। রবীন্দ্রনাথকে চেনে না কেউ, এটা কি করে হতে পারে? ওরা কি মজা করছে ওকে নিয়ে? সবার দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু না বলেই বেরিয়ে গেল লিমন।

বাড়িতে ফিরে সরাসরি নিজের ঘরে ঢুকে গেল সে। স্যান্ডেলটা ঘরের এক কোণে ছুড়ে ফেলেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। মনে হলো সমস্ত বন্ধুরা মিলে যেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে তার সাথে। কিন্তু এর পাশাপাশি কোথাও কোনো এক অচেনা অপার্থিব ঘটনচক্রের ভয়ও জেগে উঠলো তার মানস কোঠায়। বিছানা ছেড়ে নিজের বুক সেলফ এর দিকে এগিয়ে গেল। পুরোনো গীতবিতানটি তুলে নিল হাতে। একটু পাতা উলটেই বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল। গীতবিতান নয় ইকোনমিক্স এর মোটা একটা বই। এই বইটি এখানে এলো কি করে?

তড়িঘড়ি করে কম্পিউটারটি অন করলো লিমন। গুগলে সার্চ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে কোন কবির নাম খুঁজে পেল না। নিজের মাথাটাই খারাপ হয়েছে মনে করে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো চেয়ারে। পাশের ঘরেই আড্ডা দিচ্ছে মেসের বাসিন্দারা। তাদের কথাবার্তা শুনতে পেলেও মনে হল, কোন এক সুরঙ্গ বেয়ে সে আওয়াজ অনেক দূর থেকে তরঙ্গিত হয়ে তার কানে আসছে। কপালের দুই পাশের শিরা দুটো দপদপ করে কাঁপছে। সেই দপদপ তরঙ্গ ও অন্যদের কথার তরঙ্গ একবার বিপরীতমুখী হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, আরেকবার একমুখী হয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে তার মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ। বাস্তব আর পরবাস্তবের কোন এক অজানা গহীন মোহনায় পথ হাতড়ে হাতড়ে সারারাত কী এক ঘোরের মাঝে বিছানায় পড়ে রইলো লিমন।

ক'দিন পরে আবার বসলো আড্ডা। লিমন নিজেও যোগ দিলো সে আড্ডায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোন কথা তুললো না। কিন্তু তাতে তার নিজের ভেতরের স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব রয়ে গেল অনেকখানি। অন্যরা সেটা টেরও পেল। কিছুক্ষণ পর সায়েম বললো

- তোর সেদিনের গানটা একটু লিখে দে না। সুরটাও দিস। তুলতে পারলে সবাই মিলে গাইবো।

সায়েমের মুখের দিকে না তাকিয়ে খোলা জানালার দিকে তাকালো লিমন। খানিকটা স্বগতোক্তির মতোই বললো,

- আমার গান? ঠিক আছে, লিখছি।

খুব সহজেই গানটি হারমোনিয়ামে তুলে ফেলল সায়েম। সবাই মিলেমিশে গানটি গাইলও কয়েকবার। গাওয়ার সাথে সাথে সবার প্রশংসাভেজা দৃষ্টি লিমনকে ছুঁয়ে গেল বার বার। সায়েম বললো,

- এরকম গান আজ অবধি কখনো গাইনি লিমন। বরাবর যা গাই তার চাইতে অনেক আলাদা হলেও একেবারেই যেন অনুভূতির কাছাকাছি। কোথায় পেলি এই গান, কোথায় পেলি এই সুর?

কোন উত্তর দিল না লিমন। কিন্তু তার চেহারার বিষন্নতার ছায়া সবাইকে স্পর্শ করলেও এর উত্তর খুঁজে পেল না কেউ।

বেশ জোরালো একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো শফিক। লিমনের দিকে তাকিয়ে বলল,

- আসলে তুই বেশ বড় মাপের এক কবি লিমন। আমরা টের পাইনি, তুই নিজেও হয়তো পাসনি।

অনুপম একটি চেয়ারে বসে আঁকিবুকি কাটছিল কাগজে। সেই আঁকিবুকি বন্ধ করে সবার মুখের দিকে তাকালো একবার। তারপর বললো,

- আমিও এরকম কবিতা আগে কখনো শুনিনি। পুরানো ধাঁচের শব্দেরই যেন নতুন এক মালা গেঁথেছিস তোর লেখায়। তোর কোন আপত্তি না থাকলে আমাদের পরবর্তী সংখ্যায় তোর লেখাটি ছাপাতে চাই।

সবাই মিলে গানটি গাইল আবার। আড্ডা শেষ হলেও এই গানের আবেশ রয়ে গেল সবার ভেতরে অনেকক্ষণ।

অনুপমের সাহিত্য পত্রিকা ছাপিয়েও আরো অনেক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হল লিমন হাসানের কবিতা। কিছু অতি আধুনিক বিদগ্ধজন তার পুরনো ধাঁচের সমালোচনায় মুখর হতে চাইলেও করলেও প্রশংসার জোয়ারে সে সমালোচনা ভেসে গেল বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো। তার লেখা,

'মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণও ধুলার তলে
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে'

দেশের ধার্মিক মহলেও খুব সমাদর পেলো। 'হেদায়েতুল ইসলাম' নামে একটি ধর্মীয় সংগঠনের নেতা মাওলানা গোলাম কিরমানী তাদের মাসিক পত্রিকায় লিখলেন,

'আজকাল অনেক কবি ধর্ম ও সমাজ নিয়ে কবিতা ও সাহিত্য রচনা করে থাকেন। কিন্তু জনাব লিমন হোসেনের মতো আল্লাহতাআলার কাছে নিবিড় আত্মত্যাগের প্রকাশ আর আজ অবধি কারো লেখাতেই দেখা যায়নি। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর লেখার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ইসলামী সমাজ আবার নতুন করে জেগে উঠবে ও সমর্পণের মহিমা ছড়িয়ে দেবে মানুষের ঘরে ঘরে।'

তাতে এখনকার আধুনিক সমাজে কিছুটা ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাওয়া ইসলামিক চেতনা আরেকটু বেশি জায়গা খুঁজে পেতে সমর্থ হলো। কবিতাটির একটি আরবি অনুবাদও প্রকাশিত করা হলো তাদের পত্রিকায়। দেশের বড় এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও লিমন কোন অজুহাতে সে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া থেকে বিরত রইলো।

কিন্তু তার একটি কবিতা,
'আমি যাহা কিছু চাই,
প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।'

ইসলামিক ত্যাগ-তিতিক্ষার একটি মাইলফলক হয়ে গেল। দেশের আলেম সমাজের এ নিয়ে সামান্য কিছু মতভেদ থাকলেও সব উঠে গেল 'হেদায়েতুল ইসলাম' এর প্রচারণার জোরে।

দেশব্যাপী সুনাম ছড়ালেও বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়াটা একেবারেই ছাড়লোনা লিমন। নতুন নতুন গান ও কবিতা লেখা এবং সবাইকে নিয়ে সে গান গাওয়া, তার কবি সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝেও একটি নিয়ম হয়ে রইলো। এরই মাঝে হঠাৎ করে নজরুলের একটি গান গেয়ে আবারও একই সমস্যার মুখোমুখি হলো সে। 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গাইতে গিয়ে দেখলো কাজী নজরুল ইসলামের এই গানটি কারোরই জানা নেই। তার নিজের সংগ্রহ থেকেও নজরুলের বইগুলো হঠাৎ করে কি এক অজানা কারণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও সায়েমের পারদর্শিতায় এই গানটি তাদের আড্ডার সীমানা পেরিয়ে দেশবাসীর মুখে মুখে ঘুরতে লাগলো। কাজী নজরুলের আরও একটি কবিতা,
'আমার শ্যামা মায়ের কোলে চলে চড়ে,
ডাকি আমি শ্যামের নাম। '

দেশের হিন্দু মহলে দারুণ সমাদর পেল। এইতো সত্যিকারের কবি। পারিবারিক পরিচিতিতে মুসলিম হলেও নিজের আদি ধর্মীয় ইতিহাস আজ অবধি ভুলতে পারেনি। এই আত্মানুভূতিকে ধ্বজা করেই সনাতনী হিন্দু ধর্ম আবার প্রতিষ্ঠিত হবে উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আদি-অনাদি ধর্ম রক্ষা সমিতির মাগাজিনে তার কবিতাটি প্রকাশিত হলো। পাশাপাশি ছাপা হলো তার হিন্দী অনুবাদ। নিজ দেশ ছাড়িয়েও প্রতিবেশী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়লো লিমন হাসান এর সুনাম। দেশের সবচাইতে জাকজমকপূর্ণ পূজামণ্ডপে তাকে অতিথি হিসেবে ডাকা হলেও কোন এক অজুহাতে লিমন দূরেই রয়ে গেল।

কিন্তু মুসলিম কবি নজুরুল ইসলামের কবিতা নিয়েই বিপদের সূত্রপাত। এই কবিতার কারণেই মুসলিম মৌলবাদী একটি দল মহাখাপ্পা হলো লিমনের উপর। "হেদায়েতুল ইসলাম"ও যোগ দিল ওদের সাথে। দুই দল মিলে "লিমন হোসেন এর কল্লা চাই", বলে গগনবিদারী মিছিল বের করল রাজধানীর পথে পথে। দেশের মাদ্রাসার ছাত্ররাও যোগ দিলো এই আন্দোলনে। কদিন পর এই আন্দোলন শুধুমাত্র রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ রইল না, দাবানলের ছড়িয়ে পড়ল দেশের প্রত্যন্ত আনাচে-কানাচে। ধ্বংস হলো দোকানপাট ও বহু মূল্যবান স্থাপনা। কোন কোন এলাকায় আক্রান্ত হল হিন্দুবসতি। একজন মুসলিম হয়ে হিন্দুদের জন্য লেখা কবিতায় তার যে অপরাধ, তা

তার কবি, মানুষ ও জাতীয় অধিকারকে পদদলিত করে দেশদ্রোহীর তকমা লাগিয়ে দিল।

উপসংহার

লিমনের সাথে দেখা হয়েছিল আমার জার্মানির স্টারনবার্গ নামে একটি ছোট্ট শহরে। আমার বাসস্থান মিউনিখ থেকে সামান্য দূরেই একটি বিশাল সুন্দর হ্রদের পারে অবস্থিত স্টার্নবার্গ। সেখানে ঘনঘনই বেড়াতে যাই। একটি দোকানে পিজ্জা খেতে গিয়ে দেখা হলো পিজ্জা বিক্রেতা লিমনের সাথে। বুদ্ধিদীপ্ত অবয়বের এই তরুনের সাথে কিছুক্ষনের মাঝেই আলাপ জমলো। একটু পরই তার কাজের শিফট শেষ হবার কথা। সে সুবাদে পাশের একটি ক্যাফেতে গিয়ে বাকী কথা হলো। এভাবেরই আমার পরিচয় ঘটলো কবি লিমনের সাথে।

বাংলাদেশে তার জীবন বিপন্ন শুনে 'পেন' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা নানা দেনদরবার করে নিয়ে আসে এদেশে। কবি লিমনকে নিয়ে বেশ কয়েকটি রমরমা দিন কাটে এই সংস্থাটির। একটি গরিব দেশের ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাতে আক্রান্ত বিপদগ্রস্থ কবি কে রক্ষা করে তাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। চলে নামিদামী কবি, সাহিত্যিক রাজনীতিবিদদের সামনে রেখে নীতিনির্ধারনী আলোচনা সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম। এতে পেনের সদস্য সংখ্যাও বেড়ে উঠলো দেড়গুণ। নিযম অনুযায়ী এসব স্তিমিত হতেও বেশীদিন সময় লাগেনা, কবি লিমনকে নিয়ে এই উত্তেজনাও স্তিমিত হয়ে এলো একসময়। ফলশ্রুতিতে কবিতা ছেড়ে পিজ্জা বিক্রিই এখন লিমনের পেশা।

বেশ কয়েকবারই স্টারনবার্গ গিয়েছি লিমনের সাথে আলাপ করার জন্য। তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনেক কথার মাঝে তার জীবন সম্পর্কে জেনেছি। মাঝে মাঝে কাজ শেষ হবার পরও ক্যাফেতে বসে অনেক সময় কেটেছে আমাদের। গতবার তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় হঠাৎ করেই খুব মেঘলা হয়ে গেল আকাশ। স্টারনবার্গের সেই লেকের উপর যেন নিকষ কালো অন্ধকার। সে দিকে তাকিয়ে লিমন বলে উঠলো,

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'।

আমি অবাক হয়ে লাইনটি শুনলাম। স্টর্নবার্গের এই প্রকৃতির সাথে মিলে মিশে এই একটি ছত্রেই এক অবিস্মরণীয় মহাকাব্যিক দ্যোতনা। অবাক দৃষ্টিতে তাই লিমনের তাকিয়ে বললাম,

- এটা কার কবিতার লাইন লিমন? কী অদ্ভুত সুন্দর!
- জীবনানন্দ দাশ, বলল লিমন।
- জীবনানন্দ দাশ কে?

আমার প্রশ্ন শুনে মুখের দিকে তাকালো লিমন। অব্যক্ত ও অপরিচিত এক হাসি ফুটে উঠলো তার চেহারায়। তার আড়ালে সুস্পষ্ট বেদনার তিরতিরে কাঁপন। সেদিকে তাকিয়ে আমিও মলিন হেসে বিদায় নিলাম।

(একটি বিদেশী কাহিনীর ছায়া স্পর্শ করে)

মিউনিক, জার্মানি

আমীনুর রহমান

সাদাকালো মুখগুলো

এখনো আমি কিশোরী বেলার স্বপ্ন দেখি। প্রায়ই দেখি। ছি-বুড়ি খেলার বা পেয়ারা গাছে ঝুলে থাকার স্বপ্ন; দেখি স্কুলের বন্ধু ইরা, তোতন, আর ঝর্ণাকে। যশোরের সেই দোতলা বাড়িটাও দেখি। ঘরের সামনে ঝোপের মত বেড়ে ওঠা হলদে কাঞ্চনের গাছ। উঠানের ডান দিকে পেয়ারা, আর হাসনু হানা। পেয়ারা গাছে ছোট ছোট পেয়ারা। কামড় দিলে ভেতরের গোলাপি রসে ঠোঁট ভিজে ওঠে। বিচিগুলোও গোলাপী। মনে হয়, সবুজ পেয়ারার ভেতরে কেউ যেন হাওয়াই মিঠাইয়ের গুটলি লুকিয়ে রেখেছে।

পেয়ারা গাছটার ডালে ছোট্ট একটা পাখি বাসা বেঁধেছিল একবার। পাখিটার নাম জানতাম না। আমাদের বাড়ির টুনটুনি বলত, সুঁইচুরা পাখি। শুনে আমি হাসতাম। মা-কে বললে, মাও হাসতেন। বলতেন, টুনটুনি বানিয়ে বলেছে। বাবা বলতেন, হয়তো সত্যিই পাখিটার নাম সুঁইচুরা। কত পাখিই তো আছে, আমরা কি সব পাখির নাম জানি? নাম যাই হোক, ছোট পাখিটার সাহস দেখে আমরা তো অবাক। সবার সামনেই ফুড়ুৎ করে এসে পাখা গুটিয়ে বাসায় বসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। যেন আমার বাড়ি আমি আসবো, তাতে অন্যের কি, এমন একটা মালিক মালিক ভাব। পেয়ারার ডালটা একটু বাঁকালেই পাখির ডিমগুলো দেখা যেত। মাখন রঙের তিনটা ডিম। একটার সঙ্গে আরেকটা হেলান দিয়ে আছে, যেন তিনটা সাদা কড়ি। আমি ছুঁতে গেলে, টুনটুনি রে রে করে উঠত। ‘ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না। হাত দিয়া ধরলি চুমকা লাইগ্যা যাবিনি। বাচ্চা আর ফুটবিন নানে।’ চুমকা লেগে যাওয়া কি, আমি বুঝতাম না। তবে টুনটুনির বলার ভঙ্গিতে বুঝতাম খারাপ কিছু। তাই সরে আসতাম বাসার কাছ থেকে। যদিও প্রতিদিন একবার কয়েকবার করে ডালটা টেনে নামিয়ে দেখতাম। লোমবাকলহীন বাচ্চাগুলোকে চিঁচিঁ করে চেঁচাতে দেখতাম। মা পাখিটাকে ঠোঁটে করে খাবার খাওয়াতে দেখতাম। মনে মনে ঠিক করেছিলাম একটাকে পুষবো। খাঁচা কিনবো, দানা খেতে দেব। ভাবতে ভাবতেই একদিন সকালে উঠে দেখলাম সুঁইচোরা আর তার তিন বাচ্চা কেউই নেই পেয়ারা ডালে। শুধু শূন্য খড়কুটো ছড়িয়ে আছে গাছের নিচে।

টুনটুনিই বলেছিল, একেক পাখির একেক স্বভাবের কথা। ঠিক মানুষের মত। কলতলায় সাবান রাখলে কাক তা চুরি করে, অন্য পাখি নয়, । ছাদে মরিচ শুকাতে

দিলে, টিয়া চুরি করে। আর সুঁইচুরা করে সুঁই চুরি। যেন তেন সুঁই না, কাঁথা সেলাই করা ভুমা সুঁই।

'তো সুঁই চুরি করে পাখি কি করে?' আমার ধন্দ কাটে না, তাই টুনটুনিকে প্রশ্ন করি 'কাকই বা সাবান দিয়ে কি করে?'

টুনটুনি একটুও চিন্তা না করে আমার প্রশ্নের জবাব দেয়। বলে, 'যার যা দরকার সে তাই চুরি করে।'

'মানে?' আমি টুনটুনির উত্তর বুঝতে না পেরে আবার জিজ্ঞেস করি।

টুনটুনি বলে, 'কাকের গা ঘসার জুন্যি দরকার সাবান। টিয়ার মিষ্টি গলার জুন্যি দরকার ঝাল। আর সুঁইচুরার দরকার সুঁই।'

'কিন্তু সুঁই কেন?'

'কারণ অন্য পাখি তারে জ্বালাতন করে।'

'কেন জ্বালাতন করে?' এ প্রশ্নের উত্তরে একটু উদাস হয়ে টুনটুনি বলে, 'সে তুমি বুঝব্যান না।'

আমি প্রশ্ন করতেই থাকি, আর টুনটুনি অদ্ভুত সব উত্তরে আমাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে যেতেই থাকে। আমি টুনটুনির মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকি। আমার চেয়ে মাত্র বছর পাঁচেকের বড় টুনটুনি। অথচ তার কাছে সব প্রশ্নের উত্তর আছে। ও তো স্কুলেও যায় না। আমার মত ওর ব্যাগে আমার বাংলা বই দ্বিতীয় শ্রেণী, প্রাথমিক গণিত দ্বিতীয় শ্রেণী, ইংলিশ ফর টু ডে নাই। ও তো তিনের ঘরের নামতাই জানে না। অথচ কত কি জানে।

'বলো না টুনটুনি, সুঁইচুরা কাঁথা সেলাইয়ের সুঁই কেন চুরি করে?'

টুনটুনি বিরক্ত হয়ে বলে, 'কলাম তো, সুঁই দিয়্যা অন্য পাখিদের জ্বালাতন থেইকে নিজেরে বাঁচায়।'

'জ্বালাতনটা কি সেটা বলছো না কেন? অন্য পাখি কি ওকে ঠোকর মারে?'

এবার টুনটুনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঠিক ঠোকর মারে না। তয় জ্বালায়, ঠোকর মারতি চায়। এই যেমন ধরো আমারে তোমার ছোট মামা জ্বালায়। তোমাগের ড্রাইভার জ্বালায়। তাই ভাবতেছি ইবার আমার কাছেও এট্টা সুঁই রাখতি হবি। কেউ জ্বালাতি আসলি সিধা ঢুকাই দিবানি।'

'ছোট মামা তো আমাদের বাড়িতে থাকে না। তোমাকে জ্বালায় কি করে।' প্রসঙ্গটা বদলে যাচ্ছে এমন ভাবে রাশ টেনে আমি বলি, 'বছরে মাত্র একবার দুইবার আসে। তাহলে তোমাকে জ্বালায় কি করে?'

'কলাম না, সে তুমি বুঝব্যান না। ঐ একবার দুইবারই যে জ্বালায় তা সারা বছর জ্বলে।'

আরেকটু বড় বেলার স্বপ্নও দেখি। যখন আমি টুনটুনির মত বুঝতে শিখেছি, কেন সে নিজের কাছে একটা ভুমা সুঁই রাখতে চেয়েছিল। বুঝতে শিখেছি, অন্যেরা কি করে জ্বালায় বা জ্বালাতে চেষ্টা করে। তখন সুযোগ পেলে বাড়িতে আসা কেউ কেউ এবং

বাড়ির বাইরের দু'একজন আমাকে জ্বালাতে চেষ্টা করছে। মা বুঝতে পারত। তাই চোখে চোখে রাখত। চোখে চোখে রাখাটা শুরুর দিকে ভালই লাগত। মনে হত, শুধু আমি না, আমার জন্য আরো দুটো চোখ সারক্ষণ পাহারায় আছে। সুতরাং সাধু সাবধান। তবে মায়ের সেই চোখ রাখার ভেতরে কেমন একটা সযত্ন উদাসীনতা ছিল। যেন কিছুই দেখছে না এমন ভাব কিন্তু আমার নিঃশ্বাসও মায়ের কাছে চেনা। আরেকটু বড় হলে মায়ের ঐ পাহারাটাই আমার দম বন্ধ করে দিতে শুরু করল। বিশেষ করে ছুতা নাতায় যখন প্রতিদিনই স্কুলের ব্যাগে তল্লাশি শুরু হল, তখন। বাথরুমে একটু দেরি হলেই দরজার কাছে এসে আদুরে গলায় মা বলত, 'তোমার কিছু লাগবে চঞ্চলা? শাওয়ারে পানি আছে তো? নাকি পানি বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে? জামা কাপড় ভুলে যাওনি তো?' একা জানালায় বসে রোদের দিকে তাকালে, চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে বলত, 'আমাকে কি কিছু বলবি?' সন্ধ্যায় ছাদে উঠে হাসনু হানার ঘ্রাণে চোখ বন্ধ করে শ্বাস নিলেও কপালে হাত ঠেকিয়ে বলত, 'জ্বরজারি হয়নি তো?' আমি যে মায়ের এসব অভিনয়ে মাখানো গোয়েন্দাগিরি বুঝতাম, তা মাকে জানতে দিতাম না। জানলে মা কি লজ্জা পেত? নাকি কেমন অমন করছে তার আরেকটা অজুহাত দাঁড় করাতো? কে জানে?

সেই বয়সের স্বপ্ন যেন আমার মাথায় বড়শিতে গেঁথে গেছে। একই স্বপ্ন দেখি। রাতের পর রাত। প্রতিরাতেই এক জায়গায় শুরু, এক জায়গায় শেষ। যেন আমার ঘুমের ভেতর গভীর ষড়যন্ত্র করে কেউ একটা ভিডিও ক্যাসেট চালিয়ে দেয়। আমি বাবার গাড়িতে স্কুলে যাচ্ছি। ফাতেমা হাসপাতালটা পাড় হয়ে ভৈরব ব্রিজের কাছে আসতেই দেখি, একটা পা মাটিতে ছুঁইয়ে সাইকেলের সিটে বসে আছে ছেলেটা। প্রতিদিনই একই বেশ। সাদা জামা আর গাঢ় নীল প্যান্ট। এলোমেলো চুল। শুধু রোজ আলাদা চশমার ফ্রেম। একেক দিন একেক রঙ। আমার খুব হিংসে হয়। আমি তো বছরে একবারও চশমা বদলাই না। বাবাকে বললে, বাবা হাসে, 'অত ঘনঘন চশমা বদল করতে হয় না। বছরে একবার করলেই চলে।' আমি আমার বছর পুরানো চশমার কাচের ভেতর দিয়ে ছেলেটার চোখের মণি অব্দি দেখতে পাই। সেখানে সকালের শেফালির মত টুপটাপ আকুলতা ঝরে পড়তে দেখি। আর আশে পাশের টুংটাং রিক্সা মোটর সাইকেলের শব্দ ছাপিয়েও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। সাইকেল আরোহীকে পেছনে ফেলে, ভৈরব ব্রিজ পার হয়ে যায় আমার গাড়ি। একটা দীর্ঘশ্বাস আমার বুকের কাছ অব্দিও উঠে আসে। তবে আমি সেটা আটকে রাখি। মা বলে, 'মেয়েদের অনেক শক্ত হতে হয়। একবার পা পিছলে গেলে সর্বনাশ।' আমার কষ্ট হয় কিন্তু মায়ের কথা ভেবে বুকের কাছে দীর্ঘশ্বাসটা আটকে রাখি। তবে ঘাড় ঘুরিয়ে সাদা শার্ট আর নীল প্যান্টকে সারাদিনের মত আর একবার দেখি।

আমাকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে দেখে মিরর ভিউতে তাকিয়ে তসলিম ভাই বলে, 'আপা কিছু কি ফেইল্যা আলেন? ফিরতি হবি?'

‘না না আমি কিছু ফেলে আসি নি। আপনি চলেন।’ তসলিম ভাই আমার কথায় বিশ্বাস করে না কিন্তু মিরর থেকে চোখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ পর তসলিম ভাই আবার মিররে তাকায়, আমাকে দেখে। তবে এবার চোরা চোখে। তার চোখটা যেন আমাকে জ্বালাতে চেষ্টা করে। আমি সে তাকানোটা উপেক্ষা করি। ততদিনে আমি ঐ রকম তাকানো ঝেরে ফেলতে শিখে গেছি। আমার ভেতরে তখন শুধুই ফিনিক্স সাইকেল, গাঢ় নীল প্যান্ট আর সাদা সার্টের চোখ।

ঠিক তখনই স্বপ্নটা ভেঙে যায়।

আবার মাঝে মাঝে আরো অদ্ভুত স্বপ্নও দেখি। স্বপ্নেই আমার অচেনা যুবকের সঙ্গে প্রেম হয়। একেক দিন একেক যুবকের সাথে। সেই সব নতুন নতুন যুবকের হাত ধরে ঘুরি। বসি। খুনসুটি করি। কেউ কেউ আমাকে উপহারও দেয়। বই কলম পারফিউম এ রকম জিনিস। তারপর খুব গভীর, মাখামাখি প্রেমে ডুবে যাই আমরা। তেমন প্রেম, যে প্রেমে ঘুমের ভেতরও নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে আসে। শরীর ঘেমে ওঠে। আর ঘুম ভেঙে সমস্ত শরীরের প্রশান্তি ঠোঁটের কোনায় জাগিয়ের রাখে এক চিলতে হাসি। এই স্বপ্নগুলো অনেকদিন মনে থাকে। স্বপ্নের ভেন্যুগুলোও। সেখানে ক’টা চেয়ার, কটা গাছ, খাটের উচ্চতা, তোশকের আরাম, জানালার শিক এরকম ছোটখাটো সব কিছু। তবে রোজ দিনই যে অমন করে ঠোঁটের কোণে হাসি জাগিয়ে ঘুম ভাঙে তা নয়। মাঝে মাঝে মাখামাখির মধ্যিখানেই ঘুম ভেঙে যায়। ঠোঁটের কোণে প্রশান্তির হাসি নয়, সমস্ত শরীর তখন খিচরে থাকে। ইশ ভালবাসাবাসিটা শেষ হল না। আরেকটু দীর্ঘ হলে কী হতো। এ তো শুধু স্বপ্ন। সেখানেও এমন আদাখেচরা কেন? আমি কাত ফিরে শুই। ছোট বেলায় টুনটুনি বলত, ‘পাশ ফিরে শুয়ে একবার আলহামদুলিল্লার সুরা পড়ে বুকে ফুঁ দিলে, ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন আবার দেখা যায়।’ আমি তাই করি। মাঝে মাঝে সত্যিই বাকিটা দেখি। আর না দেখলে, ঘুম ভেঙে নিজেই নিজেকে ভালবাসার চূড়ান্তে নিয়ে যাই। তবে সে যাত্রা স্বপ্নের অনুভূতির মত অতোটা স্নিগ্ধ, অতোটা প্রশান্ত হয় না, তবে প্রশান্তি না এলে সারাদিনের যে তীব্র এক-কপালে ব্যথা, তা থেকে মুক্তি মেলে।

ঘুম ভেঙে আমি সেই অচেনা যুবককে আর তার আদর খুঁজি। মনে হয় অমন কেউ নিশ্চয়ই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও আছে। অথচ তার সাথে কোন দিন দেখা হবে না। এমনকি স্বপ্নেও দ্বিতীয় বার তাকে দেখতে পাব না। স্বপ্নের স্থানগুলো মনে থাকবে কিন্তু সেই স্বপ্ন-যুবকের মুখশ্রী ভুলে যাব। আরেকটা নতুন স্বপ্ন এসে আগের স্বপ্নটাকে চাপা দিয়ে দেবে। যেন খোলা জানালা দিয়ে নতুন একরাশ ধুলা এসে বইয়ের তাকে আগের দিনের ধুলার আবরণকে আরেকটু পুরু করে দেবে। আমার মন খারাপ হয়। খুব, খুব খারাপ হয়। মনে হয়ে কেউ যেন পাটার ওপর রেখে কাঁচা হলুদ থেতলানোর মত করে থেতলে দিয়ে গেছে আমাকে। সেই মন খারাপটা সারা দিন সমস্ত কাজে, সমস্ত কথায় মিশে থাকে। অথচ কারণটা কাউকে বলতে পারি না। মাঝে মাঝে ভাবি বলব কিন্তু আবার পিছিয়ে আসি, কেউ হয়তো বুঝবেই না, সেই ভয়ে। এমন কি বিজয়াকেও বলি না। অথচ ও-ই আমাকে সব চেয়ে বেশি বোঝে। ওর সাথে কাউসারকে নিয়ে কথা বলি।

আমার ভেতরের শুষ্কতার কথা বলি। আমাদের দু'জনের পাকিয়ে ওঠা উলের মুঠোর মত জটিল সম্পর্কের কথাও বলি। কাউসারের হঠাৎ মসজিদমুখী হয়ে ওঠার পেছনে লুকিয়ে থাকা অক্ষমতার কথা বলি। অথচ সহস্র এক আরব্য রজনীর মত নতুন নতুন যুবকের মাখামাখি আদরের কথা ওকে বলি না। বলতে পারি না।

এই সব চাওয়া না চাওয়া স্বপ্নের সারির ভেতর আমি কখনো তালালের স্বপ্ন দেখি না। অথচ কাউসারের আগে আমার জীবনে তালাল ছাড়া আর কিছু ছিল না। প্রেমকে যে অমন গভীর কিন্তু উচ্ছ্বসিত করে তোলা যায়, তা তালালই আমাকে দেখিয়েছিল। তাকে কোন দিনই স্বপ্নে দেখি না; দেখি না ধানমণ্ডি পাঁচ নম্বর রোডের সেই লাল বাড়িটাকেও। তার ছাদ, মোজাইক করা সিঁড়ির ধাপগুলো, কালচে ইটের রেলিং, বাসায় ঢোকার মুখে বোগেনভেলিয়ার লতানো উত্থান, কিছুই দেখি না। অথচ আমি দেখতে চাই, খুব করে চাই। যেমন করে চাইলে জেগে থাকাটাও স্বপ্নের মত মনে হয়, তেমন করে চাই। ঐ বাড়ির চারতলাটা আমার যশোরের বাড়ির মতই চেনা। সিলিং ফ্যানের পাখায় কেটে কেটে ঝরে পড়া বিকেলের গাঁদা ফুলের মত রোদ, ঘুলঘুলির ভেতর চড়ুইয়ের উৎপাত, আর লেকের পাড় থেকে গভীর রাতের গাঢ় অন্ধকার চিরে ডেকে ওঠা অচেনা পাখির শব্দ - এসবের কিছুই দেখি না আমি, কিছুই শুনিনা আমি। অথচ তালাল যতদিন দেশে ছিল, ঐ বাড়ি ঘিরেই আমাদের দিন রাত একাকার ছিল। ও চলে যাবার পর, আমার সবচেয়ে রোদেলা দিনগুলো ওখানেই ডুবিয়ে রেখে এসেছিলাম। আর নিয়ে এসেছিলাম থরে থরে সাজানো যন্ত্রণা আর আনন্দের এক মিশ্র অনুভূতি। বহু দিন আমি বুঝতে পারিনি, কোনটা আমার যন্ত্রণা আর কোনটা আমার সুখ। বহুদিন বুঝিনি কী করে যন্ত্রণা থেকে সুখ আলাদা করতে হয়। সময় চলে গেল কিন্তু আমি সযত্নে সঙ্গোপনে সাজিয়ে রাখলাম তালাল আর আমার যুগল সব মুহূর্ত, যুগল নিঃশ্বাস আর যুগল টানাপোড়েন। এখনো মাঝে মাঝে গোপন খাম থেকে সে সব দিনের টুকরো চিরকুটগুলো খুলে খুলে পড়ি। অনুভব করি রোদের মায়া। শুনি পুরনো ফ্যানের একটানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। কেন এই স্বপ্নের মত সত্যিটা আমার ঘুমের ভেতর আসে না? কেন পুরোনো সুরকির আস্তর উঠিয়ে দেখতে পাই না, ভেতরের পাথরের গাঁথুনি? আমি জানি, একটা মাত্র আস্তর সরালেই খুঁজে পাওয়া যাবে, ছুঁয়ে দেখা যাবে থরে থরে সাজান তুমুল কারুকাজ।

অথচ না দেখতে চাওয়া স্বপ্নগুলো আমাকে হন্তারকের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ঘুমের ভেতর তাড়া করে, ঘুম ভেঙেও তাড়িত হই। দু'একদিন হয়ত ঠোঁটের কোণে ভাললাগা নিয়ে ঘুম ভাঙে কিন্তু যেদিন টুনটুনির কান্নায় আমার ঘুম ভাঙে, আমি বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠে বাতি জ্বালিয়ে রক্তের দাগ খুঁজি। হিসহিসে গলায় বলতে শুনি, 'সরফরাজ তুই এখনই ময়মনসিংহ চলে যা। কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। আর কোন দিন এদিকে আসবি না।' কেউ বুঝতে পারে না কিন্তু আমি জানলা দিয়ে দেখি ছোট মামা মাঝ রাতে, কাঁধে একটা কালো ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঝুলে পড়া পেয়ারা ডালের নিচে মাথা নিচু করে, হলদে কাঞ্চনের পাশ দিয়ে। তখনো পাশের ঘরে

মা বাবার ফিসফিসে গলা। মুখের ভেতর কাপড় ঢুকিয়ে টুনটুনির কান্না লুকানোর চেষ্টা করছে। আর বাইরে তক্ষক আর শেয়ালের ডাক অন্ধকার চিড়ে ছুটে এসে আমাদের বন্ধ জানালায় আছড়ে পড়ছে।

মাস খানেকের মধ্যেই ধুমধাম করে টুনটুনির বিয়ে হয়ে যায়, আমাদের ড্রাইভার তসলিম ভাইয়ের সঙ্গে। সব খরচ আমাদের। মেহমানের মত এসে খুশি মনে টুনটুনির মা-বাবা মেয়ে বিদায় করে দিয়ে যায়। বাবা তসলিম ভাইকে কালেকটরেটে চাকরি দিয়ে দেয়। প্রথমে মাস্টার রোলে তারপর পারমানেন্ট।

আমার না-দেখতে চাওয়া এ সব স্বপ্নই আমার হন্তারক। আসলে আমি কোন স্বপ্নই দেখতে চাই না। আমি ঘুমাতে চাই। প্রাণ ভরে প্রশান্তির ঘুম। যেমন করে ঘুমালে সকালে জানালার রোদকে আপন মনে হয়। পাশ বালিশটাকে আরও খানিকটা জড়িয়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে, তেমন ঘুম। যে ঘুম থেকে উঠলে মনে হয়, নতুন একটা দিনের সুখ সারা শরীরের অলিগলিতে খেলা করছে। তেমন ঘুম। অথচ আমার ঘুম এলে হন্তারকের মত অসংখ্য না-দেখতে চাওয়া স্বপ্ন আসে। তাদের হাতে উদ্যত স্বপ্নের ধারালো চাকু। স্বপ্ন কি করে এমন হন্তারক হয়, এমন নির্মম হয়?

আগে যখন কাউসার ছিল, গভীর রাতে ওর নাক ডাকার শব্দে ঘুম ভেঙে যেত। তখন ভাবতাম, ও না থাকলেই ভাল। যেতে চাইছে যাক। ওর সাথে আট বছর সংসারের বাঁধনতো শুধুই রুদাইবা। ওকে নিয়েই আমি থাকি। কাউসারের সাথে তো আর কোন বন্ধনই নাই। বিছানা এক কিন্তু সমুদ্রের চেয়েও বড় হয়ে গেছে দূরত্ব। ফুলদানিতে আর কোন ফুলই নাই, শুধু ভরাট শূন্যতা। সব কিছুতেই কর্তব্যের তালাচাবি। সে যদি কুয়েতে গিয়ে নতুন করে শুরু করতে পারে, করুক। দেশে তো কিছুতেই পসার হচ্ছে না ওর। অথচ আমি জানি কাউসার খুব ভাল ডাক্তার। কেন যে ও এভাবে পিছিয়ে পড়ছে ওর বন্ধুদের থেকে। মাঝে মাঝে খুব হতাশ মুখে ঘরে ফেরে। তখন আমার খুব খারাপ লাগে। ওর সেই হতাশ মুখটা দেখতে আমার ভাল লাগে না।

কাউসার চলে গেল। আমি যেতে দিলাম। কলেজের চাকরি, রুদাইবার এটা সেটা, আমার দিন ভালই কাটবে। তা ছাড়া বছরে তো দু'বার আসবে। কুয়েত আর এমন কি দূরে। আমরাও যাব। রুদাইবাকে বুঝালাম, নিজেকেও যেন সান্ত্বনা দিলাম এভাবে।

কাউসার চলে গেলে আমি যেন নিজেকে খুঁজে পেলাম। আসলে আমার বোধ হয় নিজেকে খুঁজে পাবার জন্য এই একাকীত্বটা দরকার ছিল। বন্ধুদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ, কলেজের কাজ সেরে বিকেলটা রুদাইবার সঙ্গে। ফিরে এসে মা মেয়েতে গল্প, হোম ওয়র্ক, টুকিটাকি কাজ তারপর মেয়েকে জড়িয়ে প্রশান্তির ঘুম।

তবে সে সুখ বেশি দিন স্থায়ী হলো না। আমার দেবর আজিজুল প্রায়ই আসতে লাগল আমাদের বাসায়। পাশের বাড়ির ফারাবি সাহেব প্রথম ক'দিন এলেন সন্ধ্যায় চা খাবেন বলে। ভাবিকে নিয়েই। কিন্তু ক'দিন পর তিনি একা আসতে শুরু করলেন। দুই তলার সদরুল সাহেবও দেখা হলে আজকাল প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, কিছু লাগবে কি না? লাগলে যেন অবশ্যই তাকে বলি। 'কিছু করতে হলে আমাকে বলবেন, আমি করে দেব, কোন

লজ্জা করবেন না।' অথচ কাউসার থাকতে কোন দিন কথা হয়েছে এমন তো মনে পড়ে না। এরা যেন সবাই দল বেঁধে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে আমি এখন কেবল আমার মেয়েকে নিয়ে থাকি। সেখানে কাউসার নেই, মানে একটা অনিবার্য জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। যেন একটা বিশাল ঘরের মাঝখানে একটা আরাম কেদারা, যে কেউ যখন খুশি এসে পা ছড়িয়ে বসতে পারে। আমার ইচ্ছের অনিচ্ছের কোন মূল্য নেই। প্রথম প্রথম আমি গায়ে মাখতাম না। তারপর আমার দেবর যখন প্রতি সপ্তায় আসতে শুরু করল, তখন বুঝলাম। আগে কেন এসেছো জিজ্ঞেস করলে বলত, 'এই একটা কাম ছিল তাই আসিলাম।' অথচ এখন সে সরাসরি বলে, 'তোমরা দু'জন একলা একলা থাহো, তাই থ্যাকপ্যার আলাম। বড় ভাই নাই, আমারও তো তোমাগের দেহাশুন্যা করার দায়িত্ব আছে? তাই ন্যা?' এক দিন দু'দিন করে সপ্তায় পাঁচ দিনও থাকতে শুরু করল আজিজুল। আমার ভেতর আবার সেই দম বন্ধ ভাবটা তৈরি হতে শুরু করল। কাউসার থাকতে যেটা হতো। শেষে একদিন তাকে বাসা থেকে বের করে দেবার পরিস্থিতি তৈরি হল। তখন বুঝলাম, ছেড়ে যাওয়া মানেই শেষ করে দেয়া নয়। চলে যেতে দিলেও এতো অবশেষ থেকে যায় যে তা দিয়ে দুঃখের প্রাসাদ গড়া যায়।

জানেন, যেদিন পুলিশ আমাদের বাসায় এল কাউসারকে খুঁজতে, তার আগের দিনও কথা হয়েছিল আমাদের। বলেছিল একটা নতুন শহরে যাচ্ছে, সেখানে একটা নতুন হাসপাতাল হচ্ছে। তাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। আমি শুনে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু নতুন শহর মানে যে ইসলামিক স্টেট আমি তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারি নি।

'মিসেস হামিদ, আজ এটুকুই থাক, কেমন? আমরা না হয় আগামী সেশনে ঐ কথাগুলো শুনবো? আপনি বাড়িতে নোট করে রাখবেন, যখন যা মনে পড়ে। চাইলে ফোনে রেকর্ড করেও রাখতে পারেন। আর আগের ঔষধগুলোই চলুক। একটু ইয়োগাও করতে পারেন......................।'

আমার কানে ডাক্তার তনিমা আলীর কোন কথাই ঢোকে না, আমি কেবল টেলিফোনের ওপার থেকে সাপের মত একটা হিসহিসে গলায় শুনতে পাই, 'আমি একটা নতুন শহরে যাচ্ছি, সেখানে একটা নতুন হাসপাতাল হচ্ছে............. সেখানে অনেক মানুষের চিকিৎসা দরকার.........।'

গেইন্সভিল, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

মায়া দর্পণ

পুরনো অ্যালবামের ধূসর বিবর্ণ ছবি আর বহু বছরের এই টেলিফোন নম্বর ছাড়া ওর সাথে সম্পর্ক বলতে কিছু নেই। ছবিগুলো দেখাও হয়না। ওই অনুষঙ্গ আজও অবচেতনে শুধু ভয় আর অকারণ নির্যাতনের শৈশব স্মৃতি নিয়ে ফিরে আসে। তবু কিছু হারানো আপনজনের ছবি আছে বলে সুদেষ্ণা অ্যালবামটা রেখে দিয়েছে।

শেষবার ওর কাছে ফোন এসেছিল মাঝরাত পার করে। তখনে সেই ভয়ঙ্কর কালবেলা। হঠাৎ দেশ থেকে ফোন এলে কোভিডের আতঙ্কে শুধু একটাই কথা – কি হলো? তোমরা ঠিক আছ তো? যেন ঠিক থাকাটাই ছিল সংশয়পূর্ণ একমাত্র প্রশ্ন। দুঃসময়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকা।

সেরাতে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে সুদেষ্ণা ফোনে কথা বলার মুহূর্তে শুনল – 'কি রে? তোর বাড়িঘর নাকি পুড়ে গেছে? টিভিতে দেখছি খুব আগুন জ্বলছে...।'
সুদেষ্ণা নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল – 'সেটা জানার জন্য তুই ফোন করছিস? এখানে এখন কত রাত জানিস?'

ফোনের ওপ্রান্তে অদ্ভুত হাসির শব্দ। - 'জানবনা কেন? তুই একাই আমেরিকায় থাকিস নাকি? আমার একটা বন্ধুও থাকে, ক্যালিফোর্নিয়ায়। সব তো জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। এখানেও কী কাণ্ড হচ্ছে। কোভিডের কত মড়া, যেখানে সেখানে পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমি তো টিভিতে সব দেখছি।'

ফোন রেখে দেওয়ার আগে সুদেষ্ণা বলল – 'কেন আমাকে বারবার ফোন করিস? সব আত্মীয়স্বজন আমাকে তোর নম্বর ব্লক করে দিতে বলেছিল। এবার তাই করতে হবে।'

ফোনের আওয়াজে অসীমেরও ঘুম ভেঙ্গেছিল। হঠাৎ হঠাত এই এক উপদ্রব। অসীম ফোন ধরলে ওপ্রান্তে কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর কানেকশন কেটে দেয়। সুদেষ্ণার ঐ জ্যাঠতুতো না খুড়তুতো দিদি কৃষ্ণা শুধু সুদেষ্ণার সঙ্গে অনন্তর কথা বলে যায়। বিরক্ত সুদেষ্ণা মাঝপথে ফোন কেটে দেয়। অসীমের ধারণা মানসিক ভারসাম্যহীন ঐ নিঃসঙ্গ মহিলার চিকিৎসা করানো দরকার। কিন্তু ভাইবোনদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে এমন কাণ্ড

করিয়েছেন, যে কেউ সম্পর্ক রাখেনা। ওঁর বিয়ের পরেও প্রচণ্ড অশান্তির জন্য ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল। সুদেষ্ণা বলে – 'জেঠিমা ছোড়দির দিতে চাননি। হয়ত বুঝতেও পারতেন, ও ঠিক স্বাভাবিক নয়। আমাকেতো ছোটবেলায় মেরে মেরে শেষ করত। স্কুলের বইখাতা ছিঁড়ে দিত। পুজোর নতুন দুটো ফ্রক কাঁচি দিয়ে কেটে রাখল। তখন আমার কি বয় বলো? মনে হতো কলকাতার বাড়ি ছেড়ে বাবা-মার কাছে বিলাসপুরে চলে যাই।'

অসীম অবাক হয়েছিল – 'ওকে কেউ শাসন করতনা? তুমিও নিজের বাবা-মাকে কিছু বলতে না কেন? তোমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলিতে কোন চাইল্ড প্রোটেকশন ছিলনা? এই যে বল ঠাকুমা, জেঠিমা, কাকা, কাকীমা – তাঁরা কী করতেন?'

সুদেষ্ণা বলেছিল – 'ছোড়দি যখন এক বছরের, আমার জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছিলেন। জেঠিমা ভালো মানুষ। আমাকে যত্ন করতেন। ভালোবাসতেন। সেটাই ছোড়দি সহ্য করতে পারতনা। নিজের হিংসুটে, ঝগড়াটে স্বভাবের জন্যে পাড়ায়, স্কুলে ওর কোন বন্ধু জুটতনা। শুধু জ্যাঠামশাই বেঁচে নেই বলে, ওর ওপর হয়তো ঠাকুমা, কাকীমার একটু সহানুভূতি ছিল। তবে আমার কাকা ওকে শাসন করতেন। তখন ওর হিস্টিরিয়ার মতো হতো। জেঠিমা কাঁদতেন। ঠাকুমা ভয় পেয়ে কাকাকে বকাবকি করতেন। তখনো ছোটকাকাদের বিয়ে হয়নি। সারাদিন অফিসে, সন্ধ্যেবেলায় ক্লাবে। নয়তো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যেতেন। সংসাররে খুঁটিনাটি জানতেও পারতেন না। ছোড়দি এভাবেই প্রশ্রয় পেয়ে যেত। শেষপর্যন্ত কিন্ত্য কাকার ছেলেমেয়েরাই ওকে জব্দ করল। আমার মতো ভীতু তো ছিলনা। কাকীমাও ততদিনে সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছেন। এক পিসি এসে কিছুদিন থাকার পর ছোড়দিকে ধমক ধামক দিতে শুরু করলেন। একা ঠাকুমা আর কতদিন ওকে বাঁচাবেন?'

অসীম জিজ্ঞেস করেছিল – 'তোমাকেই বা অত ছোট বয়সে কলকাতায় পড়তে আসতে হলো কেন? বিলাসপুর তো বড় শহর। ভালো স্কুল ছিল নিশ্চয়ই?'

– 'বাবার বদলির চাকরি ছিল। বারব্র স্কুল বদলানোর চেয়ে আমাকে একবার কলকাতায়েসে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করিয়ে দিয়ে গেলেন। বাবা চেয়েছিলেন মেয়ে ভালো বাংলা শিখবে। নাচ, গান শিখবে। হস্টেরলের বদলে জয়েন্ট ফ্যামিলির আদর-যত্নে বড় হবে।'

– 'সেটা ভুল ভাবেননি। তোমার ঐ ছোড়দির চড়-চাপড় ছাড়া ও বাড়িতে প্রথম জীবনটা তো ভালোই কেটেছে?'

সুদেষ্ণা মেনে নেয় – 'সেটা ঠিক। এখন মনে হয় কলকাতার ঐ বাড়িতে না এলে হয়তো জীবনটা আমার সেভাবে দেখাই হতো না। স্কুল কলেজে কত সুযোগ পেয়েছিলাম। গানের স্কুল, নাচের স্কুল, সাঁতারের ক্লাস, পাড়ার পুরনো বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব – যেখানেই ভর্তি হই, একদল বন্ধু জুটে যায়। জন্মদিনে বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুরা এলে কী আনন্দ! আমার মা-বাবা যে কাছে নেই, সেই অভাবটা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যেই যেন এত আয়োজন। বাড়ির ছাদে কাপড় টাঙ্গিয়ে 'অবাক জলপান' করছি। 'লক্ষ্মীর

পরীক্ষা’ করছি। ছোটকাকা পরিচালক। মেজপিসি এসে নাচ শেখাচ্ছেন। সে একটা যুগ ছিল, জানো?’

অসীম মজা করে – ‘আর তোমার ছোড়দি কি করত? মারামারির সীন?’

– ‘না, না। ‘অবাক জলপান’-এ জলপাইওলা সেজেছিল। আমার এক দাদুর সবুজ চেক চেক লুঙ্গি পরে, কালো গোঁফ লাগিয়ে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে কি অ্যাক্টিং! ‘পথিক’-এর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে গোঁফ খসে গিয়েছিল।’

সুদেষ্ণার গল্পস্রোতে বাঁধ দেওয়ার জন্য অসীম মাঝে মাঝে ওদের ছেলেমেয়েদের বসিয়ে দেয়। কালেভদ্রে সে সুযোগ হয়। কেউ কাছাকাছি থাকেনা। বস্টন থেকে অমৃতা এলে মার গল্প শোনে। মতামতও দেয়। নিউ ইয়র্ক থেকে কৌশিক এলে সুদেষ্ণার পুরনো গল্পের চর্চা বন্ধ থাকে। কৌশিক ডাক্তার। সুদেষ্ণার ওজন নিয়ে কথা বলে। সুদেষ্ণা বেসমেন্টে গিয়ে ট্রেডমিল, এক্সেরসাইজ বাইক-এর ধার মাড়ায়না জেনে হিতোপদেশ দেয়। রোজ দু’ মেইল হাঁটতে বলে যায়। কৌশিকের গার্লফ্রেন্ড মাদ্রাজী। সরু ফিনফিনে ফিগার। সে অবশ্য সুদেষ্ণার ওজনবৃদ্ধি নিয়ে অন্য কথা বলে। তার ধারণা কৌশিকের ওটা বাতিক। এসব কারণে কৃষ্ণা যে রাত-বিরেতে ফোন করে সুদেষ্ণাকে উত্যক্ত করে, সেসব কথা ওদের বলার প্রশ্নই নেই।

তবু অমৃতাকে একদিন ফোনে সুদেষ্ণা ওর ছোড়দির শেষবারের ফোনের কথাগুলো বলল। অমৃতা উত্তর দিল – ‘তুমি তো যা বলছ, কৃষ্ণামাসীর জন্য তোমার কাজিনদের একটা ডিসিশনে আসা দরকার।’

– ‘কে ডিসিশন নেবে? ওর নিজের কোন ভাইবোন নেই। হাজবেন্ড নেই। ছেলেমেয়ে নেই। জ্যাঠামশাইয়ের প্রপার্টি সব ওকে দেওয়া হয়েছে। কোন ফাইন্যানশিয়াল নীড তো থাকার কথা নয়। কিন্তু একজন অ্যাডাল্ট মহিলাকে তুমি জোর করে সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে নিয়ে যেতে পারবেনা।’

অমৃতা বলল – ‘শ্যারনের সঙ্গে এসব নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম। কৃষ্ণামাসীর কেস হিস্টরি ও চাইল্ডহুড সিবলিং রাইভালরি, অ্যাগ্রসিভনেস নিয়ে কিছু ইনফরমেশন চাইছিল। ও প্রোফেশনাল কাউনসেলর। আমি তো সেরকম কোন ইনফরমেশন দিতে পারলাম না। তুমি বলেছ, ওঁর কখনো কোন ট্রীটমেন্ট করানো হয়নি। দ্যাটস ভেরী স্যাড।’

– ‘আমাদের ছোটবেলায় সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমকে সেভাবে আইডেন্টিফাই করাও হতোনা। কেমিক্যাল ইমব্যালান্স-এর ট্রীটমেন্ট, মেডিকেশন, কাউনসেলিং – এখন তো ইন্ডিয়াতে সবই হয়। পেরেন্টস অ্যাওয়্যারনেস থেকে ছেলেমেয়েদের সময়মতো ডাক্তার দেখানো হচ্ছে। প্রপার মেডিকেশন দিয়ে সুস্থ রাখা হচ্ছে। ছোড়দিরও হয়তো একসময় ট্রীটমেন্ট হতো, যদি হাজবেন্ড, ছেলেমেয়ে থাকতো। ওর জীবনে কিছুই তো হলোনা।’

একটু চুপ করে থেকে অমৃতা জিজ্ঞেস করল – ‘তুমি লাস্ট ইয়ারে কলকাতায় গিয়েছিলে, মাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?’

– ‘একদিন দেখেছিলাম। সোনালীর মেয়ের বিয়েতে। খুব রোগা হয়ে গেছে। চোখের মণিদুটো আরো সবুজ দেখাচ্ছিল। ওর ঐ বেড়ালের চাউনি। দেখলে এখনো কেমন একটা আনক্যানি ফীলিং হয়...।’

এই সব দিনরাত্রি নিয় ক্রমশ বসন্ত আসে। দীর্ঘ শীতের শেষে এই সেই ঋতু, যখন নিউ জার্সির বাঙালির ঘরে ঘরে উইকএন্ড পার্টি, ক্লাবে আসন্ন নববর্ষ উৎসব, রবীন্দ্র জয়ন্তীর রিহার্সাল শুরু হবে।

তবু এ মুহূর্তে হৃদয়ে বসন্ত কোথায়? দু’হাজার বিশের বিষক্ষয়ের স্মৃতি এক অনিশ্চিত আতঙ্ক রেখে গেছে। কাঁচের স্বর্গে বাস করে এতদিন যে দেশের মানুষ বিশ্বাস করে সেছে দুর্ভিক্ষ, মহামারি হয় কেবল তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোয়। টিভির চ্যানেলে যে দেশের মারণব্যাধির শিকার অসহায় শিশুর ছবি দেখে রেড ক্রস নয়তো কেয়ার-এ সাহায্য পাঠিয়েছে, আজ সেই আমেরিকায় কোভিড-এ লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। মহামারির আতঙ্ক, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, গৃহবন্দী জীবন, প্রায় নির্বাসনের মতো দিনরাত পাপক্ষয় চলছে।

বস্টন থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে অমৃতা, ব্রায়ান আসতে পারেনি কতদিন, কৌশিক এসে দেখাশোনা করে যেত।

কোভিডে মারা গেল সুদেষ্ণা, অসীমের বহুদিনের চেনে দুই বন্ধু। এই প্রথম এমন ঘটল, যে ঐ বিপর্যয়ের দিনে কেউ তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারলনা। তখন শহরে শহরে লকডাউন। হাসপাতালে, ফিউনারাল হোমে যাওয়া বারণ। সেদিন নিজের বাড়ির আপাত নিরাপত্তার বলয়ে বসে থেকে সুদেষ্ণার বহুদিন আগে লেখা কবিতা সিজ্জের দুটো লাইন মনে পড়ছিল – ‘মানুষ যখন লড়ে, তখন সবাই মিলে লড়ে, মানুষ যখন মরে, তখন একা... ী ওর কতদিনের বন্ধু পলা হাসপাতালের মর্গে পড়ে আছে। এ জন্মের মতো সব দেখাশোনা শেষ।

দেশ থেকে কোন ভালো খবর আসেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব হঠাৎ হঠাৎ একটা খারাপ খবর দেয়। মৃত্যুভয় নিয়ে বেঁচে থাকা, স্বজন হারানোর উৎকণ্ঠা নিয়ে লকডাউনে গৃহবন্দী মানুষগুলোর মতো সুদেষ্ণারও মন ভালো নেই।

ফোনে একদিন কাকীমার খবর নিতে গিয়ে শুনল ছোড়দিকে নিয়ে খুব সমস্যা হচ্ছে। ওর নিজের ফ্ল্যাটের কোনো বিল পেমেন্ট করেনা। ওদের ফ্ল্যাট বাড়ির কেয়ারটেকারকে নাকি ইলেকট্রিক বিল পেমেন্টের টাকা দিত। সে সব টাকা চুরি করেছে। অথচ অন্য ফ্ল্যাটের লোকজন বলছে, বহুদিনের কেয়ারটেকার এরকম লোক নয়। এমনিতেই ফ্ল্যাটের লোকেরা ছোড়দির দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ। কেউ ওকে সাপোর্ট করছেনা। ইলেকট্রিক সাপলাই-এর অফিস থেকে ওর ফ্ল্যাটের কানেকশন কেটে দিয়েছে। ওকে নিয়ে আত্মীয় স্বজনের ঝামেলাও বাড়ছে। হঠাৎ একদিন ট্যাক্সি নিয়ে ছোটকাকীমার বাড়ির গেটের কাছে গিয়ে খুব চেঁচামেচি করছিল। হয় অকে থাকতে দিতে হবে, নয়তো পঁচিশ হাজার টাকা ফেরত দিতে হবে। কোনকালে নাকি ওর বাবার টাকা ছোটকাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়েছিলেন।

সুদেষ্ণা বলল – 'ছোড়দির মাথার মধ্যে চিরকাল এরকম সন্দেহ ঢুকে বসে আছে। ছোটবেলায় বলত ওর রবার, পেনসিল, রিবন, পুতুল সব নাকি আমি চুরি করতাম। এখন ওর ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার থেকে শুরু ছোটকাকা পর্যন্ত সবাই চোর। ও কোনদিনই সুস্থ ছিলনা কাকীমা। হয়তো স্কিৎজোফ্রেনিয়া-এর পেশেন্ট। এখনও কেউ হেল্প না করলে একদিন হয়তো ডেসটিটিউট-এর মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে।'

কাকীমা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠলেন – 'ও সেয়ানা পাগল। এখন ওর চেহারা দেখলে তোমার ভয় করবে। কে ওকে মেন্টাল হোমে ভর্তি করতে নিয়ে যাবে? সেদিন পাড়ার মধ্যে এসে যা কাণ্ড করে গেল! তুমি দূরে থেকে কার জন্য কী করবে, সুদেষ্ণা?'

এখানে গ্রীষ্ম শেষ হতে চলেছে। কোভেডের ভ্যাক্সিন পাওয়ার পর ধীরে ধীরে চেনাশোনা লোকজনদের সঙ্গে আসা যাওয়া শুরু হচ্ছে। বস্টন থেকে অমৃতারা এসেছিল। ওদের বাচ্চাদের ভ্যাক্সিন দেওয়ার বয়স হয়নি। বাড়িতে মাস্ক পরে দূরে দূরেই থাকতে হলো। কতদিনে যে সব কিছু আগের মতো হবে কে জানে?

অসীমের ঘন ঘন চুল ছাঁটতে যাওয়া বন্ধু হয়েছে। নেহাত বেরোতে না হলে দাড়ি কামাতে চায় না। একদিন বলছিল – 'এক/দেড় বছরের মধ্যে বয়সটা যেন হঠাৎ-ই বেড়ে গেল। ভবিষ্যতের চিন্তা তো ছেড়েই দাও, কোনকিছু নিয়েই আর প্ল্যান করার উৎসাহ পাইনা। এঠিক সাময়িক ক্লান্তি নয় সুদেষ্ণা। ভেতরে ভেতরে কোথাও একটা রিয়ালাইজেশন এসেছে। প্যানডেমিক এর ঐ ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকার দিনগুলো জীবনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে চরম শিক্ষা দিয়ে গেছে।'

সুদেষ্ণা ভাবে – পদ্মপাতায় নীরবিন্দুর মতো জীবন। শুধু ভুলে থাকি, তাই আশা আর স্বপন নিয়ে বেঁচে থাকা। কবে আবার ভাইবোনদের সঙ্গে দেখা হবে। কবে কৌশিক বিয়ে করবে। সুদেষ্ণার আজও কৈলাস মানস সরোবর দেখা হলোনা...

কোভিডের ভয়ে বহুদিন হেয়ার স্যালনে যাওয়া হয়নি। সুদেষ্ণার একমাথা ঘন চুল লম্বা হতে হতে পিঠ ছাপিয়ে নেমে গেছে। সিঁথির দুপাশে সাদা/কালো চুলে কতদিন রঙ-এর প্রলেপ পড়েনি। ইদানীং আয়নায় রূপচর্চাহীন নিজের মুখ দেখতে দেখতে ওর সঙ্গে ঠাকুমা আর বাবার সাদৃশ্য খুঁজে পায়। ঠাকুমা ছিলেন রূপসী, বুড়ি মেমসাহেব। ঠাকুমার মতো ফর্শা রঙ, নীল/সবুজে মেশানো চোখের মণি ছিল বাবা আর জ্যাঠামশাইয়ের। ছোড়দিরও ছিল সেরকম চোখ। সুদেষ্ণার কটা চোখ ভালো লাগত না। সেদিন কাকীমা ফোনে বলছিলেন – 'এখন ওকে দেখলে তোর ভয় করবে।'

ভয়তো ছোটবেলায় করত। এখন করুণা হয়। কে জানে এভাবে কতদিন ছোড়দি বেঁচে থাকবে।

ক'দিন থেকে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বিকেলে পার্কে হাঁটতে বেরিয়ে অসীম আর সুদেষ্ণা ভিজে ফিরে এলো। দু'দিন পরে সুদেষ্ণার গলাব্যথা, সর্দিকাশি, জ্বর শুনে কৌশিক বাড়ি এলো। দুটো ভ্যাক্সিন নেওয়া সত্ত্বেও সুদেষ্ণার কোভিড টেস্ট হলো। গলায় ইনফেকশন হয়ে জ্বর হচ্ছিল।

এক রাতে জ্বরের ঘোরে সুদেষ্ণা যেন শুনতে পেল অসীম কার সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলছে। হয়তো কলকাতার ফোন। ওর অসুখ শুনে সকাল/বিকেল ফোন আসছে।

পরদিন সকালে চা নিয়ে এসে অসীম জিজ্ঞেস করল – 'ব্রেকফাস্টে কী খাবে?' টোস্টের সঙ্গে ওমলেট বানাব?'

– 'নাঃ, মুখে কোন স্বাদ পাচ্ছিনা।'

– 'একটু খাওয়া দাওয়া করা দরকার।ক'দিন রেস্ট নাও। এখন তো ক্লীনিং লেডিও আসছে। আমাকে বোলো কাকে রান্না ডেলিভারির জন্য ফোন করতে হবে।'

একথা সেকথার পর সুদেষ্ণা জানতে চাইল – 'কাল রাতে কার সঙ্গে কথা বলছিলে? অমৃতা ফোন করেছিল? '

– 'না। সুব্রতদা ফোন করেছিলেন।'

– 'আমার জ্বরের খবর ছোড়দারাও পেয়ে গেছে? কেমন আছে ওরা? ভ্যাক্সিনের সেকেন্ড ডোজ পেয়েছে?'

– 'অত কথা হয়নি। তোমার ছোড়দির খবরটাই দিলেন।'

– 'সেটাই বাকি আছে। আমি কাল আনন্দবাজার অনলাইনে হঠাৎ একটা খবর পড়লাম। সঙ্গে এক মহিলার ছবি। চেহারা দেখে বুঝতে পারিনি।খবরটা পড়তে গিয়ে ওর নাম দেখলাম কৃষ্ণকলি মজুমদার। ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটবাড়িতে আগুন লাগিয়ে রাস্তায় নেমে চিৎকার করছিলেন...'

– 'নিজের বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল? কোন অ্যাক্সিডেন্টও তো হতে পারে? এখন কি পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে?'

– 'পুলিশের কাস্টডিতে থাকার পর এখন গভর্নমেন্টের একটা মেন্টাল অ্যাসাইলামে আছেন। কাগজের ঐ ছবি আর খবরটা পড়ে তোমাদের আত্মীয়রা সব জানতে পেরেছে। সুব্রতদার সঙ্গে অপুও পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিল। সেখানেও এক অশান্তি।ওদের দেখে চোর, জোচ্চর বলে গালাগালি দিতে শুরু করলে ঘটনাটা পুলিশ স্টেশনে এক্সপ্লেইন করে অপুরা ফিরে এসেছে। তুমি চাইলে ওদের ফোন করতে পারো। তবে আমার মনে হয় তোমাদের কিছু করার নেই। এখন অন্তত ওঁর ট্রীটমেন্ট হবে। আজকের কাগজে পড়লাম উনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন – বাড়িতে কারেন্ট ছিলনা। অন্ধকারের মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জানালার পর্দায় আগুন ধরে গিয়েছিল। আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যেতে আরস্তায় বেরিয়ে পাড়ার লোকেদের ডাকছিলেন।'

সুদেষ্ণা সেল ফোনে নতুন, পুরনো খবরগুলো পড়ল। ছবিতে দেখানো ছোড়দির পরণে সেমিজের মতো একটা আধময়লা হাতকাটা নাইটি। সাদা দড়ির মতো চুল কাঁধের ওপর নেমে এসেছে। মুখের ভেতর দু' তিনটে দাঁত নেই। দু'গালের হাড় উঁচু হয়ে গেছে। এত রোগা তো কখনো ছিলনা। দু' চোখে ভয়ার্ত জান্তব দৃষ্টি। যেন দুর্ভিক্ষের ছবি থেকে এক অভুক্ত মানুষ উঠে এসেছে।

অসীমের ডাকে সুদেষ্ণার খেয়াল হলো ওর ডাক্তারকে ফোন করতে হবে। তারপর সারাদিন কেটে যাওয়ার পরে ভেবেছিল একবার কলকাতায় অপুকে ফোন করবে।

অনেক রাত হয়ে গেল। এর মধ্যে কাগজে অনলাইনে আরো খবর আসছে। রিপোর্টারদের দু' চারজনের বোধহয় এখন এটাই কারেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট। ঢাকুরিয়ার স্পট থেকে পুলিশ স্টেশন হয়ে এক তথাকথিত পাগলিবুড়ির পেছন পেছন উন্মাদ আশ্রমে যাওয়া। একবার তার ইন্টারভিউ নেওয়া। একবার তার ফ্ল্যাটের লোকজন আর কেয়ারটেকারের ইনটারভিউ নেওয়া। নিকট আত্মীয়তার অপরাধে ছোড়দা, অপু, ছোটকাকীমা, সোনালী সবাইকে ছোড়দির ইতিহাস বলতে হচ্ছে। সবশেষ খবর হচ্ছে ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটবাড়ির সহ-বাসিন্দারা 'কৃষ্ণকলি মজুমদারের' নামে 'ইচ্ছাকৃত অগ্নিসংযোগের' অপরাধে থানায় ডায়রি করেছে।

এই সব খবর পড়তে পড়তে সুদেষ্ণা নিজের মনকে প্রবোধ দিয়েছে – পাগল হয়ে বেঁচে থাকাটাও মানুষের ডেস্টিনি। ছোড়দির দুরবস্থার জন্য ওদের কোন অপরাধবোধ থাকার কথা নয়। অমৃতা সেদিন হঠাৎ বলল – 'লাস্ট টাইম যেদিন মাসী কল করেছিল, কেন বারবার আগুনের কথা বলছিল মা? ওর ফ্ল্যাটেও ক্যান্ডল থেকে আগুন ধরে গেলো। স্ট্রেঞ্জ!'

সুদেষ্ণা মেয়েকে বলতে পারেনি ছোড়দি কেন আগুনের ভয় দেখাতো। কেন ছোটবেলায় এক দেওয়ালির রাতে ওর গায়ে জ্বলন্ত রঙ মশাল ছুঁড়ে দিয়েছিল। সে রাতে ছাদে মেজদা, পিসিমণিরা না থাকলে সুদেষ্ণা জ্বলন্ত ফ্রকশুদ্ধ পুড়ে মরতো। ঈর্ষার আগুনে পুড়ে কীভাবে একজন সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করতে চায়, অমৃতা সে মানুষকে দেখেনি। ওর সেই ভয়াবহ শৈশব স্মৃতি নেই৷

সুদেষ্ণা সপ্তাহখানেক পর সুস্থ হয়ে উঠল। শুধু কাশিটা যাচ্ছেনা। দিনের বেলা থাকেনা, রাত হলেই কাশি বাড়ে। একে পোস্ট-নেজাল ড্রিপ এর সমস্যা, তার সঙ্গে কাশির জ্বালায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে। তখন অসীমেরও ঘুম ভেঙ্গে যায়। 'আলো জ্বেলে জল খাও, কাফ মেডিসিন খাও,' বলতে বলতে ওর ঘুমটাও চলে যায়। আজ জোর করে সুদেষ্ণা অসীমকে গেস্টরুমে শুতে পাঠিয়েছে। বই পড়তে পড়তে এক সময় ঘুম এলো। স্বপ্নের মধ্যে হিজিবিজি মুখ। কেমন একটা দমবন্ধ হওয়ার মতো কষ্ট নিয়ে সুদেষ্ণা জেগে উঠল। কাশতে কাশতে বমি উঠে আসার তাড়নায় অন্ধকারের মধ্যে বাথরুমে গিয়ে সিঙ্কের কাছে দাঁড়াতেই সামনের আয়নায় নিজেকে দেখতে পেল। অন্ধকার বাথরুমে বাগানের অস্পষ্ট আলো পড়েছে। আধো ঘুমে, আধো অন্ধকারে সুদেষ্ণা দেখছিল তার অবিন্যস্ত সাদা-কালো চুলে বোঝা কাঁধের দু'পাশ দিয়ে ছড়িয়ে আছে। জ্বরক্লান্ত বিবর্ণ মুখে শুধু জ্বলজ্বল করছে তার দুই চোখ, যেখানে নীলচে সবুজ আলো এসে পড়ছে। কাজলশূন্য এক ভয়ঙ্কর অপ্রাকৃত দৃষ্টির প্রতিচ্ছবির মায়া দর্পণের সামনে অসহায় সুদেষ্ণা দু'হাতে চোখ ঢাকল।

ওয়েইন, নিউ জার্সি, যুক্তরাষ্ট্র

এশরার লতিফ

যাত্রা

রুমানা যখন ঢাকা যেতে চাইলো, আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম,

- এখন ঢাকা যাওয়া কি ঠিক হবে?

রুমানা আয়নায় তাকিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জিজ্ঞেস করল,

- কেন? এখন গেলে সমস্যা কী?

আমি বললাম,

- চায়না আর ইতালিতে কোভিডে প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে। যেভাবে রোগটা ছড়াচ্ছে, কিছুদিন পরই বাংলাদেশে চলে আসবে।

রুমানা বললো,

- সে জন্যই তো আগে আগেই ঘুরে আসতে চাইছি। আব্বুর যে অবস্থা, পরে কিছু একটা হলে তো যেতেও পারব না, দেখতেও পারব না। লায়লার মত সারা জীবন আফসোস করতে হবে।

লায়লা রুমার বান্ধবী। এই নরউইচ শহরেই থাকে। লায়লার বাবা যখন খুব অসুস্থ, লায়লার মা বললেন, এখন না এসে একবারে ডিসেম্বরে লম্বা ছুটি নিয়ে আয়। তখন গরমও কম থাকবে। কিন্তু লায়লার বাবা সে মাসেই হুট করে মারা গেলেন। সেই হিসেবে রুমানা ভুল বলেনি। আমার শ্বশুর সাহেবের বয়স হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে একবার মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে পড়েছিলেন। আবার কিছু হলে রুমানা আমাকেই দায়ী করবে। বললাম,

- বাচ্চাদের তো স্কুল খোলা, বিজনেসও এখন ব্যস্ত যাচ্ছে। তার মানে তোমাকে একাই যেতে হবে।

- সেটা আমিও ভেবেছি। কিন্তু কী করা?

- ক’দিন থাকতে চাও?

রুমানা বললো,

- এতদিন পর যাচ্ছি, অন্তত দু সপ্তাহ না থাকলে কীভাবে হয়?

রুমানা বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্টের ওয়েবসাইট ঘেঁটে মার্চ মাসের পনেরো তারিখে কাতার এয়ারওয়েজের একটা ভালো অফার পেল। একটাই সমস্যা হলো নির্দিষ্ট দিনে যেতে হবে এবং নির্দিষ্ট দিনে ফিরতে হবে, টিকেট বদলানো যাবে না। ডিলগুলোর এসব শর্ত থাকেই, কিছু করার নেই।

এর মাঝে আমিও আমার ব্যবসা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। নরউইচ শহরে ফুটবল ম্যাচ থাকায় অন্য শহর থকে ফুটবল ফ্যানরা এসে এখানে ভিড় জমিয়েছে। আমার টেইকঅ্যাওয়েতেও হুট করে কাস্টমার বেড়ে গেছে। অবস্থা এমন যে খাবার ডেলিভারির জন্য নতুন ড্রাইভার নিয়োগ দিতে হয়েছে।

পনেরোই মার্চ খুব ভোরবেলা দুটো বড় লাগেজ গাড়ির বুটে উঠিয়ে আমরা হিথ্রো এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলাম। গাড়িতে বসে রুমানা বারবার বলছিল আমি যেন শরীরের যত্ন নিই, শাম্মি যেন সকালে নাস্তা খেয়ে স্কুলে যায়। আমি বললাম,

- এতো চিন্তা করো না রুমা, একটু সমস্যা হলেও আমরা মানিয়ে নেবো।

আমাদেরকে নিয়ে রুমানা উদ্বেগ দেখালেও দেশে যাবে বলে ওর চোখেমুখে আনন্দ ছলকে উঠছিল। সংসার করে করে এক ধরনের অভ্যস্ততা চলে আসে । অনেক দিন হয়ে গেছে আমি রুমানাকে ভালো করে দেখি না। আজ ওর দিকে ভালো করে তাকালাম। খুব সুন্দর লাগছিল রুমানাকে । দুদিন আগে ও পার্লারে গিয়ে চুল কেটেছে, ভ্রু প্লাক করেছে, মাসখানেক ধরে এক্সারসাইজ করে মেদ ঝরিয়েছে। ভালোই হয়েছে, না হলে শ্বশুর- শাশুড়ি ভাববেন বিদেশে খাটতে খাটতে মেয়ের জান কাহিল।

ছুটির দিনের সকাল বলে মোটরওয়েতে কোন ট্রাফিক ছিল না। সকাল আটটার দিকে আমরা হিথ্রো টার্মিনাল থ্রিতে পৌঁছুলাম। ফ্লাইট আরও দু ঘন্টা পর। চেক- ইনে লাগেজ দিয়ে রুমানা বোর্ডিং পাস নিয়ে এলো। হাতে কিছু সময় আছে দেখে আমরা কোস্টা কফিশপে ঢুকলাম। আমি আর রুমানা কাপুচিনো নিলাম, শাম্মির জন্য চকলেট ড্রিংক। রুমানা খুব আত্মমগ্ন ছিল, অনেকদিন পর বাবামাকে দেখতে যাবার আবেগটাই আলাদা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি চেক- ইনে ভিড় জমছে। লাইন আরও লম্বা হবার আগেই রুমানা ডিপারচার গেটের দিকে রওনা হলো। গেটের কাছে গিয়ে রুমানা একবার পেছন ফিরে তাকালো। বুকের ভেতর কেমন একটা হাহাকার উঠলো, কতগুলো কষ্টের ঢেউ উঠে আবার মিলিয়ে গেলো। আমি রুমানার চলে যাওয়া দেখলাম। আধঘন্টা পর রুমানা ফোন করে জানাল ও বিমানে বোর্ডিং করেছে। আমরা গাড়ি নিয়ে রওনা দিলাম আমাদের শূন্য বাড়ির দিকে।

ঢাকায় পৌঁছেই রুমানা এয়ারপোর্ট থেকেই ফোন করল। কানেক্টিং ফ্লাইট দেরিতে আসায় কাতার এয়ারপোর্টে এক ঘন্টা ডিলে ছিল। ঢাকার আবার আজ ঝড়ো বাতাস। বিমান হাল্কা ঝাঁকি খেয়েছে কিন্তু এয়ারপোর্টে ঠিকমতো নেমেছে। কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে বললাম,

- এখন সাবধানে থেকো। ঢাকায় কিন্তু চুরি ডাকাতি বেড়ে গেছে। মোবাইল দেখে শুনে রেখ।

রুমানা হেসে বললো,

- এখন ঢাকার সবার হাতেই স্মার্ট ফোন, আমার ফোন কে নেবে? কিন্তু ট্রাফিক জ্যাম খুব বেশি। এই যে আমাদের মাইক্রোবাস এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই জ্যামে পড়েছে।

আমিও রুমানার কণ্ঠ ভেদ করে যানবাহনের হর্ন শুনতে পেলাম।

সেদিন রুমানার বাসায় পৌঁছুতে তিনঘন্টা লেগেছিল অথচ ট্রাফিক জ্যাম না থাকলে লালমাটিয়া পৌঁছানো আধঘন্টার ব্যাপার। পরদিন ভোরে ওদেরকে ফোন করে জানলাম জেট ল্যাগের কারণে রুমানার সারারাত ঘুম হয়নি, এখনো ঘুমের আমেজে আছে। আমি আর বিরক্ত না করে ফোন রেখে শাম্মিকে স্কুলে নামিয়ে দিতে গেলাম। সন্ধ্যায় আবার ফোন করলাম। রুমানা বললো ওদের ওখানে কাজিনদের বিরাট আড্ডা বসেছে। ওদিকে আমার শ্বশুর সাহেবও নাকি রুমানা আসায় চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। রুমানার ইলিশ মাছ পছন্দ, তাই বাজার থেকে ডিমওয়ালা ইলিশ এনে ডিপ ফ্রিজ ভরে ফেলেছেন।

যত দিন গেল রুমানা আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই বাড়ি সেই বাড়িতে দাওয়াত লেগেই আছে, না গেলে আত্মীয়স্বজনরা মনোক্ষুণ্ণ হবে। এর মাঝে একদিন ভাইবারে কল করে জানাল সেও সব আত্মীয়দের একটা বাফেতে দাওয়াত করে খাওয়াতে চায়, বাড়িতে ডাকলে মায়ের উপর বাড়তি চাপ পড়বে। আমি বললাম,

- সেটাই ভালো, কিছু খরচ হলেও একবারে সবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাবার শরীর কেমন এখন?

- দেখে তো ভালোই লাগছে। ঘুরছে, ফিরছে, আনন্দ করছে। তবে একবার ইন্ডিয়া গিয়ে দেবি শেঠির হাসপাতালে দেখিয়ে আনলে ভালো হতো।

- হুম, দেখো যেটা ভালো হয় কর।

রুমানার সঙ্গে কথা শেষে মনে হলো দেশে গেলে সবাই মিলেই যাওয়া ভালো, দু ভাগ হয়ে দু দেশে থাকলে টেনশন বাড়ে। আমাদের বাড়ির ভেতরে রুমানার শূন্যতা দিন দিন বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। রুমানা জোরে কথা বলতে ভালোবাসে, ও নেই বলে বাড়িতে এখন ভুতুড়ে নীরবতা। প্রায় দুপুরেই রুমানা টুকটাক রান্না করতো, কারণ ও ফ্রেশ খাবার পছন্দ করে। রুমানা থাকলে এশিয়ান তরকারীর গন্ধে বাড়ির সামনের রাস্তা মৌ মৌ করতো, পাশের বাসার জেমস দম্পতি পথে দেখা হলে জিজ্ঞেস করত, আজ কী কারি রান্না করেছ তোমরা? খাবারের ঝামেলা আমি আপাতত টেইকঅ্যাওয়ের উপর দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া রুমানাও কিছু রেঁধে ফ্রিজারে রেখে গেছে। শনিবার রাতে আমি আর রুমানা সোফায় বসে নেটফ্লিক্সে মুভি দেখতাম। এই শনিবার সেটা মিস করলাম। আর সবচেয়ে নিঃসঙ্গ বোধ করলাম রাতে বিছানায় শুয়ে। আর কিছু না, পাশের একজন মানুষের শরীরে উষ্ণতা থাকলে রাতের নিঃসঙ্গতা আর মৃত্যুচিন্তা অনেকটা ঘুচে যায়। আজ রাতে বিছানায় শুয়ে আমার প্রচণ্ড একা লাগছে, মনে হচ্ছে ঘুমুলে আবার জেগে উঠব তো?

এদিকে নরউইচে হঠাৎ করেই বরফ পড়া আরম্ভ করেছে। আজ ভোরে এত বরফ পড়েছিল যে শাম্মিকে স্কুলেই দিতে পারলাম না। আমেরিকায় যেমন ওরা বরফ পড়ায় অভ্যস্ত, বরফ পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে বরফ সরানোর গাড়ি এসে রাস্তা পরিষ্কার করে ফেলে, ইংল্যান্ডে তেমন না। তার উপর আমার গাড়িটাও শীতে বিগড়ে গেল, বাধ্য হয়ে রিকভারি কল করতে হয়েছিল। ওরা এসে বললো ব্যাটারি পাল্টাতে হবে, গাড়ির টায়ার বদলে উইন্টার টায়ার লাগালে আরও ভালো। সব মিলিয়ে তিন চারশ পাউন্ড গচ্চা গেলো।

ভাগ্য ভালো যে দু সপ্তাহ অত লম্বা সময় না। ব্যবসা আর শাম্মিকে নিয়ে ব্যস্ততায় আমার সময় দ্রতই কেটে গেল। মার্চ মাসের ত্রিশ তারিখ আসতে এখন মাত্র দু দিন বাকি। রুমানার রিটার্ন ফ্লাইট গ্যাটউইক এয়ারপোর্টে, রাত একটায় ফ্লাইট ল্যান্ড করবে। অত রাতে গ্যাটউইকে তেমন ভিড় হবে বলে মনে হয় না, ইমিগ্রেশনে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে। তার মানে আমাদেরকে রাত সাড়ে বারোটার ভেতর ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করলেই হবে। সমস্যা একটাই, নরউইচ থেকে কোন হাইওয়ে বা মোটরওয়ে নেই যে গাড়ি নিয়ে নেমেই টান মারব। নরউইচ থেকে বেরিয়ে একটা ছোট রাস্তা দিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল চালিয়ে এম ইলেভেন মোটরওয়েতে পৌঁছুতে হবে। এম ইলেভেন থেকে এম টুয়েন্টিওয়ান ধরে আরও ঘন্টাখানেক দক্ষিণে চালিয়ে গ্যাটউইকে পৌঁছুব। কিন্তু এই হারে বরফ পড়লে রাতে গাড়ি চালিয়ে গ্যাটউইক যাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। এদিকে রুমানার অভাবে এ ক'দিনে বাড়িটা ব্যাচেলর হাউজের মত হয়ে গেছে। তিনদিন ধরে মেয়েকে নিয়ে সব কিছু ঝেরেঝুরে সাফসুতরো করলাম, বিছানার চাদর আর বালিশের কভার ওয়াশিং মেশিনে ধুলাম, কিছু তরকারি রেঁধে ফ্রিজে রেখে দিলাম।

উনত্রিশ তারিখে ভোর সকালে ঢাকা থেকে ফোন এলো। রুমানার বান্ধবী রোকেয়া ফোন করেছে। অবাক হয়ে বললাম,

- কী ব্যাপার রোকেয়া এত ভোরে, কিছু হয়েছে নাকি?

রোকেয়া শুকনো গলায় বলল,

- জি ভাইয়া।

- বাবার কিছু হয়েছে? রুমানা কোথায়?

- বলছি ভাইয়া, আপনি মন শক্ত করেন।

- বাবা কি বেঁচে আছেন?

- জি ভাইয়া।

রোকেয়ার কথা শুনেই বুঝতে পারছি বাবার কিছু একটা হয়েছে, হয়তো সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক। রুমানাকে পাঠিয়ে ভালোই করেছি। আমারও যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু কীভাবে যেতাম? বললাম,

- আমাকে আসতে হবে মনে হচ্ছে, কার হাতে যে কাজ গুছিয়ে যাব বুঝতে পারছি না।

- কিন্তু ভাইয়া আপনাকে আসতেই হবে। আর কেউ দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে না।

- বুঝিনি, কীসের দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে না?

- আপনি তো জানেন রুমানার আব্বা কত কনজারভেটিভ।

- হুম।

- আঙ্কেল বলেছেন এরকম অন্যায়ের পর উনি লাশ নেবেন না।

- আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না রোকেয়া, বাবা তো বেঁচেই আছেন। মা'র কিছু হয়েছে? উনি কি বেঁচে নেই? হাসপাতাল টাকার জন্য আটকে রেখেছে?

- রুমানার লাশ ভাইয়া।

- রুমানার লাশ মানে? কী বলছ তুমি উল্টাপাল্টা?

- স্যরি ভাইয়া, আমি জানতাম না আপনি এখনো শোনেননি।

- কী শুনিনি? পুরো কথা একসঙ্গে বলছো না কেন?

- কাল ঢাকা থেকে ব্যাংকক এয়ারপোর্টে নামার সময় ইজি এয়ারের যে প্লেইন ক্র্যাশ করেছে ওটাতে রুমানা ছিল।

রোকেয়ার কথায় আমি যেন ওই বিমানটার মতই আকাশ ভেঙ্গে পড়লাম। বললাম,

- ঢাকা থেকে ব্যাংককের প্লেনে রুমানা থাকবে কেন? বাবাকে চেকআপে নিচ্ছিল নাকি?

- ভাইয়া, রুমানা ওই প্লেনে ছিল। রুমানা আর জাভেদ ভাই দুজনেই মারা গেছে। বিমানের অফিস থেকে জানিয়েছে।

- জাভেদ মানে? কোন জাভেদ? যেই ছেলেটার সঙ্গে ওর ইউনভার্সিটি লাইফে প্রেম ছিল?

- জি ভাইয়া।

- রুমানা আরে জাভেদ একসঙ্গে থাইল্যান্ড যাচ্ছিল?

- জি ভাইয়া, আমি জানতাম না এসবের কিছুই। কিন্তু...

আমার মনের ভেতরে একটা পাহাড়ি ধ্বস নেমেছে, বললাম,

- কিন্তু কী?

- ও আমার বাসায় রাতে থাকবে বলে ওদের ওখান থেকে বেরিয়েছিল। গতকাল ভোরে আমার বাসায় এসে কিছুক্ষণ থেকেই চলে গিয়েছিল। আমি জানতাম না ও জাভেদের সঙ্গে ব্যাংকক যাবে।

আমার চোখে দিয়ে তখন পানি ঝরছে। মিনিট তিনেক স্তব্ধ হয়ে রইলাম। রোকেয়া ওপাশ থেকে বলল,

- ভাইয়া, আছেন?

এতগুলো বছর রুমানা ওর সংসারের দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছে। কোথাও কোন খুঁত রাখেনি। আমি জানি আমাকে বিয়ে করেছিল ওর রক্ষণশীল পরিবারের চাপে। কিন্তু ওর মনের একটা জায়গা হয়তো শূন্য ছিল যা আমি কখন পূরণ করতে পারিনি, হয়তো জাভেদকেই সে আজীবন ভালোবেসেছে। ভালোবাসা থেকে যে বাসনার জন্ম হয় রুমানা হয়তো মুহূর্তের জন্য সেই বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু তাই বলে রুমানাকে আমি সবার কাছে ছোট হতে দিতে পারি না। আর্দ্র কণ্ঠে বললাম,

- তুমি অত ভেবনা রোকেয়া, আমি আর শাম্মি নেক্সট অ্যাভেইলেবল ফ্লাইটে আসছি। রুমানা ডিজার্ভ্স্ অ্যা ডিসেন্ট ব্যারিয়াল।

আমি ফোন রেখে পাশের ঘরে গেলাম। শাম্মি লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। কাল মা আসবে এই আনন্দে ওর মুখে একটা মৃদু হাসির রেখা।

কার্ডিফ, যুক্তরাজ্য

কানিজ পর্ণা

অগস্ত্য যাত্রা

রুম্পা একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের সম্মান শেষ বর্ষের ছাত্রী।
রুম্পার সাথে সাইমের পরিচয় ঘটে বন্ধুদের মাধ্যমে।
রুম্পার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বন্ধু হচ্ছে সাইম।
সাইম ও রূম্পা খুব দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে।
কিন্তু সম্পর্কের প্রায় এক বছরের মাথায় রুম্পা আর সাইমের বিচ্ছেদ ঘটে।
তারপর থেকে এপর্যন্ত তাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ অথবা কথাবার্তা হয়নি।
কিন্তু রুম্পার আজ সাইমকে ফোন দিতেই হবে। তার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ আছে সাইমের সাথে।
রিং হচ্ছে ...
- হ্যালো?
- নম্বরটা এখনো বদলাও নাই দেখছি।
ঘুম ঘুম জড়ানো কণ্ঠে সাইম জিজ্ঞাসা করলো, 'কে বলছেন?'
- এত্ত তাড়াতাড়ি গলার স্বরটা ভুলে গেলা সাইম? আমি রুম্পা...
সাইম কিছুটা বিস্মিত কণ্ঠে, 'কে?'
- রুম্পা বলছি
'রুম্পা?' একটু ঝাঁঝের সাথেই সাইম বলে উঠলো,
- হঠাৎ কি মনে করে?
রুম্পা কণ্ঠে আরো মাধুর্য্ ঢেলে, 'কেন? সম্পর্ক নাই এজন্য কি কথাও বলতে পারিনা আমরা?'
- এটা কার নাম্বার?
- আমি যখন কথা বলছি- আমার নাম্বার। সেভ করে রাখ।
- আচ্ছা, কি বলতে চাও বলো..

রুম্পা কিছুক্ষণ খেজুরে আলাপ করে সেদিনকার মতো ফোন রেখে দিল। ও এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন সে সব ভুলে শুধুই বন্ধু হয়ে থাকতে চায়। এক কথায় শুভাকাঙ্খী বন্ধু।
সপ্তাহ দু'এক ভালোই কথাবার্তা চলতে থাকে তাদের মাঝে। ঐ যে আছে না- কথায় কথা বাড়ে।
সাইমও নানান কথা বলে।তার বর্তমান প্রেমের রাগ-অনুরাগের কথাও বাদ যায় না। প্রায় এক মাসের মাথায় রুম্পা সাইমকে দেখা করতে বলে এক রেস্তোরাতে। সাইম কারণ জানতে চায়।
রুম্পা বলে, 'এসো, তবেই না জানবে।'
সাইম রুম্পার সাথে সম্পর্ক থাকা অবস্থাতেই তার ছাত্রী শিউলির সাথে সম্পর্কে জড়ায়। প্রথমে সাইম অস্বীকার করলেও, পরে হাতেনাতে রুম্পার কাছে ধরা পড়ে যায়। সে শিউলিকেই বেছে নেয়।
রুম্পা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কয়েকবার আত্মহননের চেষ্টা করলে তার বাপ-মা তাকে কাউন্সেলিং-এ পাঠায়। এখন সে মোটামুটি সুস্থ।
সাইম নির্ধারিত সময়ের পয়ত্রিশ মিনিট দেরীতে উপস্থিত হলো।
'তোমার তো দেখি সেই আগের অভ্যাস এখনও আছে,' রুম্পা সামান্য একটু হেসে কথাটা বলল।
রুম্পার এই স্মিত হাসিটা মারাত্মক।
মনটা যেন কেমন খচখচ করে উঠে সাইমের। রুম্পা একটা ফ্লেম কমলা রঙের শাড়ি পরেছে। সাথে গতানুগতিক ম্যাচিং টিপ, কন্ট্রাস্ট চুড়ি।
চুলগুলো পরিপাটি করে সাধারণ খোঁপা। খোঁপায় শোভা পাচ্ছে অশোক। তাকে দেখতে অগ্নিসুন্দরী লাগছে। দুপুরের এই জ্বলজ্বলে রোদে সাইমের পতঙ্গ হতে ইচ্ছা করছে। আগুনের রূপ দেখে পতঙ্গের যেমন অগ্নিদাহ হয় অনেকটা তেমন অবস্থা সাইমের।
- তুমিতো আগের চেয়েও আরো সুন্দরী হয়ে গেছ।
- তাই? চল ভিতরে কেবিনে বসি। খেতে খেতে কথা বলি।
বলে রুম্পা ভিতরে ঢুকলো, পেছনে পেছনে সাইম।
এরপর দু'দিন তাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি। দু'দিন অপেক্ষা করে রুম্পা সাইমের ফেসবুকে ঢুকলো। হ্যা, সে সফল। হ্যা, সে পেরেছে।নির্বিঘ্নে সাইমের মতো বড় প্রতারককে শাস্তি দিতে পেরেছে রুম্পা।
বন্ধু বলয়ের ফেসবুক আর কমেন্টস থেকে রুম্পা যা জানতে পারল তার মর্মার্থটা এমন। প্রচণ্ড গরমে রাজধানীর এক লোকাল বাসে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সাইমের অকাল মৃত্যু।
আবার সেই ভয়ংকর সুন্দর হাসির রেখাটা তার মুখে ফুটে উঠলো।
সে অনেক সময় নিয়ে নিজের হাতে বিষটা তৈরি করছিলো।

সাইম হাত দিয়ে খেতে পছন্দ করে চামচ-কাটাচামচের চেয়ে। রুম্পা জানতো সাইম হাত ধুতে কেবিনের বাইরে যাবে।
এই সুযোগে রুম্পা সাইমের সফ্ট ড্রিংকে বিষটা মিশিয়ে দিয়েছিলো।
এই রেস্তোরায় গ্লাসে ঢেলে পানীয় পরিবেশন করে রুম্পা এটা জানতো। আর ব্যাগে তার চামচ ছিল বিষটা গুলানোর জন্য।

রুম্পা আজ ভার্সিটি যাবে না।
কফি বানিয়ে মাকে বলল, ‘মা আমাকে দুপুরে ডেকো না খেতে। তোমরা খেয়ে নিও। আমি কফি খেয়েই ঘুমাব। দু’দিন ঘুম হয় নাই।
‘কফি খেয়ে ঘুমাবি।মানে?’ বাজখাই গলায় মায়ের প্রশ্ন।
- মা প্লিজ, তুমি বুঝবা না। কিন্তু আমাকে ডেকো না কেমন?
কফি হাতে চলে যেতে যেতে হঠাৎ রন্ধনরত অবস্থায় মাকে জড়িয়ে ধরে রুম্পা বলে উঠল, ‘মা, তোমাকে অনেক অ-নে-ক ভালোবাসি। তুমি রাগ করো না, হ্যাঁ?
- এই ছাড় ছাড়, মশলা পুড়ে যাবে।
সেই মায়াবী হাসি হেসে রুম্পা চলে গেল ঘুমাতে তার কফি, মগ আর একটা চামচ হাতে নিয়ে।

ডেনভার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

কেয়া ওয়াহিদ

চিরকুটে জলের হরফ

চিরকিশোরী নায়াগ্রা জলপ্রপাত আর ঝিরঝির তুষারের রূপালি দেশ কানাডা। মিতুল ও তন্ময়, ঢাকা মেডিকেল থেকে সদ্য পাশ করা ডাক্তার দম্পতি, উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডা আসে। অনেকের মত তারাও আর দেশে ফিরে যায়নি। সমৃদ্ধ, নিরাপদ, বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ ছেড়ে কে-ই বা যেতে চায়? আমরা জানি, বসবাসের জন্য বিশ্বে শান্তিপূর্ণ দেশের মধ্যে কানাডা অন্যতম। মিতুলের বড়বোন পুতুলও পিএইচডি করতে এসে ক্যালিফোর্নিয়ায় থেকে গিয়েছে। তাদের বাবা নিজামুদ্দিন তালুকদার এবং মা রেহানা বেগম একাই দেশে থাকেন কন্যাদের সুখস্বপ্নের গর্ব নিয়ে। প্রথম প্রথম তাঁরা মন খারাপ করলেও মেনে নিয়েছেন নিয়তি। আর এদিকে দুই মেয়ে অনেক চেষ্টা করেছে স্পনসর করে স্থায়ীভাবে তাঁদের নিয়ে আসার। নাহ, তাঁরা রাজি হননি। সাফ বলে দিয়েছেন, সব ছাড়লেও শেকড় ছাড়তে পারবেন না। মাটির মায়া, শেষ বিছানার মায়া ছেড়ে দূরদেশে যাবেন না।

যাইহোক, দীর্ঘসময় পার হলো এর মধ্যে। দুই মেয়ের ঘরে এসেছে চারজন নাতিপুতি। গতবছর তারা যখন ঢাকায় বেড়াতে যায়, তখনই শিশু বাচ্চারা মায়াকাঠি ছুঁয়ে দিয়েছে। অবশেষে বাবা মায়ের মনের পারদ গলতে শুরু করে। হাল না ছাড়া দুই কন্যার দীর্ঘদিনের সাধনার পর তাঁরা রাজি হলেন স্বল্প সময়ের জন্য আটলান্টিকের পারে দূরদেশে আসতে। প্রথমে তাঁরা পুতুলের কাছে যান ক্যালিফোর্নিয়াতে – ওখানে তিন মাস থাকার পর মিতুলের কাছে আসবেন। এই নিয়ে সারা উত্তর আমেরিকায় যেন ঈদ আনন্দ শুরু হয়েছে – ক্যালিফোর্নিয়া টু টরন্টো। ছোট্ট দুজন নাতি নাতনির কত কী প্ল্যান নানা নানুকে নিয়ে। শুরু হয় চিরকুট লেখা। প্রতিদিন চিরকুটে লিখে লিখে ফ্রিজের দুই দরজা ঢেকে ফেলেছে টু ডু লিস্টে! জিসান এবং জয়ী, পাঁচ ও ছয় বছরের শিশু।

মে মাস থেকে টরন্টোতে ঠাণ্ডার তীব্রতা কমতে শুরু করে। তুষার গলা মৌসুমে রোদেলা আলো কেবলমাত্র যৌবনপ্রাপ্ত হচ্ছে। জেগে উঠছে লেক অন্টারিওর পাড়ঘেঁষা মেপল শিরিষ গাছ আর পাহাড়ি লতাফুল। লিলি, হাইড্রেনজা, রোজ, টিউলিপ মায়াঘেরা বাড়িতে থাকে মিতুল তন্ময়। ডাক্তার দম্পতির ব্যস্ত জীবন। তার উপর করোনাকালীন শঙ্কা ও কাজের চাপ। তবুও বাবা মা আসা উপলক্ষে দুইদিন ছুটি নেয় ওরা। কতদিন পর যেন নাড়ি ছেঁড়া নাড়ির দেখা মিলেছে! কতদিন পর বাবা মায়ের আহ্লাদ আদুরে

ছোঁয়া পেয়েছে! আত্মা আর রক্তের গাঢ় টান উপেক্ষা করার সাধ্য কার আছে! জিসান জয়ী ওদের নিয়মিত দুষ্টামি ছেড়ে এখন ব্যস্ত নানা নানুর প্রশ্রয়ী সান্নিধ্যে। প্রথম দিন থেকেই নানা নানুর ন্যাওটা হয়েছে। মারামারি ছেড়ে দুজনের মাঝে অনেকটা শান্তিচুক্তি বলা যায়। বাসায় শান্তি আসলেও প্রকৃতি এখনো অশান্ত। করোনার তীব্রতা দিন দিন বেড়ে চলছে। টরন্টোতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে প্রাদেশিক সরকার। স্কুল, ডে কেয়ারসহ সব নন-এসেনশিয়াল বিজনেসও বন্ধ। হঠাৎ করে যেন সবাই ঘরবন্দি হয়ে গেল। ডাক্তার দম্পতি ছুটল করোনার সাথে কঠিন যুদ্ধের সৈনিক হয়ে। বাবা মা আসাতে ভালোই হয়েছে। কাজে অতিরিক্ত সময় দিতে পারবে। এই মুহূর্তে ডাক্তাররাই একমাত্র ভরসা।

চিকিৎসা সেবা দিতে দিতে সাহসী ডাক্তার মিতুল একদিন জ্বর কাশি নিয়ে বাসায় ফিরে, এসেই রুমের দরজা বন্ধ করে নিজেকে গৃহবন্দি করে ফেলল। হাসপাতাল থেকে বাসায় ফেরার আগে টেস্ট দিয়ে এসেছিল। যা হওয়ার তাই হয়েছে – করোনা পজিটিভ। ডাক্তার তন্ময়েরও যাওয়া নিষেধ। খাওয়া দাওযা দরজার সামনে রেখে আসা হয়। বাচ্চাদের সাথে নিয়ম করে ভাইবারে দেখা, কথা হয়। মাকে দেখে বাচ্চারা প্রথমে উচ্ছ্বসিত হলেও ছুঁতে না পারার বেদনায় কেঁদে উঠে। তাদের কষ্ট দেখে বয়স্ক বাবা মা আরো অসহায় বোধ করে, সৃষ্টিকর্তার কাছে হাত তুলে মিনতি করে অশুভ এই জীবাণু থেকে মুক্তির।আবার শুরু হলো বাচ্চাদের নতুন করে চিরকুট লেখা। একেক রঙের নোটপ্যাডে একেক রকম আবদার লিখছে, মায়ের অবর্তমানে তাদের মনের দুঃসহ অবস্থার কথা লিখছে আঁকিবুকি দিয়ে, লিখেছে 'মা তুমি কবে ফিরবে?' আরো কত কী লিখে লিখে চিরকুট দিয়ে নিষিদ্ধ ঘরের দরজা ভরে ফেলেছে। মাঝেমধ্যে দরজার ওপাশ থেকে একটা দু'টা চিরকুট ভেতরে ঠেলে দেয় সেটা পড়ে মিতুল কান্নায় বুক ভাসায়। তবুও এক মুহূর্তের জন্য সে বাইরে আসেনা। কঠিন গৃহবন্দিত্ব। অবস্থা খারাপ হতে গেলে সাত দিনের মাথায় মিতুলকে হাসপাতালে শিফট করতে হয়। তখনও এই কঠিন জীবাণুকে শক্তভাবে মোকাবেলা করার মতো মানুষ তৈরি ছিলনা। পর্যাপ্ত পিপিই রোগ নিরোধক পোশাক ও ভেন্টিলেটর ছিলনা। তবুও হাসপাতালই একমাত্র আশ্রয় জীবন মরণের মাঝামাঝি এই মুহূর্তে।

ছোট্ট দুটো শিশু সন্তান – জিসান-জয়ী – এই প্রথম মাকে ছাড়া নানুকে জড়িয়ে ধরে রাতে ঘুমাচ্ছে; একটু পর পর ঘুমের মধ্যে 'মমিকে চাই' বলে কেঁদে উঠছে। নানা নানু দু'টো বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে নির্ভরতা দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কয়েকদিনের মধ্যে বাচ্চারা অভ্যস্ত হয়, নানা নানুর উষ্ণ মমতায় শান্তি খুঁজে পায়, কান্নাহীন ঘুমায় পরম নিশ্চিন্তে। বাইরে তুষার বর্ষণ – দরজা জানালা সব বন্ধ। তুষারবাহী বাতাসের ঝাপটা এসে পড়ছে জানালার কার্নিশে। মা রেহানা বেগম অতীতে ফিরে যান। টিনের চালে টাপুর টুপুর শব্দ। একবার বৃষ্টি আসে, আবার থেমে যায়। থেমে গেলেই শুরু হয় আরেক ভয়। মনে পড়ে সেই কালরাতের কথা, যখন দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে – পাক হানাদারের ভয়ে ঘুমের মধ্যেও কুঁকড়ে থাকা। আহা, ভাবনারা কোথা থেকে কোথায়

চলে যায়, অস্থির সীমানা পেরিয়ে। এই করোনাকালও যেন একটা যুদ্ধকাল, প্রকৃতির সাথে মানুষের এই যুদ্ধ। কবে শেষ হবে কেউ জানেনা। কবে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে সবই অনিশ্চিত, কেবল মৃত্যুটাই যেন নিশ্চিত। সারারাত ঘুমাতে পারেনা রেহানা বেগম এবং নিজামুদ্দিন। শান্তির খোঁজে শেষ রাতে তাহাজ্জুদে বসেন, আন্তরিক প্রার্থনায় সন্তানের আশু আরোগ্য চেয়ে বিধাতার কাছে আকুতি জানান।

মিতুলের অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। কবে বাসায় ফিরবে বলা যাচ্ছে না, আদৌ ফিরবে কিনা সেটাও অনিশ্চিত। অক্সিজেনের সেচুরেশন লেভেলও ঠিক থাকছে না। ইতিমধ্যে জিসান-জয়ী ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মাকে দেখতে যাওয়ার জন্য। তন্ময় ও তাদের নানা-নানু কেউ সামাল দিতে পারছে না। তাদের কান্নাকাটি দেখে তন্ময় তাদেরকে আশ্বস্ত করল। এই সময়টায় ডাক্তার, নার্স, পেশেন্ট ছাড়া হাসপাতালে কোন দর্শনার্থী যাওয়া নিষেধ। একই হাসপাতালের ডাক্তার হওয়াতে তন্ময় বিশেষ অনুমতি নিয়েছে বাচ্চাদেরকে একটু হাসপাতালে মাকে দেখতে আসার। সরাসরি দেখা করা নিষেধ। শর্তানুযায়ী তন্ময় সবাইকে নিয়ে ভিজিটর্স রুমে অপেক্ষা করছে। দেয়ালে ঝুলানত টিভির বড় স্ক্রিনে ভিডিও কনফারেন্স হবে মিতুলের সাথে।

কাঙ্ক্ষিত সময়ে মিতুলের ছবি ভেসে ওঠে টিভির পর্দায়। বাচ্চারা মাকে দেখে উচ্ছ্বসিত; তাদের গল্প আর থামেনা বাচ্চারা কী কী সব বলছে একের পর এক, বার বার হাত উঁচিয়ে দিচ্ছে মাকে ছোঁয়ার জন্য। মিতুলের চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে, মুখে অক্সিজেনের মাস্ক। শুধু দুই আঙুল উঠিয়ে ভিক্টরি সাইন দেখাচ্ছে। হঠাৎ মাস্ক খুলে বলল, 'কিডস, উই শ্যাল ওভারকাম।' ব্যস, আবার মুখে মাস্ক পরে নিল, ভেতরে ঠোঁট নড়ছে। কী এক জাদুমন্ত্রে জিসান-জয়ী চিৎকার করে গাইতে শুরু করলো 'উই শ্যাল ওভারকাম'। তারপর তন্ময়সহ বাবা-মাও মিনমিন করে গাইতে শুরু করল এবার আশেপাশের ডাক্তার নার্সরা গাইতে শুরু করল। হঠাৎ করে হাসপাতালের মাইকে ঘোষণা, 'ডাক্তার মিতুলকে শ্রদ্ধা দেখাতে আমরা এক মিনিট সময় দিতে চাই।' সাথে সাথে স্পিকারসহ সবাই যে যার অবস্থান থেকে পুরো হাসপাতাল জুড়ে মৃদুকণ্ঠে গেয়ে উঠলো।'উই শ্যাল ওভারকাম।'

গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত। আশা-হতাশার ভাবনা নিয়ে পাঠক বাড়ি যেতে পারত। কিন্তু ক্ষণকাল যে মহাকালের সাক্ষী, গল্প শেষ হলেও করোনাতো শেষ হয়নি।

মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন গেল। দুর্বৃত্ত করোনার জীবাণুতে সারা পৃথিবী আক্রান্ত। ইতিমধ্যে অগুণতি মানুষ মারা গেছে চায়না, ইতালি, ইংল্যান্ড, আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশে। কানাডায় তুলনামূলক কম হলেও মৃতের সংখ্যায় তারাও শঙ্কিত। বিশেষ করে বৃদ্ধাশ্রমের অনেক মানুষ মারা যাচ্ছেন প্রতিদিন। অনেকে বাবা মা হারাচ্ছেন। বন্ধু স্বজন হারাচ্ছেন। আবার পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ কানাডা। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর পরিকল্পিত ও সমৃদ্ধ ব্যবস্থাপনা সারাবিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। তিনি দেশের নাগরিকদের প্রতি দূরদর্শিতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দেখিয়েছেন।

তবুও ব্যক্তিগত দুর্ভোগ যার যার তার তার। দীর্ঘমেয়াদে গৃহবন্দি থাকার কুফল সবাইকে ছুঁয়েছে কমবেশি। মানসিক রোগ বেড়েছে। স্ট্রেস ডিজঅর্ডার, ডিপ্রেশন, এংজাইটি অবিশ্বাস্য হারে বেড়েছে। কঠিন সত্য হল করোনাকালে সর্বোচ্চ সংখ্যক আত্মহত্যা হয়েছে কানাডায়। এমন দুর্বিসহ সময়ের জন্য এই বিশ্ব তৈরি ছিলনা, তৈরি ছিলনা কোনো মানুষ।

স্বস্তির বিষয় হলো বারবার টেস্ট করে করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়ে মিতুল বাসায় ফিরেছে। শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়লেও মনের সাথে যুদ্ধ চলছিল নিয়মিত। আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে নিজ পায়ে ভর দিয়ে – সে যে ডাক্তার, মানবতার পয়গম্বর। তাঁকে কী বাসায় থাকলে চলে? ফিরে গেল নিজ পেশায়। কাজে ফেরার আগের দিন বাবা অপরাধীর মত মেয়ের পাশে গিয়ে বসেন। অসহায় কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'মা রে, আমার ইচ্ছায় তুই ডাক্তার হয়েছিস, নিজেকে আজ অপরাধী মনে হচ্ছে।নিজ হাতে তোকে আমি ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছি, আমায় ক্ষমা করিস।'

মিতুল মৃদু হেসে বললো, 'কী যে বলো বাবা! ইউ শুড ফিল প্রাউড ইন্সটেড। আর হ্যাঁ, আমি কিন্তু তন্ময়কে এর মধ্যে বলেছি, জিসান-জয়ীও যেন ডাক্তার হয়। এই জনবহুল পৃথিবী আরো ডাক্তার চায়।' এই বলে বাবাকে আরো সাহস দেয়, বাবার পিঠে নরম হাত বুলিয়ে দেয়।

দেখতে দেখতে প্রকৃতি থেকে শীত বিদায় নিয়েছে, এবছর বসন্তবরণের কোন আয়োজন ছিল না। জনমানবহীন প্রকৃতি একাই সেজে এসেছে। বাসাবাড়ি থেকে সবাই বারান্দা কিংবা জানালার গ্রিল ধরে দেখেছে শুধু। স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন ফুলেল সুবাসিত প্রকৃতি। জিসান-জয়ী যখন বাইরে যাবার জন্য বায়না করেছে, তাদের থামাতে নানা নানু নিজ হাতে ডিভাইস তুলে দিয়েছেন। অনুশোচনা অনুতাপও করেছেন মনে মনে, কচি মনের বাচ্চাদের এভাবে প্রযুক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন বলে। এই বন্দিত্বে আর কীইবা করার ছিল! বাচ্চাদের জ্বালা যন্ত্রণা কমাতে গিয়ে তাঁরাও যেন একা হয়ে গেলেন একই ছাদের নিচে।

বাসায় বিভিন্ন বয়সী তিন প্রজন্মের তিন জোড়া মানুষ। মাঝবয়সী যুগল ব্যস্ত পেশা নিয়ে। এই করোনাকালে অনেকেই বাসায় থেকে কাজ করছে, অনেকেই কর্মবিরতি নিয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে। মিতুল তন্ময় কোনোটাই করতে পারেনি, ইচ্ছা করলেও এই মানবিক কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেনি। সপ্তাহে পাঁচ ছয়দিন ওদের ডিউটি থাকে হাসপাতালে। রোগ ও রোগীর সাথেই যেন তাদের দিনাতিপাত। আর অসম বয়সীদের দিন কাটে বন্ধুত্বের খুনসুটি নিয়ে। নানুমণি ব্যস্ত থাকেন জিসান-জয়ীকে নিয়ে। যতটুকু সম্ভব আদর আনন্দে রাখার চেষ্টা করেন। রেহানা বেগম প্রায়শ ফিরে যান পুরনো দিনে যখন পুতুল আর মিতুল ছোট ছিল সেই সময়ে। নতুন করে এই ফিরে পাওয়া পুরোনো সময়ের মাতৃত্বের স্বাদ অন্যরকম। এদিকে নানাভাই নিজামুদ্দিনের সময়টা শুরু থেকে কঠিন ছিল। তিনি দেশপ্রেমিক, দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন। অনুচ্চাভিলাসী সমাজসেবী মানুষ। সারাক্ষণ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য স্ত্রীকে তাড়া

দিতেন। এখন করোনার প্রকট দেখে যাওয়ার নাম নিচ্ছেন না। তাছাড়া উনারা ফিরে গেলে বাচ্চাদের কষ্ট হবে, জিসান-জয়ীর প্রতি অনন্য এক মায়া তাঁদেরকে খাঁচাবন্দি করেছে। মিতুল আর পুতুলের দীর্ঘদিনের পীড়াপীড়িতে স্বল্পমেয়াদী সফরে এসে করোনার জন্য আর ফিরে যাওয়া হচ্ছে না। আদৌ কি ফিরে যেতে পারবেন? এটাই তাঁদের প্রতিদিনের দীর্ঘশ্বাস।

ক্যালেন্ডারে পাতা উল্টে মাসের পর মাস আসছে যাচ্ছে। অফুরন্ত এই অবসর যাপনে রেহানা বেগম ও নিজামুদ্দিনের সময় কাটে স্মৃতির পাতা উলটে পালটে। মনে পড়ে তাঁদের যাপিত জীবনের সকল সুসময় আর দুঃসময়ের কথা। একটা সময় তাঁরাও আর কথা খুঁজে পাননা, শুরু হয় নীরবতা। ভিনদেশে গৃহবন্দি দুইজন মাটির মানুষের অসহনীয় যন্ত্রনা শুরু হয়। রেহানা বেগম ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে নাজিমুদ্দিন বারান্দায় চলে যান। তাঁদের নীরব কান্না কেবল প্রকৃতি দেখতে পায়। নিয়মি টিভিতে যা দেখছেন তারপর দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তও নিতে পারছেন না। অথচ দেশ তাদেরকে প্রবলভাবে টানছে। প্রতিদিন পুতুল-মিতুল বাবা-মাকে বোঝায়, ‘আপাতত দেশে যাওয়ার চিন্তাও করোনা! তোমাদের বয়স হয়েছে, ঝুঁকি কম নেয়া উচিত।’ নিজের সন্তানের কাছে থেকেও শান্তিতে ঘুমাতে না পারাটা বাবা মায়ের জন্য প্রবল হতাশা্র, নিদারুণ বিষণ্ণতার। এসব কষ্ট না হজম করা যায়, না সন্তানের সাথে ভাগাভাগি করা যায়। মিতুল-পুতুলকে বোঝাতে ব্যর্থ হন নাজিমুদ্দিন সাহেব। নিজ দেশের ধুলোবালিযুক্ত বাতাসেও কত স্বস্তি, বাসায় নিয়মিত আসা সবজিওয়ালা, ভিক্ষুকের চেহারাতেও সে কী প্রাণশক্তি! এ প্রজন্ম সেটা বোঝে না। উপড়ে পড়া গাছ শুধু সালোক সংশ্লেষণে কতদিন বাঁচে? শেকড় যে সারাক্ষণ মাটি খোঁজে, রস খোঁজে।

এই মুল্লুকে নিজেদের খাপ খাওয়াতে কষ্ট হলেও ব্যস্তই থাকেন নাতি-নাতনিকে নিয়ে। নানাভাইও আজকাল বাচ্চাদের সাথে চিরকুট লেখা শুরু করেছেন। জিসান-জয়ীকে বাংলা বর্ণমালা শেখাচ্ছেন, ‘বাংলাদেশ’ লেখা শেখাচ্ছেন। তারাও সানন্দে আঁকাবাঁকা হরফে বাংলাদেশ লিখছে। সেই চিরকুট এখন সারা ঘরময়।

জীবন বয়ে চলে। তন্ময়ের বাবা মা বেঁচে নেই, শশুর শ্বাশুড়ির আদরে সে মাখন প্রায়। শ্বাশুড়ি দেশীয় খাবার ও পিঠাপুলির জন্য লিস্ট বানিয়ে দেয়। তন্ময়কে নিয়ে শ্বশুর বাঙালি দোকান ঘুরে সব কিনে আনে। দেশীয় খাবারে ভরা ডাইনিং টেবিল। নানুমণি এতদিনে বাচ্চাদের দেশি খাবারে অভ্যস্ত করতে পেরেছে – স্টেক, ড্রামস্টিক, ফ্রেঞ্চফ্রাই, ম্যাশড পটেটো এন্ড গ্রেভি – এসবের প্রতি বাচ্চাদের আকর্ষণ কমেছে। মিতুল তন্ময়ের জীবনেও এসেছে বৈচিত্র। দীর্ঘদিন ছোট্ট একক পরিবার হিসেবে জীবনযাপনের একঘেয়েমি প্রশমিত হয়েছে। বাবা মার সান্নিধ্য উপভোগ করছে মন ভরে।তারা একদিকে বাবা মা, অন্যদিকে তারা সন্তানও। এত কাছে থেকে পাওয়া এই আনন্দ স্বর্গীয়। দিনশেষে বাসায় এসে সকলে মিলে আনন্দময় সময় কাটাবার জন্য তারা উদগ্রীব থাকে।

দেখতে দেখতে প্রকৃতির অঙ্গজুড়ে পরিপূর্ণ গ্রীষ্মকাল এসেছে, কানাডিয়ানদের বহুল কাঙ্ক্ষিত ঋতু। বন্দিত্বের শেকল ভাঙা শুরু হয়েছে। আহারে জীবন! নিশ্বাসও চায়

স্বাধীনতা। কে জানে কতদিন থাকবে এই সুবর্ণ বাতাস! মানুষজন একটু একটু বেরোতে শুরু করছে; লং ড্রাইভ, বোটিং, বারবিকিউ, পিকনিক ইত্যাদি। জিসান-জয়ীসহ সবাই ব্যাকইয়ার্ডে সবজি বাগান নিয়ে মহাব্যস্ত। লালশাক, লাউ, কুমড়ো, টমেটো, কাঁচামরিচ, ধনিয়াপাতা, ইত্যাদি। মাঝেমধ্যে একটু বৃষ্টি হলেও বেশির ভাগ দিনই চকচকে রোদেলা। নানাভাইর কিছুতেই মন ভিজে না, আকুল মন পড়ে থাকে স্বদেশে। তিনি পছন্দ করেন দেশ নিয়ে, মাটি নিয়ে কথা বলতে, পছন্দ করেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে। অতটুকুন ছোট বাচ্চারা এসব তেমন বোঝে না। পেটের ভেতর দুষ্টুমি নিয়ে কৃত্রিম মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকে, একটু শুনেই নানুর কাছে ছুটে যায়, নানাভাইর কথা নাকি বোরিং লাগে।

অমনি রেহানা বেগম এসে স্বামীকে ধমকে দেন, 'ওদের সাথে এসব কথা না বললে হয়না? ওরা বিদেশি বাচ্চা, আপনার গল্পের কী বোঝে?'

উত্তরে নিজামুদ্দিন ক্ষেপে যান, 'বিদেশে জন্ম নিলেই কী বিদেশি হয়? এদের শেকড়তো আমার দেশেই।'

রেহানা বেগম তর্কে না জড়িয়ে বাচ্চাদের নিয়ে ব্যাকইয়ার্ডে চলে যান। পাখিদের জন্য খাবার ও পানি রাখার পাত্রটা পরিষ্কার করেন। জিসান-জয়ীও নানুমণিকে সানন্দে সহায়তা করে।

এভাবেই চলছে তাদের দিনাতিপাত। বাইরে গ্রীষ্মকালীন তেজোদীপ্ত রোদ হলেও বাতাসের দামামা বেশ সুন্দর ভারসাম্য তৈরি করেছে! জিসান-জয়ীকে নিয়ে নানাভাই ও নানুমণি প্রতিদিন বিকেলে হাঁটতে বের হন। আজ নানুম ওদের সাথে পার্কে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। লাউয়ের মাচাটা ঝুলে পড়েছে, ওটা ঠিক করবেন। জিসান-জয়ী ও তাদের নানাভাইকে রেডি করিয়ে দিলেন। মুখে মাস্ক পরিয়ে দিলেন। এক বোতল পানি ও ছোট হ্যান্ড সেনিটাইজারও দিলেন। নাজিমুদ্দিন সাহেব দুই হাতে দুইজনের হাত ধরে সামান্য দূরত্ব হেটে পার্কে পৌঁছেন।

নানার দুই হাত ছেড়ে বাচ্চারা সোজা স্লাইডে উঠে গেল। তিনি এদিক সেদিক তাকাতেই দেখেন আশেপাশে এখনো তেমন মানুষজন নেই। অনেকগুলো খালি বেঞ্চের একটিতে একজন বয়স্ক লোক বসে আছেন, সামনে প্লেগ্রাউন্ডের দিকে তাকিয়ে। তিনিও হয়তো নাতিদের নিয়ে এসেছেন বন্দিত্বের শেকল ভেঙে। নিজামুদ্দিন সাহেব পাশে যেয়ে বসলেন। একটু আধটু কথা বলেই বুঝলেন তিনি লাহোর থেকে এসেছেন, ছেলের বাসায় থাকেন দীর্ঘদিন ধরে। তাঁর নাম আজমীর খান। হিন্দি উর্দু মিশেলে দুজনে কথা বলছেন। এক কথা দুই কথা শেষ হতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসে। আজমীর খান অবচতন মনে একের পর এক ঘা দিচ্ছেন। নিজামুদ্দিন সাহেবের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। ফোঁস করে উত্তর দিলেন, 'তোমার মত জানোয়ারদের আমি চিনি, আমিও যুদ্ধ করেছি। আমাকে বাংলার ইতিহাস শেখাতে এসো না।'

আজমীর খাঁন চোখ উঁচিয়ে বললেন 'পুওর বাঙালি, সেন্টিমেন্ট ছাড়া তোদের আর কীইবা আছে? এই বয়সেও রক্ত এতো গরম! ভুলে গেছ হেনরি কিসিঞ্জার কী বলেছিল?'

‘হায়েনার বাচ্চা, ইচ্ছা করছে তোর জিভ ছিঁড়ে দিতে, তোদের যুদ্ধাপরাধের বিচার হওয়া উচিত। ভুলিনি তোদের বর্বরতা। বাঙালি তোদেরকে কখনো ক্ষমা করবে না।’

বলতে বলতে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে গেলেন। জিসান-জয়ীকে ডেকে, টেনে হিঁচড়ে বাসায় এসে পৌঁছেন নিজামুদ্দিন সাহেব।

বাচ্চারা গত তিন মাসে নানাভাইকে এতো উত্তেজিত দেখেনি। এসেই নানুমণিকে বর্ণনা করছে, নানা সারা রাস্তায় ইয়েলিং করেছে ওই স্ট্রেঞ্জারকে। বাকিদিন বাসার পরিবেশ চুপচাপ ছিল, মিতুল আজ হাফ ডে কাজ করে বাসায় চলে এসেছে। বাবার কাছে পার্কে কী হয়েছে শুনতে চাইলেই বাবা উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে। ওরা আর এই বিষয়টা নিয়ে ঘাটাল না, রাতের খাওয়া দাওয়া শেষে একটা স্ট্রেস রিলিফের পিল দিলো। তাতে রাতে ঘুম ভালো হলে সকালে ঝরঝরে লাগবে সবকিছু।

পরদিন সকালে মিতুল আর তন্ময় বাবাকে ঘুমাতে দেখে আর জাগায়নি, হাসপাতালে চলে গেল। বাকিরা আস্তে আস্তে উঠছে। নানাভাইতো কখনোই দশটা পর্যন্ত ঘুমায় না, এ নিয়ে রেহানা বেগম ও তার নাতি নাতনির ফিসফিস। রেহানা বেগম আস্তে আস্তে রুমে ঢুকে স্বামীকে জাগাতেই দেখেন স্বামীর গায়ে জ্বর। তাড়াতাড়ি নিচতলায় এসে মিতুলকে ফোন দেয়।

‘মা -- একটুও অস্থির হবেনা, একটুও কান্নাকাটি করবে না। যা বলছি মন দিয়ে শোনো। টেলিফোনে ৯১১ টিপলে সাথে সাথে ওপাশ থেকে কেউ ফোন ধরবে। তোমাকে জিজ্ঞেস করবে – তুমি কী এম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস নাকি পুলিশ চাও? তুমি শুধু বলবে, ‘এম্বুলেন্স।’ এতটুকু করতে পারবে?’

মা চাচ্ছিলেন মেয়ে ডাক্তার, সেইতো বাসায় এসে তার বাবাকে আগে দেখতে পারে!

মিতুল সেদিকে না গিয়ে বলল, ‘এম্বুলেন্স বাবাকে আমার হাসপাতালে সেন্ট মাইকেল-এ নিয়ে আসবে। আমি বাকিটা দেখছি। তুমি চিন্তা করোনা।‘

যেই কথা সেই কাজ!

নিজামুদ্দিন সাহেব হাসপাতালে ভর্তি হলেন। রিপোর্টে তাঁর করোনা পজিটিভ। অন্যান্য টেস্টে দেখা গেলো গতকাল তাঁর স্ট্রোকও হয়েছে। পরিবারের সবার দুশ্চিন্তা ও হতাশার পারদ উপরে উঠতে থাকল। কিছুতেই জ্বর গায়ে ব্যথা কমছে না, খাবার খেতে পারছেন না, শ্বাসকষ্টও বাড়ছে। দুইদিন ধরে চলছে জীবন মরণ যুদ্ধ। মিতুল বাবার কানে কানে বলছে, ‘বাবা তুমি তো সাহসী মুক্তিযোদ্ধা, তুমি পারবে। নিশ্চয়ই পারবে করোনাকে পরাজিত করতে।’

নিরুত্তর বাবা শুধু মাথা নাড়েন। আদতে করোনা নিজামুদ্দিন সাহেবকে ভেতরে অনেকটাই শেষ করে দিয়েছে। ফুসফুসের ৮০ ভাগ আক্রান্ত। বয়সজনিত কারণে অতিরিক্ত যুদ্ধও করতে পারছেন না। ফিরে আসার তুমুল চেষ্টা করা হলেও অনেক কিছুই ফেরানো যায়না। মিতুল আর তন্ময়ের সর্বোচ্চ ডাক্তারি বিদ্যাকে ব্যর্থ করে নিজামুদ্দিন সাহেবের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হতে লাগল। তাঁর আর স্বদেশ ফেরা হলোনা। চারদিনের মাথায় আইসিইউতে থাকা অবস্থায় ভেন্টিলেটর খুলে দিতে হলো।

জিসান-জয়ী এখনও জানেনা কী ঘটেছে, জানলেও হয়ত মনে রাখতে পারছে না। প্রতিদিন নানাভাইর রুমে যাবে ঘুমানোর আগে, সাইড টেবিলে পোর্সেলিন লাইটের পাশে একটা করে চিরকুট লিখে রেখে আসে, 'গ্র্যান্ডপা উই শ্যাল ওভারকাম।' আশা জাগানিয়া এই চিরকুট বাসায় বাকি সবার জন্য কষ্টদায়ক, বেদনাদায়ক। তবুও অতটুকুন কোমলমতি বাচ্চাদের চিরকুট লিখতে নিষেধ করার মতো শক্তিই বা কার আছে!

শোকছুটি শেষে তন্ময় মিতুল কাজে ফেরত গেল। মনের ভার কমেনি, ডাক্তার নার্স সবার সহমর্মিতা ও সহযোগিতায় স্বাভাবিক দিন কাটাতে চেষ্টা করছে। একটা সময় কাজে ডুবে গেছে তারা। মিতুল কাজ শেষে ফেরার পথে নিজামুদ্দিন সাহেব হাসপাতালে যে রুমে ছিলেন ওখানে একটু ঢুঁ মারতে গেল। বাবা নেই, সেই বিছানায় অন্য কেউ। ছলছল চোখে ফিরে আসতে নার্স একটা ব্যাগ তুলে দিল মিতুলের হাতে। ভারি ব্যাগটা নিয়ে বাড়ি ফিরল শূণ্য হৃদয়ে। সোফার উপর ব্যাগটা রেখে নিজঘরে ফিরে যায় নীরবে।

মাগরিব নামাজ সেরে উঠলেন রেহানা বেগম। মিতুলকে প্রায় জিজ্ঞেস করে ফেলছিলেন, 'তোমার বাবার কী অবস্থা?' কিন্তু হঠাৎ ঢোক গিলে ফেলেন। ফ্যামিলি রুমে আসতে সোফায় রাখা ব্যাগটা চোখে পড়ে উৎসুক হয়ে ব্যাগ খুলতেই দেখেন স্বামী নিজামুদ্দিনের গায়ের শার্ট, ট্রাউজার ও নরম টাওয়েল। রেহানা বেগম হাহাকারে অশ্রুজলে মাখামাখি হয়ে পরম মমতায় কাপড়গুলোতে হাত বুলাচ্ছেন, শুঁকে দেখছেন হারানো গন্ধ। ব্যাকুল কান্নায় বুকে জড়িয়ে ধরছেন আর মনে মনে আহাজারি করছেন, 'কোথায় পাবো তারে! তাঁকে হারাতেই কী এলাম এই দূরদেশে?'

হাতের মুঠোয় ধরা নরম কাপড়! আঙুলের ডগায় শক্ত কিছু লাগতেই শার্টের পকেটে থেকে বেরিয়ে এলো জিসান-জয়ীর বাংলা হরফে লেখা সেই চিরকুট।

টরোন্টো, কানাডা

খায়রুল আনাম

তোতা ও পাখি, তোতাপাখি

সত্তর দশকের প্রথম পাটে নিউইয়র্ক শহরে ভারতীয় উপমহাদেশীয়দের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। এর সিংহভাগ ছিল গুজরাতি, যারা নিজেরাই একে অপরকে ঠাট্টা করে 'গুজুভাই' বলে ডাকত, যেমন এদেশে এক কাউলা আর এক কাউলাকে 'নিগার' বলে ঠাট্টা করে বা রাগের মাথায় বলে থাকে। বাদ বাকিরা ছিল পাঁচমিশালী - দক্ষিণ ভারতীয়, পাঞ্জাবী, বাঙালী। বাংলাদেশ তখন মাত্র কিছুদিন হলো ভুমিষ্ট হয়েছে। তাই আমার মত এক আধজন ছাড়া আনকোরা বাংলাদেশীদের উপস্থিতি প্রায় ছিল না বললেই চলে। মুষ্ঠিমেয় যে সব পুর্ব পাকিস্তানিরা আগে থেকেই ছিল, দেশ স্বাধীন হবার পর হজ্বের শেষে মাথা ন্যাড়া করে হাজী বনে যাওয়ার মতো তারা স্বাভাবিক ভাবেই বাংলাদেশী হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ তখনও এই সমাজের সবাই নিজেদেরকে বাঙালী মনে করত, তা সে পুর্ববঙ্গেরই হোক বা বা পশ্চিমবঙ্গের। তখনকার সব বাংলা অনুষ্ঠান সমাজের সবার জন্য উৎসাহ ও আনন্দ উপহার ছিল।

প্রতি বছরের মতো সে বছরও নিউইয়র্কের টেগোর সোসাইটি আর ইস্টকোস্ট দুর্গাপূজা কমিটি মিলে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে দুর্গাপূজা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। গান বাজনার সঙ্গে একটা নাটকেরও ব্যবস্থা ছিল। পারিবারিক বন্ধু প্রবাল ও রমা খলিলদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে নাটক দেখতে। হলে ঢুকে চারজন সুবিধামত জায়গা দেখে বসে পড়েছে। আস্তে আস্তে লোকজন ঢুকছে। একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের ভাল সীট দেখে বসার জন্য। সেযুগে বাঙালী কম ছিল বলে ইস্টকোস্টের ঐ পূজোতে উত্তরে বস্টন ও দক্ষিণে ভার্জিনিয়া থেকে লোকজন আসত। যদিও সবাই আসত আমেরিকার কর্মব্যস্ত জীবন থেকে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে, কিন্তু মুল আকর্ষণ ছিল নতুন কোন কোন বাঙালী পরিবার এলো, সেই কৌতুহল নিবৃত্তির ও তাদের সংগে পরিচিত হবার আকুলতা।

এরকম দুটো পরিবার প্রবালদের রো পেরিয়ে সামনের দিকে এগুচ্ছিল। এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা পাশে চলতে থাকা এক তরুণীর দিকে তাকিয়ে বুলি ছুড়লেন, 'নতুন বুঝি? আগে তো কখনো দেখিনি। কোথায় থাকা হয়? আমরা নিউইয়র্কেই থাকি, কুইন্সে। দেশের বাড়ী হুগলী। আপনার'?

‘একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে? আচ্ছা বলছি। আসলে আমেরিকাতে এটাই আমার প্রথম পুজো। থাকি নিউ জার্সিতে। আর আমাদের দেশের বাড়ী হলো কেলকাটা’।

‘কেলকাটা? খলিলের বৌ সাবরিনা এতক্ষণ মাথা নিচু করে শাড়িটা ঠিক করছিল। হঠাৎ মাথা তুলে প্রশ্ন, ‘কে বলল কেলকাটা? কে? কে বলল?’ তারপর পাশের একজন সামনের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেই তৎক্ষনাৎ সে প্রায় পড়িমরি হয়ে দুই রো’র মধ্যেকার সেই সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে প্রায় ছিটকে গেল সেই তরুণীটিকে ধাওয়া করতে। গিয়ে কাঁধে এক ঝাঁকি দিয়ে তার মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, ‘এই, তুই? তুই এখানে কোত্থেকে?’

অতর্কিতে ওভাবে আক্রান্ত হয়ে ঐ তরুণী একেবারে থতমত খেয়ে গেল। সাবরিনার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, ‘কে আপনি? এভাবে অত জোরে একটা মানুষকে পেছন থেকে আক্রমণ করার মানে কি?’ দুজনে দুজনের দিকে বিহবল হয়ে তাকিয়ে থাকল প্রায় দেড় মিনিট। পরে তরুণী একটু নীচু কিন্তু বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, ‘আমাকে সামনে এগুতে হবে। দয়া করে কি কাঁধ থেকে হাতটা সরানো যায়?’

‘সরি’ বলে প্রায় চুপসে যাওয়া সাবরিনা মাথাটা নীচু করে ফিরে এসে নিজের সীটে গোঁজ হয়ে বসে থাকল। মুখ আর তুলল না। তার থিয়েটার দেখার তেরটা বেজে গেছে। একটু পরেই বরকে বলল, ‘ভীষণ মাথা ধরেছে। চল, বাড়ী চল’। খলিল অবস্থাটা একটু হালকা করার চেষ্টা করে, ‘আর একটু বসো। অতদুর থেকে এলে। অন্ততঃ হাফ টাইম পর্য্যন্ত দেখে যাও’।

‘তুমি দেখ জান ভরে’, বলে তড়াক করে উঠে হন হন করে হলের বাইরে চলে গেল। বাধ্য হয়ে খলিলও পাততাড়ি গুটিয়ে তার পিছু নিল। বাইরে বের হয়ে অনেক চেষ্টা করেও খলিল, সাবরিনা ওরফে রীনাকে কিছুই খাওয়াতে পারল না। ফেরার পথে সারাটা পথ সে গাড়ীর মধ্যে কাঁদল। বাড়ীতে ফিরেও কোন দিকে না তাকিয়ে, কিছু না খেয়ে, সোজা বিছানায় গিয়ে, বালিশে মুখ গুঁজে বাচ্চা মেয়েদের মত হু হু করে কাঁদতে থাকল। সকালে উঠে খলিল অফিসে যাবার জন্য রেডি হয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে আছে। চা, নাস্তা আর আসে না। উঠে গিয়ে দেখে সাবরিনা সেই একই ভাবে শুয়ে আছে।

‘কি হলো, শরীর খারাপ?’ বলে এপাশ ফেরাতেই দেখে রীনার দু’চোখ বেয়ে টসটস করে জলের ধারা বেয়ে যাচ্ছে। চোখ মুখ ফোলা। মনে হয় সারা রাত ধরে কেঁদেছে। ‘আরে কর কি? এই বয়সে এমন ছেলে মানুষী কেউ করে? ওরকম ভুল সবারই হয়। আমার নিজেরও কয়েকবার হয়েছে। হ্যাঁ, একটু অপ্রস্তুত লাগে বৈ কি। নাও, এখন ওঠো ত। চলো চা, নাস্তা পানি করবে। আমার আবার অফিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে’। খলিল ওর হাতটা ধরে একটু তোলার চেষ্টা করে।   ‘ছাড়তো তুমি, যাও নিজের কাজে যাও’, বলে এক হ্যাঁচকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে রীনা আবার বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে থাকে।

‘মুস্কিল! এ তো দেখি খেতে বললে মারতে ধায়। ধুত্তরি, গুল্লি মারো’ বলে খলিল মিয়া গজ গজ করতে করতে নাস্তা না খেয়েই সাবওয়ের পথ ধরে। সন্ধ্যায় কাজ থেকে

বাড়ী ফিরে দেখে অ্যাপার্টমেন্টটা অন্ধকার। রীনা জানালায়, বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। খলিল ফিরেছে টের পেয়েছে, কিন্তু রোজকার মতো 'কেমন গেল দিনটা' কথাটা জিজ্ঞেস করল না। খলিল যে সকালে না খেয়েই চলে গেল, এখন যে একসঙ্গে ডিনারের আয়োজন করার সময়, রীনার সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। খলিলের কাছে আগের রাতের ঐ সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করাটা বেশ বিরক্তিকর বলে মনে হলো। সে কিছু না বলে লাইটটা জ্বালিয়ে, টিভিটা চালিয়ে দিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসল। তখন সোনি ট্রিনিট্রন রঙ্গীন টিভি আমেরিকার বাজারে মাত্র এসেছে। কি সুন্দর ছবির কোয়ালিটি। দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। রীনা নতুন কালার্ড টিভি পেয়ে খুশীর চোটে ঢাকায় ফোন করে সবাইকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিল।

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং – টেলিফোনের শব্দ শুনে এপার থেকে খলিল বলে, 'হ্যালো'

' আচ্ছা, এটা কি খলিলদার বাড়ী?'

' হ্যাঁ। কে বলছেন ভাই, কোথা থেকে?'

'উহ, বাঁচালেন দাদা। গত দু'দিন ধরে হন্যে হয়ে আপনাদের নাম ও টেলিফোন নম্বর বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কি গভ্যযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যে দিন কাটছে, তা একমাত্র ভগবানই জানেন'।

'যন্ত্রণার আর দেখেছ কি, বাছাধন?' কথাটা খলিল মনে মনে আওড়ায়। প্রকাশ্যে বলে, 'সরি আপনার এত কষ্ট পাওয়ার জন্য। আমি কিন্তু এখনও আপনাকে ঠিক– '

'ও, আমি শ্যামল। শ্যামল চক্কোত্তি। নিন, কথা বলুন'। ওপার থেকে একটা মিষ্টি আওয়াজ এলো, 'তোতা আছে?'

'তোতা? তোতা বলে তো এখানে কেউ...আপনি ভুল জায়গায় খোঁজ করছেন না তো?'

'দুলাভাই, আমি পাখি বলছি নিউজার্সি থেকে। দোহাই, তোতাকে একটু ফোনে আসতে বলুন না, প্লীজ'।

'পাখি, দুলাভাই, তোতা- আমি রিয়েলি কনফিউজড। নিউ জার্সিটা না হয় বুঝলাম। দেখুন মিস পাখি অর হোয়াটেভার, আপনি ঠিক আছেন তো? উনি, মানে আপনার স্বামী হবেন মনে হয়, কি সব যন্ত্রণার কথা বলছিলেন। সত্যিই কি আপনাদের মধ্যে কোন...'

'প্লীজ দুলাভাই, আই বেগ ইউ, দয়া করে জাষ্ট একটিবারের জন্য তোতাকে ফোনটা দিন'।

'ম্যাম, বিলিভ ইউ মী। আমি রিয়েলী আপনাকে হেল্প করতে চাই। কিন্তু এখানে সত্যিই তোতা বলে কেউ থাকে না। আরো সত্যি হলো আমার জানাশোনার মধ্যে তোতা বলে কারুর নাম কখনো শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না'।

এর মধ্যে হঠাৎ রীনা ভেতরের ঘর থেকে দৌড়ে এসে খলিলের হাত থেকে ফোনটা ছোঁ মেরে নিয়ে ফেটে পড়ল, 'এই চুট্টি, হতচ্ছাড়ি। আর কোনদিন যদি ভুলেও এখানে ফোন করার চেষ্টা করিস তাহলে আমি তোকে সাফ খুন করে রক্ত পিয়ে খাব। ফোন রাখ, হারামজাদি, বেশরম কাঁহিকা'।

ওদিক থেকে কিছু একটা যেন বলার চেষ্টা হলো। রীনা আরো রেগে, 'জীবনেও যেন কোনদিন তোর এখানে ফোন করার দুঃসাহস আর না হয়। আর খবরদার আমার ত্রিসীমানায় আসার চেষ্টা করবি না শয়তান' বলে দুম করে ফোনটা রেখে আরো জোরে কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় গিয়ে পড়লো রীনা, নাকি তোতা, তোতা না রীনা? খোদা মালুম।

উইকডেজ-এর পুরোটা খলিল বাবাজীর ব্রহ্মচর্য করে কেটেছে। রাধার মান ভাঙ্গাতে নিশি জাগরণ ও কয়েক গ্যালন তেল ও শেষ। লাভ কিস্যু হয়নি। ভেবেছে উইক-এন্ডে চুটিয়ে লম্বা ঘুম দিয়ে পুষিয়ে নেবে। তাই আগে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও সে বিছানায় আয়েস করে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। ঠিক সাড়ে ন'টায় কলিং বেলটা বেজে উঠল। 'উহ্, ছুটির দিনে সাত সকালে আবার কে বিরক্ত করতে আসল', বলতে বলতে খলিল দরজা খুলে দিতে গেল। খুলেই একেবারে অচেনা দুজন মানুষকে দেখে হাঁ হয়ে গেল।

'দুলাভাই, আমি পাখি আর ও হচ্ছে......'

'শ্যামল। আপনাকে ফোন করেছিলাম'।

এরা কি সত্যিই পাগল না আর কিছু? কি বলা যায় বা কি করা যায়? খলিল ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওদের মুখের দিকে কেবল তাকিয়েই থাকলো।

পেছন থেকে খাঁই খাঁই আওয়াজ, 'কি হলো? ওদেরকে অমন করে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি? ভেতরে আসতে বলতে পারছ না? অদ্ভুত মানুষ! আসুন শ্যামল দুলাভাই, ঐ যে টিভির দিকে মুখ করা সোফাটা, ওটাতে বসে একটু রেস্ট করুন। কত ভোরে বেরিয়েছেন? বাসা খুঁজে পেতে নিশ্চয় অনেক কষ্ট হয়েছে? এই শুনছ? ডাইনেটে প্লেটগুলো একটু দিয়ে দাও না। চারটে গ্লাসে অরেঞ্জ জুস ঢালো। সঙ্গে জ্যাম, জেলীও বের করো, আর টোস্টারে রুটি দাও টোস্ট করতে। ওমলেটগুলো আমি বানাচ্ছি। শ্যামলদা, থুড়ি দা নয়, দুলাভাই, আপনার পোচ না ওমলেট? চা-তে কয় চামচ চিনি?'

রীনা হঠাৎ যেন একটা পাহাড়ী ঝর্ণা হয়ে যায়। খাবার রেডী হলে সবাই ডাইনিং টেবিলে খেতে বসল। খলিল লক্ষ্য করল রীনা শ্যামলকে রিয়েল শাশুড়ীর মতো জামাই আদর করছে। অথচ পাখির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার সঙ্গে কথাও বলছে না। তাকে খেতে ও বলছে না আর নিজেও কিছু মুখে তুলছে না। শ্যামল ও খলিল মিলে পরিবেশটা হাল্কা করার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

সহসা পাখি ঠাস করে উঠে পড়ে কিচেন টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ছুরি বের করে নিজের গলায় চেপে ধরে বলল, 'তুই যদি কথা না বলিস, তাহলে তোর এখানেই আমি গলা কেটে মরবো'। অমনি সব কিছু ছেড়ে রীনা এক লাফে উঠে গিয়ে, 'করিস কি, করিস কি হতচ্ছাড়ি। দে ছুরি আমাকে। দে বলছি, ভাল হবেনা, পাগলামী করিস না পাখি' বলে পাখির হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টায় ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয়।

'পাখি দেখাচ্ছে এখন। সর আমার সামনে থেকে। কাছে আসবি না। কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেছিস তো তক্ষুনি আমি গলায় ছুরির পোঁচ মারব। কেউ আটকাতে পারবে না'।

‘পাখি, আমার মাথার কিরে, আমার জানের কসম, পাগলামী করিস না। ছুরিটা দে আমাকে, আমার মাথা খাস, প্লীজ,প্লীজ’।

‘না, আমি এখানেই, তোর সামনে, তোর ছুরি দিয়ে, তোর বাড়ীতেই গলা কেটে মরব’।

‘দিবি না ছুরি তুই? দিবি না? সত্যিই দিবি না’?

‘কিছুতেই না, হরগিজ না। এখানে গলা কেটে আমি মরবই’।

‘বেশ, তবে দ্যাখ, কে আগে মরতে পারে’ বলেই ছুটে গিয়ে ড্রয়ার থেকে সবচেয়ে বড় ছুরিটা বের করে তোতা নিজের গলায় চেপে ধরল।

‘কি সব পাগলামী শুরু করলে তোমরা বলতো?’ বলতে বলতে দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে খলিল ও শ্যামল এবার মাঠে নামে। অনেক চেষ্টা করে ওদের দু’জনের কাছ থেকে ছুরি দুটো উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। এই ধস্তাধস্তিতেও নাছোড়বান্দা রীনার হাত কেটে রক্ত বের হওয়া শুরু হয়েছে।

‘এ মা করেছিস কি সর্বনাশি! ঠিক আগের মতো এখনও মাথা গরম। বয়স যে হয়েছে খেয়াল নেই। উহ, আমি এখন কি যে করি-’ পাখির আঁৎকে ওঠা কণ্ঠস্বর। কাটা জায়গাটা চেপে ধরে পাখি অস্থির হয়। দু’জনকে ভর্ৎসনা করে বলে, ‘হাঁ করে আপনারা দেখছেন কি? কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। দরকার হলে হাসপাতালে নিয়ে যান। আশ্চর্য!’ খলিল তাড়াতাড়ি মেডিসিন ক্যাবিনেট থেকে ব্যান্ড এড বের করে অকুস্থলে লাগিয়ে দেয়। রক্ত ঝরাটা আপাতত বন্ধ হলো। এরপর দু’জন দু’জনকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না!

অবস্থা আয়ত্বে এলে শ্যামল ফিসফিস করে বলল, ‘দাদা, এদের ব্যাপার স্যাপার তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে’। খলিলের সাবধান বাণী, ‘ভায়া, ধড়ে যদি প্রাণটা রাখতে চাও, তাহলে বেশি কৌতুহল দেখাতে যেয়ো না’। শুনেই দুজনে একসঙ্গে, মানে খলিলেরটা খলিলের আর শ্যামলেরটা শ্যামলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে, ‘অ্যাই, কিসের এত কথা, কিসের এত ষড়যন্ত্র? খবরদার, আমাদের ব্যাপারে একদম নাক গলাবে না’- বলেই ওরা পাশের বেডরুমে গল্প করতে চলে গেল।

খলিল আর শ্যামল অগত্যা দাবা নিয়ে বসল। দাবা চুপচাপ একটা গেম। ওয়ান বেডরুমের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট। বেডরুম থেকে খুশীর চোটে খলবল করা ওদের কথার অনেকটাই খলিল-শ্যামলদের কানে ভেসে আসছিল।

‘তুই তো আমকে দেখতে পাসনি, আমিও তোকে দেখিনি। এত বছর পরে কেবল পেছন থেকে দেখে তুই কি করে সিওর হলি যে ওটা আমি?’

‘বারে, গলার স্বরটা কোথায় যাবে? আর তামাম দুনিয়ায় ‘কেলকাটা’ বলার লোক ক’জন আছে? তোর উপর অমন আগুন হয়েছিলাম কেন জানিস?’

‘জানব না আবার? আমি না জানলে কে জানবে? ওভাবে দুর্ব্যববহার করতে গিয়ে আমি নিজের কাছে একদম মরে গেছি। আসলে অত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে ঐ পরিস্থিতিতে ঝাঁপি খুলে দুনিয়ার ফিরিস্তি দিতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সেটা সামলাতে

গিয়ে তোর উপর কি করে ঐসব কথা গলা দিয়ে বেরুলো তা এখন পর্য্যন্ত মাথায় ঢুকছে না। পুরো ঝাঁঝটা ও বেচারার উপর দিয়ে গেছে। এখানে না আসা পর্যন্ত তাই নরকের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরছিলাম। তুই ভাই মাফ করে দে'।

'ধুর পাগলী। মাফ চাওয়ার আর জায়গা পেলি না? আমি তোর অবস্থাটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু মন মানছিল না'।

'দেখ, আমরা এতদিন পরেও সেই এক আছি। আমাদের দুজনের শরীরটাই যা আলাদা, আত্মা একই। দেখনা কত মিল। প্রথমে নামটা দিয়ে শুরু করি। তুই তোতা, আমি পাখি। আমরা দুজনে মিলে একটাই তোতাপাখি। একই দিনে নাহোক, একই বছরের একই মাসে আমাদের জন্ম। ক্লাসের সচেয়ে সুন্দরী ছিলাম আমরা দুজন। বরাবর পাশাপাশি বসতাম। পরীক্ষায় একবার তুই থার্ড, আমি ফোর্থ, আর একবার আমি থার্ড, তুই ফোর্থ। আর একটা জায়গায়ও মিল আছে' বলতে গিয়ে পাখির সুন্দর গাল দুটো রাঙা হয়ে উঠল।

'শেষের মিলের জন্য শুধু আমাকেই নিওনা। ক্লাসের সব মেয়েরা, এমন কি জুনিয়ার, সিনিয়ার- সবাই পাগল হয়ে লাইন দিয়েছিল'।

'কি হয়েছিল রে তার শেষ পর্য্যন্ত?'

'ও মাই গুড লর্ড! এখনো তার জন্য পরাণ কামড়ায় তাহলে?'

'বাজে কথা তুলেছিস তো কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবো। যাঃ, তোকে বলতে হবে না। শোনার জন্য আমার বয়েই গেছে'।

'আহা, ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি তো কলা খাইনি'।

'আমি কিন্তু এক্ষুণি উঠে যাব। ওগো, শুনছ?'

'বোস, বোস। অত রাগ দেখাস না। সেলিম ভাইয়ের কথা বলছিস তো? ও ব্যাটা সবার বুকে আগুন ধরিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ইংল্যন্ডে চলে গিয়েছিল। পরে এম, আর, সি, পি করার সময়, এক কম বয়সী হাঙ্গেরিয়ান ইন্সট্রাক্টরকে- জি হ্যাঁ, প্রিন্স সেলিম, প্রিন্সেস ক্যাথরিনকে নিকাহ করেন, পবিত্র ভালবাসার উপর ভিত্তি করে। কি, খুব দুঃখ পেলি?'

'যাঃ, এতে আমার দুঃখ পাবার কি আছে? খামাকা, যত আবোল তাবোল কথা'।

'খামাকা, তাই না? তাহলে তোর চোখটা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এলো কেন?'

'তুই এতো জ্বালাতে পারিস! আমি এরপর এক মূহুর্ত এখানে...'

'তুই শুধু একা না, ঐ শয়তানটার হঠাৎ অন্তর্ধানের খবর পেয়ে আমরা সেদিন সবাই কেঁদেছিলাম। লোকটার উত্তমকুমার ও প্রদীপকুমারকে মেশালে যা হয়, তেমন একটা অদ্ভুত সুন্দর চেহারা ছিল। গোটা মেডিকেল কলেজে তার জুড়ি কেউ ছিল? তুই বল। লম্বা, ফর্সা, ব্যাকব্রাশ করা চুল। একটা রে-ব্যান-এর চশমা পরে মটর সাইকেল চড়ে আসতো। মেডিকেল কলেজের মেন গেটের পাশে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট শেষ করতো। আমরা সবাই নানা অছিলা করে এক একবার করে বাইরে এসে ওকে দেখে যেতাম। কি ভাল যে লাগতো! তুই না আসা পর্য্যন্ত সে ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতো।

তুই তো প্রায় সবার শেষে বের হতিস। ওই ফাঁকে আমাদের দেখাটাও হয়ে যেত। যেদিন তুই আগে বের হতিস, সেও আগে ভাগেই কেটে পড়তো। তুই কি সেটা বুঝতিস?'

'বুঝবোনা কেন? আমি কি গবেট ছিলুম না কচি খুকি?'

'তারপর কাউকে কিছু না বলে তুই যখন হঠাৎ উধাও হলি, ওর গেটে এসে দাঁড়ানোটাও বেশ অনিয়মিত মানে স্পোরাডিক হয়ে গেল। কোনদিন আসতো, কোনদিন আসতো না। আসলেও কেমন অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেত। ...আচ্ছা, তুই হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলি বলতো?'

'আর কেন বলিস। সেই সনাতন গার্জেনগিরি। দেশ বিভাগের কষ্টটা বাবা মার আস্তে আস্তে সয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উদবিগ্নতা ছিল অন্য জায়গায়। গার্জেনরা ভাবলো , মেয়ে সুন্দরী, মেধাবী, ডাক্তারী পড়ছে। পাশ করে বেরুলে চাকরীর ভাবনা নেই। কিন্তু বিয়ে দিতে গেলে নিজেদের গোত্রের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে? তার চেয়ে ইন্ডিয়ায় গেলে গাদা গাদা কোয়ালিফায়েড ছেলে রয়েছে। কত সোজা। একটা বেছে নিলেই হলো'।

'এসব তুই জানতিস?'

'আরে না, জানতাম না। তবে আমাকে নিয়ে ওদের চলন বলন, ফুস ফাস, ভাসা ভাসা কথাবার্তা থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু সিওর ছিলাম না'।

'কি রকম?'

'আমার এক প্রিয় পিসী থাকতো বালিগঞ্জে। আমার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড়। একদিন বাবা এসে বললেন, 'তোর পিসীর শরীরটা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। তোকে একবার দেখতে চায়। পাশপোর্ট, ভিসা, প্লেন টিকিটের সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি'। বললাম,
'বাবা, সামনে তো পরীক্ষা। এখন তো যাওয়া সম্ভব হবে না'। বাবা অবুঝ।

'যা মা, একবার দেখাটা দিয়ে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ফিরে আসবি। বিশেষ তেমন কোন ক্ষতি হবে না পড়াশুনার'।

'তারপর?'

'তারপর আর কি? গিয়ে দেখি পিসীমা বিছানায় কাদা হয়ে শুয়ে আছে। পিসীমা ছোটবেলায় আমাকে খুব আদর করত। বয়সের ব্যবধান কম ছিল বলে, বলতে পারিস আমরা এক প্রকার বন্ধুই ছিলাম। পিসীকে ও অবস্থায় দেখে মনটা খুব দমে গেল। ও হরি! পরের দিন দেখি পিসী দিব্বি ফুরফুর করে বেড়াচ্ছে। আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার এক এক দিনের সব ছক কাটা তালিকা দেখাল। আজ লেক, তো কাল গড়ের মাঠ, পরশু নিউ মার্কেট, মেট্রো, লাইট হাউস, কফি হাউস, কলেজ স্ট্রীটের বই পাড়া, শ্যামবাজারের থিয়েটার পাড়া, আরো কত কি। আমি যতই বলি পড়ার খুব ক্ষতি হচ্ছে, ঢাকায় ফেরার জন্য অস্থির হই। শুনে পিসী বেশ শান্ত গলায় বলে, 'যাবি, যাবি। কয়টা দিন একটু ঘুরে নে'। তাছাড়া দেখতাম আমাদের সঙ্গে প্রায়ই এক অচেনা যুবকও আমাদের ঘোরার সাথী হয়ে যেতো। একদিন পিসীকে পাকড়াও করে বললাম,

‘তোমাদের মতলবটা কি বলতো? পড়াশুনা ছেড়ে আর কতদিন এভাবে ভবঘুরে হয়ে বেড়াব? তোমার তো আসলে কিছু হয়নি। তাহলে কেন শুধু শুধু আমার এই ক্ষতিটা করাচ্ছ?’

‘পিসী একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, ‘বোকা মেয়ের কথা শোন। ক্ষতি করাবো কেন? তোর লাভের জন্যই তো এতকিছুর আয়োজন’।

‘আমার লাভ? মানে?’

‘মানে তোমার আর ফিরে যাওয়া হচ্ছে না। দাদা সব জেনেশুনেই এতে সায় দিয়েছে এবং তার নির্দেশ মতই এখন সব কাজ হচ্ছে। শোন্, তোর মেসোমশাই নীলরতন মেডিকেল কলেজের সিনিয়র টিচিং স্টাফ। তোকে ওখানে ভর্তি করার সব ব্যবস্থা মোটামুটি হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে পাশ করে বেরুলে ঢাকা মেডিকেল গ্রাজুয়েটদের থেকে তোর বেটার মার্কেট ভ্যালু হবে। তাছাড়া বিয়ের জন্য এখানে অনেক পচ্ছন্দসই পাত্র পাওয়া যাবে। ঐ যে ছেলেটা মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে ঘুরতে আসে, ও তো ঐ জন্যই আসে। আই,আই,টি খড়গপুর থেকে মেকানিক্যাল করে এখন আমেরিকা যাবার ধান্দা করছে। খুব ভাল পাত্র। ও ছাড়া আরো কয়েকজন লাইনে আছে, তোর পিক এন্ড চুজ করার জন্য’।

‘শুনে আমি একেবারে থ। দুই পারের গার্জেনরা মিলে কি বিরাট যড়যন্ত্রই না পাকিয়েছে আমার অজান্তে। খাঁচার পাখির মতো সেই অসহায় অবস্থায় পড়ে যাওয়ার জন্য আমি প্রথম দু’বছর অনেক কেঁদেছি’।

‘জানি, মেনলি সেলিম ভাইয়ের জন্য তো?’

‘তোতা, ভাল হবে না বলছি। দেব এক কিল বসিয়ে। সেলিম ভাইয়ের জন্য কাঁদতে আমার বয়েই গেছে। আমি বলে নিজের জ্বালায় বাঁচি না’।

‘আহা, একেবারে খাঁটি সত্য কথা। কালামের বাত। বেদ বাক্য। কে না জানে সম্পুর্ণ উল্টোটাই সত্যি?’

‘দেবো এক কিল’ বলে পাখি উঠে এসে তোতার মুখটা চেপে ধরে বলে, ‘আর একবার ওকথা উচ্চারণ করলে আমার মরা মুখ দেখবি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা পুরোপুরি অস্বীকার করছি না। কিন্তু কোথায় তুই আর কোথায় অন্য কেউ, এমন কি সেলিম ভাই। তোতাপাখি কি কখনো সেলিমপাখি হয়? বল হয়?’

‘তবে তুই ফিরলি না কেন?’

‘তোতা! ক্ষতস্থানে খুঁচিয়ে আর ঘা করিস নাতো। অনেক কষ্ট নিয়ে বহুদিন ধরে চোখের জল শুকিয়েছি। আর ঘাঁটিস না, প্লীজ। এখন তোর কথা বল। হ্যাঁরে, তোর বর সত্যিই তোকে তোতা নামে জানে না?’

‘না, আমার পাখি চলে যাবার পর, তোতা নামটি আমি দূর করে দিয়েছি। ছ’মাসের মধ্যে যখন ক্লাশে তোর টিকির নাগাল পাওয়া গেল না, পাশের সীটে অন্য একজন বসতে লাগল, তখন রাগে দুঃখে আমি তোতা নামটার কবর দিয়েছি। সাবরিনা খান তোতাকে ঝেড়েমুছে এখন শুধু রীনা খান হয়ে টিকে আছি। ...নাও, অত কান্না করে না। এখন

চোখ দুটো মোছ। আচ্ছা, ইনিই, মানে শ্যামল বাবুই তাহলে তোর সেই জাঁদরেল ইঞ্জিনিয়ার সাহেব?'

'আরে না। সেই ধুরন্ধর আদমী একটা বেটার চান্স পেয়ে আসাই বন্ধ করে দিয়েছিল। এক শাঁসালো বাপের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে জার্মানী না কোথায় চলে গিয়েছিল দু'বছরের কি একটা কোর্স করতে। ফিরে এসে প্রথমে ডিরেক্টর, ফাইনালী প্রেসিডেন্ট না কি যেন হবার কথা। তোর এই দুলাভাই, মানে আমার উনি আসলে একজন ডাক্তার'।

'হুম, ইঞ্জিনিয়ারে ফেল মারায় তোমার তো কোন ক্ষতিই হয়নি। রাঘব বোয়াল তো ঠিকই ধরেছ। আমেরিকার ডাক্তার!

তা শেষ পর্য্যন্ত গোঁফওয়ালা বর হজম করতে পারলে? এই ছুঁড়ি, গোঁফওয়ালারা না তোর দু'চক্ষের বিষ ছিল?'

'কেলেমানিক আইটেমটাই বা বাদ দাও কেন? বাব্বা! এত কথাও তোর মনে থাকতে পারে! হ্যাঁ, ও গুঁফো, কেলেমানিক সবই সত্যি। মানলাম এক কালে কাঁচা বয়সে ঐসব আমি দেখতে পারতাম না। কিন্তু বিশ্বাস কর, মানুষটা খুবই ভাল। আমাদের বাড়ীতে আসলে প্রথমে পাত্তাই দিতাম না। ও আমাদের দু'বছরের সিনিয়ার গ্রুপের। এম,বি,বি,এস-এ ফার্স্ট হয়ে তখন নীলরতনে এম,ডি করছিল। এদেশে কার্ডিয়োলজিস্ট হিসেবে অনেক নাম করেছে। আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েসন (এ, এম, এ) এর ম্যাগাজিনে ওর লেখা আর্টিকেল সবাই বেশ সমীহ করে পড়ে'।

'তোকে খুব ভালবাসে, তাই না? তুই ও বাসিস?'

'হেই কতা আর জিগাও ক্যান, বোইন। তুই নিজেই তো লেকচার মারতিস, সত্যিকারের ভালোবাসা জীবনে মাত্র একবারই আসে। বিশেষ করে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। বাকি সব কেবল মানিয়ে নেওয়া। তবে সব মিলিয়ে বেশ আছি। জানিস, ও খুব কেয়ারিং। অত ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও সে আমাকে অনেক সময় দেয়। দেখভাল করে। আমার একটু কিছু হতে দেখলে অস্থির হয়ে যায়। ...তোরটা?'

'তোর মতো সত্যিকারের প্রেম আমার জীবনে কোনদিন আসেনি। তবে কথাটা অবশ্য পুরোপুরি সঠিক নয়। প্রেম এসেছিল, কিন্তু একতরফা। তোর সেলিম ভাইকে অনেক ভাল লাগতো, হয়তো তোর চেয়ে বেশীই লাগতো। কিন্তু সে মনে হয় কোন দিন খেয়ালই করে নি। তোকে নিয়ে মশগুল ছিল। তোর জিনিষে আমি ভাগ বসাব বা তাতে বাগড়া দেব কেমন করে, এই ভাবনা নিয়ে মনের সঙ্গে নিত্য লড়াই করে নিজের ইমোশনটা দাবিয়ে রাখতাম। তারপর তুই চলে যাবার পর, লন্ডন যাবার আগে ওই আমাকে ওর মামাকে দিয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। তোকে অসম্মান করা হবে ভেবে, সেই দারুণ চান্সটা পেয়েও আমি না করে দিয়েছিলাম। আমার প্রেমের সেই চারা গাছটাকে আর বাড়তে দিই নি। পানি দেওয়া বন্ধ করে আমি তাকে শুকিয়ে মেরে ফেলেছি'।

' কিন্তু এই দুলাভাইয়ের চেহারাও তো লালটু, এনাকে দেখে তোর সেই আশ মেটে না? কত পার্সেন্ট অপুর্ণ থাকে?'

'ঐ যে বললি, কমপ্রোমাইজ। খলিল অবশ্যই দেখতে অনেক ভাল, মাশাআল্লাহ। কিন্তু খলিল তো আর সেলিম নয়। তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। তবে ওর একটা জিনিষ আমার খুব ভাল লাগে'।

'কি জিনিস?'

'অনেকটা তোরটার মতো। সুপার কেয়ারিং। আজ পর্যন্ত আমাকে কখনো কিছু চাইতে হয়নি বা হয়না। কেমন করে যেন ও আমার সবকিছু বুঝতে পারে। হয়তো মনে মনে একটু সাজ গোজ করার ইচ্ছা হলো। ও ঠিক পছন্দ হবার মতো শাড়ি, গয়না বা আমার ফেভারিট কোন পারফিউম অফিস থেকে ফেরার পথে নিয়ে আসবে। হয়তো কোন কারণে মনটা ভাল নেই। তো বেড়াতে নিয়ে গেল- সিনেমা, রেস্টুরেন্ট, শপিং মল। তারও বেশী ডিপ্রেস্‌ড থাকলে ও অফিস কামাই করে পাশে বসে থাকে, সেবা যত্ন করে। পাখি, মনে হয় আমাদের প্রথম প্রেম মিস হলেও স্বামী ভাগ্যে আমরা দু'জনেই অনেক ভাগ্যবতী। দ্যাখ, ভালোর অন্য দিকটাও। আমাদের একজন কেউ ইংল্যান্ডের বদলে দু'জনেই আমেরিকায় থাকতে পারছি'।

'আর একটা কথা আছে'।

'বল'।

'আমার ছেলে হলে আর তোর মেয়ে হলে, মেয়েটা আমাকে দিবি। তোর ছেলে হলে আমার মেয়েকে তুই নিবি। নাতি নাতনি হলে আমাদের দুজনের রক্ত তাদের মধ্যে থাকবে'।

'তথাস্তু, শ্রদ্ধেয়া মাতাজী। এখন ওঠ তো। কর্তারা বোধ হয় এতক্ষণে হন্যে হয়ে উঠেছে। লাঞ্চের ব্যবস্থা করতে হবে না?'

'কি, শেষ হলো তোমাদের মান ভঞ্জনের পালা?' খলিল খোঁচা মারে।

'না জাস্ট আরম্ভ হলো। বাকি সারাজীবন ধরে এটা চলবে, বুঝেছ?' রীনার মুখোমুখি জবাব।

পাখিকে নিউ জার্সির প্লেনে তুলে দিয়ে শিকাগো এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিগত দিনগুলোর অনেক স্মৃতিই ভেসে উঠছিল খলিল মিয়ার মনের আয়নায়। কি সুখেই না কেটেছে তাদের তিরিশটা বছর। প্রতি মাসে হয় তোতারা যাচ্ছে নিউ জার্সি, না হয় পাখিরা পাড়ি দিচ্ছে নিউইয়র্কে। পাখিদের কোল জুড়ে এসেছে দেবশিশু। তোতা তার নাম রেখেছে সূর্য। তোতাদের কোল জুড়ে এসেছে বেহেস্তের হুর। পাখি তার নাম দিয়েছে চাঁদনী। কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা বড়ও হয়েছে। দুজনেই খুব মেধাবী। সূর্য্ জনস্ হপকিন্স থেকে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ হয়ে বেরিয়েছে। চাঁদনী কলম্বিয়া থেকে জার্নালিজম করেছে। দু'দিকের মা বাবা বিয়ের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিলে সূর্য একদিন চাঁদনীকে বলল, 'ইউ নো, দিজ গাইজ আর ক্রেজি। তাদের একমাত্র চাওয়া হলো তাদের ছেলে মেয়েরা ডাক্তার হবে আর তাদের এক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে আর এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ে হবে। রিডিকুলাস!' চাঁদনীর জবাব, 'আই এগ্রি। ইউ আর অ্যাবসোল্যুটলী রাইট'। যাই হোক, ছেলে মেয়েরা তাদের মনের মতো সাথী বেছে নিয়ে বেশ সুখেই আছে।

ইতিমধ্যে মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। সময়ের সাথে শুধু বয়সই বাড়েনি। বয়সের হাত ধরে এগুতে গিয়ে চলার পথে আনুসঙ্গিক নানা রোগ শোক, দুঃখ দুর্দশার বেড়া পার হতে হয়েছে। আরও অবক্ষয় এসেছে দুই সংসারে। খলিল তোতাকে হারিয়েছে। পাখিকে রেখে একাই স্বর্গে গিয়েছে শ্যামল। খলিল নানা অসুখ বিসুখ নিয়ে জর্জরিত এবং বৌ হারিয়েও এখনো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তোতা বেঁচে থাকতেই একসময় তারা নিউইয়র্ক ছেড়ে শিকাগো চলে এসেছিল অনেক আগে। পাখিরা সেই নিউজার্সিতেই থেকে গিয়েছে।

পাখির এখন হাই ব্লাডপ্রেসার, বাজে রকমের ডায়াবেটিস, রাতে চোখে ভালো দেখে না। বছর তিনেক আগে হাঁটুতে অপারেশন হয়ে এখন একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। নিজের বাড়িতে একাই থাকে। ছেলে তার কাজের জায়গায় অন্য শহরে মাকে নিয়ে নিজের কাছে রাখার জন্য অনেক জেদাজেদি করে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। পাখি চায় নিজের বাড়ির স্বাধীনতার সুখ। কিন্তু শারিরীক যত অসুবিধাই থাকুক, প্রতি বছর তোতার মৃত্যু বার্ষিকীতে সে নিউজার্সি থেকে শিকাগো আসবেই, উইদাউট ফেল। অনুষ্ঠানের দু'দিন আগে থেকে এসে নিজ হাতে সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তবে তার শান্তি।

মেমোরিয়াল সার্ভিস শেষ হলে, লোকজন সব চলে গেলে, ওরা ফায়ার প্লেসের কাছে তোতার বড় ছবিটার নীচে গিয়ে বসে। পাখি পুরোন দিনের নানা কথা নতুন করে আবার রোমন্থন করে - বলে, জিজ্ঞেস করে, শোনে। তোতার কথা ওঠে, শ্যামলের কথা ওঠে, কথা ওঠে বাচ্চাদেরও। ভবিষ্যতের নাতি পুতির কথাও বাদ যায় না।

কখনও মুখ ফুটে সেভাবে উচ্চারণ না করলেও, খলিলের মাঝে মাঝে মনে হয়, আল্লা ভগবানের কৃপায়, হয়তো ওরা দুজন, দুজনকে ভর করে আজও টিকে আছে। সে ভাবে পাখিরও কি তাই মনে হয়?

শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র

চকোরী মিত্র

মুখোমুখি

নীতি সক্কাল বেলা উঠে পড়েছে। আজ খুব তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। ঝড়ের পর থেকে আবহাওয়াটা খারাপ। এখন ভোর ছ'টা। গাড়ি এলেই বেরিয়ে পড়বে। পথে আরো তিন জন উঠবে। রোহিনী উঠবে বেহালা থেকে, তারপর একে একে সোমা আর পুষ্পেন্দু। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু তাও যেতে হবে। এ যে দায়িত্ব, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। অনেকটা রাস্তা যাওয়া।

গাড়িটা দুলছে, চললে তো দোলা-ই উচিত। এমন ঘুমের ঘোরে আছি সে যেন বুঝতেই পারছি না। পেরোচ্ছে, একে একে সবুজ মাঠ, বড় বড় গাছ। সবটাই তো বড্ড চেনা চেনা লাগতিসে। ওই যে বড় গাছগুলো... তাতে দোলনা লাগিয়ে একটা ফুটফুটে মেয়ে দুলছে। ছেলেবেলা। একটু একটু দেখা যায় যেন। ঘুমের ঘোরে বুঝতে চাইছি এটা কোন রাস্তা কিন্তু যেন চোখ খুলছেই না। এটা কি বাসন্তী হাইওয়ে নাকি ডায়মন্ড হারবার রোড! না না, দুটো তো দুই দিকে যায়। না হতে পারে, মিলছে কোথাও গিয়ে দুই মেরু।

ত্রাণ বিতরণ যেন ঝড়ের গতিতে চলছে। উফ! এক নিমেষে শেষ হইয়ে গেল মনে হচ্ছে। না না, তা কী করে হয়? ত্রাণ মানে তো বাঁচানোর চেষ্টা, তা কি এই কিছুক্ষণ বা একটা দিনে করা যায়! শুধু দু'বেলা দু-মুঠো পেলেই কি দিন যায়? তবে এ তো ফি বচ্ছরের ঘটনা এখন। এখন নাকি ত্রাণ ট্যুরিজম হয় সাহায্যের নামে। কে-ই বা জানে! মেঠো পথ, কাঁচা রাস্তা মানেই তো গ্রামের পথ। তবে পথগুলো পেরিয়েছি যেন। রাস্তাগুলো বড় চেনা মনে হয়, রাস্তা কি সব এক-ই হয় দেখতে?

মানুষগুলো বড্ড কষ্টে থাকে। এক এক নামের ঝড় প্রতি বছর যেন পরিযায়ী পাখির মতো ঘুরতে আসে সুন্দরবন। উলটপালট করে চলে যায়। এ যেন খেলা তাদের। তাদের খেলার খেসারত দেয় মনুষ্যিরা। টেলিভিশনে লম্বা আলোচনা হচ্ছিল কাল। মোদ্দা কথা কে যে কার খেলার খেসারত দেয় বোঝা দায়। তবে এখন এই লোকজনও অনেক কিছু বোঝে, চেকবুকের কোন নম্বরে ব্যাংকে টাকা পড়বে সরাসরি তাও বোঝে। শুনে লোকে ভুরু কুঁচকে তাকায় বৈকি। আমি ভাবি, এতে ভুল কি! সারা জীবন অজ্ঞ হয়ে থেকে যাওয়াটাই বুঝি নিয়ম। অজ্ঞ হলেও তা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। আসলে জীবনটাইতো

সন্দেহের, প্রশ্নের। এই বিষয়গুলোই কতো না কৌতূহলের জনক। এই যে আমার বাড়িতে কাজের মেয়েটি থাকে, মায়া, ওর তো আমার কাজ নিয়ে কতো প্রশ্ন। মেয়েটা বেশি দূর পড়াশোনা করতে পারেনি, কিন্তু কৌতূহলী। মাঝে মাঝেই বাড়ির বইগুলোর জায়গা বদল দেখে তা বুঝি। কিছু বলি না, বললে হয়ত কৌতূহল ঢাকা পড়ে যাবে।

মায়ার কাছে আমি বিখ্যাত মানুষ। আমাকে টেলিভিশনে দেখা যায় মাঝে মাঝে তাই। সামাজিক কাজ করার সুবাদে বেশ ক'বার টেলিভিশনে মুখ দেখাতে হয়েছে বৈকি। বেশ কিছুদিন ধরে এক বন্ধু ধরেছে একটি ডকু ছবি বানাবে, তাতে নাকি আমাকে অভিনয় করতে হবে। আমার তো শোনার পর থেকে চিন্তার শেষ নেই। কিন্তু মায়া শোনার পর থেকে খুব উত্তেজিত। অনেক প্রশ্ন এখন। হয়তো ভেবেই ফেলেছে ওই যে পুরস্কারের অনুষ্ঠানগুলো টিভিতে দেখায়, বৌদি সেখানে উঠে পুরস্কার নিচ্ছে। একদিন উপযাচক হয়ে বলেই ফেলল, আমার যদি মনে হয় আমি অভিনেতাদের বাড়িতে ডেকে একদিন আপ্যায়ন করতেই পারি। ওর কোনো কষ্ট হবে না। বৌদির মান-সম্মান বলে কথা! আমি আবার ওকে বোঝালাম, 'এতো ভাবিস না।' (হাসির ছলে) 'তোমার জানা কোনো নাম করা লোক সিনেমাতে নেই !'

মুখটা গম্ভীর করে মায়া বললে, 'নেই তো নেই, আমি তোমার সম্মান রাখতে বললুম...'

হঠাৎ একটু জানতে ইচ্ছে হলো বোধ হয়, 'তোর কাউকে দেখতে ইচ্ছে হয়? নাকি সিনেমা করতে ইচ্ছে হয়?'

মায়া একটু রাগ করেই উঠে পড়ল কাজ আছে বলে। যাওয়ার আগে শুধু বললো। 'কোনো ইচ্ছে হয় না...'

'গ্রামের মানুষ বলে কি, শহর মানেই আমরা সিনেমা আর নায়ক-নায়িকা বুঝি! নাকি এই আকাশ কুসুম ভাবনা, আমাদের মতো গ্রামের মানুষ-ই করে, শহরের ছেলেমেয়েরা বুঝি ভাবে না! আমি তো ভালো চেয়েই দুটো কথা বললাম। আমরা যেন বোকা আর কিছু বুঝিনে; এটাই নিয়ম।' 'আমিও তো বলতে পারি গ্রামে যারা চাষ-আবাদ করে তাদের সব সময় জানতে হয় কিসে কী সার দিতে হবে, কতটা দিলে ভালো হবে...আরো কতো কী নতুন নতুন জিনিস পড়ে শুনে রাখতে হয়। তবে না ফসল ফলে আর শহর চলে। সেটাও তো আধুনিক পড়াশোনাই বটে। তাহলে গ্রাম্যরা আধুনিক কম কিসে! আর ফেসবুক তো আমরা সক্কলে করি, তা আর কি আহামরি!'

মায়া যেন বলছে এই কথাগুলো মনে মনে আর আমি শুনছি। কোনো উত্তর দিতে পারছি না। শুধু চোখ দুটো কথা বলছে। অনেক সময়ই অনেক কিছু নিয়ে হাসাহাসি করেছি বৈকি। ওর মধ্যে কষ্টটা চাপা পড়েছে রোজ। হয়তো তখন ও মনে মনে বলেছে অনেক কিছু কিন্তু সেদিন আমি শুনতে পাইনি। কিন্তু আজ শোনা যাচ্ছে। ঠিক-ই তো, মেয়েবেলা-ছেলেবেলার স্বপ্ন কি আর খুব আলাদা হয় জায়গা বিশেষে! নাকি এগুলো আমরা ভেবে নিই আমাদের স্বার্থ সন্তুষ্টির খাতিরে।

কাক ডাকছে। কেমন যেন হালকা লাগছে শরীর মন। দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করছি।

'চা কি খাব না? খাব না আমরা চা?' বৌদি ডাকছে।

চোখ খুলছে আস্তে আস্তে, শুয়েছিল মায়া। রান্নাঘর দেখে ঘোর কাটল। রাত পেরিয়ে দিন এখন। উঠে বসতে বসতে ভাবছে, গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে – কিছু ভাবনা, কতক কথা, ক'টা ঘটনা। চট করে চা-এর জলটা বসিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে এলো। জলটা ফোটার অপেক্ষায় সামনে দাঁড়িয়ে। বাথরুমে মুখে-চোখে জল দিয়ে বাকি ঘোরটুকুও কেটে গেছে মায়ার। বুঝতে পারল সবটুকু।

মায়া বুঝল, হয়তো স্বপ্নই একমাত্র জায়গা যেখানে সে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, কথা বলতে পারে। যেখানে সে-ই নীতি, সে-ই আবার মায়া।

শার্লোট, নর্থ ক্যারোলাইনা, যুক্তরাষ্ট্র

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

তৃণাদপি

এই গল্পটি আগে একবার বলা হয়েছিল। তবুও আরো একবার শোনা যায়।

১

পিতামহ যেদিন গৃহত্যাগ করেছিলেন সেদিন বৃষ্টি ছিল। আমার পিতা আমাকে এই কথা বলেছিলেন। প্রচণ্ড বর্ষণে সেদিন ভেসে যাওয়া মাঠ ও শস্যক্ষেত্র কেবল সমুদ্রের আভাস দিচ্ছিল। অবশ্য গর্জন ও ঢেউ ছিল না। বৃক্ষরাজিও অমনি ভেসেছিল, জনপদের মতোই এবং বড়ঘরের চালায় বসে কদিন কাটানো যায় এই ভেবে একদিন বিরক্ত হয়ে পিতামহ চালা থেকে নেমে চলে যান। তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে পিতামহী অনেককাল তাকিয়ে ছিলেন, ধুলো-ওড়া সড়ক পর্যন্ত এবং সেটি পার হয়ে দূর-বন্দরের আবছা সীমানা যেখানে, সেদিকেও। সাতদিনের প্রচণ্ড বর্ষণের পরে তাঁর মনে হয়েছিল, যদি এই প্রপাত না-থামে। শিহরিত তিনি দেখেছিলেন, ক্রমে পুকুরের মাছ দিব্যি হেঁটে নদীর দিকে চলে যাচ্ছে আর পুকুর ও নদীর মধ্যবর্তী সবুজ রং পালটানোর জন্য প্রস্তুত। 'যদি বৃষ্টি না-থামে' এই কথা ভাববার পরেই আকাশ আরো অন্ধকার হয়েছিল। তখন তিন সুখী শৃগাল ও সর্পরাজ ভিন্ন ডাঙার দিকে চলে গেলে তিনি তালগাছের শীর্ষে কোনো বাবুই দেখেননি। যদি বৃষ্টি না-থামে এই কথা ভাববার পরে গৃহতক্ষক তিনবার শব্দও করেনি। তখন তাঁর চলে না গিয়ে কী উপায় ছিল। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পরদিনই নাকি সূর্য উঠেছিল। তখন সকলে কীভাবে তিনি চলে গেলেন একথা নিয়ে অনেক বলাবলি করে। পিতামহী বলেছিলেন, প্লাবনভূমির ওপর দিয়ে হেঁটেই তিনি চলে যান। জলপৃষ্ঠে পদযাত্রা কী সম্ভব – এ-প্রশ্ন কেউ কখনো করেনি, বরং তিনি যেদিকে চলে যান সেই দিকে, ঠিক মাঝখানে, দুপাশ থেকে মাপলে ঠিক মাঝখানে, বিশাল অগ্নিগোলক সকলেই দেখেছিল – বুঝি তাঁর চলে যাওয়ার পরেই। কেন তিনি চলে যান সে-কথা অনেকেই জানে না। সুজানগর থেকে তিন পালের তিন নৌকায় তাঁর জিনিস এসেছিল এ-কথাই সকলে জানে, এবং সেই সব মহাপ্লাবনে ভেসে গেলে তাঁর আর কী করার ছিল? সাতটি বিশাল কাঠের সিন্দুকের কথাও অনেকে শুনেছিল; কিন্তু চোখে

দেখেছিল কেবল একটি কালো তোরঙ্গ মাত্র। অবশ্য অনেকে বলেন, সুজানগর নয় বেলকুচি থেকে মাত্র একটি কাঠের সিন্দুকই এসেছিল তাঁর, লেপ-তোশক এবং কাঁসা-পিতলের হাঁড়িকুড়িতে বোঝাই। কাঁসা-পিতল ছিল নিঃসন্দেহে, না-হলে মফস্বল শহরের ভাড়া করা বাসা থেকে চটের থলিটিতে কী নিয়ে যেতেন পিতা বাসনের দোকানে? তাঁর ভগিনীদ্বয় 'ভাত খাওনের একটা থালও পাইলাম না' বলে ক্ষীণ বিলাপ করলেও পিতা কখনো রাগী ছিলেন না। সর্বদা কেবল ওই কালো তোরঙ্গটিকেই দেখাতেন তিনি। যদিও সেটিতে কী আছে জানতো না কেউ।

২

'যদি বৃষ্টি না-থামে' এই চিন্তা পিতামহের মাথায়ই প্রথম এসেছিল বলে শোনা গেলেও আমার বিশ্বাস পিতাই প্রথম স্তব্ধ, গম্ভীর হয়ে বৃষ্টির সামনে বসে থাকতে থাকতে অমন চিন্তা করেছিলেন। অনুমান করি, ওই চিন্তার সময়ে তিনি বারান্দায়ই তাঁর কাষ্ঠাসনে বসা। আসনের অশক্ত পশ্চাদ্ভাগ টিনের বেড়ার সঙ্গে ঠেকানো। সদর রাস্তা দেখা যেতো ওই বারান্দায় বসলে। সদর রাস্তা থেকে নৌকাটি মোড় নিয়ে আমাদের পাড়ার রাস্তায় এসেছিল এবং পরে আমাদের উঠানে। ছোট ছোট ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ করে বারান্দার ওপরেই উঠে আসে বুঝি-বা। বন্দরও তখন জলপ্রপাতাক্রান্ত এবং স্বয়ং চিকিৎসকই চিকিৎসাকাঙ্ক্ষী – এই খবর দিয়ে নৌকারোহী দূত চলে যায়। তখন আবার বড় বড় ঢেউ নৌকাপৃষ্ঠে আঘাত করে এবং জলপ্রপাতের বড় বড় ফোঁটা দূতপ্রবরের সর্বাঙ্গে, তার নৌকার গলুইয়ে এবং তার পাশের একরকম মেটেনীল তরল জাজিমে দ্রত পড়তে থাকে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না-পারায় তখনই বুঝি তাঁর মনে এসেছিল 'যদি বৃষ্টি না-থামে?' এর জন্যে তাঁকে খেসারত দিতে হয়েছিল। তাঁকেও গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল।

একটি মাত্র নৌকাতেই সব তুলেছিলেন পিতা। অনুমিত কাঁসা-পিতল ইত্যাদিতে ভরা সিন্দুকটিসহ তোরঙ্গটিও। কী ছিল ওই তোরঙ্গে, কি কাঠের সিন্দুকে – কেউ দেখেনি। অবশ্য বিপত্নীক প্রৌঢ় যে বিপুল স্বর্ণসম্ভার সঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন এমন কেউ মনে করেনি। তবুও সকলের চোখের সামনে না-দেখা কাঠের সিন্দুক কতিপয় কি এক কালো তোরঙ্গ তাঁর নৌকায় তোলা উচিত হয়নি। উচিত ছিল তাঁরও ওই প্লাবনকালেই যাত্রা শুরু করা। জলপৃষ্ঠে পদযাত্রা সম্ভব না হলেও জলপৃষ্ঠে নৌযাত্রা অনেক সহজ ছিল। কিন্তু হেমন্তের ধানকাটা প্রান্তর ধুধু করবে তরণীর দুপাশে বুঝে উঠতে পারেননি কেরায়া জোগাড় করতে সময় কেটেছিল বলেই। আর তাই খানপুরের মোহনায় বড়ো গাঙ ছেড়ে নদীতে উঠবার মুখে নৌকাটি আটকে যায়। খরায় এই চরার দুপাশে নদীর ধারা শীর্ণ – যারা জানতো তারা আদৌ বিস্মিত হয়নি। অমনই হওয়ার কথা। নৌকা ঠেলে অগভীর ধারা পার করাবার জন্য কাঠের সিন্দুকটি তীরে নামাতে হয়েছিল। তোরঙ্গটিকেও। মফস্বল শহরের দুই ঘরের ভাড়া বাসায় সবকটি সিন্দুক রাখবার জায়গাও হয়তো ছিল না। এজন্যে সিন্দুকটির মালামাল আমি কখনো চোখে দেখিনি। কিছু তো ছিল নিশ্চয়ই।

কালো তোরঙ্গটিতে। সেটি তো চোখে দেখেছি। এমন তো ভাবাই চলে যে খুলে না-দেখলেও অজ্ঞাত বস্তু ঠিকই ছিল। তাছাড়া মফস্বল শহরের এ-বাসা থেকে ও-বাসা বদল করার সময়ে সবকটি সিন্দুক কি তোরঙ্গ যে সঙ্গে যাবেই এমন না-ও হতে পারে। আর দু-ঘরের বাসা যখন একঘরে নেমে আসে পুত্রদুটিকেও যখন কাছে রাখা যায় না, অন্যের আশ্রয়ে দিয়ে দিতে হয়, তখন সিন্দুক কি তোরঙ্গের খবর কে রাখে।

নৌকাযাত্রায় ভিন্ন শহরে আসবার পরেই দুটি ঘটনা তাঁকে বিভ্রান্ত করে। তাঁর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণ এবং উপার্জনহীন জীবন। কাঠের সিন্দুক যে-কটাই থাকুক তাদের অন্তর্গত মালামাল জীবনকে অনেক দূর নিয়ে যায় না।

৩

একটু আগে তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন। উঠে, মাথার বালিশের নিচে হাত দিয়ে একটা লাল রঙের চ্যাপটা কৌটো আর দেশলাই বের করেছেন। তারপর বিড়ির ধোঁয়ায় যখন ঘরের মধ্যেকার ভোরের আলো আবছা হয়ে আসে তখন বিছানা ছেড়ে ওঠেন। ঘরে ভোরের আলো একেই তো কম আসে, তার ওপর বিড়ির ধোঁয়া, পাশে শোয়া সঙ্গিনী এতোক্ষণ নাক-মুখ ঢেকে শুয়ে থাকলেও আর পারে না। উঠে বিছানা থেকে নেমে দ্রুত হাতে জানালা খুলে দেয়। 'খুলো না, খুলো না' বলতে বলতেই জানালা দিয়ে আসা আলো দিনকে স্পষ্ট করে। প্রায় আতংকিত তিনি দ্রুত প্রাতকৃত্যঃ সমাপনের জন্যে দরজা খুলে বাইরে যান, ফিরে আসেন এবং রাতের খুলে রাখা পোশাক আবার পরে নেন। সামান্য আহার্য কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা না-করেই সদর দরজা খুলে বাইরে পা রাখেন এবং সামান্য এগোলেই যার মুখোমুখি হন তাকে এড়ানোর জন্যেই প্রাতঃভ্রমণের আয়োজন।

'এই যে, এতো সকালে, কোথায় চললেন?' প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকাতেই হয় এবং সামান্য হাসির সঙ্গে 'এই একটু হাঁটাহাঁটি আর কী।' কথা শেষ হবার আগেই 'তা হাঁটুন, আমার কথা মনে আছে তো?' বলে অপরজন তাকে থামিয়ে দেয়। রাস্তার মাঝখানে বসে পড়াই হয়তো উচিত ছিল তাঁর; কিন্তু এমন করা যায় না ভেবে মহাজনের হাত দুটি ধরতে একটু এগিয়ে যান, 'আর দুটি দিন।'

'অনেক হয়েছে, আর নয় – যা করার করুন।'

চোখ বন্ধ করে ঘরের চারপাশ দেখেন তিনি। না-দেখা কাঠের সিন্দুকটি এবং কালো তোরঙ্গটিতে চোখ পড়ে তার। তখন আর কিছুই করার থাকে না।

৪

বাসা থেকে কোমরে দড়ি বেঁধেই নাকি পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে। ছাড়পত্রের দরখাস্তে ভুল ঠিকানা ব্যবহার করা এতো বড় অপরাধ, জানা ছিল না তাঁর। তাই পাড়ার শেষে ঘাসের জাজিমপাতা মাঠটুকুও পার হতে অনেক সময় লেগেছিল তাঁর। কেননা

পায়ের নিচে চাপা পড়া ঘাস কোনোমতে মাথা নিচু করতে চাইছিল না। শুনেছিলাম থানা থেকে বেরিয়ে সোজা ঘরে আসেন তিনি। কারো সঙ্গে দেখা না-করেই। পরদিনই বড় শহরে এবং সেখান থেকে ভিন্ন ছাড়পত্র সংগ্রহ করেই নদীর ওপারে চলে যান। আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, কালো তোরঙ্গটি বড় শহরের এক পরিচিতের কাছে রইলো, যদি মনে হয় নিয়ে যাই যেন। কৈশোরে পরাশ্রয়ী, যৌবনে অনিকেত আমার ওই তোরঙ্গর কোনো প্রয়োজন ছিল না। রাখবার কোনো স্থান ছিল না এজন্যেই হয়তো।

৫

'বৃষ্টি যদি আর না-থামে' এই কথা কয়েকবার অস্ফুটে বলেছিলাম। রিকশার পাদানি মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছিল, এই জুতোজোড়া নিয়ে যাওয়া যাবে না জানতাম তবুও পা দুটো উঁচু করে সিটের ঠিক নিচে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। এতে বরং বিপদ আরো বেড়েছিল। চোরাগর্তে চাকা বসে গেলে সদ্যকৃত পোশাকটি জলপৃষ্ঠে নেবে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল কয়েকবারই। আর তখনই আরো একবার 'যদি বৃষ্টি না-থামে' অস্ফুটে বলেছিলাম। ঘরে পৌঁছে সে-কথা আবার বললে আশপাশের কেউ চিন্তিতস্বরে বলে, 'না মুশকিল হবে মনে হচ্ছে।' আর কিছুক্ষণ বৃষ্টি হলে তো গাড়িও যেতে পারবে না। আর গেলেই-বা কি, স্রোত যদি এ-পাশ দিয়ে এসে ও-পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় ইঞ্জিনের ওপর দিয়ে, তাহলে কী করা যাবে। 'ইঞ্জিনে জল ঢুকলে গাড়ি তো এক পাও নড়বে না।' যে-বন্ধুর বদান্যে যানটির ব্যবস্থা হয়েছিল সে নিজেই যদি ঘর থেকে বেরুতে না-পারে, পাঁচ-মাথার মোড়ের সাগর যদি ঢেউয়ে উন্মাতাল হয়, তখন কী করা?

তিনদিন আগেই ভুলটি করেছিলাম। সমুদ্রযাত্রার কারণেই সম্ভবত বড় ঘরের চালা থেকে নেমে জলপৃষ্ঠে পদযাত্রার কথা মনে পড়েছিল এবং প্রথমে শব্দ করে নয়, নিঃশব্দেই বলেছিলাম, 'যদি বৃষ্টি না-থামে'। সে-কথাও নিশ্চয়ই কেউ শুনেছিল, তাই পরমুহূর্তেই গাছপালার মাথা কাঁপিয়ে ধোঁয়াটে চাদরে তাদের ঢেকে নিয়ে আরো জোরে এসে জানালায় আঘাত করেছিল বারিধারা, ঝড়ো বাতাসকে সঙ্গে নিয়ে। 'তুমি গিয়েই বাসা ঠিক করবে কিন্তু,' সন্তানটির হাত ধরে তার মা আমাকে বলেছিল। জানালার ফাঁক দিয়ে গলে আসা বৃষ্টির ছাঁট হাতে ধরার চেষ্টায় ছিল শিশুটি। আমি তার দিকে তাকিয়ে 'একসাথে গেলেই ভালো করতাম, জানো' বলি। 'না, আত্মীয়ের গলগ্রহ হবো না।' একই কথা। সে-ও বলে, আমিও বলি। অথচ এমন করে থাকা যায় না। সে-ও জানে, আমিও জানি। 'কিন্তু একা কী করে গোছাবে সব?'

'যা পারি নেব। আর কিই-বা আছে নেবার। কিছু বিক্রি করতে না-পারলে বাড়িওয়ালা নেবে।'

যাত্রার এখনো কয়েক ঘণ্টা বাকি, গলির মুখ থেকে তোড়ে ছুটে আসছে স্রোত – ঢেউ নিয়ে। একটির ওপরে আর-একটি। হাঁটু ডুবেছিল অনেক আগেই। এখন কি ডুববে কোমর? বাক্স দুটি গোছানো প্রায়। শেষ মুহূর্তে যদি কিছু ঢোকাতে হয়, এজন্যে তালা লাগানো হয়নি। শুভার্থী যাঁরা বিদায় জানাতে এসেছিলেন প্রফুল্লতার মাঝেও তাঁদের

মুখে উদ্বেগ দেখা যায়। ঘরে তো ফিরতে হবে সবাইকেই। 'এখন যা মনে হচ্ছে, ফেরার পথে রিকশাও পাওয়া যাবে না। সিএনজি তো নয়ই।' এই গলির স্রোত ঠেলে বড় রাস্তায় গিয়ে সেটি ধরাও খুব সহজ নয়। সদা আমুদে বন্ধুটি জানালার শার্সির প্রায় ভেঙে পড়ার আওয়াজকেও হাসিতে উড়িয়ে দিতে চায়।

'আজ না-হয় কাল বৃষ্টি তো থামবেই। এত ভাবনা কিসের?' বর্ষাতি গায়ে ছাতা মাথায় গাড়ির মালিক সুহৃদ দরজা দিয়ে ঢোকে। 'ওঃ কি বৃষ্টি! তোমাদের রাস্তায় ঢোকাই যায় না প্রায়।' আমি বিভ্রান্তের মতো তাকাই। এবারে স্পষ্ট করে বলি, 'যদি বৃষ্টি না-থামে।' আর তখনই, ঠিক তখনই কালো তোরঙ্গটির কথা মনে হয়। এই শহরে হয়তো আমার অনেককাল আসা হবে না। হয়তো কখনোই নয়। তাহলে তোরঙ্গটি? বন্ধুকে বলি, 'শেষ কাজটি করে দাও ভাই। আমার কালো তোরঙ্গটি এনে দাও। নিয়ে যাই।'

পরম বিস্ময়ে কারো মুখে কথা আসে-না যেন। যদিও কালো তোরঙ্গটির কথা সবাই জানতো।

'কী আছে ওর মধ্যে? এই বৃষ্টিতে, ঝড়ে কোনোমতে সেটি আনা যাবে না।' স্ত্রীও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। যদিও সে জানে আমি আর ফিরবো না। একাই যেতে হবে তাকে আমার কাছে। এতোকাল পরেও দেখি, কিছুই মোছেনি, কিছুই ঝাপসা নয়। জলপৃষ্ঠে পদযাত্রার সব দৃশ্যই যেন দেখতে পাই আমি।

'জানি ওতে কিছুই হয়তো নেই। তবুও ওটিকে নিয়ে যাই।' যাত্রার তখনো বেশ দেরি আছে। গন্তব্যও বেশি দূরে নয় ভেবে বন্ধুর সঙ্গে বেরোই। ডোবা রাস্তায় অস্বস্তিকর আওয়াজ তুলে গাড়িটি যেতে থাকে। গন্তব্যে পৌঁছে দেখি বাড়ির সামনের ঘাসের লন বৃষ্টিতে ডোবা। সেটি পার হয়েই ঘরে ঢুকতে হয়। পায়ে চলার রাস্তাটি কোনোমতে নজরে পড়ে না।

জলে ডোবা ঘাসের জাজিম মাড়িয়েই না-হয় গাড়িতে উঠবো ভেবে তোরঙ্গটিকে নিয়ে বারান্দা থেকে নামি। অতি মহার্ঘ্য কি অতি তুচ্ছ কিছুরই ওজন থাকে না – এটিরও ছিল না। তাই সহজেই বারান্দা থেকে নামি। আর ঠিক তখন, জলে-ডোবা-ঘাসে পা রাখার মুহূর্তে পিতার কথা মনে পড়ে – একটি তৃণশীর্ষও তাঁর পায়ের নিচে চাপা পড়েনি বলে তিনি তোরঙ্গটিকে সঙ্গে নিতে পারেননি। তবুও ঘাসে পা রাখি। চোখ বুঁজি – যেন না-দেখি একটি পা তুলে আর-একটি পা পাতার মুহূর্তে তৃণশীর্ষ মাথা নোয়ায় কি-না। নাকি ধমক দিয়ে বলে, 'অমন করে কে যায়? কে যায়? কে?'

পোর্ট সেইন্ট লুসি, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

তাসনীম হোসেন

এলিয়েন

মেজাজটা সকাল থেকেই খারাপ হিং-এর। এইদেশে মানুষ আসে? প্রফেসর আর কোন জায়গা পেল না আসার। স্পেসশিপ ল্যান্ড করার মত খোলা জায়গাই পাওয়া ভার এই দেশে। সুখ নিয়ে রিসার্চ করবি তো কোন ভালো জায়গার যা, তা-না শেষ পর্যন্ত আসলি এই দেশে। প্রফেসর টিং-কে একটা ভেংচি কেটে কম্যুনিকেশন মডিউলটা খুলে বসল তিয়েনটান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হিং। কাজ শুরু হতে বাকি আছে আরেকটু সময়। হিং-এর পাতলা ছিপছিপে নীল রঙের শরীর, কান দুটো একটু লম্বা, এছাড়া বাকি সব কিছুই মানুষের মত। গত একশ' বছর ধরে পৃথিবীতে শুভেচ্ছার বাণী আর গবেষণার উদ্দেশ্যে আসছে আংটাং গ্রহের বাসিন্দারা। একুশশো বেয়াল্লিশ সালের পৃথিবীর মানুষ আর ভিনগ্রহের মানুষের ভয়ে ভীত নয়। দুই গ্রহের সম্পর্কে কোন টানাপোড়েন নেই, যদিও শুরুতে পৃথিবীর মানুষ একটু সন্দিহান ছিল আংটাং-এর বাসিন্দাদের উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সেটাও আজকে ইতিহাস। তিয়েনটান বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ টিমগুলো প্রায়ই আসে এই পৃথিবীতে, এবারের রিসার্চ মিশন হচ্ছে মানুষের সুখের পেছনের ডিএনএর ফ্যাক্টরগুলো এ্যানালাইসিস করা।

হিংয়ের কম্যুনিকেশন মডিউলে ভেসে এসেছে ছটের ছবি। অনেক দূরের গ্রহের নীলাভ মাটিতে বসে আছে হিংয়ের প্রিয়তমা ছট। এই সময়টা সবাই ছুটিছাটায় নানান দিকে যায়, হয়ত ছটও গিয়েছে কোথাও। কোথায় এটা, আশে-পাশে বেগুনি রঙ দেখে মনে হচ্ছে অরণ্যের কাছাকাছি কোথাও, রাংজিবের কাছে কোথাও নাকি?

'কেমন আছ হিং?' হিংয়ের চিন্তাভাবনায় বাধা পড়ল ছটের প্রশ্নে ।

'এই আছি আর কি?' দায়সারা জবাব হিংয়ের।

'কেমন লাগছে পৃথিবী?'

'কেমন আবার লাগবে?' একটু বিরক্তি নিয়েই জবাব দেয় হিং।

'আমার সময়েই বাজেট কাট। অন্যসময় দলবল নিয়ে পৃথিবীর ভালো ভালো জায়গায় যাওয়া হয়, এবার বাজেট কাটের জন্য শুধুমাত্র দুইজন মিলে এই দেশে আসা। এই বাজেটের কারণেই পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা আর নোংরা ল্যান্ডিং স্ট্রিপে নামতে হয়েছে।

এটাতে আসে কেউ, রীতিমত পোড়াকপাল না হলে?' এক নিঃশ্বাসে যেন ক্ষোভটাকেই ঝেড়ে দেয় হিং।

'আর গবেষণার সাবজেক্টের খোঁজার জন্য একটা বিজ্ঞাপণ দেওয়া দরকার, ইন্টার গ্যালাক্টিক বিজ্ঞাপণের অনেক খরচ, এই লোকগুলো ব্যবসা ছাড়া আর কিছু বোঝে না, অন্য গ্রহের লোক বিজ্ঞাপণ দিতে গেলেই খরচ হয় দশগুণ। ভালো কোন পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ না দিয়ে প্রফেসর টিং কোথায় বিজ্ঞাপণ দিলেন? একটা ব্লগে...আরে এই ব্লগ পড়ে কয়জন লোক? এখনতো গবেষণার সাবজেক্ট খুঁজতে হবে হাতে হারিকেন নিয়ে।' ক্ষোভটা যেন কিছুতেই কমছে না হিংয়ের ।

'আহ...মাত্র কয়েকটা দিনইতো' ছটের গলায় যেন মধু ঝরে পড়ছে। 'দেখতে দেখতেই কেটে যাবে'। এরপর তুমি ফিরলেই আমরা ঘুরতে যাব...'

কথা শেষ না হতেই কম্যুনিকেশন মডিউলে ভেসে উঠল প্রফেসর টিংয়ের চেহারা। একটু উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে মনে হয় বুড্ডা মিয়ার মুখে।

'হিং একটু আসো তো এরিয়া সি-তে।' কিছুটা আদেশের মত শোনাল প্রফেসর টিংয়ের কথাটা।

ছটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হিং রওনা হল এরিয়া সি-এর দিকে। ছোট মহাকাশযান, যেতে দুই মিনিটের বেশি লাগল না। এরিয়া সি আসলে এই মহাকাশানযানের বৈঠকখানা বলা যায়। বিশ ফুট বাই বিশ ফুট বর্গাকৃতির একটা ঘর, কয়েকটা দুধ-সাদা চেয়ার পাতা। এইখানেই শুরু হবে গবেষণার সাবজেক্টেদের ইন্টারভিউ। তবে সেটা শুরু হতে আরো ঘন্টা খানেক বাকি। তাহলে কি জন্য ডেকেছেন প্রফেসর হিং?

'তুমি তো বিজ্ঞাপণ দিয়েছিলে একটা ব্লগে, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার, এরা যে পয়সা চায় তাতে ভজঘট ডট কম ছাড়া আর কোথাও দেওয়া যায়নি এই বিজ্ঞাপণ। কেন স্যার, কি হয়েছে?'

'এই বিজ্ঞাপণতো কারো চোখেই পড়ার কথা না...কিন্তু বাইরে এত লোকজন কেন?' প্রফেসর টিংয়ের কণ্ঠে বিস্ময়।

বাইরে উঁকি দিয়ে হিং দেখে প্রফেসরের কথাই ঠিক। ডকিং এরিয়ার বাইরে হাজার খানেক লোক জমা হয়েছে। ভিড়টা মনে হয় বাড়ছে। নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কালো পোশাক পরা একদল লোক ঘোরাঘুরি করছে। হিং কম্যুনিকেশন মডিউলের ওয়েব ইন্টারফেসে গিয়ে দ্রুত বিজ্ঞাপণটা বের করে।

আংটাং গ্রহের তিয়েনটান বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান জেনেটিক্স বিভাগে 'সুখের ডিএনএ ম্যাপিং' প্রজেক্টের গবেষণার জন্য সাবজেক্ট খোঁজা হচ্ছে। প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে বাছাই করা হবে। আগ্রহী ভলান্টিয়ারদের আংটাং গ্রহে তিনমাস থাকতে হবে এবং এই সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ তিয়েনটান বিশ্ববিদ্যালয় বহন করবে। ভলান্টিয়ারদের আকর্ষনীয় অর্থনৈতিক প্যাকেজ দেওয়া হবে এবং প্রজেক্ট শেষে আংটাং

গ্রহে ভ্রমণের জন্য বিশেষ সুবিধাও আছে।
'স্যার কোন ভুল হয়েছে?'

'না, না, না, এই বিজ্ঞাপনের ড্রাফটতো আমি দেখেছি আগে। আমাদের যে বাজেট, এবার ধনী দেশগুলোর ভলান্টিয়ার কাউকে নিতে পারবো না, তাছাড়া ওই দেশগুলোর স্পেসশিপ ডকিং ফি, বিজ্ঞাপণের খরচ এগুলো দিতে গেলে আমার প্রজেক্টই বাতিল করতে হয়। সব হিসেবে এই বাংলাদেশই বেশ ভালো চয়েস ছিল। এদিকে কখনো আসাও হয়নি। কিন্তু এই অখ্যাত ব্লগের বিজ্ঞাপণ দেখে এত লোক কেন? এই ব্লগের বাকি সব পোস্টে হিট দেখাচ্ছে দুইশ'র ঘরে আর এই তোমার বিজ্ঞাপনে বাইশ হাজার কেন?' একটু চিন্তা প্রফেসরের কণ্ঠে।

হঠাৎ এরিয়া-সিয়ের কম্যুনিকেশন মডিউলের ভেসে উঠে ইনকামিং কলের ইঙ্গিত। এটা বাইরে থেকে, স্থানীয় নিরাপত্তার লোকজন। ট্র্যান্সলেটরটা অন করে দিয়ে গুরু-শিষ্য আলাপ শুরু করেন।

'স্যার আমি মেজর আলাউদ্দীন, র‍্যাবের সাথে আছি।' ধাতব অনুবাদিত কণ্ঠ শোনা যায়। ছোট একটা রেফারেন্স ভেসে আসে মডিউলের স্ক্রিনের ফুটনোটে।

র‍্যাব এই দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত প্যারামিলিটারি বাহিনী, জনগণের প্রচুর আস্থা এই বাহিনীর উপর, যদিও এদের বিরুদ্ধে...
স্কিপ বাটনটা চেপে ধরেন প্রফেসর টিং। মিলিয়ে যায় ফুটনোট। মনে মনে একটা গালি দেয় শিষ্য হিং, আরেকটু জানা ইচ্ছে ছিল র‍্যাবের গল্প।

'সুদূর আংটাং গ্রহের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন অফিসার। আমরা শুভেচ্ছা মিশনে আপনাদের পৃথিবীতে এসেছি। রোজেন-আইনস্টাইন ব্রিজের সার্থক প্রয়োগ এই সফর, আমাদের এবং আপনাদের বিজ্ঞানের পিপাসাকে...'

হিংয়ের মুখ দিয়ে হয়ত একটা গালি বেরিয়ে যেত এবার, কিন্তু বাধা দিলেন আলাউদ্দীন।

'স্যার, ইন্টারভিউটা কি একটু তাড়াতাড়ি শুরু করা যায়? ভিড় সামলাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে আমাদের। ডিউটিতে বেশি লোক নেই আজকে, কয়েকজন আবার ছুটিতে আছে।
'

'অবশ্যই অবশ্যই, ইন্টারগ্যালাক্টিক নিয়ম অনুযায়ী আমরাতো আপনাদের লোকের কোন তালিকা করতে পারি না। আপনার লিস্ট অনুযায়ী প্রার্থীদের পাঠিয়ে দিন।'

'হিং, দ্রুত কোয়ারেন্টাইন এরিয়াটা রেডি কর। শুনলেতো লোকজন আসছে।' ব্যস্ত কণ্ঠে প্রফেসরের আদেশ।

হিং কাজে লেগে পড়ে। এরিয়া-সিয়ের অর্ধেক অংশ কাচের মত পাতলা একটা জিনিস দিয়ে আলাদা করে, দুটো ভাগ হয়ে যায় তাদের এই বৈঠকখানা। এক অংশে গুরু আর শিষ্য, আর অন্য অংশে ভলেন্টিয়ার হতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা। কম্যুনিকেশন মডিউল দুই অংশেই আছে সুতরাং কথা বলতে অসুবিধা নেই। এবার অপর অংশের বাতাসের চাপ, তাপমাত্রা আর অক্সিজেন লেভেল পৃথিবীর সমান লেভেল নিয়ে আসা, কাজটা

করতে মিনিট দুয়েক লাগলো। এই গ্রহের মানুষেরা পানি পান করে, তাই এক্সডিপি-১১ রোবট দিয়ে টেবিলের উপর পানির বোতল আর গ্লাস রাখা হোল। এরা ফুল ভালোবাসে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিতে তৈরি একগুচ্ছ গোলাপ ফুলও দেওয়া হল। ধাতব মহাকাশাযানের ক্ষুদ্র এই অংশে মোটামুটি পৃথিবীর মানুষের পছন্দসই একটা ছোট ঘর তৈরি হল মাত্র কয়েক মিনিটেই।

মহাকাশযান থেকে স্বয়ংক্রিয় ছোট গাড়িটা বের হয়ে গিয়েছিল আগেই। প্রায় আধা-মাইল দূরে মানুষের সারি দেখা যাচ্ছে, আর তার একটু পেছনেই ময়লা ময়লা বাড়ি ঘর। মহাকাশযান ল্যান্ডিং স্টেশনের এত কাছে বাড়িঘর গুরুশিষ্য কেউই দেখেনি। বাড়িগুলোর পেছনে যে আকাশটা দেখা যাচ্ছে সেটার অবস্থা প্রায় বাড়িগুলোর মতই। ভাগ্যিস তাদের বাইরে যেতে হচ্ছে না, হিং ভাবল।

'হুম, দেখেছ, ল্যান্ডিং স্টেশনের এত কাছে জনসমাবেশ বাড়ি ঘর! ইন্টারগ্যালাক্টিক নীতিমালার কোন একটা ধারায় বলা আছে যে স্টেশনের এত কাছে কোন স্থাপনা করা নিষেধ।'।গুরুর গলাটা মনে হয় শুকনো শোনাল এইবার।

নাহ, এই বুড়োটা নীতিমালা ছাড়া মনে হয় আর কোন কথাই জানে না। সবাইকে নীতিমালা শেখানো গুরুদায়িত্বটা মনে হয় ওরই হাতে।

'ক্যান্ডিডেট আইডি ০০০১, এখানে হাজির, সিকিউরিটি ক্লিয়ারড।'।বাইরে থেকে স্পেসশিপের ইন্টালিজেন্ট সিকিউরিটি মডিউলের ঘোষণা শোনা যায়।

'দরজাটা খুলে দাও।'

খুলে গেল ধাতব দরজা। কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ। মানুষটার হাতে একটা কাগজের পোটলা, হাবেভাবে ফুটে উঠছে ভয়মেশানো সমীহ। কালো একটা কাপড়ে ঢাকা সারা শরীর।

'ক্যান্ডিডেটের নাম সাবিহা বেগম, বয়স ২৯, মহিলা।'।ধাতব কণ্ঠের ঘোষণা।

'আপনি আসন গ্রহণ করুন ম্যাডাম।' প্রফেসর টিং মাপা অনুরোধ জানান।

মেয়েটা একটু ইতস্তত করে বসে পড়ল নরম চেয়ারে। মুখের কাপড়টা সরাতেই ভেসে উঠল একটা মায়াকাড়া ভীত মুখ।

'আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন, আমাদের উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যা করি ম্যাডাম। আমি আংটাং গ্রহের তিয়েনটান বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান জেনেটিক টেকনোলজির হেড প্রফেসর টিং, আমার সাথে উপস্থিত আছে আমার ছাত্র হিং। আমরা মানুষের বেসিক অনুভূতি নিয়ে গবেষণা করছি অনেকদিন। মানুষের দুঃখ, সুখ ইত্যাদি মৌলিক অনুভূতির জেনেটিক ম্যাপ বের করার চেষ্টা করছি। এই ফলাফল আমরা আপনাদের বিজ্ঞানীদের সরবরাহ করব যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে আরো নিখুঁত মানুষ তৈরি করতে পারেন। ইন্টারগ্যালাক্টিক নীতিমালা অনুযায়ী আমরা মানুষ নিয়ে রিসার্চ করতে পারি শুধু তখনই যখন এটা মানবজাতির কল্যাণে আসে। আমরা প্রযুক্তিতে আপনাদের চেয়ে একটু এগিয়ে আছি কিন্তু প্রযুক্তির আদান-প্রদানের মাধ্যমেই সভ্যতা এগিয়ে যায়। তাছাড়া আমরা নিজেরাও আগ্রহী আপনাদের ব্যাপারে জানার জন্য। এই মিশনটা শেষ

করতে আপনাদের সময়ের হিসাবে তিন মাসের মত লাগবে। আপনি রাজি থাকলে আমরা কিছু ছোট টেস্ট করব আপনার উপর।'

'স্যার আমাকে আপনারা এইখান থেকে নিয়ে যান, দোহাই আপনাদের।' মেয়েটা প্রায় আতর্নাদ করে উঠল। 'এখানে মানুষের থাকা সম্ভব না স্যার। পশু... পশুও থাকতে পারবে কিনা জানি না। তিন মাস বাসায় পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই যে কতদিন ধরে। স্যার খাওয়া নেই, পানির কষ্ট, গরমে সেদ্ধ হই, মশা আর পোকার জ্বালায় টিকতে পারি না। বাচ্চাটা মরেছে কয়েক বছর আগে, জামাই পালিয়ে বেঁচেছে। আমি মেয়েমানুষ, মনে হয় এই দেশে জন্মে পাপ করেছি, স্যার আমাকে বাঁচান। আপনাদের সাথে নিয়ে যান আমাকে।' সাবিহা বেগম একনাগাড়ে বলে গেলেন।

'আপনি ভুল করছেন ম্যাডাম, আমরা একটা স্পেসিফিক মিশনে এসেছি ম্যাডাম, মাত্র তিন মাসের জন্য কিছু ভলান্টিয়ার নেব। ইন্টারগ্যালাক্টিক নীতিমালা অনুযায়ী আমরা দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারি না।'

'স্যার...প্লিজ, আমি জানি আপনারা কে। এই দেশে মেয়েদের পড়াশুনা নিষেধ, বোরখা ছাড়া বের হওয়া যায় না। নিজে নিজে সামান্য লেখাপড়া শিখেছি আমি। বাবার ইচ্ছা ছিল বিদেশে পাঠিয়ে দেবেন, পারলেন কই? তারপর বিয়ে হল, খেয়ে না খেয়ে ভালোই ছিলাম। ওদের নজরে পড়ে গেলাম, ইজ্জত খোয়ালে এইদেশে মেয়েদের সব শেষ হয়ে যায়। স্বামীটা পালিয়ে গেল, বাচ্চাটাও অসুখে-বিসুখে পড়ে মারা গেল, মেয়ে বলে কাজ করতে পারি না স্যার। না খেয়ে মরার দশা, আমি আপনাদের গোলাম হয়ে থাকব স্যার।' মেয়েটার গলা ধরে এলো, মনে হয় কাঁদছে।

হিং কম্যুনিকেশন মডিউলের রেফারেন্সগুলো দ্রুত চেক করে চলে।

২০৬০ সালে বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয়। বহু লোক নিহত হয় এতে। বাংলাদেশে নারীদের পড়াশুনা ও চাকরি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও জলবায়ুর প্রভাবের ফলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষতে মারা যায় আরো অনেক লোক। এরপরও জনসংখ্যার চাপ সামলাতে না পেরে সরকার সিদ্ধান্ত নেন যে, দেশের টেকনোলজি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ সকল সুবিধা পাবে একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক, এদের নাম আলেম সম্প্রদায়। বাকিরা (যাদের বলা হয় কাফির) সুবিধাগুলোর সামান্য একটা অংশ পাবে। দেশের জনগণ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। প্রচুর অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে এতে কাফিরদের মধ্যে। বিচ্ছিন্ন কিছু সহিংস ঘটনা ঘটলেও দেশে স্থিতাবস্থা বজায় আছে, সরকারের পুরো নিয়ন্ত্রণে আছে দেশ। আলেম অধ্যূষিত এলাকায় জীবনযাত্রা বেশ আধুনিক, প্রযুক্তিও সহজলভ্য।

'আপনি কাফির নাকি?' একটু বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করে হিং। আড়চোখে তাকিয়ে দেখে গুরুকে, উনি স্পষ্টতই বিরক্ত এই প্রশ্নে।

'জ্বি, জ্বি ওরা আমাদের কাফির বলে। স্যার এইগুলি ওদের কথা। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, স্যার পুরোপুরি বিশ্বাস করি...নামাজ পড়ি নিয়মিত।'

মুসলিমরা ঈশ্বরকে আল্লাহ বলে, আল্লাহতে যারা বিশ্বাস করেনা তাদের কাফির বলা হয়। রেফারেন্স চেক করে একটু ধাঁধায় পড়ে হিং। কাফির তাহলে ঈশ্বরে বিশ্বাসের ব্যাপার, এটা কোন সম্প্রদায়ের নাম নয়।

'আমাদের নাম দিয়েছে কাফির। ওরা স্যার ভয়ঙ্কর লোক। এগুলো বলছি জানলে আমাকে মেরে ফেলবে। স্যার দয়া করুন, নিয়ে যান আপনাদের সাথে।' মেয়েটার ব্যাকুলতা ফুটে উঠে তার মুখের প্রতিটি রেখায়।

'দেখুন ম্যাডাম, এগুলো ইন্টারগ্যালাক্টিক ইমিগ্রেশন নীতিমালা অনুযায়ী নিষিদ্ধ, হয়তো আমার বলাই উচিত হচ্ছে না।' টিং স্মিত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে জানান।

'স্যার আপনাদের ইমিগ্রেশন দিতে হবে না। আমাকে নিয়ে চলুন এই থেকে। শুধু নিয়ে যান আপনাদের দেশে, বাকিটা আমি করে নেব।'

'দেখুন, এটা পুরো নীতিমালা বিরোধী কাজ। তাছাড়া আমাদের দেশে সাঙ্ঘাতিক মন্দা চলছে...আমাদের নিজেদের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাটাই কমে গেছে।' গুরু এবার বোঝানোর চেষ্টা চালান।

'আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত জানি স্যার। দরকার হলে গান গেয়ে খেতে পারব।'

২০৬০ সালে বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লবের পর রবীন্দ্রসঙ্গীত নামক গান নিষিদ্ধ হয়। এই গান প্রায় দুইশ' বছর ধরে চালু ছিল। কিন্তু ইসলামী সরকার এগুলো মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে এগুলো নিষিদ্ধ করেন। এই বিপ্লবের একশ বছর আগেও এক সরকার এগুলো বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেবার সম্ভব হয় নি। দেশে হামদ-নাত নামে একধরনের হালকা সঙ্গীত চালু আছে। কিছু কিছু লোক গোপনে রবীন্দ্রসঙ্গীতসহ আর কিছু সঙ্গীত চর্চা করে, যদিও এগুলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

কম্যুনিকেশন মডিউলের হিস্টোরিক্যাল রেফারেন্সগুলো ছাত্র আর শিক্ষক দুজনেই দেখেন এইবার।

হঠাৎ বেজে উঠে কম্যুনিকেশন মডিউলের ঘণ্টি। বাইরে থেকে আসা কল।

'স্যার আমি আলাউদ্দীন স্যার। স্যার এইখানে অবস্থা একটু শোচনীয় স্যার। ভিড় বেড়ে গেছে, মানুষ স্যার আনরুলি হয়ে গেছে স্যার, ওরা সবাই স্যার আপনাদের সাথে যেতে চায় স্যার। আমাকে মনে হয় স্যার লেজার গান ব্যবহার করতে হবে স্যার। স্যার র‍্যাব কিছু করলেই হাজারটা বদনাম স্যার, আগের বার কাফির মেরে বান্দরবানে বদলি হয়েছিলাম স্যার। এইবার স্যার আর যেতে চাই না ওখানে স্যার। ওইখানে স্যার সমস্যা আরো দ্বিগুণ স্যার। স্যার মেয়েটাকে নামিয়ে দিন স্যার, আর আমি চলে আসি স্যার। আমি স্যার দরকার হলে আপনাদের সিকিউরিটির কাজ করব স্যার, আপনাদের গাড়ি পাঠানো লাগবে না স্যার, আমি পাঁচ মিনিটেই আসতে পারব স্যার। এই কাজ করতে ভালো লাগেনা স্যার...' ধাতব কণ্ঠেও মনে হয় উত্তেজনা বোঝা যায় কিছুটা।

প্রফেসর টিং বেশ ঠাণ্ডা মাথার লোক। লঞ্চ মডিউলকে মৌখিক নির্দেশ দিলেন ইঞ্জিন চালু করতে, এটা করার এক মিনিটের মধ্যে স্পেসশিপ উড়ে যাবে আকাশে। রোবটটাকে বললেন মেয়েটাকে বাইরে রেখে আসতে। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই পাঁজাকোলা করে

প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেল রোবটটা মেয়েটাকে। এরই মধ্যে মেয়েটা খাবলে ধরেছে আধা লিটারের পানির বোতলটা।

'স্যার আরো কয়েক বোতল পানি পাওয়া যাবে?' মেয়েটার শেষ অনুরোধটা উপেক্ষা করতে হয় দুজনকেই।

পরদিন সকালে দৈনিক 'আঁধার ও আলো'-তে খবরটা বের হয়। এইগুলো আজকাল পত্রিকার তৃতীয় পাতায় স্থান পায়। প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির যুগে প্রথম পাতা দখল করার মত খবরের অভাব নেই। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ –

পালিয়ে গেল এলিয়েনরা

রিসার্চ টিমের ছদ্মাবরণে নাস্তিকতা প্রচারের উদ্দেশ্যে ভিনগ্রহ থেকে আসা এলিয়েনদের হটিয়ে দিয়েছে তৌহিদী জনতা। ঘটনাটা ঘটে গতকাল সকালে ঢাকার অদূরে গাজীপুরে। রিসার্চ টিমের নামে ধর্মহীনতা প্রচারের কুটিল অভিপ্রায় টের পেয়ে স্থানীয় লোকজন ধাওয়া দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে বিধর্মী আংটাং গ্রহের একদল লোককে। উত্তেজিত লোকজনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাবকে লেজার গান ব্যবহার করতে হলে ঘটনাস্থলে ২০ জন লোকের মৃত্যু ঘটে। র‍্যাব ভিনগ্রহের নাস্তিকদের সাহায্যের অভিযোগে সাবিহা নামের এক তরুণীকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য তার বিরুদ্ধে গাজীপুর থানায় পতিতাবৃত্তির মামলা আছে। পাবলিক ডাটাবেজের পুরানো মামলার লিঙ্ক দেওয়া হল। এদিকে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগে র‍্যাবের কমান্ডার আলাউদ্দীনকেও সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পাবলিক রেকর্ড অনুযায়ী তিনি পাঁচ বছর আগেও একবার সাসপেন্ড ও বদলি হয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাওলানা কাজিম এর সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি আবারো ধর্ম ও দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালু রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, সেই সঙ্গে তাঁর প্রশাসনের কেউই বিচারের উর্ধ্বে নয় বলেও জানিয়েছেন।

অস্টিন, টেক্সাস, যুক্তরাষ্ট্র

দীপেন ভট্টাচার্য

আমেনহোতেপের সময়

সূর্য ডুবে গেলে পরে রুক্ষ পাহাড়ের কোলে সম্রাজ্ঞী হাতসেপসুতের মন্দিরের খিলান-গুলো অন্ধকারে হারিয়ে যেতে থাকে। সারা দিন বাটালের ওপর হাতুড়ি চালিয়ে লাল হয়ে থাকে আমার দুই হাত, গত কয়েকদিন ধরে বাম করতলে একটা ফোস্কা শান্তি দেয় না। দেবতা আমুন-রা'র স্তুতিগাথাকে খোদাই করি একটা বড় শিলায়, তার ওপর লাল ও সবুজ রঙের প্রলেপ দিই, রুক্ষ বাদামি-হলুদ পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শিলালিপি। বন্ধু আমেনাখত বলে, 'আমেনহোতেপ, বাড়ি যাও, কাজটা শেষ করার জন্য আরো দু'দিন সময় আছে। ফোস্কাটার যত্ন নাও, নইলে পরে আর বাটালি ধরতে পারবে না।'

নীল নদে এখন বন্যার স্রোত, বন্যার প্রথম মাস মাত্র, বহু দক্ষিণে কুশ দেশের বৃষ্টির জল ভেসে আসে এই উত্তরে। নৌকায় নদী পার হই পশ্চিম থেকে পুবে। পার হতে হতে ফোস্কার ব্যথাটা তীব্র হতে থাকে। নৌকা পাড়ে ঠেকলে ভাবি হেকেত খেলে ব্যথার উপশম হতে পারে। নৌকার ঘাট থেকে পানশালা দু'মিনিটেরও পথ নয়, সেখানে মূলত রাজকীয় প্রতিনিধি আর ধনী ব্যবসায়ী আসে। শিক্ষিত লেখক হিসেবে পানশালার মালিক আমাকে সম্মান করে, তাই এখানে আমার ঢুকতে বাধা নেই। সেখানে যেয়ে দেখি বেশ ভীড়, অনেকে দাঁড়িয়ে, কেউ মেঝেতে বসে। কম্পিত তেলের প্রদীপ কেমন যেন অদ্ভুত আবেশ সৃষ্ট করেছে। মালিককে আমার বাটালিটা দিয়ে বললাম, 'এক ঘটি হেকেত দাও।' ও ভাবেনি এমন মূল্যবান একটি জিনিস হাতছাড়া করব, বলল, 'এর বদলে আপনাকে আমি দু ঘটি হেকেত দেব।' মালিক খুব ভাল মানুষ, নাম নেবনেফের।

মেঝেতে বসে নেবনেফেরের দু ঘটি হেকেত খেয়ে মাতাল হই, ফোস্কার কথা মনে থাকে না। হঠাৎ খেয়াল হয় আমার পাশে এক বুড়ো বসা, কখন সে এসেছে মনে করতে পারি না। আমি বিড়বিড় করে বলছিলাম, 'আমার ছেলেটা হঠাৎ বড় হয়ে গেল, কিন্তু মেয়েটা পাঁচ বছরের, এমন যদি হত যে, ও সবসময়ই ওরকমই থাকবে।' এটুকুই, সেদিন সেই বুড়োর প্রতি মনোযোগ দিইনি, কিন্তু মনে হয় সেও আমার মত বিড়বিড় করে বলেছিল, 'বাহ, বেশ তো, এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট হলে মন্দ কী? আর কে

থাকে তোমার সাথে?' 'এক্সপেরিমেন্ট' কথাটার অর্থ বুঝলাম না, কিন্তু মনে হয় উত্তর দিয়েছিলাম, 'আমার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, আর মা; ছেলে বড়, মেয়ে ছোট।'

'আর তোমার মেয়ের নাম?'

'নাউনাখত! আমার চোখের মণি।' এরপরে আরো কত কী বলেছিলাম মনে নেই, হয়তো বলেছিলাম, 'আমুন-রা'র দিব্যি, আর কেউ যদি বুড়ো না হয় তো আরো ভাল।'

বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হল, দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন রণরঙ্গিনী সম্রাজ্ঞী হাতসেপসুত। না, ঠাট্টা করছি, আমার বউএর নাম হল মেনাতনাখত, কিন্তু তার মেজাজ মর্জি দেখে তাকে আমি মাঝে মধ্যে আমাদের ফারাও হাতসেপসুতের নামে ডাকতাম। তো তাকে হাতের ফোস্কার কথাটা বলে কিছুটা শান্ত করলাম, সহানুভূতি পেলাম। বাটালিটা যে হেকেতের বদলে দিয়ে এসেছি সেটা চেপে গেলাম, আর একটি বাটালি আছে আমার। মেনাতনাখত সেসময়ে ছিল আট মাসের অন্তঃস্বত্তা, ভরা পেট নিয়ে বেচারি আমার ওপর বেশি হম্বিতম্বি করতে পারল না। নাউনাখত দৌড়ে এসে কোলে চড়তে চাইল, তাকে তার মা বকা দিয়ে ঘরে কোনায় গিয়ে বসে থাকতে বলল। জিজ্ঞেস করলাম, 'নেফেরহোতেপ কোথায়?' ছেলে নেফেরহোতেপের বয়স আট, সকালে ওকে দেবী হাথোরের একটা প্রার্থনা সঙ্গীত নকল করতে দিয়ে গিয়েছিলাম, আমেনহোতেপের ছেলে বড় হয়ে আমেনহোতেপের মতই লেখক হবে এই ছিল আমার অভিলাষ। মেনাতনাখত বলল, 'তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছে।'

এই বয়সেই নেফেরহোতেপের হাতের লেখা চমৎকার, নলখাগড়ার কলম ঠিকমত ধরে, নিজে থেকেই কালি বানিয়ে নেয়। বাড়িতে পাপিরাসের কাগজ বেশি নেই, যা আছে তাতেই অনুশীলন করে। একটা প্রদীপ নিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকি, প্রদীপের কম্পিত শিখায় নেফেরহোতেপের ঘুমন্ত মুখাবয়ব জীবন্ত হয়ে ওঠে, স্নেহের ছেলে আমার – প্রাণের প্রদীপ। পাশে পাপিরাসের পাতাটা কুণ্ডুলী পাকিয়ে আছে। হাতের প্রদীপ মাটিতে রেখে ছেলের পাশে বসি, পাতাটা তুলে নিয়ে পড়ি,

নেফেরহোতেপের কাঁপা হাতের লেখায় –

> হে পশ্চিম আকাশের সম্মিলিত প্রবীণগণ,
> হে পশ্চিম আকাশের সম্মিলিত দেবগণ,
> হে পশ্চিম আকাশেকূলের অধিরাজেরা
> আমরা হাথরের আগমনে উৎসব করি,
> আমরা তার সৌন্দর্য অবগাহনে আনন্দ করি।

মিশরের খুব কম মানুষই এই লেখা পড়তে পারবে, ছেলের কাজে খুব গর্ব হয় আমার।

সেই রাতটি অন্য অনেক রাতের মতই ছিল বলব, কিন্তু হেকেতের প্রভাবেই হোক, কী অন্য কোনো কারণেই হোক আমার ঘুম হল না। সূর্য ওঠার আগে ঘর থেকে বের হয়ে আসি, পুব আকাশে লুব্ধক তারা জ্বলজ্বল করে, তার উদ্দেশ্য মনে মনে বলি, 'হে দেবী সপদেত, আমার পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখো।' আসলে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সপদেত, হাথোর বা আমুন-রা কারুর কাছেই হয়তো আর প্রার্থনার দরকার ছিল না,

কারণ – এতদিন পরে যা মনে হয় – তার আগের রাতেই নেবনেফেরের শুঁড়িখানায় আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

সেই রাতের পরে কয়েক মাস কেটে গেল, কিন্তু বউ মেনাতনাখতের অন্তঃস্বত্তা ভাব যেমন ছিল তেমনই রইল, তার যে ভরা অবস্থা ছিল তার আর কোনো পরিবর্তন হল না, এমন যেন সময় তার জন্য থমকে গেছে। কী ধরণের কষ্ট বেচারিকে ভোগ করতে হচ্ছিল বুঝতেই পারছেন। মেনাতনাখতের গর্ভবতী অবস্থা থেকে নানান মুক্তির পথ আমরা চিন্তা করেছি, কিন্তু হিত করতে বিপরীত ফলের ভয়ে ওদিকে অগ্রসর হইনি।

আমার বয়স্কা মা আমাদের দুটি ঘরের উল্টোদিকে, উঠোন পেরিয়ে একটা ঘরে থাকতেন। বন্যার প্রথম মাসে মা মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন, উনি যে সে সময় কী শারীরিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তা বলে বোঝাবার নয়। পাঠকের নিশ্চয় এরকম নিকটজনের কষ্ট কাছ থেকে দেখবার অভিজ্ঞতা আছে, সেখানে মৃত্যু হল এক ধরণের মুক্তি। দুঃখের বিষয় মা মুক্তি পেলেন না, বরং অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে রইলেন। তাঁর নিরন্তর কোঁকানি শুনে মাঝে মধ্যে আমি ও আমার স্ত্রী ভাবতাম তাঁকে মুক্তি দেবার কোন উপায় আছে কিনা, কিন্তু সেই উপায়টি এমনই ভয়ানক যে সেই পদক্ষেপটি নিতে আমরা সাহস করতে পারিনি। একটি বছর এ'ভাবে কাটল।

এই একটি বছর যে কী ধরণের অস্বস্তি ও যন্ত্রণায় কেটেছে তা বলে বোঝানোর নয়। আর এদিকে ওয়াসেত জনপদে আমাদের সম্বন্ধে নানা কানাঘুষো শুরু হল, বাড়ির ঝি হেনেতসেনু খবর নিয়ে এল, বাজারে গুজব আমাদের বাড়িতে নাকি স্বয়ং অপদেবতা অ্যাপোফিস বাস করছে। বন্ধু আমেনাখত বলল, নদীর পশ্চিম পাড়েও খবরটি ছড়িয়েছে – জগৎ ধ্বংস করতে ওয়াসেত জনপদে অ্যাপোফিস নেমেছে, আর তার আবির্ভাবের প্রথম পর্যায়ে সে আমাদের বাড়িতে সময় থামিয়ে দিয়েছে। বাজারে অনেক দোকান আমাকে দ্রব্য বিক্রী করা বন্ধ করে দিল, হেনেতসেনুকে দিয়েই জিনিসপত্র কেনাতে হত। তবে ভাগ্য তাও ভাল বলতে হবে যে, ওয়াসেত নগরাধ্যক্ষ আমার কাজ পছন্দ করতেন, তাই কাজের ফরমাশ বন্ধ হয়নি, তাই বাড়িতে খাদ্যের অভাব হল না। অন্যদিকে দেখুন, মানুষের স্মৃতি এমন একটা অদ্ভুত জিনিস, এই বছরটিতে নেবনেফেরের পানশালার সেই বুড়োটির কথা আমার মাথায় আসেনি। অবশেষে এক রাতে যখন আবার ঘুম হচ্ছিল না, ভোরে উঠে ঘরের বাইরে গিয়ে পুব আকাশে লুব্ধককে দেখলাম, বললাম, 'দেবী সপদেত, তোমার মনে কী এই ছিল?' ঠিক তখনই মনে পড়ল সেই কথাগুলি – 'বাহ, বেশ তো, এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট হলে মন্দ কী?'

সেদিন আর তর সইছিল না, কখন নেবনেফেরের পানশালা খুলবে। সে তো দুপুরের পরে, এদিকে নদীর পুব পাড়ে আমুন-রা'র স্তুতিগাথাকে শীলাতে খোদাই করার জন্য ওয়াসেত নগরাধ্যক্ষ আদেশ দিয়েছে, ছেলেকে দিয়ে বার্তা পাঠালাম বউয়ের শরীর খারাপ করেছে, আসতে পারব না। দুপুরের পরে শুঁড়িখানায় গেলাম, কিন্তু নেবনেফের সেরকম বিশেষ কোনো বুড়োর কথা স্মরণ করতে পারল না, তবে বলল, 'কত বুড়োই না আসে এইখানে, আপনি তো বেশ কিছুদিন আসেন না।' এই বলে সে আমার দিকে

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল, বোধহয় যাচাই করতে চাইছিল আমার বয়স বেড়েছে কিনা, অ্যাপোফিস আমার কাঁধে ভর করেছে কিনা। সেদিন থেকে প্রতিদিন আবার নেবনেফেরের আড্ডায় যাওয়া শুরু হল, আর তাতে এত বছরের কষ্টার্জিত সোনার দেবেন খরচ হতে থাকল। মেনাতনাখত প্রথমে আপত্তি করেছিল, কিন্তু তাকে বোঝাতে সক্ষম হলাম এ'ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। অবশেষে দ্বিতীয় বছরের বন্যার চতুর্থ মাসের এক সন্ধ্যায় আর এক বুড়ো এসে পাশে বসল। আমি ইতিমধ্যে তিন ঘটি হেকেত খেয়েছি, এক ঘটি হেকেত বুড়ো এক চুমুকে শেষ করে দিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, 'আপনার কন্যাসন্তান কেমন আছে?' চমকে তার দিকে তাকাই, ঘন সাদা ভুরুর নিচে দুটি চোখ তারুণ্যে জ্বলছে। পাঠক, আমার বলতে লজ্জা নেই, সেই দোকানে, আরো অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে, আমি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম, কিন্তু বসে টাল সামলাতে পারলাম না, শুয়ে পড়লাম, দুটি হাত জড়ো করে বলার চেষ্টা করলাম, 'প্রভু, আপনি আমাদের বাঁচান!' এটা বলতে গিয়ে জিভ জড়িয়ে গেল, 'প্লভনিমাচান' এরকম কিছু একটা আমার মুখ দিয়ে বের হল। সে আমার এই ব্যবহারে অপ্রস্তুত হয়েছিল মনে হয়, এর পরে আমাকে আবার তার পাশে বেঞ্চে বসা অবস্থায় আবিষ্কার করি (সেই-ই বোধহয় আমাকে টেনে তুলেছিল), মনে হল দূর থেকে তার কথা ভেসে আসছে – 'এসব রৈখিকভাবে হয় না। আর আমাকে প্রভু বলবেন না, আমি সেই লোক নই, আপনার যাকে দরকার তার নাম হল ইমোতেহেপ। তিনি থাকেন উত্তরে - ইনেবু-হেজে।' এটুকুর পরে আর কিছু আমার মনে নেই। বেশি রাতে শুঁড়িখানা বন্ধ করে নেবনেফের আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। পরে এই দ্বিতীয় বুড়োরও কেউ খোঁজ দিতে পারল না।

ইনেবু-হেজ মিশরের প্রাচীন রাজধানী, ওয়াসেত থেকে ৬০ ইতেরু উত্তরে, সেখানে যেতে হলে নীল নদ ধরে নৌকায় অন্তত দশ দিনের মত সময় নেব। বাড়ি ছেড়ে এতদূর কখনও যাই নি, মেনাতনাখত তো আমাকে যেতেই দেবে না, ছেলে নেফেরহোতেপ গম্ভীর মুখে আমাকে ইনেবু-হেজ নগর কীরকম বিপজ্জনক এই নিয়ে উপদেশ দিতে থাকল, আর নাউনাখত, কী বুঝল কে জানে, আমার গলা জড়িয়ে কান্না জুড়ে দিল। এরকম একটা ব্যাপার, কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে। মেনাতনাখত বলল, 'ইমোতেহেপের হাতে যদি এত ক্ষমতাই থাকে, সে তো আমুন-রা'র সমান, আকাশ থেকে নেমে এসেছে, তোমার সামান্য মাতাল কথায় সে পৃথিবী বদলে দেবে? সে কি জানে না আমাদের কী অবস্থা, তুমি মনে করছ সে শুধু তোমাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছে?'

আমি বললাম, 'তাহলে নেবনেফেরের শুঁড়িখানায় যে বুড়োর সঙ্গে আমার কাল দেখা হল সে আমাদের কথা কেমন করে জানে? নিশ্চয় আমার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ আছে?'

এই শুনে মেনাতনাখত তো হাসতে হাসতে মেঝেতে বসে পড়ে। বলে, 'তুমি নিজেকে কী ভাবছ? আমুন-রা'র প্রতিনিধি?'

আমি বললাম, ‘এসব বলো না, আমাদের সম্রাজ্ঞীই তাঁর একমাত্র প্রতিনিধি, তাঁর বংশধর।’

‘তাহলে?’ মেনাতনাখত বলে, ‘সম্রাজ্ঞী হাতসেপসুতের ওপর ছেড়ে দাও, তিনি নিশ্চয় ইমোতেহেপকে খুঁজছেন।

আমার এবার দ্বিতীয় বুড়োর কথা মনে পড়ল, বললাম, ‘সে বলেছিল, ‘এসব রৈখিকভাবে হয় না’, অর্থাৎ সবসময় যে আমুন-রা থেকে সরাসরি ফারাওর কাছে নির্দেশ আসবে এমন না।’

এমন সব বাদানুবাদ হতে থাকল, বেশ কিছুদিন যাবার পরে মেনাতনাখতকে রাজি করাতে পারলাম। হেমন্তের এক সকালে বন্ধু আমেনাখতের সঙ্গে নৌকা করে রওনা দিলাম উত্তরে। তীরের কাছে নলখাগড়া আর পাপিরাস, আর দূরের রুক্ষ বাদামি-হলুদ পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে খেজুর, বাবলা ও পারসিয়া গাছ, হঠাৎ করে দু-একটি পিরামিড, দেবী হাথোরের মন্দির দেখতে দেখতে এবং মাঝে-মধ্যেই রাজকীয় নৌবাহিনী ও স্থানীয় মাস্তানদের চাঁদা দিতে দিতে দিন সাতেক পরে ইনেবু-হেজে পৌঁছে আমরা একটি পান্থশালা খুঁজে পেলাম, যেখানে সরকারি লেখক ও শিলালিপি খোদাইকারিরা সাময়িকভাবে বাস করতে পারে। সে রাতে আমার ঘুম এল না, নতুন একটি শহরের অট্টালিকা, আবহাওয়া, ঘ্রাণ আমাকে জাগিয়ে রাখল, পান্থশালার ছাদে উঠে দেখি লুব্ধক তারা মাথার ওপরে। তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, ‘হে দেবী সপদেত, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো, ইমোতেহেপের সাক্ষাৎ যেন পাই।’

পরদিন সকাল সকাল উঠে আমেনাখাত আমাদের নৌকাটা কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে কিনা দেখতে চলে গেল, আর আমি শহরে বের হলাম ইমোতেহেপের খোঁজে। সারাদিন ইনেবু-হেজের অলিগলি খোঁজার পরে এক খেলনার ফেরিওয়ালা বলল ইমোহেতেপ নামে এক লেখককে সে চেনে। তখন সন্ধ্যা হয় হয় যখন ফেরিওয়ালা আমাকে একটা বড় বাড়ির সামনে নিয়ে এল। ভেতর থেকে ক্রন্দনরোল ভেসে আসছিল, আমি বড় দরজায় আঘাত করলে এক দাসী এসে দরজা খুলে দিল। বললাম, ‘আমার নাম লেখক আমেনহোতেপ, আমি দক্ষিণের ওয়াসেত থেকে আসছি লেখক ইমোতেহেপের খোঁজে।’ সে আমাকে উঠোনে এনে দাঁড় করিয়ে ভেতরে দৌড়ে চলে গেল, সেখান থেকে কান্নার শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে এক বর্ষীয়ান নারী বের হয়ে এলেন, আমি দাসীকে যা বলেছি তারই পুনারাবৃত্তি করলাম। উনি আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, ‘লেখক ইমোতেহেপ আজ সকালে মারা গেছেন।’

মারা গেছেন? আমি চিৎকার করে উঠলাম, ‘সে তো অসম্ভব এক ব্যাপার। পৃথিবীতে আমুন-রা’র প্রতিনিধি মৃত্যুবরণ করতে পারেন না।’ সেই বৃদ্ধা আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন, তারপর মেনাতনাখতের মতই হেসে উঠলেন, হাসতে হাসতে তার চোখ দিয়ে জল গড়ালো, মাটিতে বসে পড়লেন। ভেতর থেকে বেশ কয়েকজন বের হয়ে এলো, এরাই যে এতক্ষণ কাঁদছিল সেটা বুঝলাম। তারা এসে বৃদ্ধাকে ধরে তুললো,

আমার দিকে তির্যক দৃষ্টি দিতে দিতে। তাদের চোখ লাল, গালে জলের ধারা এখনও শুকায় নি।

বৃদ্ধা তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই নর কী বলে দেখো, তোমাদের বাবা নাকি আমুন-রা'র প্রতিনিধি ছিলেন।' ইমোতেহেপের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা তাদের পিতার এরকম একটি সম্মানীয় সম্বোধনে তাদের মা'র মতো হেসে উঠবে কিনা বুঝে পায় না। তারপর বৃদ্ধা বললেন, 'ইমোতেহেপ লেখক ছিলেন বটে, কিন্তু লেখা থেকে অবসর নেবার পরে বাড়ির একটি কাজও করতেন না, করতে পারতেনও না, মানে কীভাবে বাড়ির কাজ করতে হয় জানতেন না। তো আজ সকালে আমাদের দাসীকে পাঠিয়েছি বাজারে, আমি আবার কিছু কাপড় জলে ধুয়ে রেখেছিলাম, ইমোতেহেপকে বললাম ছাদে এগুলো নিয়ে যেয়ে বিছিয়ে দাও, শুকাতে হবে। এই বলাটাই কাল হল, ছাদে কাপড় মেলতে গিয়ে নিচে পড়ে গেলেন, আমুন-রা'র কৃপায় সাথে সাথেই মৃত্যু হয়েছে, কষ্ট পান নি। আমুন-রা'র প্রতিনিধি? হুঁ, প্রতিনিধিই বটে!'

ইমোতেহেপ যে আমুন-রা'র মতো ক্ষমতা থাকতে পারে তা তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছে হাস্যকর মনে হয়েছিল। কাপড় শুকাতে যাওয়া এবং ছাদ থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু আমাকে বিস্মিত করল, ইনেবু-হেজে আমার এই বিশাল অভিযান পণ্ডশ্রমই হল। বললাম, 'আপনাদের এই বিয়োগে আমার সমবেদনা জানাই, একজন লেখকের কাছ থেকে আর একজন লেখকের এই পরলোক যাত্রার জন্য সমস্ত শুভকামনা রইল। ওসিরিস যেন তার আত্মাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। আমি কি তাঁর দেহকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি?'

ইমোতেহেপের সন্তানেরা আমাকে ভেতরে নিয়ে যায়, চারদিকে চারটি প্রদীপ লম্বা স্তম্ভের ওপর জ্বলে, দেহটিকে সংরক্ষণ করার প্রস্তুতি চলছে। এই ইমোতেহেপকে বছর দেড়েক আগে পানশালায় দেখেছিলাম কিনা স্মরণ করতে পারি না। মৃতের মুখমণ্ডল তার জীবিত অবস্থা থেকে বদলে যায়।

বিদায় জানিয়ে বের হয়ে আসার সময় ইমোতেহেপের এক সন্তানকে তিনি ওয়াসেত নগরীতে কোনোদিন গিয়েছিলেন কিনা জিজ্ঞেস করি। সে 'হ্যাঁ' বললে মনটা আরো খারাপ হয়ে যায়। সেই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে বিদ্ধস্ত মন নিয়ে হাঁটি; বেচারি মেনাতনাখত, বেচারি মা, তাদের কষ্টের কি শেষ হবে না? হাঁটতে হাঁটতে নীল নদের পাড়ে পৌঁছাই, আমাদের নৌকা আমেনাখত পাহাড়া দিচ্ছিল। সেই রাতটা আমরা নৌকায় কাটাই, পরদিন সকালে পাল তুলে দক্ষিণে রওনা দিলাম, দিন আটেক পরে ওয়াসেতে ভিড়লে দেখি ঝি হেনেতসেনু অপেক্ষা করছে, আমাদের দেখে তার মুখ ঝলমল করে উঠল। 'মেয়ে হয়েছে আপনার,' চিৎকার করে সে নৌকা ভিড়ানোর আগেই, 'কন্যাসন্তান।' কী দুঃশ্চিন্তা যে মাথা থেকে নামল তা বলার নয়, মেনাতনাখত মুক্তি পেয়েছে। নাউনাখত আর পাঁচ বছরে আটকে থাকবে না, তার বড় হওয়াটা আমি দেখে যেতে পারবো।

পশ্চিম দিকে সূর্য ডুবছিল পাহাড়ের পেছনে, পাহাড়ের সামনে সম্রাজ্ঞী হাতসেপসুতের মন্দিরের খিলান অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। নৌকা থেকে মাটিতে পা

দিলাম, হেনেতসেনুর হাসিময় মুখমণ্ডল মুহূর্তে বদলে যায়, মাথা নিচু করে কাঁদে, বলে, 'আপনার মা গতকাল দেহত্যাগ করেছেন, ওসিরিস তাঁকে নিয়ে এখন হাঁটছেন, তাঁর এই যাত্রা যেন সুগম হয়।'

পুবে পূর্ণ চন্দ্র উঠছিল, তিনি সময়ের দেবতা খোনস - তাঁর ঘড়ি আবার চালু করেছেন। মাকে ভালভাবে বিদায় জানাতে পারলাম না; আকাশের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকাই, ওসিরিস সেখানে কোথাও হয়তো মা'র আত্মাকে বহন করছেন। আমি আমেনহোতেপ, লেখক, এই শিলালিপিতে এই অত্যাশ্চর্য কাহিনি লিখে যাচ্ছি আজ, সম্রাজ্ঞী হাতসেপসুতের শাসনের দশম বছরে, বন্যার চতুর্থ মাসে, ওয়াসেত নগরে।

মোরেনো ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

নাহার মনিকা

প্যাঁচানো

এ কথা শুনে আপনার হাসি পাচ্ছে তো? অনেকেই হাসে।বলে এমন উদ্ভট কথা না কি কেউ শোনেনি। অথচ আমার সারাদিন কাটে আলোর কাছে যাওয়ার চেষ্টায়। সূর্যের স্বাভাবিক আলো স্পর্শ করতে না পারলে যে ক্লিষ্টতার মুখোমুখি হই তা মানুষকে বোঝাতে চাওয়া যে মূর্খামি সেটা অন্তত আমি বুঝি।

আমার বাসার মত আমার চাকরীও নিচতলায়, প্রায়ান্ধকার একটা ঘরে, যেখানে সব সময় দুই' শ ওয়াটের লাইট জ্বলে।চারদিকে আকাশচুম্বি বাড়ি, নিচতলার ঐ অফিসঘর বেচারার কোন উপায়ই নেই সূর্যের কণামাত্র আলো নিজের ভেতরে নিয়ে আসে। কাকভোরে উঠে ছুটতে ছুটতে আসি, আর ফেরার সময় সন্ধ্যার শহরে বিদ্যুতের বাতির সমূদ্র সাঁতার দিয়ে ঘরে ফিরি।কিন্তু তবু আমার আলোর প্রতি কাতরতা ঘোচে না।ঐ যে বললাম আলোর অভাবে...।

অফিসের নির্বাহীরা বসেন সতের তলায়।সেখানে প্রতিদিন না হলেও দু একদিন পর পর আমাদেরকে নিচতলা থেকে যেতে হয়।বস ডেকে পাঠান, মিটিং থাকে।লিফট থেকে বের হলেই পরিস্কার ইউনিফর্ম পরা সৈন্যদলের মত এক পশলা সূর্যের আলো স্যালুট দেয়।আমিও মনে মনে পালটা সালাম ঠুকে ঢুকে যাই সেই আলোকময় জগতে।সেখানে সব উর্ধ্বতনের ব্যস্ততা, টাইয়ের নিখুঁত নট, শাড়ি-শালোয়ার-কুর্তির মসৃণ সিল্ক, আঙ্গুলের ছাঁটা নখে টাইপ করা সম্মোহিত করে রাখার মত নোটিশপত্র, বিজ্ঞাপন।আমার ইমিডিয়েট বসের গাঢ় লিপষ্টিক, তার বসের আফটার শেইভের মৃদু ধেয়ে আসা ঘ্রাণ, তারও বসের ব্রান্ডেড ব্লেজার থেকে বেরুনো জেল্লায় ঝাপসা হয়ে আসে চোখ।

এই ফ্লোরে সবাই ডায়েট প্ল্যান, সবাই ব্যায়াম, অথবা সাঁতার, সবাই পাঁচতারা হোটেলের পুলসাইড বার রেস্তোরায় কফি, বিয়ার, ওয়াইন কিংবা স্কচ অন দ্য রকস। মাপা হাসি, পরিমিত কৌতুক আর শনৈ শনৈ কী এক অপরিসীমের দিকে যাওয়া আমার ভেতরেও পাম্প দেয়া সাইকেলের টায়ারের মত শক্ত উত্তেজনা তৈরী করে।কিন্তু এখনো এই আলোময় ফ্লোরের একজন না বলে মন খারাপ নামের একটা পাউডারের স্তর সারা গায়ে লেগে থাকে।তবে হাল ছাড়িনি।একবার না পারিলে দেখ কতবার যেন?

সেদিন বাইরে মেঘের পরে মেঘ জমে আঁধার করে এসেছে।সহকর্মীরা কোথায় ভালো খিচুড়ি দিয়ে লাঞ্চ করা যায় তার আলোচনায় মত্ত।সবার মধ্যে একটা ঢিলেঢালা ভাব। এমন নিকষ কালো দিনে আমার কারো সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না।

আমি মাত্র শেষকরা প্রজেক্ট প্ল্যানের প্রিন্ট আউট নিয়ে ফাইলটা গুছিয়েছি।ওপরের ফ্লোরে যাবো, তখন হঠাৎ ইলেকট্রিসিটে চলে গেল।বিদ্যুৎ ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়, কিন্তু জানি যে সতের তলায় জেনারেটর চালু করে দেয়া হয়েছে।আর দিনের বেলা সেখানে অন্ধকার থাকার প্রশ্ন আসে না।আমার বস এই ড্রাফট প্রজেক্ট প্ল্যানের জন্য অপেক্ষা করছেন।

বিদ্যুৎ নেই বলে লিফট চলছে না।আমি সতর্ক হয়ে ফাইলটা নিয়ে বেরিয়ে আসি। লিফট চলছে না তো কি হয়েছে? সিঁড়ি আছে।সিঁড়ি বেয়ে সতের তলা ওঠা কোন বিষয়? অফিসের কেউ জানে না যে গোপনে আমিও ডনবৈঠক, আমিও চামচে মার্বেল রেখে দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানের অধিকারী।

ওপরে ওঠার সিঁড়ি পেছনের দিকে, দরজার ওপরে লাল অক্ষরে ছোট্ট সাইন এর পাশে তীরচিহ্ন- সিঁড়ি।

ঠেলে ঢুকতেই পেছনে ভারী দরজাটা খট করে বন্ধ হয়ে গেল।অমনি কিছুটা অন্ধকার এসে ধাক্কা দিলো।ঘাড় ঘুরিয়ে আর দরজাটা দেখার সাহস পেলাম না।শুধু সামনে সরু আবছা আলো দেখে প্রায় লাফ দিয়ে সিঁড়িতে উঠে গেলাম।কতগুলো ধাপ পার হলে ল্যান্ডিং, সেটা পেরিয়ে সিঁড়ির পরের ধাপে উঠলে একপাশে দেয়াল যা উচু ছাদের দিকে, দেয়ালের কোনে একটা ঘুলঘুলি।সিঁড়ি দিয়ে আগে কোনদিন ওপরে যাইনি, এখানে ঘুলঘুলি আছে! এখান দিয়ে আলোর আভাস আসছে! ঘুলঘুলিতে ঘষা কাঁচ।আলো সরাসরি আসে না, কাঁচের ভেতর দিয়ে প্রতিসরণের আঁকাবাঁকা ভঙ্গীর কারণে আলোটাকে একটা মরা সাপের মত লাগে।

বাইরে যদি আজকে প্রখর সূর্যালোক হতো তাহলে কি এই ঘুলঘুলি দিয়ে আসা আলো আরো প্রাণসঞ্চারী উজ্জ্বল হতো? এসব হাবিজাবি ভেবে আসলে আমি নিজেকে চাঙ্গা করি।একধরণের আত্মসম্মোহন।নিজেকে বলি, যে অন্ধকারের ভেতর থেকেও আলো উৎসারিত হয়।বলতে বলতে সিঁড়ি ভাঙ্গি।না, সতের তলা বেশী দূরে না, এই তো চারতলা পার হলাম।

বিদ্যুৎ না থাকলে এই অফিসের অন্য সব জায়গায় জেনারেটরের মহার্ঘ পরিষেবা চালু হয়ে গেলেও সিঁড়িতে আলো নিভে যায়।সিঁড়ি সবচে অবহেলিত, অথচ এখান দিয়ে মানুষকে উঠতে হয়, ওপরে যেতে হয়, সেখান থেকে নামতে হয়! দূর্ঘটনায় সিঁড়ির কথা সবার আগে মনে পড়বে।অথচ সবাই লিফট খোঁজে।

হা করে শ্বাস নিতে নিতে দশ তলায় উঠলাম।সিঁড়ির অন্যপাশে খাড়া উচু দেয়াল, প্রতি তলায় ভেতরে ঢোকার দরজার মাঝখানে ছোট্ট বর্গাকারের কাঁচ, তার ওপরে চৌখুপী ষ্টীলের জাল।সেখানে থেকে ওপাশে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতে পাই শান্ত রিসেপশনের নীল সোফাসেটের পাশে তরতাজা অর্কিড।কোন মানুষ দেখা যায় না।

পা ভারী হয়ে আসছে, হাঁটুর মালাইচাকিতে খিল ধরে গেছে।চট করে হিসেব করে দেখলাম যে প্রায় সাড়ে পাঁচ' শো সিঁড়ি ভেঙ্গে সতের তলায় অবশেষে পৌঁছেছি! আহ! পৌছে যাওয়া ভীষণ তৃপ্তিময়!

এখানেও একই রকম দরজা, কাঁচ বসানো ফোকর।কিন্তু কি আশ্চর্য! সিঁড়ির দিকের এ দরজায় বাইরে থেকে এখানে হাতল নেই।দরজা খুলতে হলে কি ধরে টান দেবো?

যতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে উঠতে শুরু করেছিলাম, সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তার অনেকখানি কমে গেছে।এখন বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দমবন্ধ লাগছে।এই ফ্লোরে ঘুলঘুলি নেই, আলো কম।নিচের তলায় গিয়ে ঘুলঘুলির কাছে দাঁড়িয়ে একটু নিঃশ্বাস নিয়ে আসবো? ভুরুক করে আসা একটু আলোর ঝলকানি পেলে প্রাণশক্তি বাড়বে?

অফিসে বসদের কাছে আরোহণ ও অবতরণ আমার কাজের মধ্যে পড়ে।চাকুরীর চুক্তিপত্রে এমন লেখা আছে।আজকে এই যে হা করে শ্বাস নিতে নিতে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, অথচ দরজা খুলতে পারছি না- একথা বলে কোথায় অভিযোগ করা যায় ভাবছি।হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, খোদ আমার বস, না কি এই ভাড়া নেয়া অফিসের মালিকপক্ষ? যারা বিল্ডিং বানাতে গিয়ে ভুল করে, কিংবা ইচ্ছে করে বাইরে থেকে দরজা খোলার বন্দোবস্ত রাখেনি!

বন্ধ দরজায় ক্রমাগত নক করতে থাকি আমি।

গরমে শরীরে, গলার কাছে ঘামে চিটচিট করলেও গায়ের জামা খোলার প্রশ্ন ওঠে না।অফিসের পোশাক বলে কথা, শিষ্টাচারও।যে কোন মুহূর্তে দরজা খুলে গেলে মুশকিলে পড়বো।তারচেয়ে থাক, বড়জোর ঘামাচি হবে।শিষ্টাচারের কাছে ঘামাচির ভোগান্তি তুচ্ছ বিষয়।

চৌকোনা কাঁচের ভেতর দিয়ে ওপাশে দেখার চেষ্টা করি।এবার নির্বাহীদের কাউকে কাউকে দেখতে পাই, নীল সোফাসেট এর কাছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছেন। তাদের শরীরি ভাষায় সারাদেশ জুড়ে এ অফিসের অসংখ্য ব্রাঞ্চের মালিকানাস্বত্ত।ওদের চোখে চিন্তা ও অহংকারের ছাপ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা কি আমার এবং আমার মত আরো অনেক অনেককে নিয়ে? না কি ক্রেতা-ভোক্তা, যাদের ওপর দিয়ে আমাদের দৌড়ের জন্য তৈরী পিচ, তাদেরকে নিয়ে।অথবা দৌড়ের ঐ পথ কত দীর্ঘ তা নিয়ে?

ওদের ভাষা বোঝার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে অধস্তনদের দু' একজন নোটপ্যাড হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অবনত ভঙ্গী, দোকানের ফলের মত নিরীহ ভাবলেশহীন চোখ । কিন্তু উর্ধ্বতনরা তাদের মাথার ওপর দিয়ে অন্য কোথাও তাকিয়ে কথা বলছেন।

দরজার এপাশে আমি বিনীত দর্শক, নিজের শরীরী ভাষায় স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তন টের পাই।হাত বিনীত হয়ে মুখে একটা গলতে থাকা আইসক্রিমের হাসি এসে যাচ্ছে।এমনটা হচ্ছে বলে নিজের ওপর বিরক্ত হই, আচ্ছা বলেন, আমার কি এমন বিগলিত হবার দরকার আছে? সিঁড়ি বেয়ে ওঠার কাজ তো আমি যোগ্যতা বলেই পেয়েছি।আলো এবং চাকরীতে উন্নতি দুইই পরস্পরের পরিপূরক আমার কাছে।কি ই না করছি এ দুটো বিষয়কে নিজের জীবনে ধরে রাখতে।

সেই সকালে কোনমতে বাথরুমের কাজ সেরে অফিসে চলে আসি- এই বাক্যটা যত সরল, আমার আসা কিন্তু ততটা না। পায়ের গোড়ালিতে আগের দিনের দৌড়ের পাথরবাঁধা ভার লেগে থাকে।মনে মনে বলি, আরেকটা দিন।দিনের শেষে সন্ধ্যা হবে। তখন বাসায় ফিরবো, নিজের ঘর, আহ নিজের বিছানা! ঘুমাতে পারবো।আর রাত কত বিশাল! নিজস্ব রাত। রাতে শরীরের শিরা উপশিরাদের বিশ্রাম। আহ, ওদের একান্ত বিশ্রাম। সুতরাং রাতের সুখভাবনা ভেবে আমি দিনের ঘণ্টাগুলোর ভেতর নিজের অস্থিমজ্জা মিশিয়ে দিতে থাকি।

চৌকোনা ফোকরে চোখ রেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি কতক্ষণ বুঝতে পারছি না। মোবাইলটা সঙ্গে আনা হয়নি। আসলে ইচ্ছে করে রেখে এসেছি, মিটিংএর সময় মোবাইল বেজে উঠলে আমার ম্যাম বিরক্ত হন।গত মিটিং এ সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার আসক্তি কম বলে পিঠ চাপড়ানো পেয়েছিলাম।আজকে তাই সাইলেন্ট মোড এ টেবিলের ড্রয়ারে রেখে এসেছি যাতে বেজে উঠলে কেউ আমাকে না খোঁজে।

কিন্তু, কতক্ষণ এভাবে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো? কতবার নক করলাম। জোরে দুম দুম শব্দ করলাম। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। এবার কিছুটা পিছিয়ে এসে ধমাধম লাথি দেই দরজায়।

আরে! এখন তো ব্যপারটা খাপছাড়া এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে! এবার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি আমি। কেউ কি শব্দ শুনছে না? এখানে কি বাইরের শব্দ ঢোকে না!

না, বসে থাকলে চলবে না।হয় দরজা খুলতে হবে, না হয় খোলাতে হবে।

কিন্তু উঠতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম! ছাদটা ঝড়ের কবলে পড়া গাছের ডালের মত নিচু হয়ে আমার মাথায় ঠেকে যাচ্ছে! এইতো একটু আগেই ধরাছোঁয়ার বাইরের মত উঁচু আর দশাসই ছিল! শরীর বাঁকিয়ে তড়াক করে উঠে রেলিং ধরে নিচের সিঁড়িতে নেমে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ছাদ যেন আরেকটু নিচু হলো! আমিও আরো কয়েক ধাপ নেমে গেলাম। আরো দ্রুত। দশ তলার ঘুলঘুলি অদৃশ্য হলো। আলো অন্ধকারের মাপজোক মাথা থেকে উধাও হয়ে গিয়ে আমার বুকের কাছটায় শক্ত ইট চেপে বসেছে। অভ্যাসবসে আমি জানি, এ অবরোধ আতংক।সরু, ছোট, অন্ধকার, চেপে আসা জায়গায় এ আতংক ভর করে আমার ভেতর। এর আগেও দু একবার হয়েছে। নিরোধ হিসেবে মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হয়।

তখন আমি কি করি জানেন? নিজেকে আরো কঠিন কোন অবস্থায় কল্পনা করে নেই। ভাবি, আমার অবস্থা যদি এমন হতো যে কোন দূর্ঘটনা কবলিত বিমানের ভেতরে আছি। তেলের ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছে, বিমানে আগুন ধরে যেতে পারে।ককপিট থেকে জরুরী অবতরণের ঘোষণা দিচ্ছে ক্যাপ্টেন।কিন্তু যে কোন মুহূর্তে অবতরণের আগেই নীলিমায় ভাসতে ভাসতে পুড়ে অঙ্গার হতে পারি সবাই। জান্তব মৃত্যুভয়ের কাছে মাথার ওপরে ছাদ নিচু হয়ে আসার আতংক তখন ফিকে হয়ে আসে। একটা সত্যি কথা বলি, আমি

কিন্তু কোনদিন বিমানে ভ্রমণ করিনি। টিভি সিনেমায় দেখা দৃশ্যের সঙ্গে কল্পনায় নিজেকে জুড়ে দেই।

আচ্ছা, সিঁড়ির একেকটা ধাপে ক' টা করে সিঁড়ি? স্থপতি নিশ্চয়ই হিসাব করে বানায়।চারতলা থেকে তিনতলা নামতে বত্রিশটা।মাঝখানে চৌকোনা ল্যান্ডিং।সেখানে বসে পড়লাম।একটু স্থির হয়ে নেই।ধরা দেওয়ার ধন সেতো নয়, অরূপ মাধুরী- সতের তলার দরজার উদ্দেশ্যে বেকুবের মত এই গানের লাইন মনে আসে।বেসুরো করে গেয়ে উঠবো? না কি কোন বাস বা ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে নিজেকে কল্পনা করে নেবো? কিন্তু বিমানে ভ্রমণ তো দূর, আমার তো বাসে ট্রেনেও দূরপাল্লার কোন ভ্রমণে যাওয়া হয় না।

আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন, কিন্তু সবার কি গ্রামের বাড়ি থাকে? কারো কারো ভিটেমাটি যমুনা বা পদ্মার ভয়াল করাল গ্রাসে নদীগর্ভে বিলীন হতে পারে না?

সুতরাং ধরা যাক, আমি গ্রামের সেই প্রান্তিক চাষীর সন্তান, নদীর কাছাকাছি একচালা টিনের ঘরটাই সম্বল।অন্যের জমি চাষ করি।ধানের ক্ষেতের উদাসী বাতাস দেখে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারি।অন্ধকারে জমির আল দিয়ে হেঁটে যেতে আমার পা ফসকায় না।আমার বন্ধু না থাকলেও শত্রু বলতে তেমন কেউ নেই।শুধু সেদিন সর্বগ্রাসী ভয়াল নদী আমার শত্রুহলো।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি, ভরযুবতীর শরীরে প্রেম ভর করার মত গড়িয়ে গড়িয়ে নদী তার পাড়ভাঙ্গার খেলা দেখাচ্ছে, আর আমার বুকের ভেতরে আতংক জমে কঠিন পাথর হচ্ছে।ইচ্ছে করছে সে পাথর বের করে এনে নদী তীরে বাঁধ দেই।নদী এক আছাড়ে যতটুকু পাড় ভাঙ্গে, আমি লাফ দিয়ে ততটুক পিছিয়ে আসি।ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখি আমার ঘরের চালা কত দূর।নদী আর কতবার গা মুচড়িয়ে আছাড় দিয়ে পাড় ভাঙ্গলে সেখানে পৌঁছে যাবে!

নদীর খেলা একসময় ফুরিয়ে যায়।ভিটেমাটির সঙ্গে আমার কপাল চাপড়ানো কান্নাও সঙ্গে নিয়ে যায় নদী।সেদিন আকাশ তার উঁচু সীমানা থেকে নিচে নেমে দম আটকে ধরেছিল আমার।তবুতো আকাশ ছিল মাথার ওপরে।নদীভাঙ্গন আমাকে এই অন্ধকার সিঁড়িতে নিচু হয়ে আসা ছাদ, আঁটসাঁট অন্ধকারের চাপ ভুলতে দিচ্ছে কই?

বরং সাধারণ শহরবাসী মধ্যবিত্ত হিসেবে নিজেকে কল্পনা করে নেওয়া যাক।যেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্র।বাবা মা' র যত্নে বড় হয়েছি।একদিন কোন রেষ্টুরেন্টে খেতে গিয়ে জঙ্গী হামলার মুখে পড়ে গেলাম।টেবিলের নিচে লুকিয়ে আছি। আমার চারপাশে বন্দুকধারী মুখোশপরা জঙ্গী নিষ্ঠুর কণ্ঠে হেঁকে যাচ্ছে।ভয়ে,আতংকে কাঁপতে কাঁপতে শব্দ করে কেঁদে ফেলায় ওরা আমাকে টেনে বের করে ফেললো।নিজের নাম ধাম সব ভুলে গিয়ে তোতলাতে শুরু করেছি।জঙ্গীদের একজন বন্দুকের ধাক্কায় দেওয়ালের কাছে নিয়ে ফেললো।তারপর অসংখ্য প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে ওরা ঠা ঠা গুলি করে দিলো।রেষ্টুরেন্টের টেবিলে জ্বলতে থাকা আশ্চর্য মোমগুলোকে দেখতে দেখতে গুলি খেয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে গেলাম।আমার বাঁ পাশে তখন এক তরুণীর তাজা লাশ।লম্বা চুলের কাছে পড়ে থাকা তার চশমার কাঁচে রক্ত, যেন কেউ

পিচকিরি দিয়ে কালচে লাল রং ছিটিয়ে বিমূর্ত চিত্রকলা নির্মাণ করে গেছে। আমার নিঃশ্বাস পাহাড়ের মত ওজনদার করে দিয়ে রেষ্টুরেন্টের বাতাস দুর্গন্ধে ঝিম মেরে আছে। মরতে মরতে নাড়িভুড়ি উলটে আসে আমার, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

না না, শহরবাসী মধ্যবিত্ত ভালো ছাত্র, অথচ ভীত-আতংকিত হিসেবে নিজেকে ভেবে নেয়া মন সায় দিচ্ছে না।

কিন্তু আর কোন দুঃসহ ভূমিকায় নিজেকে কল্পনা করে নিলে মাথার ওপরে নেমে যাওয়া এই ছাদ তার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে?

বাইরে সম্ভবত কালবৈশাখী আকাশ আরো কালো করে দিয়েছে। সিঁড়ির অন্ধকারে আমার অবরোধআতংক যেমন দ্বিগুণ হতে থাকে, তেমনি মনে মনে নিজেকে বিযুক্ত করলে সাময়িক উপশমও মেলে, বর্তমান সহনীয় হয়।

সত্যি তো, এই মুহূর্তে আমি মৃত্যুমুখে পতিত নই।পায়ের গোড়ালি ভারী বোধ সত্তেও সকাল বেলায় সিঁড়ি বেয়ে ওঠার শক্তি থাকে।এই যে সতেরতলা অব্দি উঠে এসেছিলাম। বলা যায়, দশতলা পর্যন্ত খরগোশের গতিতে লাফিয়ে পার হয়েছি।তারপর কখন থেকে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম।ঐ তো একটু আগে দরজার ফোকর দিয়ে আমার বসকে দেখেছিলাম, হিলের খট খট তুলে হেঁটে যাচ্ছে, সিল্কের শাড়ির পরিপাটি কুচি পদক্ষেপের তালে সামান্য হেলছে দুলছে।ম্যাম চোখ নাচিয়ে কথা বলছেন আরেকজনের সঙ্গে। পাশ দিয়ে কেউ একজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল, যেন কোথাও কোন দূর্যোগ মোকাবেলা করতে যাচ্ছে।আসলে হয়তো কোন মিটিং এর জন্য মিনিটখানেক দেরী হচ্ছে তার। দরজার এপাশে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম, দুম দুম কিল দিয়ে দরজায় শব্দ করলাম, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাথি দিলাম।এরা কেউ শুনলো না!

দ্রুত নিচে নেমে নিজের ডেস্কে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে এবার রীতিমত শরীর ঠান্ডা হয়ে আসে আমার। তিন তলার সিঁড়ির নিচে প্রবল অন্ধকারের ঘূর্ণি। কোন প্রলয়ংকরী ঝড়ের মোকাবেলা করছি এমন বোধ গ্রাস করে নেয় আমাকে।ঐ যে বললাম বাতাস পানি না, আলোর অভাবে মৃতপ্রায় লাগে আমার। কি করে নিচে নামবো! তবু সিড়ির রেলিং আঁকড়ে ধরলাম।অর্ধেক নেমে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ি, মনে হয় কেউ যদি আকঁশি দিয়ে টেনে আবার আমাকে ঘুলঘুলির কাছটায় নিয়ে যেতো! আবছা আলোর কিছুটা সঙ্গে নিয়ে ফিরতাম।

ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ছে শরীর।তবু, যেহেতু নিচে নামাই ভবিতব্য, এবার সর্বশক্তি দিয়ে উঠে দাঁড়াই।নিচতলায় পৌঁছে গেছি, কয়েক পা এগিয়ে দরজাটা টেনে খুলবো।এবার নিশ্চয়ই দরজা খুলে যাবে।নিচতলা তো আমার নিজস্ব। সিঁড়ির শেষ ধাপে গা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়লাম, একটু জিরিয়ে নেই। সিঁড়ির নিচটায় বেশ অনেকটা জায়গা। অনুভূমিক হয়ে থাকার কারণে প্রথমে নজরে পড়ে না।সমান্তরাল হলে কত কিছু দেখার আছে।

কখনো খেয়াল করা দরকার পড়েনি যে এত বড় দালানের সিঁড়ির কাছে একটা খোড়লের মত আছে। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে সেখান দিয়ে সরু লিকলিকে কিন্তু

বেগবান আলোর রেখা ধীরে এসে হাজির হয়।আমাকে অনড় করে দিয়ে আলোর চলাচল আটকে জ্বলজ্বল করতে থাকে কতগুলো চোখ, কোন কোন চোখে সেঁটে বসা চশমা। তাদের একজন ফ্যাশফ্যাশে গলায় কথা বলে ওঠে-' আটকা পড়লেন তাহলে?'

আমি এবার রীতিমত ভয় পেয়ে হকচকিয়ে উঠে বসি।কারা এরা?

অন্ধকারের উৎস থেকে আবছা আলো ধীরে ধীরে পরিস্কার হচ্ছে।মুখগুলোর দিকে দেখতে চেষ্টা করি, সঙ্গে সঙ্গে নিজের হৃদপিন্ডের শব্দে কানে তালা লেগে যায় আমার, কোত্থেকে ধেয়ে আসা ঠান্ডা চাবুকের মার মেরুদণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলে।

আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না, জানি।কিন্তু অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ট্রেনিং এই অফিস আমাকে দিয়েছে।এক আধ বছর না, পুরো সাড়ে তিন বছর ধরে।আর এখন যা দেখছি তা তো সব দিনের আলোর মত সত্যি।যদিও সিঁড়ির এ জায়গাটায় আলোর ঘাটতি আছে।

তবে আলো অন্ধকারের ভেদ ঘুচে গেল যখন দেখি, সুচালো মুখের কতগুলো খুড়ুলে প্যাঁচা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।তাদের গলায় ঢিলেঢালা টাই, কারুর স্খলিত শাড়ি, দুমড়ানো ওড়না।

চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেলাম।ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিলো যে এখানে হৈ হট্টগোল করে কোন লাভ নেই।

-'আপনারা ?'- পোষাকের গুণে প্যাঁচাদেরকে আপনি সম্বোধন করে ফেললাম।

-'আমরাও আপনার মত, দরজা খোলার অপেক্ষায়, নামা ওঠার দৌড়ের মধ্যে আছি।

-'ওহ, কিন্তু আমি তো একটু আগেই এখান দিয়ে গেলাম' - আমি তোতলাই। হতভম্ব হয়ে আবারো প্যাঁচাগুলোকে দেখি।ওরা আমার চোখে স্থির চোখ রেখে চেয়ে আছে।টিভির বিজ্ঞাপনে দেখা মাথা শান্ত রাখার সংলাপ মনে মনে আউড়ে আমি প্যাঁচাগুলোকে গোনার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দেই, কারণ ওদের চোখ আমার চোখ বরাবর।ওদের মাথা আমার মাথায় সমান সমান।একজনের মাথার পেছনে আরো অনেক মাথা।পায়ের পাতায় ভর দিয়েও সবাইকে আলাদা করে দেখতে পাচ্ছি না আমি।ওদের কেউ আমাকে নখর দিয়ে আঁচড় দিলে তা আমার নাকে এসে লাগবে।ওদের চোখ মুখ শান্ত না হিংস্র বোঝা যাচ্ছে না।

-' প্রথম প্রথম এমনই মনে হয়, যে এই তো একটু আগে গেলাম, আসলাম' - মহিলা প্যাঁচা কানের দুল ঝাঁকিয়ে বলে।ধাঁ করে তার মুখটা চিনতে পারি।এতো সায়রা আপা! আমি যখন এ অফিসে জয়েন করলাম।এই আপা আমার পাশের কিউবিকলে বসতেন।আমাকে পুরো অফিস ঘুরে দেখিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সপ্তাখানেক পর তার টেবিলের কতগুলো ফাইল আমার ডেস্কে রেখে গেলেন।তারপর থেকে তাকে আর দেখিনি।খোঁজ করলে কেউ কিছু বলতে পারেনি।মনে পড়লো সায়রা আপা প্রতিদিন কানে এমন ঝুলানো দুল পরতো, এরকমই মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলতো। কিন্তু এমন বুড়োটে ছিল না তো! বরং ঢলঢলে একটা ভাব ছিল।

সায়রা আপাকে কিছু বলার আগেই পেছন দিয়ে উঁকি দিলো ইশতিয়াক ভাইয়ের হাই পাওয়ারের চশমা।পাওয়ারের কারণে তার চোখদুটো আগেই বড় দেখাতো।কারদিকে চেয়ে কথা বলছেন বোঝা যেত না।এখন অতিকায় দেখাচ্ছে।উনি আমাকে এ অফিসে ট্রেনিং দিয়েছিলেন।অনেক ধৈর্য্য নিয়ে আমাকে কাজের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিতেন।ওনাকে নিয়ে কি যেন কানাঘুষা চলছিল। এই অফিসের জন্য বেশী স্লো ইশতিয়াক ভাই। সবকিছুতে বেশী ডিটেইলিং কেউ চায় না কী? এখানে রেডি-সেট-গো' না হলে ওপরে ওঠা মুশকিল। আমি নতুন নতুন তখন অতসব কথা ভালো বুঝতে পারিনি। একদিন অফিসে এসে দেখলাম ইশতিয়াক ভাই নেই।তার অনুপস্থিতি হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার মত লেগেছিল আমার। তারপর অবশ্য উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলেছিলাম।

আচ্ছা, এদের পাশে জুবুথুবু হয়ে দাঁড়িয়ে ওই প্যাঁচাটা কে! চেনা, কিন্তু নাম মনে নেই।কোন সেকশনে যেন! বিষণ্ণ চোখের লাল টিপ পরা, উনি কি আমার উল্টোদিকের কিউবিকলে বসতেন? তারও ওপাশে আরেকজন, টাকমাথা?

সিঁড়ির নিচের ফোকর গলে আসা সরু আলোর রেখা এখন বেশ স্পষ্ট।সার বেঁধে দাঁড়ানো প্যাঁচাদের দু' চারজন বাদে অন্যরা পরিচিত না, তবু সবাইকেই চেনাজানা মনে হচ্ছে। অন্ধকারের ভেতর এমন জ্বলজ্বলে অথচ নিস্পৃহ চেয়ে থাকা মনে হচ্ছে কোথাও দেখেছি।কোথায় তোমায় যেন দেখেছি! হ্যা, দেখেছি।

বিশ্বাস করেন, আমার নিচতলার বাসায় সকালে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমের মরাটে বাল্বের আলোয় আয়নার সামনে এই মুখগুলোকেই তো প্রতিদিন দেখি।

মন্ট্রিঅল, কানাডা

পূরবী বসু

মহাজীবন

এতোদিন যাবৎ সংসারটা হয় দৈর্ঘ্যে, অথবা প্রস্থে, কিংবা একই আকার ধারণ করা সত্ত্বেও স্তরে স্তরে অর্থাৎ সীমানার ভেতর থেকেও আভ্যন্তরীণ ভরাট কিংবা ঘণত্বের কারণে কেবল প্রসারিত হয়েই চলছিল।

কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন, তা সঙ্কুচিত হতে শুরু করে।

আমি অবাক হই না।মাঝেমাঝে জীবনের প্রয়োজনেই জীবন ছোট হয়ে আসে, অথবা তাকে কেটে ছেঁটে ছোট করে নিতে হয়, কিছুটা বাহুল্যবর্জিত শীতকালের শুকনো ন্যাড়া গাছগুলোর মতো। সকল শুষ্ক পাতা আর বাড়তি শাখাগুলোকে কেটে ফেলে দেবার মাস কয়েক পরেই বসন্তের সূচনায় নতুন কচি শাখা-প্রশাখা, পাতা, কুঁড়ি, এমন কি নতুন নতুন অজস্র ফুলের সমারোহ দেখা দেয় কুঞ্জে।কাননে।

কিন্তু প্রচন্ড শীতের দুঃসময়ে এতো ডালপালা, পাতা, ফুল কুঁড়ি নিয়ে বেঁচে থাকা খুব কঠিনই হয়ে পড়ে গাছগুলোর জন্যে।তাই তারা বাঁচে বাহুল্যবর্জিত হয়ে - শীর্ণকায় কান্ডটিকে শিরদাঁড়ার মতো কোনমতে সোজা খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রেখে।

মরোক্কোর এক বেকার বংশীবাদক ছেলের হাত ধরে যখন অ্যানথ্রোপলজিতে পিএইচডি করা আমাদের একমাত্র কন্যা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, আর বছর না ঘুরতেই কনিষ্ঠ সন্তান মানে আমাদের পুত্রও হাই স্কুল পাশ করে অন্য শহরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হলো, আমরা দু'জন তখন স্বভাবতই একটু একা হয়ে পড়লাম।

ততদিনে আমিও যতোটা সম্ভব প্র্যাক্টিস গুটিয়ে এনেছি।দুটো কি তিনটাই তো জীবন, একটি সংসার চালাবার জন্যে আর কতো টাকা লাগে! মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত প্র্যাক্টিস ছেড়ে দিয়ে তাই আরো তিনজন পিডিয়াট্রিসিয়ানের সঙ্গে গ্রুপ প্র্যাক্টিসে যোগ দেই অতঃপর।

গ্রুপ প্র্যাক্টিসের মজা তো এটাই, নিজের জন্যে খানিকটা বাড়তি সময় পাওয়া যায়। এছাড়াও অনেক রকম চয়েস থাকে। ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে। আমার সহকর্মীরা অবশ্য উল্টোটাই বলে।গ্রুপে তারা কাজ করে ঠিকই, কিন্তু একক প্র্যাক্টিসের জন্যে হা-হুতাশ লেগেই থাকে তাদের কথাবার্তায়; চালচলনে।তবে আমি কিন্তু একক প্র্যাক্টিস ছেড়ে দিয়ে একটুও অনুশোচনা করি না।প্রাত্যহিক দায়দায়িত্ব-ও অপেক্ষাকৃত কম মনে হয় এখন।আর সেই মহা ভয়ঙ্কর ম্যালপ্রাক্টিস ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়াম? ওটা কমে অনেক

সহনীয় পর্যায়ে চলে এসেছে এখন।সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসে ডিনার খাবার পর সপ্তাহে এক দুটো হলিউডের পুরনো দিনের পছন্দের মুভি পর্যন্ত দেখার সময় হয় আজকাল। নিজের একলা প্র্যাক্টিসের সময় সেসব সৌখিনতার সুযোগ ছিল না।

শহরের প্র্যাক্টিস কমিয়ে দিয়ে প্রতি শনি-রবিবারগুলোতে শহর থেকে নব্বুই মাইল ড্রাইভ করে উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়ি অঞ্চলের এক ছোট ক্লিনিকে নিয়মিত যাই।এই ক্লিনিকে রোগী যারা আসে তাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ-ই এদেশের নেটিভ ইন্ডিয়ান । নিকটবর্তী শহর বা গ্রাম থেকে বহু দূরে তাদের নিজস্ব লোকালয়ে- ঠিক তাবুতে নয়, তবে বিশেষভাবে নির্মিত তাদের ব্যতিক্রমী নক্সার বাড়িঘরে বাস করে তারা।অধিকাংশই ক্লিনিকে আসে পায়ে হেঁটে।একান্ত বাধ্য না হলে তারা অবশ্য ডাক্তার দেখাতে আসে না।নিজেদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী টোটকা জাতীয় কোন বস্তু দিয়ে প্রথমে চিকিৎসা করায়।যখন ডাক্তারের কাছে আসতেই হয়, আসার সময় কখনো হাতে করে নিয়ে আসে কয় গোছা পরিণত ভুট্টার ছড়া, এক কাদি কলা বা কয়েকটি লাল টুকটুকে মরিচ, টমেটো অথবা গাঢ় কমলা রঙের মিষ্টি আলু।কখনো এক থলে শুকনো রেড বা ব্ল্যাক বীন্স্।।একবার এক মধ্যবয়সী নারী-নিজের হতে বানানো বিভিন্ন রকম ছোটবড় পাথর বসানো একটি রুপোর আংটি দিয়েছিল আমাকে তার অসুস্থ পুত্রকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে সুস্থ করে তোলবার জন্যে।আরেকবার অন্য একজন ইন্ডিয়ান নারী এনেছিল হাতে বোনা ভেড়ার লোমে তৈরি এক ভারি সোয়েটার।একদিনের জন্যে হলেও তাকে আবার সেটা পরে দেখাতে হয়েছিল আমাকে।দেখে খুশি হয়েছিল খুব।মুখ ফুটে তা বলতেও বাঁধেনি, স্পষ্ট ইংরেজিতে বলেছিল সে, ‘ও, মাই গড! ইউ লুক সো লাভলী।’

সপ্তাহের পাঁচটি দিন শহরে থাকি, থাকতে হয়।সেখানেও কিছু রোজগার দরকার।কিন্তু শনিবার এলেই মুক্তির ডানা মেলে ভেসে বেড়ায় আমার স্বাধীন ময়ূরী মন।আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচার জন্যে, এই কোলাহলপূর্ণ বড় শহরের নষ্ট বায়ু ছেড়ে নির্মল বাতাস বুক ভরে টেনে নেবার জন্যে ছুটে যাই উত্তরের সেই পাহাড়ি অঞ্চলে। দীর্ঘ জীবন- হ্রদে বিভিন্নরকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সাঁতরে যেতে যেতে আস্তে আস্তে তলানিতে যে ক্লেদ, গ্লানি, বিতৃষ্ণা, ক্লান্তি, আর হতাশা জমা হয়েছিল, বহুদিন ধরে, সেই বদ্ধ জলাশয়ের তলা থেকে সেসব ময়লারা এখন ধীরে ধীরে ওপরে ভেসে উঠেছে। জাহাজ থেকে সাগরে পড়া পোড়া তেলের মতো হৃদয়ের ওপরের স্তরে থিক থিক করে ভাসছে তারা অনবরত।সাতান্ন বছর বয়সী শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ আমি যখনই রাজধানী ছেড়ে ওই ছোট্ট গ্রামীণ শহরটাতে যাই, প্রতিবারই নতুন করে অনুভব করি, এখনো বেঁচে আছি। জীবন স্রোতে পোড়া তেল নয়, স্বচ্ছ, সুশীতল ও সুনীল জলপ্রবাহের আনাগোণা টের পাই। শব্দ শুনি।সেখানে বসে প্রতি মুহূর্তে বোধ করি, সুন্দর, নির্মল, হালকা, ফুরফুরে এক ভালোলাগা।মনে হয়, আনন্দ বলে এখনও কিছু অবশিষ্ট রয়েছে জীবনে। সপ্তাহান্তে দু'দিনের এই নির্জন-বাস, এই নিরিবিলি নৈঃশব্দ, শান্ত নিরুপদ্রব পরিবেশ,- এর চেয়ে উত্তম, এর চেয়ে শ্রেয়তর, অপার স্নিগ্ধতার আর বুঝি কিছু নেই।হতে পারে না।

এখানে এলেই মনে হয়, জীবন থেকে ভালোলাগার বস্তুগুলোর পুরোপুরি নির্বাসন ঘটেনি। শুধু তাদের সন্ধান জানতাম না এতোদিন॥ আর তাই শনিবারে সূর্য্য ওঠার আগেই রওনা হয়ে ছুটে আসি এখানে।শুধু সহজ সরল পাহাড়বাসী রোগীদের জন্যেই নয়, গ্রামীণ হাইওয়ের ওপর দিয়ে একা একা মুক্তমনে গাড়ি চালাতে চালাতে মনের আনন্দে শিষ দেই, দু'চার লাইন প্রিয় রবীন্দ্রসংগীতও গেয়ে ফেলি কখনোসখনো। দু'পাশে অবারিত ঘন সবুজে আচ্ছাদিত বন্য লতাপাতা আর শস্যক্ষেত, সেই সঙ্গে দূরে দূরে একেকটা খামারবাড়ি পেরিয়ে দ্রুত সামনের দিকে ছুটে চলে আমার গাড়ি, আমার মনের সঙ্গে, চিন্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আসার কথা মনে হয় না আমার।সারাদিন তো ক্লিনিকেই থাকি, সঙ্গে এলে সপ্তাহান্তের এই দীর্ঘ সময় হোটেল রুমে একা একা করার কী-ই বা থাকতো তার! সে নিজেও অবশ্য আসার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করেনি কখনো। তাছাড়া আমি মনে করি, প্রতিটি মানুষেরই কিছুটা নিজস্ব সময় থাকা দরকার - একা নিজের মতো করে কিছু সময় কাটানো প্রয়োজন।এই স্পেসটুকু না থাকলে, না পেলে আমরা হাঁপিয়ে উঠি। নিদারুণ সংসার, রুটিন দায়িত্ব-কর্তব্য, ও অতিপরিচিত ভুবন ফেলে তাই কেউ কেউ পালিয়ে আসে, হারিয়ে যেতে চায়, হোক তা চার মাস, দুই দিন বা তিন ঘন্টা বা হোক তা তিরিশ মিনিটের জন্যে।নিজেকে সতেজ ও সবুজ করে তুলতে এটুকু ছাড় দিতে হবেই নিজেকে, চুপিচুপি মনকে বোঝাই আমি।

পাহাড়ের কোলে ছোট্ট এই জায়গাটিতে সপ্তাহের ঐ ছত্রিশ ঘন্টার প্রতিটি মুহূর্তে আমি টের পাই, আমি বেঁচে আছি।একেবারে শেষ হয়ে যাইনি।আর তখনই আমি স্পষ্ট বুঝি, একটি মারাত্মক একঘেয়ে, নিরানন্দ জীবন টেনে বেড়ানোর কোন অর্থ হয় না। কারো জন্যেই না।আমার আরো অনেক আগেই বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল।

সেই সন্ধ্যেয় বাড়ি থেকে নিয়ে আসা স্ত্রীর রেঁধে দেওয়া খাবারের সঙ্গে ওই ক্লিনিকের রেজিস্টার্ড নার্স মনিকার ঘর থেকে রেঁধে আনা খাবার একত্র করে দুজনে মিলে ডিনার খাচ্ছিলাম।আমার জন্যে বরাদ্দ করা সপ্তাহান্তের নির্ধারিত হোটেল রুমে বসেই খাচ্ছিলাম আমরা।এই রুমটা একখানা ফার্নিশড এফিসিয়েন্সী এপার্টমেন্টের মতো। আজকের এই সান্ধ্য আহারই এখানে বসে মনিকার সঙ্গে একত্রে প্রথম খাদ্যগ্রহণ নয়।প্রায় উইকেন্ডেই শনিবার আমরা একসঙ্গে খেয়ে থাকি।

আজো কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে আমরা খাচ্ছি।এক সময় অপ্রাসঙ্গিক কী জানি কী বলে একচোট হাসাল আমাকে মনিকা।কী বলেছিল ঠিক মনে নেই এখন। কথা হচ্ছিল আমাদের ক্লিনিকের এক আধ-পাগল রাঁধুনী সম্পর্কে যাকে আমরা দুজনেই খুব পছন্দ করি। কিন্তু মনিকার বলার ভঙ্গিটি ছিল ভীষণ মজার। নেপথ্যে তখন মৃদু আওয়াজে বহু দিনের পুরনো পপ ব্যান্ড গ্ল্যাডিস নাইটস অ্যান্ড দা পিপ্সের এক কন্সার্টের রেকর্ড বাজছিল হোটেলের স্টেরিওতে।সিক্সটিজের একঝাঁক প্রতিভাময় শিল্পীর গাওয়া অনেক জনপ্রিয় গানই শোনা যায় এই স্টেশনে। যেমন গাইছে গ্ল্যাডিস এখন, এক পাশে ছোট ভাই, অন্য পাশে কাজিন নিয়ে তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে সেরা গানটি,

'মিড নাইট ট্রেইন টু জর্জিয়া'। দূরের কোন এ, এম রেডিও স্টেশন থেকে নিশ্চয়। কাছাকাছি এফ এম রেডিওতে ওসব গান আর কেউ বাজায় না এখন।খাওয়া শেষে গ্লাস-প্লেটগুলো ডিশওয়াশারে দিয়ে লিভিং রুমে ফিরে আসি আমরা। সোফায় এসে বসে মনিকা।সামনের অটোমনে পা দুটো একটার ওপরে আরেকটা আলতো করে ভাঁজ করে রাখা।অতি আয়েশে।মনিকাকে দেখলে মনে হয় ওর মধ্যে যেন কখনো কোন টেনশন নেই, সর্বদা কেমন এক প্রশান্তির ছায়া সমস্ত অবয়ব জুড়ে। বন্ধ টেলিভিশনের সামনে বসে বসে আনমনে বাঁ কপালের ওপরের ছোট চুলগুলো ডানহাতের তর্জনীতে একবার পেঁচাচ্ছে, একবার খুলছে সে।ছত্রিশ বছরের মনিকার ছিপছিপে অ্যাথলেটিক স্বাস্থ্য ও পূর্ণ যৌবন তার খাটো স্কার্ট আর সিল্কের ব্লাউজে উদ্ভাসিত হলেও বসার ধরণে তা যথেষ্ট সংযত -অবগুণ্ঠিত।মিউজিকের তালে তালে মৃদু পা নাড়াচ্ছে মনিকা।আমার হঠাৎ মনে হলো, যে যাপিত জীবনের অধিকারী আমি, তেমন জীবন হবার কথা ছিল না আমার। আমি টের পাই, আরও একবার, মানুষের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত ও অনিশ্চিত।তাকে অবহেলা করা, অগ্রাহ্য করা ঠিক নয়।মনে হয়, আমার যে জীবন, যা আমি যাপন করি, তা যেন আমার নিজস্ব জীবন নয়, অন্যের গড়ে দেয়া, বা অপরকে খুশি করার জন্যে করণীয় বেঁধে দেওয়া একটা নির্দিষ্ট সময় পার করার ব্যবস্থা মাত্র।অর্থাৎ নিজের নয়, অন্য কারো জীবনকে যেন বয়ে বেড়াতে হচ্ছে আমাকে।অথচ আজীবন আমি ব্যক্তি স্বাধীনতার পূজারী।

সেই সন্ধ্যায় বা বিকেলে কোন মদ্যপান করিনি আমরা।আমি সম্পূর্ণ সজাগ, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।কিন্তু অতি আকস্মিকভাবেই আমি স্থির করে ফেলি, পরিপূর্ণ একা একাই সিদ্ধান্ত নেই, এই পাহাড়ি ঝর্ণাস্নাত ছোট্ট উপশহরেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেবো।এই মাসের শেষ সপ্তাহে যখন আসবো এখানে, আর কোনদিন ঐ মহানগরে, পরিচিত বাড়ি, বা গ্রুপ প্র্যাক্টিসে ফিরে যাবো না। শহরের বাড়িঘর, গাড়ি, ব্যাঙ্কে যত টাকা সব ভাগ করে দিয়ে দেবো স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে।আমি জানতাম মনিকা লাফিয়ে উঠতো কথাটা শুনলে।কিন্তু আমার এই পরিকল্পনা আজ কারো কাছে প্রকাশ করার ইছে হলো না। এমন কি মনিকার কাছেও নয়।আমি নিশ্চিত যা করতে যাচ্ছি, সেটা প্রধানত নিজের কথা ভেবেই।সব জেনে বুঝে কেউ যদি পাশাপাশি চলতে চায়, বিশেষ করে মনিকার মতো উচ্ছল ও জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী এক নারী, যদি এই ব্যতিক্রমী যাত্রার সাথী হতে চায়, বাধা দেই কী করে? কিন্তু এই যে মুক্তির স্বপ্ন দেখছি আমি, তা কেবল মনিকার জন্যে নয়।আমার জীবনে মনিকা উদিত হবার অনেক আগে থেকেই আমি মোটামুটি জীবনের একটা ছক এঁকে ফেলেছিলাম।মনিকা এসে যুক্ত হয়ে তাকে পূর্ণতা দিতে চলেছে মাত্র।যদিও অন্যরা তা মানবে না কিছুতেই।তাতে কিছু আসে যায় না।

সেই ছোটবেলা থেকে, পড়াশোনা শেষ করার অনেক আগে থেকেই, মা ও ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছি।কারণ অসময়ে পিতৃহারা হয়েছিলাম আমরা। আজও সংসারের একটানা, একঘেয়ে ঘানি টেনে বেড়াচ্ছি।অথচ এতো করেও নিজের অক্ষমতার কথাই কেবল স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বর্তমান জীবনের ধরণ - প্রাত্যহিক দিনের

চেহারা - এখনকার বেঁচে থাকা।একটা অতৃপ্তি, একটা আশাভঙ্গ, একটা প্রাপ্তির অপূর্নতা যেন থেকেই যাচ্ছে কোথাও না কোথাও।আমি ভেবে দেখি, আমার গোটা জীবনের প্রায় সবটাই উৎসর্গ করে দিয়েছি আমি অন্যদের জন্যেই।নিজের ইচ্ছা, আনন্দ, সখের জন্যে কিছুই করিনি। অন্যরাও এই ব্যাপারে বেশ উদাসীন। ধরেই নিয়েছে, আমার মতো মানুষের প্রায় কিছুই লাগে না।তাই ঠিক করেছি, আর যে কদিন বাঁচবো, নিজের মত করে বাঁচার চেষ্টা করবো।নিজের জন্যে বাঁচবো।আবারও বলছি, মনিকা এই জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হলেও সব নয়।অত্যাবশ্যকীয় নয়।শুধু তার জন্যেই আমি ঘর ছাড়ছি, এটা সত্য নয়। তবে আমার নবজীবনে সে একজন বিশেষ সংযোজন হবে, সন্দেহ নেই।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে কিছুটা উৎফুল্ল ও হালকা মনে ঘরে ফিরি পরদিন। মনিকাকে বিদায় দেবার আগে তাকে গভীর চুম্বনে কাছে টানি। মুখে কিছু না বললেও সে কি আমাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল তখন? আমার চোখদুটো খুব বেশি চকচকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কি? আমি জানি না। তবে কোন কথা বলতে পারিনি আমি।শুধু অনেকক্ষন তাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ছিলাম দরজার কাছে। পারস্পরিক অনুভূতি বা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো কথা বলি না আমরা।বর্তমানের বিশেষ মুহূর্তগুলো হারিয়ে যেতে পারে এই ভয়ে বোধহয়।আজও কিছু বললাম না।মনিকাও নয়।

গত কিছুকাল ধরে আমার স্ত্রীর সিঁড়ি ভাঙতে ও হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।এমন কি একই জায়গায় কয়েক মিনিটের বেশি দাঁড়িয়ে থাকাটাও রীতিমতো ক্লান্তিকর তাঁর জন্যে। ফলে রান্নাবান্নাও ঠিকমতো করতে পারে না। এ বয়সে, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে অস্থিওআর্থ্রাইটিসের আধিক্য খুব বেশি দেখা যায়। এই ভেবে ব্যথার ওষুধ ও অ্যান্টাইইনফ্লেমেটরি বড়ি দিচ্ছিলাম ওঁকে। সেই সঙ্গে জয়েন্টের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে গ্লুকোসোমাইন, কন্ড্রাইটিস, ক্যালসিয়াম ও উচ্চমাত্রার ভিটামিন ডি। এতে তেমন উপসম না হওয়ায় অরথোপেডিক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল কিছুদিন আগে। গত দু' সপ্তাহ ধরে তাঁর যে অগুনতি পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছিল, একে একে সেসব পরীক্ষার ফল আসতে শুরু করেছে।

গতকাল রাতেই পাহাড়ী ক্লিনিক থেকে ঘরে ফিরেছি।

অবশেষে, জীবনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাটিয়ে দেবার পর নিজের জীবন সম্পর্কে, কীভাবে শুধু নিজের জন্যে নিজের মতো করে বাঁচা যায়, সে ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক নির্মল প্রশান্তি ও অনাবিল আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরেছি গতকাল।তাই প্যাথোলজি রিপোর্টগুলো এসেছে কয়েকটা, টেবিলের ওপর দেখেও খুলিনি সেগুলো গত রাতে। সকালে উঠে দেখবো স্থির করে শুতে চলে গেছি।

কিন্তু আজ দুপুরের আগেই স্ত্রীর ল্যাব টেস্টের কিছু ফলাফল দেখে, সেই সঙ্গে অরথোপেডিক ডাক্তারের কল পেয়ে তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলে স্তম্ভিত হয়ে যাই। যা ভাবা গেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ ও জটিল অবস্থা। এমন সম্ভাবনা ওঁর

অরথোপেডিক স্পেসালিস্টও প্রথমে একেবারেই ভাবেন নি। আগামী কাল শেষ এবং কনফার্মেটরি টেস্ট রেসাল্টটি আসার কথা ছিল। কিন্তু ডাক্তার ফোন করে আজই সেই ফলাফলটা জেনে নিয়েছেন রিপোর্ট ছাড়াই। ওটা ছাড়াও অন্য সব পরীক্ষা থেকে আমি ও অরথোপেডিক স্পেসালিস্ট প্রায় নিশ্চিত হয়েছি সেই সকালেই যে এই বাড়ির গৃহকর্ত্রীর অসুখটা অতি কঠিন। মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। ধীরে ধীরে আরও খারাপ হবে তাঁর অবস্থা।প্রোগ্রেসিভলি ডিজেনারেটিভ অসুখ। ভবিষ্যতে ভালো হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। প্রতিদিন আরও খারাপ হতে থাকবে। আর কিছুকাল পরেই হুইল চেয়ার ছাড়া চলাফেরা করা যাবে না এ প্রায় নিশ্চিত।

নতুন করে সিদ্ধান্ত নেবার পালা এখন আমার। ভাবার বেশি কিছু ছিল না। অতঃপর শহরের গ্রুপ প্র্যাক্টিস নয়, ঝর্ণাস্নাত পাহাড়ি শহরই ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই।স্ত্রীর পক্ষে একা বাস করা আর সম্ভব নয়।তাঁর দেখাশোনার জন্যে সার্বক্ষণিক একজন বিশ্বস্ত লোকের দরকার। পুত্র এ বছরই কলেজ শেষ করবে, তাই বলে কলেজ পাশ করে ঘরে বসে মায়ের সেবা করবে না সে, বলাই বাহুল্য। কেউ-ই করে না। অন্তত এই সংস্কৃতিতে তো নয়-ই। আমার স্ত্রী অবশ্য বার বারই লং টার্ম কেয়ারের জন্যে নার্সিং হোমে চলে যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে।তার অসুস্থতার জন্যে আমি সুস্থ মানুষ কেন এমন কঠিন জীবনযাপন করবো? এর সঠিক উত্তর আমিও জানি না। তবে ঐ ঝর্ণাতলার ক্লিনিকে বা ঐ পাহাড়তলীর শহরে আর কখনই আমি ফিরে যাইনি।মনিকার সঙ্গেও যোগাযোগ করিনি। সে ফোন করলে হয় ধরিনি, অথবা ঠান্ডা গলায় জবাব দিয়ে ফোন রেখে দিয়েছি। সপ্তাহ ও সপ্তাহান্ত উভয়ই কাটে এখন এই বাড়িতেই, মাঝে মধ্যে বাইরের দু'একটি রোগী দেখা ছাড়া। গ্রুপ প্র্যাক্টিসও একরকম ছেড়েই দিয়েছি, নামটা যদিও রয়েছে সেখানে। ফলে মাঝে মধ্যে দু'একটা কেইস নিই।এভাবেই কেটে গেছে গত পাঁচ বছর।

যে স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে যাবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলাম, তাঁর এই কঠিব অসুখের ডায়োগনসিস আমার সকল পরিকল্পনা আমূল বদলে দিয়েছে। কিন্তু আমার অসুস্থ স্ত্রী হুইল চেয়ারে বসে আজও উল বোনে, বই-ম্যাগাজিন পড়ে, বুক শেলফের বই থেকে ধূলা ঝাড়ে, ইচ্ছে হলে একপদ সহজ কোন রান্নাও করে ফেলে মাঝে মাঝে। গদি দেয়া মোড়ার ওপর বসে ফুল গাছের পরিচর্যা করে।রোজ সন্ধ্যায় ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে প্রিয় গান শোনে। জীবন থেকে অতি কম প্রত্যাশা তাঁর বরাবরই। এখন সে অপেক্ষাকৃত বেশি তৃপ্ত, এমন অসুখ নিয়েও সম্পূর্ণ অচল না হয়ে আজও বেঁচে আছে এই বিস্ময়কর ঘটনায়, সুখানুভূতিতে।

পুত্রের গ্র্যাজুয়েট স্কুল শেষ। চাকরী নিয়েছে সিয়াটলে। এক ভেনেজুয়েলার নারীর সঙ্গে প্রেম করে লিভ টুগেদার করছে। মরোক্কোর বংশীবাদকের সঙ্গে কন্যার বিয়েটা ভেঙে গেছে গত বছর।শেষ বছরটা বেশ টানাপোড়েনেই কেটেছে ওদের।তবু মেয়ে ঘরে ফিরে আসেনি।রয়ে গেছে উত্তর আফ্রিকাতেই।ওখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়-আশয়ে এক দুর্নিবার আকর্ষণ জন্মে গেছে তার।কখনোসখনো বিভিন্ন জায়গা থেকে ভিউ কার্ড পাঠায়। কখনো বা নিজের তোলা বা আঁকা ছবি দিয়েই বানায় কার্ড।

আর আমি! ওদের যাপিত জীবনের, ওদের আনন্দ-বিষাদের অংশ হয়ে- একরকম সাক্ষী হয়েই বেঁচে আছি আজও।শুধু মাঝে মাঝে জীবনের দৈর্ঘ্যের প্রসারতার অসারতা ভেবে শঙ্কিত হই।লক্ষ্য করি, জীবনটাকে সকলেই রাবারের ব্যান্ডের মতো করে দুই হাতে দুই দিক থেকে ক্রমাগত টেনে টেনে আরও প্রলম্বিত করার অনবরত চেষ্টা করছে। কিন্তু তা না করে যদি কেবল এই সীমিত জীবনটাকেই আরো স্বস্তিময়, অর্থবহ, আরও আনন্দঘন ও স্বাধীন করার চেষ্টা করতো, তাহলে কতোই না ভালো হতো।জীবনের মান তো আর তার দৈর্ঘ্য দিয়ে মাপা যায় না! তবু লোকে সর্বাগ্রে দীর্ঘ জীবনেরই আরাধনা করে কেবল। প্রিয়জনের জন্যেও একই প্রত্যাশা। কিন্তু কেন? কী লাভ তাতে? কার লাভ? আমি জানি না।

পোর্ট সেইন্ট লুসি, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

প্রবীর বিকাশ সরকার

কোনো এক বর্ষার গল্প

বাঙালি জীবনের সঙ্গে বর্ষা ঋতুর সম্পর্ক চিরপুরাতন এবং অত্যন্ত নিবিড়। আমার জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কৈশোরের অপার কৌতূহল আর রহস্যময়তা কেটে গিয়ে যখন যৌবনের মৌসুমি হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলাম নিজেকে তখন বর্ষা হয়ে উঠল অনন্য এক অনুভূতিশীল জগৎ যেখানে দুঃখ, ব্যথা, মান-অভিমান, ক্ষোভ এবং বিরহযন্ত্রণার প্রথম বিমিশ্র স্বাদ টের পেলাম। যার হয়তো তখন কোনো অর্থই ছিল না, ছিল স্রেফ তারুণ্য। আসলে তাও হয়তো নয়।

বর্ষার সঙ্গে নরনারীর একটা নিবিড় গোপন সম্পর্ক আছে। সে পুরানোর সঙ্গে নতুনের, আবার নতুনের সঙ্গে নতুনের কিংবা পুরাতনের সঙ্গে পুরাতনের সম্পর্ক তৈরি করে। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন শুরু হলো তখন আমি পরিপূর্ণ তরুণ। আর তারুণ্য মানেই খেয়ালিপ্রবণ প্রাপ্তবয়স্কতা। বিপরীত আকর্ষণ নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষিত হওয়াটা বয়সের, যৌবনের এবং জৈবিকতার ফলিত স্বরূপ মাত্র। আর এই ১৮ থেকে ২৫ বয়সটি ঘনঘন ভাবাবেগ ও রুচিবোধের বদল ঘটায়। অস্থিরতা, চঞ্চলতা, চাওয়া-পাওয়া এবং বিরহবিধুরতা এই অধরা বয়সটাকে প্রবলভাবেই নিয়ন্ত্রিত করে। আর প্রকৃতি বা ঋতুর প্রভাব তো আছেই।

যৌবনের প্রথম বর্ষাকে আমি পুরোপুরি উপভোগ করেছি রোমান্টিকতায়। মাঝেমাঝে লবনাক্ত জৈবিকতায়ও। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তারুণ্য যেভাবে কেটেছে আমার বিস্তৃত বিশাল নিভাঁজ সবুজের মধ্যে তার তুলনা নেই বললেই চলে। ছেলেবেলা থেকে লেখালেখির সূচনা বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। সাহিত্যচর্চাকে পল্লবিত ও প্রগাঢ় করেছিল বর্ষাঋতু।

মনে পড়ে প্রথম বর্ষেই একদিন বাদলের অমিতাভ রূপ, রস ও সৌরভ বিরহী করে তুলেছিল আমাকে সাতসকালে, ঘুম ভেঙেছে রিমঝিম মিহি শব্দের সুরে। জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম ধুমল পাহাড় তার ওপরে ছাইরঙা মেঘের আভরণ। গুরুগম্ভীর মেঘের নিনাদ। একটা ভার্জিন সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে আলাওল হলের দু'তলার দীর্ঘ বারান্দার শেষ মাথায় যেখানে প্রশাসন ভবনের মূল রাস্তা শুয়ে আছে সেদিকের খোলা দেয়ালের

রকের ওপর বসা মাত্রই নিচের দিকে দৃষ্টি আটকে গেল। চোখ ভরিয়ে দিল একটি মেয়ে। ফর্সা শরীরে হলুদ পাড়ের কালচে সুতির ঢেউখেলানো শাড়ি, একই রঙের ব্লাউজ, ঠোঁট জোড়া টকটকে লাল আর খোঁপায় বেল ফুলের মালা জড়ানো। কে এই মনোরমা ঊর্বশী কন্যা দাঁড়িয়ে আছে বাসের প্রতীক্ষায় শাল গাছের নিচে! বেপরোয়া এই বয়সটা তাই সহসা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল:

'এই মেঘলা দিনে একলা
ঘরে থাকে না তো মন
কাছে যাবো কবে পাবো
ওগো তোমার নিমন্ত্রণ...'

ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটি তাকালো এক ঝলক আমার দিকে। এর আগে ক্যাম্পাসের কোথাও তাকে দেখিনি, সে আমাকে দেখেছে কিনা জানি না। তারপর বাস এসে থামলে তাতে উঠে জানালার পাশে বসে আবার আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। বাসটি চলে গেলে পরে অদ্ভুত এক শূন্যতা মেঘের মতো এসে আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সেই ছবিটি আমি কোনোদিন ভুলতে পারলাম না, সেই মেয়েটিকে আমি আর কোনোদিন এই ক্যাম্পাসে দেখতেও পেলাম না। আশ্চর্য! কোথা থেকে এলো, কেন এলো এই ক্যাম্পাসে জানলাম না।

তারপর বর্ষা এলেই মেয়েটির কথা মনে পড়ত খুব। নানাভাবে তাকে কল্পনা করেছি। প্রেয়সীরূপে, বন্ধুরূপে, বিরহিনীরূপে। নাম দিয়েছি কখনো বীথি, কখনোবা বাণী আবার কখনোবা বর্ষা। নানা নামে সে আমার কবিতায় ও গল্পে এসেছে। বাদলের ঝরোঝরো সন্ধ্যায় বর্ষার গান শুনতে গিয়ে সহপাঠী মন্দিরা রায়ের (ছদ্মনাম) কণ্ঠে চকিতে মনে হয়েছে মন্দিরাই কি সেই মেয়েটি? ওই তো হলুদ পাড়ের কালচে সুতির ঢেউখেলান শাড়ি, একই রঙের ব্লাউজ, ঠোঁট জোড়া টকটকে লাল আর খোঁপায় বেল ফুলের মালা জড়ানো.......বুকের ভেতরে বাদল ঝরছে আমার, চোখে অবিশ্বাস্য সন্দেহের দোলা!

কোনোদিন নির্জন দুপুরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে হয়েছে, আরে ওই যে বাসটা চলে গেল তার একটি জানালায় কি সেই মুখটি ছিল না? আবার কোনোদিন বর্ষাসন্ধ্যায় অ্যাপ্রচের কাছে 'ভুইল্যা' কেনার সময় সহসা মনে হতো ঘাড়ের কাছে কোনো সহসা চাপা নারীকণ্ঠ: 'এভাবে একা একা কষ্ট পেয়ে কী লাভ?' ঘাড় ফেরাতেই বৃষ্টির ঝাপটায় চশমা হয়ে যেত ধবেধবে সাদা, কোথাও কেউ নেই। রাগে, ক্ষোভে মাথার ভেতরে রক্তশিরা দপদপ করে উঠতো। কিন্তু কিছুই করতে পারতাম না আমি। এমনি অসহায় অপদার্থ কিংবা কাপুরুষ ছিলাম। নানা রকম ভ্রান্তি আর ঘোরের মধ্যে অধরা স্বপ্নের মতো সেই বর্ষাসুন্দরী আমাকে নিয়ে খেলে গেছে। কতদিন বর্ষাঘন নিষিদ্ধ শহরে আপাদমস্তক টলোমলো নেশাগ্রস্ত আমি ভুল শাড়ি ব্লাউজ টেনে ছিঁড়ে খুঁজেছি তাকে। গভীর রাতে ভেজা শরীরে জুবুথুবু ক্লান্ত শ্রান্ত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে অন্ধকার ঘরে এসে সটান বিছানায়। বাইরে তুমুল বৃষ্টি, বুকের ভেতরে ঝড়ো হাওয়া। মাথার মধ্যে ঘুরে চলেছে পৃথিবী। ঘুমহীন দুচোখ। একসময় ধীরে ধীরে ভেসে আসতো বহু

দূর থেকে মিহি সুরে অতুল প্রসাদের সেই অসামান্য গানটি যা মন্দিরা একদিন অডিটরিয়ামের আড়ালে বৃষ্টির দুপুরে নির্জনে শুনিয়েছিল আমাকে:

‘বধুঁয়া, নিঁদ নাহি আঁখি পাতে
আমিও একাকী তুমিও একাকী
আজি এ বাদল রাতে
নিঁদ নাহি আঁখি পাতে...........
গগনে বাদল নয়নে বাদল জীবনে বাদল ছাইয়া
এসো হে আমার বাদলের বধূ চাতকিনী আছে চাহিয়া
কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া সজনী তোমার জাগিয়া..... ’

একদিন সেমিনার কক্ষে ওপাশে মুখোমুখি বসা মন্দিরা রায়কে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আচ্ছা, তুমি কি কোনো একদিন বর্ষার সকালে আলাওল হলের কাছে বাসের জন্য প্রতীক্ষায় ছিলে? হলের দু’তলায় রকের ওপর আমাকে বসে থাকতে দেখেছিলে?’

আশ্চর্য হয়ে মন্দিরা রায় বললো, ‘কই না তো! মনে পড়ছে না। কেন?’

- না এমনি। আচ্ছা, বৃষ্টির দিনে কেন তুমি এই রঙের শাড়ি পড়ো বলো তো?

মন্দিরা রায় এক গাল হেসে বলল, ‘কেন? তোমার ভালো লাগে না বুঝি?’

- আলবৎ ভালো লাগে। আচ্ছা মন্দিরা, তুমি কি কখনো এমন কোনো মেয়েকে দেখেছ, যে হলুদ পাড়ের কালচে সুতির ঢেউখেলান শাড়ি পড়ে, একই রঙের ব্লাউজ, ঠোঁট জোড়া টকটকে লাল আর খোঁপায় বেল ফুলের মালা জড়ানো......ঠিক তোমার মতো?

টোকিও, জাপান

ফেরদৌসী পারভীন

চিঠি

বেশ কয়েক বছর পর এবার গাঁয়ের বাড়িতে ঈদ করলাম। বসার ঘরে সোফায় বসে একটু আয়েস করে চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল প্রধান ফটকের দিকে। দেখলাম এক মহিলা গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকছেন। ভদ্রমহিলাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। আমি উঠে গেটের কাছে এলাম। ওনাকে চিনতে কষ্ট হল না কারণ ত্রিশ বছর আগের সেই তেইশ বছরের মিতু এই তেপান্ন বছর বয়সেও দেখতে তেমনই আছে। কেবল চুলে হালকা রুপালি আভার ছাপ। আর ওজন হয়তো একটু বাড়তির দিকে।

মৃদু হেসে সে বললো, চিনতে পেরেছ? আমি অভিভূত হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। ওর কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে হেসে বললাম, আরে চিনব না, তোমাকে! দু'জন কথা বলতে বলতে বসার ঘরে ঢুকলাম। বৌ রত্মাকে ডাকলাম। রত্মা এসে ভ্রূকুচকে তাঁকাল। পরিচয় করিয়ে দিলাম।

রত্মা হালকা চা নাশতা নিয়ে এলো। মিতুকে বললাম, রাতে খেয়ে যেও। সে খুবই বিব্রত হয়ে বললো, আমার ছেলে মেয়েরা এবং ওদের বাবা আমাকে ছাড়া সাধারণত খাবার টেবিলে যায় না। খাবার সময় হলে কোনো কারণে আমি বাইরে থাকলেও ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করে। ওর বরের কথা ওঠায় জানতে চাইলাম তোমার বর কি করেন? ও একটু হেসে বলল, তিনি হচ্ছেন মাস্টারমশাই। আমি বললাম' ও আচ্ছা; সরকারি স্কুলে? মিতু খুব সাধারণভাবে বলল স্কুলে না। তাহলে কি কোনো কলেজে, কোন্ কলেজে? ও এবারও বললো, কলেজেও না। তাহলে কোথায়? মিতু সলাজ ভঙ্গিতে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো,আমরা দু'জন একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি।

আমি এবার হালকা কাশি দিয়ে জানতে চাইলাম- কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে? কথপোকথন যেভাবে এগোচ্ছে তাতে ভয় পেলাম এবার বুয়েট অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বলে না বসে! না, আমার সে ধারণাও ঠিক হলো না। এ দুটোর কোনটারই নাম সে বললো না। আমেরিকার ভার্জিনিয়া স্টেটের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বললো। আরও বললো, তার স্বামী ও শাশুড়ি মা'র সহযোগিতায় ওখানেরই একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পিএইচডি' ডিগ্রি নিয়েছে। অনেক বছর আগে এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, মিতুর বিয়ে হয়েছে। ছেলে আমেরিকায় থাকে। ভেবেছিলাম হয়তো আমেরিকায় 'ডিভি'

লটারিতে গেছে। লেখাপড়া তেমন না জানা কিংবা অল্প শিক্ষিত কোনো ছেলে হবে হয়ত! আরও শুনেছিলাম তার বউ মারা গেছে। একটা তিন বছরের বাচ্চাও আছে। মিতু তার দ্বিতীয় স্ত্রী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা শুনে আমার বৌ রত্মার চোখ বিস্ময়ে কপালে উঠল। আর আমি খানিকটা নড়েচড়ে বসলাম। আমার বউ একটি সরকারি ব্যাংকে চাকরি করে বলে সে সবার কাছে খুব গর্ব করে বলে বেড়ায়। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম বলে কি এ মেয়ে! মুখচোরা সেই মিতু আজ আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক! পিএইচিডি ডিগ্রিধারী! শান্তশিষ্ট মিতু যে, স্কুল শিক্ষক বাবার মৃত্যুর পর মা সহ ছোট দুই ভাইবোনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল। বললাম, তোমার ছোট দুই ভাইবোনের কি অবস্থা, খালাম্মা কেমন আছেন?

মিতু বললো 'মা' আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তা প্রায় দশ বছর হল। আমার বর আসিফ রিতুর বিয়ে দিয়েছিল ওরই এক বন্ধুর সাথে। ওরা এখন অস্ট্রেলিয়াতে আছে। এবার মিতু খানিকটা বিষণ্ণতা নিয়ে বললো, ছোট ভাই রাজুর জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। মার খুব ইচ্ছে ছিল ও বুয়েটে পড়ুক। কিন্তু ওর চান্স হয় নি। শেষে বিআইটি থেকে পাস করে বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেয়। আসিফ অনেক চেষ্টা করেছিল মা'কে সহ রাজুকে আমেরিকায় নেয়ার জন্য। রাজুর স্কলারশিপও হয়েছিল কিন্তু মা'কে নেয়ার অনুমতি পায় নি। আমি যখন মা'কে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেলাম তখন আবার রাজুর যাওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর মা রাজুকে ছাড়া যেতে কোনো মতেই রাজি হন নি।

খালা আম্মার সাথে তাহলে তোমার শেষ দেখা হয় নি? মুখে তৃপ্তির হাসি কিন্তু দুঃখের সাথে বললো, আম্মার অসুস্থতার খবর পেয়ে আমি ও রিতু দুজনই এসেছিলাম। এরই মধ্যে আমার বউ উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে মাছ মাংস বের করে রান্নাঘর ভরে ফেলেছে। সাহায্যকারী মেয়েটাকে ধমক দিচ্ছে দ্রুত রান্না সারার জন্য। মনে মনে ভাবলাম মিতুর পরিচয়ই আমার বউয়ের মনোভাব পাল্টে দিয়েছে। প্রথমে হালকা চা নাশতা দেয়ার ত্রুটি পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টায় মনোযোগী হয়েছে। ঘড়ির কাটায় তখন আটটা। মিতু বললো, এবার আমাকে উঠতে হবে। ভাবিকে ডাকো। আমার বউ এলে বললো, আবার কবে দেখা হবে ঠিক নেই আগামীকাল সবাইকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসুন চাট্টে ডালভাত একসাথে খাওয়া যাবে। আমাদের দুজনের সাথেই সে হ্যান্ডসেক করল। আমার হাতটা কি একটু কেঁপে উঠল।

মিতু চলে গেল কারণ গাড়ির হর্নের শব্দে বুঝতে পারলাম। মিতু কি তাচ্ছিল্য করে আমার সাথে দেখা করতে আসল? হাজার ভেবেও মিতুর কথাবার্তা কিংবা মুখের ভঙ্গিতেও কোনো তাচ্ছিল্য কিংবা উপহাসের লেশমাত্র খুঁজে পেলাম না। বরং সেই শান্তশিষ্ট মুখচোরা মিতুকেই খুঁজে পেলাম। তবে ওর চোখেমুখে একটা গাঢ় প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাসের ছাপ দেখতে পেলাম।

ফিরে তাকাই বছর তিরিশেক পেছনে। আমি হাসান। তখন ক্লাস টেনে পড়ি। বাবা মারা যাওয়ায় নানার বাড়িতে থাকতে এল মিতুরা তিন ভাইবোন আর ওদের মা। মিতু ক্লাস এইটে ভর্তি হলো। ছোট বোন রিতু ফাইভে আর রাজু থ্রিতে। অজপাড়াগাঁ থেকে এসে ওরা ভর্তি হয়েছে উপজেলা স্কুলে। আমি ছিলাম আমার ক্লাসের ফার্স্টবয় এবং স্কুলে সব সময়ই সর্বোচ্চ নাম্বার পেতাম। কিন্তু মুখচোরা শান্তশিষ্ট মিতু বার্ষিক পরীক্ষায় তার ক্লাসে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে প্রথম হয়ে স্কুলের সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। এইটে মিতু বৃত্তি পেল। মেট্রিকে ৩ লেটারসহ ফার্স্ট ডিভিশন পেল। এর ভেতরে আমি স্টারমার্ক নিয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হলাম। মিতুও এইচএসসির পর 'সমাজবিজ্ঞানে' ভর্তি হল। সেই ক্লাস টেন থেকেই আমি মিতুতে মনে মনে বাঁধা পড়েছিলাম। কিন্তু বলা হয় নি মুখ ফুটে সে কথা। ঢাকায় আসার পর একদিন ওর কাছে প্রকাশ করলাম। মৃদু হাসল মিতু। এলোমেলো চুলগুলো বাঁধতে বাঁধতে বললো, আমাকে কি তুমি বোকা মনে কর? তোমার মনোভাব বুঝতে পারি নি বলে কি মনে হয়! তারপর বললো, শুক্রবার আমার টিউশনি থাকে না। যদি সম্ভব হয় তুমি বিকেলের দিকে টিএসসিতে এসো।

আমি জানি শুক্রবার সকালের দিকে মিতু ওর বিভাগের এক শিক্ষকের পিএইচডির থিসিস লেখায় সহযোগিতা করে। বিনিময়ে ও কিছু সম্মানি পায়। টিউশনি, থিসিস লিখতে সহযোগিতার পারিশ্রমিক, বাবার পেনশনের সামান্য কিছু টাকা এবং মায়ের সেলাই থেকে পাওয়া অর্থ দিয়েই কোনোরকমে ওদের সংসার চলছিল।

সেবার ঈদে গাঁয়ের বাড়িতে গেলাম। মাস্টার্স পরীক্ষার তখন মাত্র কয়েকমাস বাকি। আম্মার মুখ অন্ধকার। রাতের খাবার পর আম্মার ঘরে আমার ডাক পড়ল। তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, তুমি যদি মনে করে থাক ঐ ফকিরনির ঘরের বয়স্ক বুড়ি মেয়েকে বিয়ে করবে সেটি তোমার ভুল ভাবনা। চৌধুরী বংশের মান মর্যাদা আছে। তোমার বিয়ে আমি ঠিক করে রেখেছি আবদুস সামাদ ভাইয়ের মেয়ে রত্নার সাথে। তিনি আমাদের মতই সম্মানীয়। অর্থ বিত্ত-বৈভবে সবাই তাকে এক নামে চেনে জানে। রেজাল্টের পরপরই তোমাদের বিয়ে দিয়ে রত্নাসহ তোমাকে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার জন্য লন্ডন পাঠাবেন। তুমি কি ভেবে দেখেছ যে মিতুকে বিয়ে করলে ওদের পুরো সংসারটাই তোমার ঘাড়ে পড়বে। তোমার অর্থের লোভে ছলচাতুরি করে ঐ ধিঙ্গি মেয়েটা তোমাকে ফাঁদে ফেলেছে।

এরপর ঢাকায় ফিরে এলাম। মিতুর সাথে দেখা করলাম। ও মেঘলা আকাশের চেহারা নিয়ে বললো, আমি সব জানি। আমাকে কিছু বলতে হবে না। বললাম, তুমি জানো কিভাবে? মিতু বললো, আমি বাড়ি গেলে খালাম্মা আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আমি মিতুর কাছে চিঠিটা দেখতে চাইলাম। ও লজ্জিতভাবে বললো, এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত চিঠি। খালাম্মা আর আমার মধ্যকার বিষয়। ভাবলাম চিঠির ভাষা ও বক্তব্য হয়তো এতই তীর্যক, রূঢ় ও লজ্জাজনক যে, সেটা আমাকে দেখাতে মিতু লজ্জা পাচ্ছে। এবার মিতু আমার দিকে তাকিয়ে কিছুটা আনমনা হয়ে

জানতে চাইল, আমার কিছু বলার আছে কি না? আমি খানিকটা অস্বস্তিতে পড়লাম। কি বলব তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। বাবা-মার কথার বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মিতু আমার দ্বিধান্বিত চেহারা দেখে নিজেই যেন আমাকে উদ্ধার করল। বলল, তুমি এখন হলে ফিরে যাও। পরে একদিন এস। টেনশন কোরনা, তোমার সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ফেরার সময় অনুভব করতে পারছিলাম দু'টো ছলছল চোখ পেছন থেকে আমার অন্তরের ভাষা সব পড়ে নিচ্ছে। আর নিজেই হয়তো লজ্জায় অবনত হচ্ছে এই ভেবে যে আমার মতো একজন কাপুরুষকে ভালোবেসেছে।

তারপর আর মিতুর সাথে দেখা হয় নি। কিছুদিনের মধ্যেই আমি বউ সহ লন্ডন পাড়ি দিলাম। ত্রিশ বছর পর মিতুর সাথে আজ আবার দেখা হলো।

পরের দিন মিতুদের বাড়িতে দুপুরের দাওয়াত। রত্মা খুব দামি শাড়ি গহনায় নিজেকে সাজাল। সাধারণ পোশাক আর হালকা পাতলা গহনায় যে কত অসাধারণ হয়ে ওটা যায় এবং ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে সেটা এখনও রত্মা বোঝে না। আমিও কি বুঝতাম যদি গতকাল মিতুকে না দেখতাম। অতি সাধারণ পোশাকেও মিতুকে কি মর্যাদাবান আর অসাধারণ দেখাচ্ছিল সেই কথা মনে হলে এখন নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাচ্ছি। মিতুর কাছে আমাদের জন্য আরও চমক অপেক্ষা করছিল সেটা বুঝতে পারি নি।

দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আমরা মিতুর বাড়িতে পৌঁছতেই হৈচৈ করে বের হয়ে এল পুরনো সব বন্ধু-বান্ধবীরা। শরীফা বললো, হাসান তুই তো চাঁদ হয়ে গেছিস। নীল আর্মস্ট্রং চাঁদের দেশে গিয়েছিলেন। তাঁকে তবুও দেখা যায় কিন্তু তোকে তো একেবারেই দেখা যায় না। আমি হাসতে হাসতে বললাম, খোঁজ নিয়ে দেখ্ নীল আর্মস্ট্রং পূর্ণিমার রাতে চাঁদে গিয়েছিল তাই তাকে দেখা যায়। আমার বসবাস গাঢ় অমাবস্যার ঘোরতর অন্ধকারে। একারণে দেখতে পাস না। চকিতে রত্মার দিকে তাকালাম। দেখলাম ওর মুখ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে।

স্কুল সহপাঠী তুষার হাবিব, স্বপনকে দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমি দেশেই থাকি অথচ ওদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। আর মিতু মাত্র কয়েক দিনের জন্য দেশে এসে ওদের সবাইকে খুঁজে বের করেছে। অন্ধ আভিজাত্য মিথ্যে বংশ মর্যাদা ও কেরিয়ারের নেশায় আমি এতটা অহংকারী হয়ে গিয়েছিলাম যে, এসব সাধারণ গ্রাম্য বন্ধু বান্ধবীদের সাথে মেলামেশা করা, সম্পর্ক রাখা কিংবা সামান্য খোঁজখবর রাখার কথা মনে আসে নি। এমনকি বন্ধু বলেও হয়তো কখনও মনে হয় নি! নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরের মানুষ করে রেখেছিলাম। আর আমার সাথে জুড়ি মিলেছিল আরেক অহংকারী রত্মা। রাবেয়ার স্বামী মারা গেছে সেকথা আমি জানি না অথচ মিতু দেখছি জানে!

পাশের ঘর থেকে সম্ভবত মিতুর বরের মৃদু অথচ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল। মা, আমি কালই রওয়ানা দিচ্ছি চিন্তা কোরনা। তারপর কাকে কাকে যেন নির্দেশনা দিচ্ছে কোন্ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ভদ্রলোকের চোখমুখ লাল সামান্য উত্তেজিতভাবে এঘরে প্রবেশ করে বললেন, দুঃখিত অনেকক্ষণ আপনাদের বসিয়ে

রেখেছি। এরপর আমার সাথে হাত মেলালেন। বান্ধবীদের দিকেও হাত বাড়ালেন। মিতু হাসতে হাসতে বলল, কতবার রিহার্সেল দিলাম তোমায় অথচ স্টেজে এসে ভুলে গেলে। ভদ্রলোক সঙ্কুচিতভাবে খাঁটি ইংরেজি উচ্চারণে ওহ সরি সরি বলে হাত টেনে নিলেন। এবার শরীফা, শিউলি, বেনু ওদের বিব্রত হওয়ার পালা। হাসাহাসিতে চারদিক ভরে উঠল। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। নিতান্তই অতি সাধারণ পোশাক ও সাদামাটা চেহারা তবে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী তা যেকেউ একনজর দেখলেই বুঝতে পারবে। অতি সাধারণ অথচ কত অসাধারণ তিনি।

মিতুর বর মিতুর দিকে তাকিয়ে বলল, মা'র শরীরটা হঠাৎ করে খুব খারাপ করেছে। আমি কাল ভোরেই রওয়ানা দেব। তুমি বরং কটা দিন থেকে যাও। বন্ধু বান্ধবীদের সাথে ঘুরে বেড়াও। তারপর যেও।

আমি গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম! আমরা তিন ভাই কী মায়ের প্রতি এত যত্ন নিতাম। আমাদের তিন ভাইয়ের ঢাকায় সাড়ে চার হাজার স্কয়ার ফিটের বাড়িতে জায়গা এতটাই কম ছিল যে, মায়ের থাকার এতটুকুন জায়গা ছিল না। তাঁকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গ্রামেই পড়ে থাকতে হয়েছিল। দেশে থেকেও মার সাথে দেখা করার সময় হতো কেবল মাত্র ঈদে। তাও সব ঈদে যাওয়া হতো না। অথচ এই ভদ্রলোক মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে কালই রওয়ানা দেয়ার চিন্তা করছেন। ভাবলাম আমাদের অর্থের অভাব ছিল না কেবল মনের জোরের অভাবটাই ছিল। বউদের মতের বিরুদ্ধে মা'কে আমরা ঢাকার বাসায় রাখতে পারি নি।

বিকেলে চা নাশতা খেয়ে বাসায় চলে আসলাম। কিন্তু মনকে কোনোমতে স্থির করতে পারছিলাম না। কেমন যেন হাহাকার করছিল। মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলাম- মিতু কি সুখী? আমাকে না পেয়ে ওর মনে কি কোনো আফসোস নেই? কখনও ক্ষণিকের অবসরে আমার কথা মনে করে কি গোপনে চোখের পানি ফেলে? হয়তো ফেলে! হাহাকার করে ওঠা মনে একথা বড় জানতে ইচ্ছে হলো।

পরদিন সকালবেলা আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাজির হলাম মিতুর মামার বাড়িতে। বাড়িটা কেমন যেন শান্ত নীরব। মনের ভেতরে বিদ্যুৎ চমকের মতো খেলে গেল আশঙ্কা। মিতু কি তাহলে চলে গেছে? ওর মামি হাসিমুখে বসালেন আমাকে। চা নাশতা দিলেন। উঠে আসার সময় আমাকে একটা খাম দিয়ে বললেন, মিতু এটা তোমাকে দেয়ার জন্য বলেছে।

খামটা খুললাম। সেখানে একটা চিঠি।

প্রিয় হাসান,

কেন জানিনা আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার সাথে আবার দেখা করতে আসবে। তাই আমার এ চিঠি। আমি চলে যাচ্ছি। আসিফকে একা ছাড়তে মন চাইল না।

ভালোবাসার নির্দিষ্ট বিন্দু বা বৃত্ত থেকে বের হয়ে যে স্বস্তি পাওয়া যায়, প্রশান্তিতে মন ছেয়ে যায়, আত্মসম্মানবোধ যে আরও দৃঢ় হয় সেটা জানলাম তোমার ভালোবাসার বৃত্ত থেকে বের হতে পেরেছিলাম বলেই। তা-নাহলে আসিফের মতো মানুষের বড় হৃদয়

ও অসীম ভালোবাসা অজানাই থেকে যেত আমার কাছে। তোমাকে ভালোবেসেছিলাম বলেই আজ আমার এই বিশাল প্রাপ্তির মর্ম অনুভব করতে পারছি। ভালোবাসার পার্থক্যটা বুঝতে পারছি। কেবল তাকে শুধু ভালোই বাসছি না বরং সত্যিকারের সম্মানবোধ ও শ্রদ্ধাবোধ থেকেই তাঁকে ভালোবাসতে পারছি। সেই ত্রিশ বছর আগের অনুভূতিকে আমি অস্বীকার করছি না। কালের বিবর্তনে সেই অনুভূতির বর্তমান নাম যাই হোক না কেন!

আসিফ তোমার কথা জানত। সেই ত্রিশ বছর আগে তুমি যখন আর ফিরে এলে না তখন আমি প্রচণ্ডভাবে মানসিক আঘাত পাই। একদিন স্যার খুব আন্তরিকতার সাথে আমার অস্থিরতার কারণ জানতে চাইলেন। সবকিছুই ওনাকে বললাম। স্যার বললেন, তুমি কয়দিন বিশ্রাম কর। তারপর এসো। তবে নিয়মিত ক্লাসে আসবে তা নাহলে আমি চিন্তা করব। বেশ ক'দিন পর স্যারের মা একদিন হলে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। গিয়ে দেখলাম স্যারের তিন বছরের ছেলে রাতুল ও স্যার বসে আছেন। আমরা সবাই মিলে খেলাম, ঘুরলাম। রাতুল অনেক আনন্দ পেল; সাথে আমিও। এভাবেই ধীরে ধীরে তোমাকে হারানোর আঘাতটা কাটিয়ে মানসিক শক্তি ফিরে পাচ্ছিলাম। প্রায় দু'তিন মাস পর একদিন স্যার আমাকে একটা চিঠি দিলেন। বললেন মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়ে চিন্তাভাবনা করে তার উত্তর দিতে।

চিঠিটি ছিল এমন, মিতু, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তোমার মা ও ভাই বোনদের দায়িত্ব আমি নিতে চাই। কেবল আমার ছেলে রাতুলকে 'মা' ডাকার অধিকার দেবে তুমি। যদি তুমি সম্মতি দাও তাহলে আমার আম্মাকে তোমার মায়ের কাছে পাঠাব।

হ্যাঁ হাসান, সেই স্যারই আমার স্বামী আসিফ। আমার তিন ছেলে মেয়ের মধ্যে বড় ছেলের নাম রাতুল। আমি আসিফের দ্বিতীয় স্ত্রী। দ্বিতীয় স্ত্রী হয়েও যে আমি কতটা গর্বিত সে-কথা তোমাকে বোঝাতে পারব না। যতটা আলোয় মন আলোকিত হলে একটি মেয়েকে মূল্যায়ন করা যায় তারচেয়ে বেশি আলোয় আলোকিত আসিফরে হৃদয়। আমরা যতটা না স্বামী স্ত্রী তারচেয়েও অনেক বেশি বন্ধু। মুখ দেখেই আমরা পরস্পরকে পড়তে পারি, বলে দিতে পারি মনের কথা। এখন ভাবি দু'টো চিঠি আমার জীবনকে মুহূর্তেই বদলে দিয়েছিল। প্রথম চিঠিটা আমাকে সাগরের গহীন অতলে ডুবিয়ে দিয়েছিল যেটা তোমার মা আমাকে দিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় চিঠিটা আমাকে সেই অতল থেকে তুলে এনে অনুপম শান্তিময় জীবন দিয়েছিল।

তোমরা ভালো থেকো, সবাইকে ভালো রেখো।

শুভ কামনা তোমাদের জন্য।

চিঠিটা পড়ার পর হাতে নিয়ে পাথর মূর্তির মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম কারও কারও দুর্ভাগ্য আসে সৌভাগ্যের ছদ্মবেশে। আর কারও কারও বেলায় ঠিক উল্টোটা হয় সৌভাগ্য আসে দুর্ভাগ্যের ছদ্মবেশে। আমার মা আর মিতু হয়ত তারই উদাহরণ। মা সেদিন মিতুকে অস্বীকার করে চিঠি লিখে নিজের সন্তানের দুভ্যার্গ্যকে

স্বাগত জানিয়েছিলেন। আর সেই অস্বীকার করা চিঠির ভেতর লুকিয়েছিল মিতুর সুমধুর সৌভাগ্য।

আমার মনের হাহাকারের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। মিতুর মতো সংগ্রামী মেয়েরা ধূলোজল মেখে উপেক্ষা ও অসম্মানকে শক্তিতে পরিণত করে। এগিয়ে যায় কেবলই সুন্দর আগামীর দিকে।

তেহরান, ইরান

বন্যা হোসেন

অদৃশ্য পেন্সিল

১

মস্কোর দামাদিওভা এয়ারপোর্ট থেকে বাংলাদেশ হাই কমিশনের পাঠানো গাড়িটা ছুটে চলেছে রাজধানীর কেন্দ্রস্থলের কোনো হোটেলের উদ্দেশ্যে। পঁয়ত্রিশ বছর পর সম্পূর্ণ নতুন দেশ মনে হচ্ছে চারপাশের পরিবর্তন দেখে। সেসময় এয়ারপোর্ট ছিল একমাত্র শেরমিতোভা। এখন নাকি চার পাঁচটি এয়ারপোর্ট রয়েছে।

রাস্তার পাশের বার্চ, পাইন আর ওক গাছগুলো ছাড়া বাকি সবই অপরিচিত। এই সেপ্টেমবরের সকালে ঝকঝকে দিন, নির্মল আকাশ, পরিষ্কার রাস্তাঘাট দেখে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। যা দেখছি তাই নতুন লাগছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে ফুলের বাগান। ছেঁটে রাখা ঘাস আর ঘন সবুজের স্নিগ্ধতা ঢাকাবাসী ভুলতে বসেছে।

ছাত্র থাকাকালীন দেখেছিলাম বড়ো বড়ো দালানের মাথায় ছিল কাস্তে হাতুড়ি আঁকা লাল পতাকা। এখন সেখানে তিন রঙ্গা পতাকা বাতাসে উড়ছে; নতুন আশায় উদ্দীপিত।

দ্বিপাক্ষিক কিছু চুক্তি স্বাক্ষরের প্রারম্ভিক কাজে আমাকে পাঠানো হয়েছে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে। উচ্চপদস্থ রুশ জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তার দরকার ছিল বাংলাদেশ সরকারের। আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে দূতাবাস থেকে আসা শফিউল সাহেব বিদায় নিলেন।

দেশে ফোন করতেই পিউ তার মায়ের ফোন ধরে একটানা বকবক করল সে কতটা চিন্তিত ছিল বাবাকে নিয়ে ইত্যাদি। সাদাফ ছিল ভিডিয়োতে। ছয় বছরের বাচ্চাটা নানাভাইকে দেখে খুশিতে অনেক কিছু বলতে চাইল। কিছু অর্থহীন শব্দ ছাড়া বাকীসব বোধগম্য হলো না। মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ছে। হাত পা ছুড়ছে একটা দেড় দুই বছরের বাচ্চার মতন। প্রচন্ড মায়া হয় সাদাফকে দেখলে কিন্তু এর ভবিষ্যতের কথা ভেবে আশংকায় বুক কেঁপে ওঠে।

পিউ ভিডিয়োটা অফ করে জানায়, সে ওবাড়ি থেকে একবারে চলে এসেছে। আর ফিরে যাচ্ছে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি; অবধারিত ছিল এসংবাদ। সাদাফের জন্মের ছ' মাস পর পিউয়ের বর আরাফ আর ওর বাবা মায়ের যে পাংশু মুখ দেখেছিলাম তখনই যা বোঝার বুঝেছি। সাদাফ বিশেষ বাচ্চা যার অতিরিক্ত যত্ন ও চিকিৎসা দরকার। এই সত্যটা জানার পর থেকে কোনোরকম সম্পর্কটা টিকে ছিল এতদিন।

মেয়ের সিদ্ধান্তে সম্মতি জানিয়ে ক্লান্তির অজুহাতে ফোন ছাড়লাম। পিউয়ের মাকে ফোন করব সামান্য বিশ্রাম নিয়ে। গরম ঠান্ডা পানি মিশিয়ে শাওয়ার নিলুম মিনিট পনের। বেশ ঝরঝরে লাগছে এখন। সকাল দশটা বাজে। অন্তত দু' ঘন্টা ঘুমাতে পারলে মন্দ না। লাঞ্চের পর দূতাবাসে গিয়ে আগামিকালের মিটিং নিয়ে কিছু আলোচনা হবে। রাশান কর্তৃপক্ষের সাথে বসবার আগে বিষয়গুলো নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার সবার। একবছর ধরে আলোচনা চলছে তারপরও কত খুঁটিনাটি সমস্যা হতে পারে।

২

পঁয়ত্রিশ বছর আগে দেশটির নাম ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। রেড স্কোয়ারে হাঁটছে আনিস সহপাঠীদের সাথে। রঙ্গিন সাজে সজ্জিত সেন্ট বাসিল গির্জার উজ্জ্বল আলোতে পুরো পরিবেশ বর্ণাঢ্য এক রূপকথার জগত; তৃতীয় বিশ্ব থেকে যাওয়া ছাত্রদের জন্য। তুষারকন্যার মতো দেখতে রুশ মেয়েটা হাত ধরে টানে; সে লেনিনের সমাধির দিকটায় যেতে চায়।

- পাশলি তুদা। (চল, ওদিকে যাই)।

এই মেয়েটির কাছে রাজধানী মস্কো বিদেশি ছাত্রদের মতোই অচেনা। একারণেই কিনা কে জানে সে শুরু থেকেই বিদেশিদের সাথে স্বতস্ফূর্তভাবে মেলামেশা করে। আনিস ছাড়াও বেশ ক'জন বাংলাদেশির সাথে পরিচয় হয়েছে। ভাষা নিয়ে ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেয় আর বিদেশিদের মুখে ভুলভাল উচ্চারণ শুনে সে বেদম হাসিতে পেট চেপে ধরে ক্ষণে ক্ষণে।

চঞ্চলা হরিণী স্বভাবের স্বর্ণকেশী মেয়েটির গাল দুটো টকটকে আপেলের মতো। কথা বলে যেন অবিরাম বয়ে চলা এক ঝরনা। যেন এক গল্পকথার নদী যার কুল নাই, কিনারা নাই। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় মুহূর্তের মাঝে। ফেলে আসা গ্রাম, সেখানকার জীবনযাত্রা, পাড়া পড়শী, বাবুশকা, বয়ে চলা নদী, গ্রামের একমাত্র কারখানা যেখানে গবাদি পশুর অস্ত্রপোচারের সামগ্রী তৈরি হয়- - সব সে বলত কলকল করে।

ওর পোশাকী নাম সেনিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। ভারিক্কি নামের মেয়েটাকে মিষ্টি করে 'সুশা' ডাকেই বেশি মানাতো। ওর সঙ্গে প্রতিদিন ক্লাসের পর চলাফেরা করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। ছুটির দিনে শহরের আনাচেকানাচে ঘুরে সিনেমায় যাওয়া ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। আনিস তুখোড় ছাত্র; ওদেশে বলত আতলিচনিক(এক্সেলেন্ট)। সুশার চোখে তার জন্য মায়া আর সমীহের কমতি দেখেনি কখনো।

তৃতীয় বর্ষে দুজনেই পড়াশুনায় ব্যস্ত বলে দেখা সাক্ষাত কম হচ্ছিল। সুশা দু'দিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকায় আনিসের টনক নড়ল। হোস্টেলে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল,

প্রচন্ড জ্বরে সুশার গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথায় জলপট্টি দিয়ে, অসংখ্যবার লেবু চা আর ওষুধ খাইয়ে কিছুটা সুস্থ করে ফিরল আনিস গভীর রাতে নিজের কামরায়। অচেতন অসুস্থ মেয়েটির সেবা শুশ্রুষা করতে গিয়ে আচমকাই মনে হচ্ছিল, ওকে ছাড়া জীবনযাপন করা কষ্টকর। অন্যদিকে, পড়াশোনার ব্যস্ততার মাঝে হৃদয়ঘটিত সমস্যা হলে সময়মত ডিগ্রি পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে।

আনিসের হৃদয়রাজ্য তখন সুশার দখলে; তাই সে একসাথে জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখে। চঞ্চলা প্রজাপতির মতো মেয়েটার বাস্তব বুদ্ধি ছিল অনেক বেশি। ভাবাবেগে তাড়িত না হয়ে শুধু বলেছিল, " আমাকে বিয়ে করবে, আনিস? দু'জনের স্টাইপেন্ডের টাকায় আমাদের চলে যাবে। কিন্তু পড়া শেষ হলে তুমি দেশে ফিরে গেলে আমাকে কি তোমার আপনজনেরা মেনে নেবে ?"

নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী ছেলে আনিস কী উত্তর দেবে এই প্রশ্নের? মেয়েটা বুঝেছিল প্রাচ্য দেশের এই তরুণের পক্ষে হুট করে এমন অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্ত নেয়া অনুচিত হবে। বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলেও ভালোবাসার ফল্গুধারা আগের মতোই বইছিল। খাওয়া-রান্নার সময়ের অভাব, পড়াশোনার ব্যস্ততা আর সুশার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে পাগল করে দিচ্ছিল। একটি বিদেশি মেয়ে তাকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসে; প্রতিটি আচরণ, স্বভাব লক্ষ করে নিজেকে বদলাতে চেষ্টা করে। এর প্রতিদানে কি তাকে আরও বেশি করে ভালোবাসে কাছে পেতে ইচ্ছে করে না? দুটি উজ্জ্বল যুবক যুবতী শুধু প্রতিদিন ঠোঁটে ঠোঁট মেলানোর চাইতেও একসঙ্গে জীবনযাপনের ইচ্ছেটা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছিল।

বছরখানেক পর এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আবাসিক হোস্টেল কর্তৃপক্ষ দুজনকে একই ইউনিটে থাকার অনুমতি দিল। ব্যাচেলরস শেষ করে দুজনেই তখন মাস্টার্স শুরু করেছে। দুটি ছোটো কামরার একটিকে শোবার ঘর, অন্যটিকে খাওয়া ও বসার ঘর বানানো হলো। বাথরুমের সামনে ছোটো জায়গাটিতে একটি টেবিলে চূলা বসিয়ে রান্না শুরু হলো। সুখী সুন্দর দাম্পত্য জীবন যা পাশ্চাত্যের দেশের জন্য খুব স্বাভাবিক; কেউ ভ্রু তুলে প্রশ্ন করার নেই। বিয়ের বৈধ সার্টিফিকেট না হলেও চলবে।

কে না জানে রুশ মেয়েদের আন্তরিকতা আর হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসার কথা! সুশার পান্না সবুজ চোখের মোহে সাড়া দেবে না এমন কেউ আছে কী না সন্দেহ। আর আনিস তো বেচারা এক পুরুষ মাত্র! যার আগমন বাংলাদেশ থেকে যেখানে পুরুষ শুধু নিঃশর্ত সেবা পেতে অভ্যস্ত। সেবার পাশাপাশি উত্তাল প্রেমের জোয়ারে ভলগাতেও বুঝি প্লাবন হয়েছিল। পাপ পূন্যের গ্লানি বাদ দিয়ে বর্তমানকে ঘিরেই চলছিল তাদের পৃথিবী। ক্রমশ সুশার ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছিল। সুশা অন্য বাঙ্গালিদের প্রশ্ন করে শিখে নিচ্ছিল প্রেমিকপ্রবরের পছন্দের খাবারগুলো। একেকদিন সে চমকে দিত আনিসকে তার নবলব্ধ জ্ঞান দিয়ে। মুগ্ধতার পালা শেষ হত আরেকপ্রস্থ ভালোবাসার বিনিময়ে।

৩

মস্কোতে আসার পর দুদিন কেটে গেছে। বাংলাদেশ দূতাবাস, এনার্জি সেক্টরের সাথে মিটিং, লাঞ্চ, ডিনার ইত্যাদিতে সময় কেটে যাচ্ছে খুব দ্রুত। পুরনো কোনো বন্ধুরা নেই এদেশে; সহপাঠীরা ফিরে গেছে স্বভূমিতে। সুশাকে চিনত কঙ্গোর সেরাফিনা, শ্রীলঙ্কার জোসেফ, কলোম্বিয়া আর ভারতের দুজন যাদের নাম এখন আর কিছুতেই মনে পড়ছে না।

এতদিন পর বিবেকের দংশন শুরু হয়েছে। হোটেলের বাথরুমের আয়নায় প্রতিদিন দু'বেলা নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে একজন অপরাধীকে খুঁজি আমি। আবার ভাবি, হয়ত সুশা আমাকে অপরাধী ভাবছে না। স্বেচ্ছায় দ্বৈত জীবনে সম্মতি জানিয়েছিল সে।

সুশাদের ছোট্ট গ্রাম জালাতুখা মস্কো থেকে দুশো কিলোমিটার দূরে। প্রায়ই অবকাশ কাটিয়ে আসা হতো সেখানে। নগরকেন্দ্রিক বদ্ধ জীবনের বাইরে উন্মুক্ত খোলামেলা প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ। গ্রামের মানুষগুলো পৃথিবীর সবদেশেই হয়ত একইরকম। বড্ড খোলামেলা, সহজ সরল। বাবুশকা (নানি বা দাদি) ভেরা আর জেদুশকা (নানা বা দাদা) নিকোলাই ছিলেন আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু। সুশার মা তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর কর্মস্থল সাইবেরিয়ার একটি শহরে থাকতেন। বছরে একবারের বেশি আসার সুযোগ হতো না। বাবুশকা ভেরা, সুশার মা নাতালিয়া আর সুশা- তিন অসমবয়সী নারী একত্র হলে অনাবিল হাসিতে চারদিক আচ্ছন্ন করে রাখতেন। কী প্রচন্ড কর্মস্পৃহা তাঁদের। সুশার জন্য বাবুশকা ভেরা প্রতিবারই বেশ কিছু কাজ জমিয়ে রাখতেন। পর্দা সেলাই বা শীতের জন্য সবজি ম্যারিনেট করে বোতলজাত করা বা জংলী ফলের জ্যাম বানানোর কাজ। সুশাকে প্রায় দেখাই যেত না রাতে বিছানায় ঘুমানোর সময় ছাড়া। সে সারাদিন পড়শীদের খোঁজ নিত, গ্রামের বুড়োবুড়িদের হাঁস মুরগি, গরু ছাগল, কুকুর বেড়াল সবাই যেন তার বন্ধু। আমি ভাবতাম, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে রসায়নে মাস্টার্স পড়ুয়া একটি মেয়ে যেভাবে পড়াশোনার বাইরে জীবন, প্রকৃতি বা সামাজিকতা নিয়ে ভাবে এমনভাবে আমাদের দেশের কজন মানুষ চিন্তা করে? আমরা সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পড়ার সুযোগ পেয়ে এলিট শ্রেণীতে ঢোকার ছাড়পত্র পাওয়া গেছে ভেবে জীবনধর্মী সব কাজকে অপমানজনক মনে করি।

সুশাদের পরিবারের একজন হয়ে ওঠার ফলে মস্কোবাসের শেষ দু'বছরে আমি নানা কাজ শিখেছিলাম। জঙ্গলে গিয়ে মাশরুম সংগ্রহ, বুনো ইয়াগাদি চেনা, বিষাক্ত ফল পরিহার করা ইত্যাদি। গ্রামের জীবন হলেও এরা ঘড়ির কাঁটা মেনে চলতেন। বাড়ির অন্যান্যরা উঠে পড়লে তরুণ দম্পতির বেশিক্ষণ একে অপরের বাহুডোরে কাটানো সম্ভব হেতো না। সকালে ঘরে তৈরি কালো রুটি, মাখন আর পনির খেয়ে কড়া কফিতে চুমুক দিয়ে সবাই নিজস্ব কাজে বেরিয়ে পড়ত।

মাঝে মাঝে আমাকে রান্না করতে বলত বাবুশকা ভেরা। বাগানের ঝাল মরিচ দিয়ে মুরগির ঝোল রান্না করে খাওয়াতাম শুধু পেয়াজ রসুন, আদা লবন, মরিচ আর টমাটো দিয়ে। সেই রান্না ছিল জালাতুখাবাসীর কাছে ভারতীয় রান্না খাওয়ার স্বর্গসুখ।

আয়না আজকাল প্রতিদিন আমাকে অতীত দেখাচ্ছে। কাকে জিজ্ঞেস করা যায় সুশার কথা? একবার জালাতুখায় ঘুরে আসব গাড়ি ভাড়া করে? কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর পর কি সব আগের মতো আছে!

দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রাটারি জামিল সাহেব স্থানীয় বাংলাদেশিদের কয়েকজনকে চেনেন। তাকেই বরং জিজ্ঞেস করে দেখা যাক যদি কাউকে পাওয়া যায়।

- জামিল সাহেব, আমার এক রুশ সহপাঠীকে খুঁজছি। আশির দশকে পড়াশোনা করেছে এমন কাউকে চেনেন আমাদের দেশিদের মধ্যে ?

- কঠিন প্রশ্ন। দেখি খোঁজ করে। পুরনোরা মোটামুটি সবাই চলে গেছে। রুশ পরিবারে বিয়ে করে এখানেই অবস্থান করছেন এমন কয়েকজনকে জানি। ফেসবুক গ্রুপ আদনাক্লাস্নিকি-তে (সহপাঠী) খোঁজ নিলে আরো দ্রুত খুঁজে পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। আপনি যেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন ? ফ্রেন্ডশিপ মানে প্যাট্রিস লুমুম্বায় ?

- জি, না। আমি মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম।

- আরেকটা কাজ করুন না! আপনার ডিপার্টেন্টে চলে যান। আজকাল তো পুনর্মিলনী হয়; বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রাক্তন ছাত্রদের নাম ঠিকানা সংরক্ষণ করে।

- আপনি দারুণ দূরদর্শী মানুষ। বুঝতে পারছি কেন এত অল্প বয়সে এই পজিশনে এসেছেন।

- আরে স্যার, কী যে বলেন। অলওয়েজ হ্যাপি টু সার্ভ ইউ।

৪

জামিলের পরামর্শ অনুযায়ী ফেসবুক গ্রুপে সার্চ দিলাম। মনের অস্থিরতার জন্য দেশে কয়েকদিন যাবত ভালো করে কথা হচ্ছে না। রাতে ঘরে ফিরে ল্যাপটপে লগ ইন করতেই স্ত্রী ফোন করে বসল।

- কী ব্যাপার ? তুমি তো বিদেশে গিয়ে আমাদের ভুলেই গেলে ! খোঁজই নিচ্ছ না। ফোন করলে ধরো না।

- মিটিং চলছে প্রায় সারাদিন। এখানে কতগুলো প্রাথমিক কাজই শেষ করা হয়নি। আমার যাওয়া হয়ত কয়েকদিন পিছাতে হতে পারে। মূল চুক্তি স্বাক্ষরের সময় মন্ত্রীর সাথে আবারও আসতে হবে।

- আমি এসব বুঝি না। পিউ নাকি আর ওবাড়িতে ফিরবে না। জানো নিশ্চয়? এই সমস্যার সমাধান ভাবতে হবে। মেয়ে ডিভোর্সি এটা মানুষকে বলা যায় ? বাচ্চার পেছনে যে খরচ আমরা কিভাবে সামলাবো ?

- মাঝেমধ্যে সন্দেহ হয় পিউ তোমার নিজের মেয়ে তো ? মেয়েটাকে সারাক্ষণ বাচ্চার জন্য খোঁটা শুনতে হচ্ছে গত পাঁচ বছর। ওখানে কি করে সে থাকবে ? ধনী হলেও ওরা মানুষ না। মানুষ হলে নিজেদের ঘরের সন্তান সম্পর্কে এত বাজে ভাষায় কথা বলত না। চিন্তা কোর না, আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন পিউ আর ওর বাচ্চার দেখাশোনার ভার আমার।

- হুম, তুমি তো বলেই খালাস। বাচ্চা নিয়ে পিউকে আবার কেউ বিয়ে করতে চাইবে ? ওর কী বা এমন বয়স ! বাচ্চাটাকে কোনো শিশুসদনে দিয়ে দেয়া যায় না ? টাকা পয়সা যা লাগে আমরা দেব। তাহলে পিউও নিশ্চিন্ত হত, আমাদের বুকের ভারও কমত।

আরিফার সাথে আজকাল আর কথা খুঁজে পাই না। দেশে গিয়ে ভালো চাকরির সুবাদে ধনীকন্যার সাথে বিয়ে হয়েছিল। সম্ভ্রান্ত বংশ আর তাদের ঠাটবাট নিয়েই আছেন আরিফা। নিজের সুনাম, সম্মান এসব বিষয়গুলোই বেশি গুরুত্বপুর্ন বাংলাদেশের সো কল্ড বড়োলোকদের জন্য। এতটুকু মনুষ্যত্ব নেই।

ফেসবুক ছেড়ে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে রসায়ন অনুষদের পেজ বের করে শিক্ষকদের নাম, পিএইচডি ছাত্রদের নাম ও প্রোফাইল খুঁজলাম কিছুক্ষণ। তেমন কিছুই পেলাম না।

আগামী দু'দিন সাপ্তাহিক ছুটি। হাই কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত একটি বারবিকিউ বা শাশলিক পার্টি করা হবে শহরের বাইরে; সেখানে যেতে হবে। আমার সম্মানেই এই আয়োজন।

শনিবার সকালে বেরিয়েছি রেড স্কোয়ারের উদ্দেশ্যে। হোটেল থেকে বেরিয়ে সামান্য হেঁটে রাস্তা পার হয়ে আক্তিয়াবরস্কায়াতে মাটির নিচের মেট্রো রেলে ঢুকলাম। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আর ঠান্ডা হাওয়া শুরু হয়েছে। মাফলার, টুপি সাথেই আছে। এই ঠান্ডাই ধীরে ধীরে ডিসেম্বরে গিয়ে কঠিন ঠান্ডায় রূপান্ততিত হয়। তুষার শোভিত সেই দিনগুলো কঠিন হলেও স্মৃতির পাতায় রঙ্গিন হয়ে আছে। এতগুলো বছর যেন এক গোপন সিন্দুকে অনুভূতিগুলো দম আটকে ছিল। এদেশে পা দেওয়া মাত্রই সব বানের জলের মতো ভুসভুস করে বেরোতে শুরু করেছে।

মেট্রো স্টেশন থেকে বের হতেই মার্শাল জুকোভস্কির ভাস্কর্য। লেনিনের মুসলিয়ামে ঢোকার জন্য লাইনে দাঁড়ালাম। প্রচুর লোক এসেছে এই সকালে। প্রত্যেকের ব্যাগ তল্লাশি হচ্ছিল। পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে নিচে নেমে গেছে, চারপাশে অস্ত্রবাহী নিরাপত্তা রক্ষী। কালো কোট, কালো প্যান্ট পরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন দুনিয়া কাঁপানো ইতিহাস সৃষ্টি করা ছোটখাট মানুষটি। লালচে ফ্রেঞ্চ কাট দাঁড়ি আর মুখমন্ডল ও হাত দুটোতে আলো এসে পড়েছে ছাদে ফিট করা বিশেষ বাতি থেকে। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন মৃত্যুবরণ করেছেন। এই মৃতদেহটি সেই থেকে মমি হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

ইতিহাস যাদুঘরের ঠিক পাশেই নতুন কাজান গীর্জা। আশেপাশের ভবনের দেয়ালে বা মাথায় কাস্তে হাতুড়ির জায়গায় রুশ খ্রীষ্টধর্মের সন্তদের প্রতিকৃতি দেয়া। রেড স্কোয়ার আর ক্রেমলিন আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। রেড স্কোয়ার চত্বরে মাটির নিচের আধুনিক শপিং মল মানিয়েজনায়া প্লোশাদে ঘুরে ফুড কোর্টে ঢুকে এদেশের বিখ্যাত খাবার ব্লিনি বা ইংলিশ ক্রেপ নিলাম সলটেড স্যামন আর চকলেট দিয়ে। এসব খেতে গিয়ে আবারও মনে পড়ে যায় সুশার কথা। সুশা প্রায় প্রতিটি ছুটির দিনে ব্লিনি বানাতো সকালের

নাশতায়। কখনও রাতের খাবারেও ব্লিনি আর কাটলেট। আশপাশের প্রতিটি মানুষকে খুঁটিয়ে দেখছি যদি সুশার সাথে মিলে যায় কারো চেহারা এই প্রত্যাশায়।

রোববার দিন বারবিকিউয়ের পরিকল্পনাটি আবহাওয়ার কারণে বাতিল হলে ভাবলাম দুতাবাস থেকে গাড়ি নিয়ে জালাতুখায় ঘুরে আসব। দ্বিধাদ্বন্দ্বে যাওয়া হলো না।

আয়নার সামনে আবছায়া সেই মুখ। অনুভূতিগুলো যেন ঘুমিয়ে ছিল সেই গানটার মতো, আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ...। ত্রিশ বছরের অধিক সময় গভীর ঘুমে নিমজ্জিত আমার ঘুম ভাঙল ভুল সময়ে ভুল পরিস্থিতিতে। সাদাফকে দেখলে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয় তুষারকন্যার মতো দেখতে একটি শিশুর কথা মনে করে। সামান্য অসাবধানতায় যেন কাচের ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। সারারাত এপাশ ওপাশ করলাম। সেই শিশুটির মুখ থেকে পাপা ডাক শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। একটি ছবিও সঙ্গে নেই।

৫

পরদিন সব কাজ দুপুরের মধ্যে শেষ করে গিয়ে হাজির হলাম আমার সেই অতিপরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। এই দালানটির মত একই স্থাপত্য শৈলীতে কয়েকটি দালান ছিল সেসময়ে মস্কো শহরে। মূল ফটকের ভেতর ঢুকে আগের মতোই প্রচুর তরুণ শিক্ষার্থীদের দেখা পেলাম। সতেজ অথচ ভাবগম্ভীর পরিবেশ।

রসায়ন বিভাগের অফিস সহকারী মেয়েটিকে নিজের পরিচয় দিতে সে বেশ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আমাকে বলল, এত বছরেও তুমি ভুলে যাওনি ভাষা?

মৃদু হেসে আমার কৌতূহলের কারণ জানালাম। সে আমাকে বলল, তুমি সেনিয়া মানে সুশাকে খুঁজছ? সে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগের একজন পরিচালক। এই যে রুম নম্বর। দৌড়ে যাও, সে সম্ভবত অফিসেই আছে।

ঝলমলে তরুণী মারিনাকে বলশয় স্পাসিবা (অসংখ্য ধন্যবাদ) দিয়ে দৌড়ে লিফটে উঠলাম। তখুনি খেয়াল হলো; এতবছর পর এলাম কিছু একটা আনা উচিত ছিল। যাকগে, এখন বোধহয় সেসব ভাবা অবান্তর।

দরজার বাইরে নেমপ্লেটে ভর্তি সংক্রান্ত বিভাগের প্রধান পরিচালকের নাম লেখা। এত বছর পর আমাকে চিনতে পারবে ? যাব কি যাব না দোনোমোনা করতেই দরজাটি খুলে গেল। অল্পবয়সী এক তরুণী হাসিমুখে আমাকে বলে, "অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসোনি তো ! ম্যাডামের মিটিং চলছে টেলিফোনে। তোমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।"

নিজের পরিচয় দিলাম। কুড়ি মিনিট পর সুশা নিজে উঠে এল বাইরে আমার সাথে দেখা করতে। এত বছর পরেও সেই একই চেহারা। চামড়ায় টান ধরেনি; ঔজ্জ্বল্য কমেনি, গাল দুটো তেমনি লালচে। মাখন রঙ্গা সিল্কের শার্টের ওপর কালো বিজনেস কোট প্যান্ট পরা সুশাকে দেখে বুকের মাঝে পিনপিন করা কিছু কষ্ট দানা বাঁধছিল। চুলগুলো কেটে ফেলছে ঘাড় পর্যন্ত। পাতলা ঠোঁটে মভ কালারের লিপস্টিক। কানে

সামান্য গয়না। আঙ্গুলে অনেকগুলো আংটি। ঠিক বোঝা গেল না ম্যারিটাল স্ট্যাটাস। তাতেই বা আমার কি ! এতগুলো বছর নিশ্চয় সে অপেক্ষায় বসে থাকেনি।

সুশা আগের মতোই উচ্ছ্বসিতভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরল। দুই গালে গাল ঠেকিয়ে অভিবাদন জানালো। হাত ধরে তার কামরায় নিয়ে গেল।

- তারপর বলো, কবে এসেছ?

- অফিসের কাজে এসেছি।

- বাঃ, বেশ পদস্থ ব্যক্তি। খুব ভালো লাগছে জেনে।

- এখানে আসার পর তোমাকে খুব মনে পড়ছিল। জানতাম না কিভাবে খোঁজ করব। একবার ভাবছিলাম তোমাদের গ্রামে চলে যাব কিনা !

- খোঁজ করছিলে কেন? ভাগ্যিস গ্রামে যাওনি। বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি।

- তাই ? বাবুশকা ভেরা ...?

- বহু আগে মারা গেছে। কেউ নেই। খুব পুরনো বাড়ি তো। অনেক মেরামতের দরকার ছিল। সাশা মারা যাবার পর আর ঝামেলা করতে ইচ্ছা করেনি।

- সাশা ?

- আমার স্বামী। ক্যান্সার হয়েছিল। সাত বছর হয় মারা গেছে। তোমার পরিবার সম্পর্কে বলো।

- এক ছেলে, এক মেয়ে। নাতিও হয়েছে।

- আর বউ ?

- আরিফা ওর নাম। তোমার ছেলেমেয়ে ক' জন ?

- তিনজন। দুই মেয়ে এক ছেলে। আমার নাতনির ছবি দেখাচ্ছি।

বলেই সে তার টেবিলের উপর রাখা একটি ফটোস্ট্যান্ড আমার দিকে ঘুরিয়ে দিল। এক ফুটফুটে শিশু দুষ্টুমিষ্টি হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। আমার জুলিয়ার মুখখানা যেন বসানো।

- জুলিয়ার সন্তান ?

সুশার মুখখানা যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। নিজেকে সামলে বলে, না। আমার ছেলে ইভানের মেয়ে আলিওনা।

- জুলিয়া...উমম।ওর সাথে দেখা করা সম্ভব ? কোথায় আছে, কী করছে ? জানি, এতবছর পর এসব প্রশ্ন করা ঠিক হচ্ছে না। পারলে আমাকে ক্ষমা কোরো।

- সে ঠিক আছে। আমরা তো কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি। বয়স কম ছিল। আনন্দ করেছি, প্রথম যৌবন উপভোগ করেছি। আমার আফসোস নেই; অভিযোগও নেই।

ভেবেছিলাম সুশা নিশ্চয়ই ভীষণ ক্ষেপে গালিগালাজ করবে। ওর জায়গায় আরিফা হলে কী করত ! অনুমান করা খুব কঠিন নয়। আজকের দিনে দ্বিতীয়বারের মতো আফসোস হলো।

- জুলিয়া কি এখন কথা বলতে পারে ? ও কি করছে ?

সুশা কয়েকমুহূর্ত চুপ করে রইল। এক অদ্ভুত মমতা আর স্নেহ ফুটে উঠল ওর চেহারায়।

- তোমার ইমেইলটা লিখে দাও। তোমাকে একটা জিনিস পাঠাবো। অনেক আগেই দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার কোনো ঠিকানা ছিল না আমার কাছে।

- আচ্ছা, দিচ্ছি। কাল রাতে আমার ফ্লাইট। এর আগে জুলিয়ার সাথে দেখা করা যায় না ?

- হ্যাঁ অবশ্যই। ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। চলে যাও।

বেশ অবাক হলাম। এত সহজে সুশা আমার মতো এক হতভাগ্যের সাথে কন্যার দেখা করার ব্যবস্থা করছে। অনেক অনুরোধেও নিজে যেতে রাজি হলো না। ঘড়ি দেখে বলল, আজ বাদ দাও। কাল খুব ভোরে চলে যেও।

কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল সুশা। ব্ল্যাক কফি ও প্রিয় শাকালাত (চকলেট) আলিওনকা পরিবেশন করল। আমার মতোই নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ত সুশাও।

- আমার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইছি। দেশে যাবার পর একটা ভালো চাকরি হয়ে গেল। কিছুদিন পরই বাবা মায়ের পছন্দে বিয়ে। তোমাকে সব জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। তুমি কোনো উত্তর দাওনি।

- ভেবো না। যা হয়েছে হয়ত তাই ছিল অদৃষ্টে লেখা। আমার কোনো অভিযোগ নেই তোমার বিরুদ্ধে, আনিস। যে কদিন একসাথে ছিলাম ভালোবাসায় ছিলাম। ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে সম্পর্ক টেনে বেড়ানোর কোনো অর্থ হয় না।

'সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়, তুমি ফিরিলে না ঘরে···' সুশার কণ্ঠে নজরুলের গানটি শুনে চমকে তাকালাম। সুশা আমার কয়েকটা প্রিয় গান গাইতে চেষ্টা করত। বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও গেয়েছে। প্রতিটি গান গাইবার আগে সে অর্থ বুঝে নিত আমার কাছে। রুশে তার ডায়েরিতে লিখে রাখত। বিব্রত আমি মুখ চুন করে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন সকাল আটটায় হোটেল থেকে চল্লিশ মিনিট দূরে যেখানে এসে নামলাম সেটা আসলে একটি কবরস্থান। ড্রাইভারকে অনুসরণ করে পা টিপে চলেছি চোরের মতো মেয়ের কবর দেখতে। যে বেদীর সামনে এসে দাঁড়ালাম সেখানে শুয়ে আছে আমার ছোট্ট কন্যাটি যাকে তার তিন বছর বয়সে কথা না বলতে দেখে আমি পালিয়েছিলাম। একে রুশ মা তার উপর বোবা কন্যা। নিজের দেশ; নিজের আপনজনদের প্রতি এক অপরাধবোধ আমাকে শেষ করে দিচ্ছিল। ডাক্তার বলেছিল, স্পিচ থেরাপি করলে ও কথা বলবে। সুশা ওর চিকিৎসা করিয়েছিল। কাল সারারাত ধরে ছয় বছরের জুলিয়ার একটা ভিডিয়ো ক্লিপ শুনেছি। সেখানে জুলিয়া পাখির মতো কিচিরমিচির করে বলে যাচ্ছে, পাপা ইয়া লুব্লু তিবিয়া। আই লভ ইউ পাপা। ইয়া লুব্লু তিবিয়া।

সুশা ভিডিয়োর সঙ্গে দুই লাইন লিখেছে ইমেইলে। জুলিয়া পনের বছর বয়সে অত্যধিক ডায়াবেটিক ও আরও কিছু শারীরিক জটিলতার কারণে মারা গেছে। কতক্ষণ

সেখানে বসেছিলাম জানি না। আমার প্রথম সন্তানের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম। আজ সে সবকিছুর ঊর্ধ্বে। জুলিয়াকে উপেক্ষা করার শাস্তি বিধাতা দিয়েছে আজ সাদাফের রূপে।

সময় হয়তো সব লিখে রেখেছিল তার অদৃশ্য পেন্সিলে।

অটোওয়া, কানাডা

বাসবী খাঁ ব্যানার্জী

শেষ যাত্রা

সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছে। সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল আজকের দিনটা। কিন্তু ওসব ভাবার বা কাব্য করার সময় নেই। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পরে রূপরেখা। আজকাল প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মে এত সময় লাগে! ব্রেকফাস্ট তাড়াতাড়ি সেরে রূপরেখা রোজকার ওষুধগুলো খেয়ে নেয়। বাব্বা! এখন কিছুক্ষণের স্বস্তি।

আজ মনটা বড়ই ভারী হয়ে আছে। চায়ের কাপ আর কাগজ নিয়ে সে বসার ঘরের বড় কাঁচের জানালার পাশের সোফাটায় বসে। কাগজে চোখ রাখলে হয় আমেরিকার ইলেকশন নয় কোথাও টেররিষ্টদের নতুন আঘাত, সঙ্গে করোনা তো আজ প্রায় মাস ধরে আছেই। আজকাল আর কাগজ পড়তে ইচ্ছে করে না। নিঃসঙ্গতা কাটাতে কিছু সোশ্যাল সার্ভিসে নিজেকে জুড়েছে। সে সূত্রেই গত সন্ধ্যায় চার্চের একটা স্পেশাল একুমেনিক্যাল সার্ভিসে গেছিল সে। বাংলায় অনুবাদ করলে বৈশ্বিক উপাসনা। কিন্তু মানেটা হল, খ্রিস্টীয় সব সেক্টদের একসাথে উপাসনা।

গত সন্ধ্যায় ১১০ জন নিঃসঙ্গ, একাকী মৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য সিটি মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যে এই উপাসনা আয়োজিত হয়েছিল। তাদের আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু কেউই নেই। কেউই এই প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

যেমন ৭৪ বছরের মিশাইল। অবিবাহিত, একা থাকত। কারও সাথে একেবারেই মেলামেশা নেই। কতদিন ধরে রান্নাঘরে মৃত পরেছিল সে তা জানা নেই। ঘরে রাতদিন আলো জ্বলতে দেখে প্রতিবেশীরা পুলিশে ফোন করে। কাগজপত্র ঘেঁটে কাউকে পাওয়া যায় নি।

৭৫ বযসী ইনগ্রিড। ঐ একইভাবে মৃত পড়ে ছিল। যদিও তার একটি মেয়ে আছে। কিন্তু কোনো সম্পর্ক তাদের মধ্যে ছিল না। মেয়ে জানিয়েছে, সে শেষকৃত্যের কোনো দায়িত্ব নেবে না। ঠিক এরকমই ১১০ জন, আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুহীন মৃতের শেষবিদায় ছিল গত সন্ধ্যায়। ঘন কুয়াশার মত ভারী এক বিষণ্ণতা ঘিরে ফেলে তার মন। সার্ভিসের মাঝে তার মনে একই প্রশ্ন বারে বারে উঠেছে, এতগুলো মানুষকে কেউ ভালবাসে না? কেন এমন হয় ? বাড়ি ফিরে আর খেতে ইচ্ছে করেনি। কোনো রকমে কাপড় পাল্টে সে শুতে চলে যায়।

রূপরেখাও এ পরবাসে একাই থাকে। অনেক বছর আগে অর্ণবের সাথে ডিভোর্স হয়ে গেছে। ছেলে সোহম তখন পাঁচ বছরের। ইউনিভার্সিটিতে ল্যাব এসিস্ট্যান্টের কাজে খাটুনি ও দায়িত্ব কম নয়। সকালে ছেলেকে তৈরি করে, স্কুলে পাঠিয়ে তারপর ল্যাবে যেত সে। বিকেলে ছেলেকে নিয়ে ফেরা। তারপর রান্না, খাওয়া ইত্যাদি। এইভাবে সোহমকে ল' পড়ানো। এখন সে বেশ নাম করা কোম্পানি-লইয়ার। তার বৌ-বাচ্চাদের নিয়ে লন্ডনে থাকে।

সোহম তখন কিশোর। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ছে। সেই সময় হঠাৎই তার একার জীবনে আসে আজিজ। দেখা হয়েছিল এম্বাসি আয়োজিতএক গানের আসরে। আজিজের গান শুনে রূপরেখা মুগ্ধ হয়। প্রোগ্রাম শেষে সে অভিনন্দন জানায়। তার থেকে টুকিটাকি কথা। আজিজ বাংলাদেশের। কয়েকদিন ওদের শহরে আছে জেনে রূপরেখা ওকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে। সেই সন্ধেটা আজও সে ভুলতে পারে না। সুর ও কথায় আজিজ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আজিজ বাংলাদেশে ফিরে গেলেও তাদের সম্পর্ক কিন্তু চলতে থাকল ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল টেলিফোন বা চিঠির মাধ্যমে। আজিজ তাকে রূপা বলে ডাকতো। আহা! কি সুন্দর সেই দিনগুলো।

এক বার দেশে যাওয়ার সময় সে ব্রেক জার্নি করে ঢাকায় ক'দিন থাকে। খুব ভালো কেটেছিল সে ক'দিন। সম্পর্ক আরো গভীর হতে আজিজ বিয়ের প্রস্তাব দেয়। নানা বিড়ম্বনার মধ্যে তারা বিয়ে করে। রূপরেখার মা তখনও বেঁচে। মুসলমানের সাথে তার বিয়ে মা মানতে পারেন নি। কিছুদিনের মধ্যে মায়ের মৃত্যুর খবর আসে। আজিজের সাথে রূপরেখার সম্পর্কটা ছেলেও মানতে পারে নি। ঐ সময় থেকে সে মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। পড়া শেষ হতেই ভালো অফার পেয়ে সেই যে লন্ডন গেল, আর সে ফিরল না। নিজেই বিয়ে ঠিক করে জানাল। পুত্রবধূ মহারাষ্ট্রিয়ান। রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা। দুই বিয়ে করা শাশুড়িকে তেমন সম্মানের চোখে দেখে না। রূপরেখা অনেক বলে কয়ে এদেশের পরিচিতদের একটা পার্টি দিয়েছে। দুটি পরীর মত মেয়ে। নাতনি দু'জনকে দেখার জন্য তার প্রাণ ফেটে গেলেও তার সেই অনুমতি নেই। বার কয়েক গেছে সে লন্ডনে। দ্বিতীয় বারের ভিসিটে ছেলে তাঁকে বলেই দিল যে, সে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। তাও সে পরের সামারে গেল। হোটেলে উঠে ফোন করে একবার একটুখানির জন্য দেখা করতে চাইল সে। ওদের বাড়ির সামনের একটা পার্কে ছেলে নাতনিদের নিয়ে এসেছিল। ঐ শেষ। এখন মাঝে সাঝে ফোন করলে ওরা জবাব দেয় না। সুতরাং তার শেষ খবরে ছেলে যে আসবে না তা প্রায় নিশ্চিত।

আজিজের সাথেই বা তার সম্পর্ক টিঁকলো কোথায়? আজিজের মনে যে প্ল্যান ছিল সেটা রূপরেখা বুঝতে পারে নি। তাকে বিয়ে করে জার্মানিতে থাকার ছাড়পত্র পাওয়ার পরই আজিজ তাকে ছেড়ে চলে যায়। ছেলে দূরে চলে গেছে, প্রেম তাকে ছেড়ে গেছে. সে এখন এই বিদেশে একদম একা।

তাই শেষকৃত্যের কিছু ব্যবস্থা সে করে রেখেছে। উইল করা আছে। সব ছেলেই পাবে। কিছু ক্যাশ শোবার ঘরের ড্রেসিং ক্যাবিনেটে একটা খামে রেখেছে, যেন সিটি

মিউনিসিপ্যালিটির টাকাতে তার শেষকৃত্য না হয়। এছাড়া তার কীভাবে শেষ কাজ হবে তার নির্দেশ দিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখেছে।
কিন্তু কেন এরকম হল? কেন কাছের সম্পর্কগুলো এভাবে ভেঙে যায়?
কতক্ষণ এভাবে সে বসেছিল খেয়াল নেই। ফোনের রিং এ চমকে উঠে ফোন ধরল সে।
- ডোরিস বলছি, মাইগ্রেশন ব্যুরো থেকে। একটি জরুরি ব্যাপারে তোমার হেল্প চাই।
- নিশ্চয়ই। কি ব্যাপার বলো।
- এক ভারতীয় মারা গেছেন। প্রায় সাত দিন আগে মারা গেছেন বলে পুলিশের তদন্তে প্রকাশ। রান্নাঘরে মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন। আশেপাশের লোকেরা পচা গন্ধ পেয়ে পুলিশকে খবর দেয। কোনও আত্মীয়ের খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিন্তু কাগজপত্র থেকে জানতে পারা যায় ভদ্রলোক দক্ষিণ ভারতীয় এবং হিন্দু। সিটি মিউনিসিপ্যালিটি শেষ কাজ করাবে। হিন্দু ধর্মের রীতি অনুসারে। তুমিও তো হিন্দু। তাই তোমার সাহায্য চাই। ঠিক কী কী লাগবে, কীভাবে করা উচিত, এই সব ব্যাপারে একটু আলোচনা করা দরকার।
রূপরেখা এতো আশ্চর্য হয়েছে যে মিনিট খানেক লাগল তার নিজেকে সামলে নিতে। তারপর বলল,
- হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আজই কি আসতে হবে?
- হ্যাঁ, এমনিতেই অনেকদিন হয়ে গেছে।
- ঠিক আছে, আমি এখুনি তৈরি হয়ে আসছি।

ব্রান্সউইক, জার্মানি

বিপাশা বাশার

অনুরণন

কিছুক্ষণ আগেই ধারালো কিচেন নাইফ দিয়ে জেনিফার বাম পায়ের উরু বরাবর কয়েকটা জখম করলো। উষ্ণ রক্তের কয়েকটি চিকন ধারা ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছে।

উত্তেজনার কারণে জেনিফার এতক্ষণ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো, কাটাকাটির পর একসময় তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসলো।কেমন একটি অস্বাভাবিক গাঢ় প্রশান্তির ছায়া নেমে এলো তাঁর চোখে।

সেদিনই নিজের শরীর প্রথম কেটেছিল জেনিফার।

বয়স খুব সম্ভবত ১৬, হাইস্কুলের মাঝামাঝি সময়ে।

তারপর থেকে প্রায় প্রতি রাতেই সে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে ভোতা ছুরি দিয়ে কাটে।

বিভিন্ন ধরনের ছুরি কালেকশনে রাখা তাঁর বাবা-মায়ের একটি হবি।

লুকিয়ে রান্নাঘর থেকে একটা ছুরি নিয়ে এসেছে জেনিফার।

কিন্তু বাবা-মা কেউ টেরই পায়নি।

বুদ্ধি করে সে এমন সব জায়গায় কাটে যেগুলো কাপড়ের নিচেই থাকে, কখনও উন্মুক্ত হয় না।

শরীরের রক্তক্ষরণের সাথে সাথে মনের ক্ষরণের কিছুটা হলেও অবসান ঘটে।তবে সেটা সাময়িক সময়ের জন্য।

জেনিফার এবছর হাইস্কুল পাশ করলো।অত্যন্ত ভাল রেজাল্ট করেছে সে।ক্লাসের টপ ৫%, চাট্টিখানি ব্যাপার নয়।

ইতিমধ্যেই সে ভাল একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে গেছে।

বড় হয়ে ইংরেজী সাহিত্যে পিএইচডি করার মনোবাসনা তাঁর।

গ্রীষ্মের ছুটির সময়টি তাঁর অসহ্য রকম নিঃসঙ্গতায় কাটে। বাবা-মায়ের অনেক আদরের একমাত্র কন্যা সে।

কিন্তু একাকীত্ব হল তাঁর পরম শত্রু।

এই সময়ে তাঁর মনের ইমোশনগুলো কন্ট্রোল করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে।

— হোয়াই ইজ দিস লাইফ সো বোরিং ? আই হ্যাভ সো মাচ টু অফার , ইয়েট সো লিটল টাইম।

বিভিন্ন রকম কণ্ঠস্বরের মৃদুগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে ওঠে তাঁর মস্তিষ্কের প্রতিটি নিওরোন। কত চেষ্টা করেছে সে ঐ শব্দস্বরগুলোকে চিরদিনের জন্য নীরব করে দিতে।

কিন্তু তাঁরা কখনও তাকে ছেড়ে যায় না, সব সময়ে তাঁর কাছে থেকে যায়… নিস্তব্ধতার অনুরণন।

— জেনিফার, অনেক দিন কাটাকুটি নাই ? কি ব্যাপার ?

— জেনি, মন খারাপ লাগলে তোমার মায়ের কয়েকটা ঘুমের ওষুধ নিয়ে খেয়ে ফেল।

— জেনিফার, এত সাজুগুজু করে সেদিন প্রমে গেলে , রায়েন তোমাকে একটু তাকিয়েও দেখলা না ?

গত কয়েকদিন হলো কারণে অকারণে তার মন খারাপ থাকে। বন্ধুদের সাথে পার্টি করতেও ভাল লাগছে না।

রাতের ঘুম এক অর্থে হচ্ছে না বললেই চলে।

অসংলগ্ন কি সব স্বপ্ন দেখছে যার কোন মাথামুণ্ডু নেই।

সেদিন স্বপ্নে দেখলো লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও তাকে ডেটে নিয়ে গেছে।

লিওনার্দো-এর প্রতি তার বিরাট ক্রাশ।তাঁর বড় একটা পোস্টার ঝুলছে জেনিফারের বেডরুমের দেয়ালে।

কিন্তু জেনিফারের রিয়েল লাইফ ক্রাশ, রায়েন।

সেই কিন্ডারগারটেন থেকে একসাথে পড়ে এসেছে তাঁরা ।

ক্লাস এইট পর্যন্ত বেস্ট ফ্রেন্ড ছিলো।

ঘন্টার পর ঘন্টা একসাথে ভিডিও গেম খেলতো দুজনে।

হাইস্কুলে এসে কোন কারণ ছাড়াই রায়েন আর সে দূরে সরে যেতে লাগলো ।রায়েন আর আগের মত কারণে অকারণে বাইকে চড়ে চলে আসে না তাদের বাড়ি।

মা সেদিন বলছিলেন ,

— রায়েন দেখি এখন আর আমাদের বাড়িমুখো হয় না ? কী ব্যাপার জেনিফার ?

— জানি না মা।রায়েন মনে হয় ওর নূতন গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ব্যস্ত ।

— ও রিয়েলি ? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি তাঁর গার্লফ্রেন্ড ?

— নো ওয়ে মা ! প্লিজ !

জেনিফার মুখে অস্বীকার করলেও তার হৃদয়ে ছুরি বসিয়ে দেয় যখন সে দেখে রায়েন ব্রিয়ানার হাত ধরে হেঁটে যায় তাঁর সামনে দিয়ে।

শনিবার সকাল।

জেনিফারের মা, সুজান ঘড়িতে দেখলেন সকাল ১০টা বাজে।

কি ব্যাপার জেনিফার এতো দেরি করে ঘুমচ্ছে ?

সে তো অসম্ভব আর্লি রাইজার !

হয়তো কাল রাতে মুভি দেখে দেরি করে ঘুমিয়েছে।

সুজান জেনিফারের জন্য প্যানকেক বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

মেয়েটা কিছুদিন পর কলেজে চলে যাবে।

তাই তার পছন্দের খাবারগুলো রান্না করার চেষ্টা করে সে।

একেবারেই সময় দিতে পারে না মেয়েটাকে সে।

একটা বড় ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডন্ট সুজান, ভীষণ ব্যস্ত ক্যারিয়ার নিয়ে।

প্যানকেক গুলো যত্ন করে স্ক্র্যাচ থেকে বানানো প্রায় শেষ।

সুজান আবার ঘড়ি দেখলো, ১১টা বাজতে চলেছে।

– জেনি···. জেনিফার ! ইটস্ ইলেভেন ও ক্লক ! গেট আপ সুইটি।সুজান কিচেন থেকে জোরে জোরে ডাকলো।

সুজানের ডাক শুনে রিচার্ড তাঁর স্টাডি থেকে বেরিয়ে এলো।রিচার্ড সকাল থেকে কাজের একটা জরুরি জুম মিটিংএ ছিল।

– কি ব্যাপার ? জেনি ওঠেনি এখনও ঘুম থেকে?

– দেখো তো প্লিজ কি করছে ? নিশ্চয়ই কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনছে।সুজান তাওয়া, পাতিল ধুতে ধুতে বিরক্তির সুরে বললো।

রিচার্ড দোতালায় জেনিফারের রুমের দিকে রওয়ানা হলো।

রুমের দরজায় হাল্কা করে নক করলো সে।

– জেনি , জেনি সুইটহার্ট !

রিচার্ড আরও বেশ কয়েকবার ডাকল।

কোন শব্দ নেই।

এবার রিচার্ড দরজার নবটা আলতো করে ঘোরাতেই খুলে গেল।

জেনিফার বিছানায় শুয়ে আছে শান্তভাবে।কিন্তু তাঁর শোয়ার ধরনটা দেখে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হলো রিচার্ডের। সে দৌড়ে গিয়ে দেখলো জেনিফারের শরীরটা ঠান্ডা নিথর হয়ে আছে।

– সুজান··· সুজান ! কল নাইন ওয়ান ওয়ান।রিচার্ড চিৎকার করে উঠলো।

সুজান এক দৌড়ে সিঁড়ি টপকে উপরে এসে জেনিফারকে নিস্তেজ অবস্থায় দেখে মূর্ছা গেল।

দেখতে দেখতে সাত দিন হয়ে গেল জেনিফার হাসপাতালের আইসিইউ-তে লাইফ সাপোর্টে আছে।

সেদিন জেনিফারকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিকটস্থ হাসপাতালে নেয়ার সাথে সাথেই আই সি ইউতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে তাঁর শরীরের তাপমাত্রা ৩২-৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস করে দেওয়া হয়ে ছিল যাকে বলে induced hypothermia।

Out of hospital cardiac arrest হলে সাধারণত এটাই স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট আমেরিকাতে।

চব্বিশ ঘন্টা পরে তার শরীরের তাপমাত্রা নরমাল পর্যায়ে নিয়ে আসা হলো।

তারপরও জেনিফারের কোনরকম নিওরোলজিকাল রিকোভারি দেখা গেল না।

একে একে তাঁর শরীরের প্রতিটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো ফেল করা শুরু করেছে।

ডাক্তাররা মোটামুটি একমত যে এটা জেনিফারের সুইসাইড এটেম্পট্ ছিল।যদিও কোন সুইসাইড নোট লিখে যায়নি সে।

— আমাদের ধারণা জেনিফার সুইসাইড আটেম্পট্ করেছে ।

— সুইসাইড ? কেন আমার মেয়ে সুইসাইড করবে ?

শি ইজ আ ভেরি হ্যাপী গার্ল ! সে সবসময় 'স্ট্রেট এ' স্টুডেন্ট।তার এত এত বন্ধু!

সুজান কান্নায় ভেঙে পড়লো।রিচার্ড তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে।

— আমরা বুঝতে পারছি।এটা আপনাদের জন্য নিশ্চয়ই তীব্র মানসিক কষ্টের।

আই সিউ ডাক্তার অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সমবেদনা জানালো।

— কিন্তু মনে হচ্ছে জেনিফার কাজটি করেছে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে।

টক্সিকলোজি রিপোর্ট অনুযায়ী সে বিভিন্ন পর্যায়ে হাতে সময় নিয়ে বিভিন্ন রকম ওষুধ ওভারডোজ করেছে যেমন এন্টি-সিজার মেডিসিন , এসপিরিন , সাধারন টাইলেনল আর শেষমেশ নিয়েছে স্লিপিং পিল।এসব ওষুধ সে আপনাদের মেডিসিন ক্যাবিনেট থেকেই নিয়েছে।

সুজান আর রিচার্ড যেন একটা ঘোরে আছে। তাদের কানে আদৌ কিছু ঢুকছে কি না কে জানে!

— আচ্ছা, জেনিফার কি আগে কখনো সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল ?

—প্রশ্নই ওঠে না! সে আমাদের একমাত্র মেয়ে।সে সারাক্ষণ হাসিখুশী থাকতো। কখনও তাকে দেখে মনে হয়নি সে ডিপ্রেশনে ভুগছে।

— আর ইউ শিওর ? তাঁর উরুতে আর পেটে অসংখ্য কাটার দাগ।মনে হচ্ছে সে রেগুলার শরীর কাটতো।

— কি বলছেন এসব? আমার মেয়ের শরীরে জখম ?

— জী। আপনারা ওর ডায়েরী/জার্নাল কিংবা ল্যাপটপ চেক করে দেখবেন।নিশ্চয়ই সঙ্গোপনে সে ব্যক্ত করে গেছে কোথাও তার মনের কথা।

বাকি সময় ডাক্তাররা কনফারেন্সে যা বললেন তাঁর সারমর্মে দাঁড়ায় যে পুরো ঘটনাটি জেনিফার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সমাপন করেছে।

এর জন্য সে যে প্রচুর রিসার্চ করেছে তা বুঝতে অসুবিধে নেই।

আজকাল ইন্টারনেটের বদৌলতে বোমা বানানো থেকে শুরু করে সুইসাইডের মত একটি ঝুঁকিপূর্ণ ভয়ংকর কাজও স্টেপ বাই স্টেপ লেখা থাকে।

— দুর্ভাগ্যবশত জেনিফার প্রথম দিন থেকেই অলমোস্ট ব্রেইনডেড ছিল।মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ওঠার আশা নেই বললেই চলে।লাইফ সাপোর্টের কারণে সে শুধুমাত্র বেঁচে আছে।

– প্লিজ সত্যি করে বলুন, জেনির কি বাঁচার কোনই আশা নেই ?

– আই এ্যাম রিয়েলি ভেরি সরি।সত্যি বলতে জেনির বেঁচে ওঠা হবে একটা মিরাকল

সুজান আর রিচার্ড আবারও কান্নায় ভেঙে পড়লো।

নিরাশ হয়ে তারা হাসপাতালের প্রার্থনা ঘরে গিয়ে বিধাতার কাছে তাদের একমাত্র আদরের ধন, জেনিফারের প্রাণভিক্ষা চাইল।

তাদের সাথে প্রার্থনায় সামিল হয়েছে তাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব। সবাই এক অলৌকিক শুভ পরিণতির আশায় আছে।

জেনিফারের হাইস্কুলের বন্ধু বান্ধব, অনার সোসাইটির বন্ধুরা, ব্যান্ডের বন্ধুরা সবাই হাসপাতালের করিডোরে বসে কাঁদছে।তাদের প্রাণপ্রিয় বন্ধু, জেনিফার অন্য ভুবনে চলে যাচ্ছে সেটা মানতে ভীষণ কষ্ট হতে তাদের।

আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত হাসিখুশী আমোদপ্রিয় ব্রিলিয়ান্ট মেয়েটি কত কষ্ট লুকিয়ে রেখেছিল মনে মনে।

কিসের এত কষ্ট , কিসের এত হাহাকার ছিল তাঁর জীবনে ?

–আপনারা কি জানেন জেনিফার অর্গান ডোনার ছিল কি না ?

পরদিন প্যালিয়েটিভ কেয়ারের এক নার্স কথা বলতে এল সুজান আর রিচার্ডের কাছে।

– কেন বলুন তো ?

সুজান মনে মনে ভাবলো, জেনি অবশ্য ড্রাইভারস লাইসেন্স নেওয়ার সময় বলেছিল আর ডিক্লেয়ার করেছিল যে সে অর্গান ডোনার।

অর্গান ডোনেশনের ব্যাপারে সে অত্যন্ত সিরিয়াস ছিল।

এ ব্যাপারে সব সময় সে বলতো সবার অর্গান ডোনেশনের অনুমতি দিয়ে রাখা উচিত ।

– আমরা আপনাদের অনুমতি পেলে জেনিফারের অর্গান ডোনেশনের যথাযথ প্রক্রিয়া মানে 'অর্গান হারভেস্ট' শুরু করতে পারি।

– জী, শুরু করুন।জেনিফার সব সময় অর্গান ডোনেশনের পক্ষে জোর গলায় বলত।

সুজান আর রিচার্ড মিলে সব পেপারওয়ার্ক সম্পূর্ণ করলো।

সেদিন সন্ধ্যা ৭টায় জেনিফার লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থাতেই মারা গেল।

জেনিফার মেয়েটির এই অকাল মৃত্যুতে তার পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব সহ আই সিউ টিমের সবার মনে গভীর বিষাদের ছায়া নেমে এল।

এক মাস পরের কথা।

সুজান আর রিচার্ড কাজ থেকে দীর্ঘমেয়াদী ছুটি নিয়েছে।

নিয়মিত সাইকোথেরাপি সেশন চলছে তাদের।

কিন্তু জেনিফার চলে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের মনের হাসি আনন্দ আর হৃদয়ের স্পন্দন সবই যেন থেমে গেছে।

আজকাল চোখের পানিও শুকিয়ে গেছে।

শুধু রয়েছে বিষণ্ণতা।

একটা জিনিস কেউ বুঝতে পারে না ।

জেনিফার কেন আত্মহত্যা করেছিল?

অনেক হাইপোথিসিসিস/ থিওরি থাকলেও এ ব্যাপারে সঠিক উত্তরটা কেউ জানে না।

জেনিফারের রুমে তাঁর ডায়েরী, জার্নাল, ল্যাপটপ, সোস্যাল মিডিয়া ...সবকিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যায়নি কোন সূত্র।

হাসপাতাল থেকে আজ একটি চিঠি এসেছে।

চিঠিটা পড়ে সুজান অনেকদিন পর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

চিঠিতে লেখা ছিল:

—আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে জেনিফারের তেরটি অর্গান সার্থকভাবে ডোনেশনের সুযোগ পেয়েছে।

থ্যাংক ইউ ফর দ্য গিফট অফ লাইফ।

জেনিফারের অকাল মৃত্যুর কারণে তেরজন মানুষের আরোগ্যলাভ হওয়ার সুযোগ হলো।

জীবনে এইটাই কি কম পাওয়া ?

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মেয়েটি রেখে গেছে মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসার নিদর্শন, গিফট অফ লাইফ।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। চরিত্রের নামকরণ কাল্পনিক।)

অস্টিন, টেক্সাস, যুক্তরাষ্ট্র

মল্লিকা ধর

কৃষ্ণারণ্য

১

সুরাসুরের দ্বন্দ্ব চলেই, তাই সেই গল্প বলা ও কখনো ফুরায় না। এইবারে পটভূমি কৃষ্ণারণ্য পর্বত আর তার দু'পাশের দু'টি দেশ - যুযুধানবর্ষ ও পরাক্রমবর্ষ। কিন্তু তার ঝাপটা বয়ে যায় মহাসাগরের বিশাল বিস্তার পেরিয়ে দূরে - আরো দূরে। সেখানে ঊষা নামক মহাদ্বীপে ও এই দ্বন্দ্বের প্রভাবে চলতে থাকে মহা আলোড়ন।

যুযুধান বর্ষে থাকতেন জ্ঞানী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা। কিন্তু যুযুধানবর্ষের যোদ্ধারা তাদের বিতাড়িত করলো দেশ থেকে। এই প্রাজ্ঞরা সবাই পাড়ি দিলেন মহাসাগরের পরপারে সেই মহাদ্বীপের উদ্দেশ্যে। ঊষাদ্বীপে পৌঁছে তারা কিন্তু উষ্ণ আতিথ্য পেলেন।

যুযুধানবর্ষের তরুণ যোদ্ধারা জানতো না সত্যিকারের জ্ঞানের ক্ষমতা। তাদের দেশ তখন খুব উন্নত, অর্থে ক্ষমতায় সুউচ্চ। তাই তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করলো।

যুযুধানবর্ষ ও পরাক্রমবর্ষের মধ্যে যখন যুদ্ধ লাগল তখন প্রথমে সবাই ভেবেছিল কিছুদিনের মধ্যেই এই যুদ্ধ থেমে যাবে। কিন্তু তা হল না, ক্রমে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল বৃতবর্ষে, অমোঘবর্ষে ও শ্যেনবর্ষে। তারপরে ক্রমশ আরো দূরে দূরে, যুদ্ধের দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগলো গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর।

যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা ঊষাদ্বীপে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন সংবর্ত শর্মা। তাছাড়া অন্যরা হলেন অদ্রিবর্মা, বুধাদিত্য, প্রতীপবর্মা, প্রশরবর্মা, নীলাদ্রি, অচ্যুতশর্মা, শিলাদিত্য, প্রবাদিত্য, প্রশঞ্জন, প্রসঙ্কেতক প্রমুখ। এরা সকলেই ছিলেন মহাজ্ঞানী, স্ব স্ব ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

যুযুধানবর্ষের প্রধান তখন দর্পজিৎ বিক্রান্তাদিত্য। সংক্ষেপে দর্প। ইনি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন সাধারণ সৈনিক। ক্রমে ক্রমে নিজের দল গড়ে শেষে ক্ষমতা দখল করেছেন পূর্ববর্তী মহারাজ হৃদয়াদিত্যকে পরাজিত করে।

দর্পের নামের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত মিল দেখা যেতে লাগল, এমন দর্পী সহজে কাউকে দেখা যায় না। দিন দিন তিনি কঠিন থেকে কঠিনতর সব ব্যবস্থা নিতে লাগলেন দেশকে উন্নত করার নাম করে। তাঁর যোদ্ধাবাহিনী, গূঢ়পুরুষবাহিনী, আরক্ষাবাহিনী সবই অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, কোথাও কোনো খুঁত দেখা গেলেই কড়া হাতে তা দমন করেন দর্প।

যুযুধানবর্ষ তখন জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও প্রকৌশলে প্রায় গোটা গ্রহেই প্রথম। এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু দর্পের কয়েকটি ধারণা ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। তাঁর ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যুযুধানবর্ষের বিশুদ্ধরক্তের সন্তানরাই কালক্রমে পৃথিবী শাসন করবে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি ও তাঁর অনুচরেরা শুরু করলেন প্রচন্ড ধড়পাকড়। নির্বিচারে হত ও বিতাড়িত হচ্ছিল যুযুধানবর্ষের নাগরিকেরা- যারা দর্পের বিচারে বিশুদ্ধরক্তের নন। বহু মানুষ তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে প্রাণরক্ষায় অন্য দেশে পালালেন। কিন্তু ক্রমে সেখানেও পড়তে লাগলো যুদ্ধের অশুভ ছায়া। যারা পারলেন ঊষাদ্বীপে পালালেন। যারা পারলেন না, তারা দিবানিশি ইষ্টনাম জপতে লাগলেন।

যুযুৎসুবর্ষ ছিল যুযুধানবর্ষের মিত্ররাষ্ট্র। এই যুদ্ধে তারা একত্রে কাজ করতে শুরু করল। দর্প সন্ধান করছিলেন এক মহাশক্তিশালী অস্ত্রের। যে অস্ত্র মুহূর্তের মধ্যে দেশ জ্বালিয়ে ছারখার করে দিতে পারে। তিনি তাঁর দেশের প্রকৌশলীদের বাধ্য করলেন ঐ অস্ত্রের সন্ধানে নিয়োজিত হতে।

ঊষাদ্বীপ এতকাল যুদ্ধের ছায়া থেকে অনেক দূরেই ছিল। সমুদ্র পার হয়ে যুদ্ধের আগ্রাসী দাবানল একদিন তাঁদেরও ছুঁয়ে ফেলল। অকস্মাৎ একদিন যুযুৎসুবর্ষের যোদ্ধারা আকাশচারী রথ থেকে ঊষাদ্বীপের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে অগ্নিবর্ষী অস্ত্র প্রয়োগ করলো। কয়েকটি অস্ত্রপূর্ণ রণতরী জলমগ্ন হয়ে গেল। এই ঘটনার পরে ঊষাদ্বীপ যুদ্ধ ঘোষণা করল যুযুৎসুবর্ষ ও তাদের মিত্রদেশ যুযুধানবর্ষের বিরুদ্ধে।

সংবর্ত শর্মা তখন ঊষাদ্বীপে গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। যুদ্ধের খবর তিনিও পান, তবে এই বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। এসব তাঁর কিছুটা অভ্যাসে এসে গেছে। হাজার হোক, জন্মেছিলেন যুযুধানবর্ষে, সেখানে তো প্রথম থেকেই যুদ্ধ দেখে দেখেই বড়ো হয়েছেন।

কিন্তু এবার ব্যাপার অন্যরকম। প্রযুক্তি এত এগিয়ে গিয়েছে,মানুষের জ্ঞানের সীমা এতই ছড়িয়ে গিয়েছে- যে এবার অবস্থা বেশ ঘোরালো। সংবর্ত নিজেই তো আবিষ্কার করেছিলেন এক সাংঘাতিক সূত্র। অবশ্য তিনি শুধু তাত্ত্বিক আবিষ্কারক, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার ব্যাপারে তিনি নিজে জড়িত ছিলেন না।

যুযুধানবর্ষেরই অন্য দুই গবেষক, অস্তিক আর তিষ্যা যখন ওটা পরীক্ষা করে দেখছিলেন তখন সেদিকে মোটে দৃকপাতই করেন নি সংবর্ত। তিনি তখন তাঁর নিজের নতুন গবেষণায় সুখে কালাতিপাত করছিলেন। এই নতুন ব্যাপারটাও তার কাছে ছিল পুরোপুরি তাত্ত্বিক, পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণে কী হবে না হবে সেই নিয়ে তাঁর মোটে মাথাব্যথা ছিল না।

তাই যখন বৃতবর্ষের আর্তভাগ আখন্ডল তাঁর তত্ত্ব পরীক্ষা করে দেখতে অভিযান করলেন, তখনও সংবর্ত নিশ্চিন্তে খেয়ে ঘুমিয়ে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক চিন্তা করে দিন কাটিয়েছেন। অন্য আরেক গবেষক শুদ্ধশীল তো ভালো করে ঘুমোতে পর্যন্ত পারেন নি উদ্বেগে আর দুশ্চিন্তায়। কি জানি কি হয়, তত্ত্ব টেঁকে না ধসে যায়। কিন্তু সংবর্ত শতকরা একশোভাগ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁর তত্ত্ব টিঁকবেই টিঁকবে। যাই হোক সেসব তো অনেক বছর আগের কথা। তখন তো এইভাবে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয় নি।

এবারে দর্পের সেই মহাস্ত্রের সন্ধানের খবর কানাঘুষোয় পৌঁছে গেল ঊষাদ্বীপে। কিছুদিন আগে যুযুধানবর্ষ থেকে নানা ঘুরপথে উষাদ্বীপে পালিয়ে আসা তিষ্যা খবরটা নিয়ে এসেছিলেন। শুনে যুযুধানবর্ষের পলাতকেরা মহা ভয় পেয়ে গেলেন। এবার তো কিছু একটা না করলেই নয়।

অদ্রিবর্মা আর শিলাদিত্য চললেন সংবর্ত শর্মার উদ্দেশ্যে। তখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছিল, সংবর্ত ছুটিতে ছিলেন। অদ্রিবর্মা আর শিলাদিত্য মোটেই হাল ছাড়লেন না, চললেন তাঁর গ্রীষ্মাবাসের উদ্দেশ্যে।

গ্রীষ্মাবাসটি ছিল একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে। সেখানে পৌঁছে অদ্রি আর শিলাদিত্য খুঁজতে আরম্ভ করলেন বাড়ীটা। কিন্তু কিছুতেই আর খুঁজে পান না। স্পষ্ট ঠিকানাও জানা নেই এদিকে। সংবর্ত সবাইকে তাঁর ঠিকানা দেওয়া পছন্দ করেন না। খুব বিখ্যাত কিনা, লোকে গিয়ে বিরক্ত করবে,তাই।

ঘুরতে ঘুরতে তো দু'জনে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বেশ গরম,দু'জনে ঘেমে নেয়ে একশা। অদ্রি খানিকটা বিরক্তও হয়ে উঠেছেন। একবার বললেন,"শোন শিলাদিত্য, আর বেশী ঘুরে কাজ নেই। চল আমরা ফিরে যাই। কে বলেছে আমাদের এইভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে?"

শিলাদিত্য হেসে ফেললেন, "ঘরের খেয়ে বনের মোষই বটে। " সেদিন সকাল থেকে দুজনের কিছু খাওয়াও হয় নি।

শেষ পর্যন্ত, তখন প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেছে- দুজনে একটা বটগাছের ছায়ায় এসে বসলেন। শুনশান দুপুর, কোনোদিকে জনমনিষ্যির দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই নিশ্চয় দরজা বন্ধ করে আরামে শীতলপাটিতে ঘুমোচ্ছে।

অদ্রি এবার রীতিমতো চটে গেছেন, বললেন, "আর পারা যাচ্ছে না। এইভাবে হারা উদ্দেশ্যে ঘুরে লাভ আছে কিছু? আর কেনই বা আমরা এইভাবে ঘুরছি? সংবর্ত শর্মাই বা কী করতে পারবেন?"

শিলাদিত্য অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা মেজাজের, বললেন," এতটা যখন এসেই পড়েছি, তখন আরেকটু দেখাই যাক না। আরে আমরা তো নিমিত্তমাত্র, সব তো উপরওয়ালাই করাচ্ছেন কিনা। "

একটা বাচ্চা ছেলে খেলতে খেলতে গাছের কাছে এলো। শিলাদিত্য তাকে ডেকে বললেন," এই খোকা,শোনো শোনো, তোমার নাম কী?"

খোকাটি চোখ কুঁচকে এই দুজনকে পর্যবেক্ষণ করলো খানিকক্ষণ- তারপর বললো," আমার নাম দিয়ে তোমাদের কী দরকার?"

অদ্রি চটেই ছিলেন, এবার গরম গলায় বললেন," নাঃ, তোমার নাম দিয়ে দরকার কিছু নেই আমাদের। দরকার খালি সংবর্ত শমার বাড়ীর খোঁজটা। এ যে কোন পান্ডববর্জিত জায়গায় এসে তিনি গ্রীষ্মাবাস বানিয়েছেন, কার বুদ্ধিতে ভগবান জানেন, একটা ভালো লোক মেলে না যে বাড়ীটা কোথায় বলতে পারে!"

ছেলেটা কেন জানি এবার হেসে ফেললো। বললো,"আরে! তোমরা তো ভারী বোকা বাবু। ওই তো দেখা যাচ্ছে সংবর্ত শর্মার বাড়ী। "

ছেলেটার নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে দু'জনে দেখলেন বড় বড় কয়েকটা নারকেল গাছ আর ঘন সবুজ কলাগাছের ঝাড়ে ঘেরা একটা ছোটো বাড়ী। শিলাদিত্য আর অদ্রি এসে বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লেন।

বেশ খানিকক্ষণ পরে একজন মহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন। ওদের দেখে বললেন," আরে আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য। ভিতরে এসে বসুন। উনি ঘরেই আছেন, আসছেন। "

ভদ্রমহিলাকে অদ্রি আর শিলাদিত্য দু'জনেই চেনেন, সংবর্ত শর্মার স্ত্রী ইনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রমহিলা ওদের জন্য দইয়ের সরবৎ, নারকেলের সন্দেশ, আরো কিছু ফলমূল এনে দিলেন। বললেন সবই ঘরে তৈরী।

সব সাজিয়ে দিয়ে নরম গলায় বললেন, "আপনারা এসব একটু মুখে দিন, উনি এলেন বলে। আসলে যা গরম পড়েছে, উনি দুপুরে একটু বিশ্রাম করছিলেন। "

শিলাদিত্য বললেন," ইশ, ছি,ছি,দেখুন তো অসময়ে এসে কী ঝামেলা করলাম। আমরা সকালেই আসছিলাম, কিন্তু কিছুতেই বাড়ীটা খুঁজে পাইনি। আসলে ঠিক ঠিকানাটা জানা ছিল না তো। আমাদেরই ভুল। "

ভদ্রমহিলা বললেন," না না, এসব কী বলছেন? ঝামেলা কেন হবে? আপনারা সরবৎ খান, উনি আসছেন। "

মহিলা ঘর থেকে চলে যেতেই শিলাদিত্য অদ্রির দিকে তাকিয়ে বললেন," কী অদ্রি, এবার? বনের মোষ তাড়িয়ে এবার ঘরের খাওয়া জুটলো তো? পেতিস এমন জিনিস তোর শহরে?"

অদ্রি দইয়ের সরবতে একটা লম্বা আরামের চুমুক দিয়ে বলেন," আঃ, ভাই শিলাদিত্য, এই জিনিসের জবাব নেই। আমি ভাবছি ভদ্রমহিলার সঙ্গে দিদি পাতিয়ে ফেলি, প্রত্যেকবার নববর্ষের সময় এসে ভালোমন্দ খাওয়া যাবে। "

শিলাদিত্য হাসলেন," দ্যাখ, আগামী নববর্ষের সময় কোথায় থাকি আমরা। আদৌ থাকি কিনা। "

অদ্রি একটু উষ্ণ গলায় বললেন, "সত্যি, যতো সব বোকার বেহদ্দগুলো কামড়াকামড়ি করে মরবে, ভুগতে হবে আমাদেরও। "

"কই, কারা আবার কী কামড়াকামড়ি করলো?" বলতে বলতে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা থেকে সদ্য ওঠা সংবর্ত এঘরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে এরা দু'জন উঠে দাঁড়ালেন।

" আরে উঠলে কেন? বসো বসো। তোমরা আমার অতিথি। "

তিনি একটি কোমল সুখাসনে বসলেন। বললেন,"হ্যাঁ, এবার বলো কী ব্যাপার। কী জন্য এই মারাত্মক গরমে হন্যে হয়ে ছুটে এসেছ ছুটির মধ্যে? ছুটি ফুরোলে তো শহরেই আমাকে পেতে। "

"ছুটির মধ্যে এসেছি বলে ক্ষমা করুন, খবরটা ভয়ানক। কিছু একটা করা দরকার, এক্ষুনি। " শিলাদিত্য বললেন।

"কী হয়েছে?" উৎসুক চোখে তাকিয়ে বললেন সংবর্ত।

এবার অদ্রিবর্মা বললেন," কী আবার হবে, আপনার দর্প যা শুরু করেছে ! এখন নাকি সে দেশের প্রকৌশলীদের ধরে জোর করে অস্ত্র বানাতে লাগিয়েছে। আপনি নিজেই তো তত্ত্বটি বার করেছিলেন, এবার যদি ওরা বানিয়েই ফেলে সেই অস্ত্র--"

"আরে আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। একটু বুঝতে দাও ব্যাপারটা। দর্প আবার আমার হল কবে থেকে?সে তো কবেই আমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে বেঁচেছে। "

এবার শিলাদিত্য হাল ধরলেন, " অদ্রির ভয়ে মাথা ঠিক নেই। আপনি একটু তলিয়ে ভাবুন। আপনার ঐ সাংঘাতিক আবিষ্কার--আপনি তো তার পরীক্ষা নিরীক্ষার দিকে চেয়ে দেখেন নি। অস্তিক এখন যুযুধানবর্ষের যোদ্ধাদের হয়ে ঐ অস্ত্র বানিয়ে দিচ্ছেন, এইরকম খবর আছে। তিষ্যা পালিয়ে এসেছেন সম্প্রতি, তিনি খবর দিলেন। অবশ্য অস্তিক একা নয়, সঙ্গে হিরণ্যবর্গ, ইলবর্ত, দ্বৈপায়ন, জনার্দন- সবাই আছেন। ওদের সবাইকে জোর করে দর্প কাজে লাগাচ্ছেন। "

সংবর্ত তাঁর মাথার দীর্ঘ সাদা চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন,"এই ব্যাপার? তা খবর কতটা সত্যি? তিষ্যা তো অনেকদিন আগে থেকেই যুযুধানবর্ষের বাইরে। আমি যখন দেশত্যাগ করি, তিনিও প্রায় সেইসময়েই বেরিয়ে আসেন। তারপর উনি উত্তরবর্ষে অনেকদিন ছিলেন। সেই খবরও রাখি। যুযুধানবর্ষের এখনকার কাজের অগ্রগতির খবর তিনি কতটা জানেন সত্যি করে? "

অদ্রি ছটফট করছিলেন বলার জন্য, এবার বললেন," শুধু তিষ্যা নন, সম্প্রতি নীলাদ্রিও এসেছে ঊষাদ্বীপে। এখানে আসার আগে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল হিরণ্যবর্গের। সে ওকে বলেছে নিজের মুখে। "

"হুম বুঝলাম। ভাবছি হিরণ্য ঠিক কী রকমের লোক ! নিজে যেচে এসে সব বলে দিয়েছে নীলাদ্রিকে ? "

"আপনি এটাকে ঠাট্টা ভাবছেন?"অদ্রির মুখ কালো হয়ে যায়।

দেখে সংবর্ত হাসেন, বলেন "না না, আমি জানি দর্প সবই করতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমি কী করতে পারি? আমি তো কোনোদিন পরীক্ষা- নিরীক্ষায় ছিলাম না, তোমরা নিজেরাই জানো। "

তিনজনে অনেক আলোচনা করে ঠিক হল সংবর্ত শর্মা ঊষাদ্বীপের রাজা রাজভদ্রকে একটি চিঠি দেবেন। সেই চিঠিতে সব জানানো হবে বিস্তারিত ভাবে। আরো বলা হবে এই ব্যাপারে রাজভদ্র যাতে খুব তাড়াতাড়ি কোনো ব্যবস্থা নেন।

সংবর্তের চিঠি যথাসময়ে চলে গেল রাজভদ্রের কাছে। ঊষাদ্বীপের বৃদ্ধ রাজা রাজভদ্র নিজেও খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন, তিনি চিঠিটিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিলেন।

খুব তাড়াতাড়িই তিনি ব্যবস্থা নিলেন। ব্যবস্থা নিলেন এক মহা কর্মযজ্ঞের, যেখানে যোগ দেবেন দেশের প্রধান প্রধান জ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা। যুযুধানবর্ষ থেকে যে সব মহাজ্ঞানীরা পালিয়ে এসেছিলেন তাঁদের প্রায় সবাইকেই রাজভদ্র এই কাজে যোগ দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন।

এবার দর্প যে মহাস্ত্রের সন্ধান করছিলেন সেটা এঁরাই খুঁজতে আরম্ভ করলেন।

সেই একই গল্প। সুর ও অসুরের বজ্র সন্ধান। শুধু নামগুলো পালটে পালটে যায়। গল্প একটু একটু পালটায়, মূল ভাবনাটা সেই একই থাকে। শেষে সবাই জানে জয়লাভ করে সব সময়েই সুরপক্ষ, অসুরেরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে পাতালে পালায়। সুরগণ সদাসতর্ক থাকে কবে আবার তারা পাতাল থেকে উঠে এসে তাদের সুখস্বর্গে ঝড় তোলে।

এইভাবে গড়িয়ে যায় এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর ইতিহাস-একই লাল- কমলা- ধূসরের পুনরাবৃত্তি। যারাই জয় পায় তারাই দেবতা, পরাজিতরা অসুর মাত্র।

সংবর্ত শর্মা একদিন বুঝতে পারলেন এই লাল কমলা ধূসরের অশ্রুময় পুনরাবৃত্তি তাঁকে দিনে দিনে ক্লিষ্ট করে তুলছে। যে দুর্লভ জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন সারা জীবনের সাধনায়, এই হত্যা ও আত্মহত্যাপ্রবণ মানবগোষ্ঠী তাঁর সেই জ্ঞানকে কাজে লাগালো শুধু ধ্বংসে।

তারপরে গড়িয়েছে আরো কয়েক বছর। যুদ্ধের গতি পরিবর্তন হয়েছে,কিন্তু মীমাংসা হয় নি। যুযুধানবর্ষ দখল হয়েছে, দর্প আর তাঁর সঙ্গীরা হয় পালিয়েছে না হয় আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু যুযুৎসুবর্ষ এখনো যুঝে যাচ্ছে।

ঊষাদ্বীপের দ্বারা প্রযুক্ত মারাত্মক অস্ত্রে যুযুৎসুবর্ষের নিযুত মানুষ হত্যার কাহিনী যখন সংবর্তের কাছে এসে পৌঁছলো তখনো আরেক গ্রীষ্ম। তিনি ছিলেন তাঁর গ্রীষ্মাবাসে।

খবরটি যেদিন জানলেন সেই রাতেই সংবর্ত নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। কেউ জানতো না তিনি কোথায় গিয়েছেন, এমনকি তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত নন। সেই ঘটনার পর বহু মাস, বহু বছর গূঢ়পুরুষেরা সন্ধান করেছেন সংবর্তের, কিন্তু কোনো সন্ধান পান নি।

সেই রাত্রেই অস্তিকও অমন রহস্যময়ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যান পরাজিত যুযুধানবর্ষের এক বন্দীশালা থেকে। তখন যুযুধানবর্ষ ছিল বৃতবর্ষের লোকেদের অধিকারে, বন্দীশালাও তাদেরই। তারা বহুভাবে খোঁজ চালিয়েও কোনো চিহ্ন পায় নি অস্তিকের। বহু মাস, বহু বছর খোঁজ চালাবার পরে একসময় খোঁজ বন্ধ করা হয়।

২

সেই নিরুদ্দেশ হবার রাত্রে সংবর্ত আর অস্তিক বসে ছিলেন এক পাথুরে গুহায়। গুহাটি কৃষ্ণারণ্য পর্বতের একটি গোপন গুহা। সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যের গুহা। রহস্যময় এই সন্ন্যাসী নানা রূপে, নানা নামে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে এঁকে দেখা গিয়েছে। এঁর প্রকৃত পরিচয় কেউ জানেন না।

বিদ্যারণ্য এলেন, এরা দু'জনেই উঠে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসীর পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করার পর দু'জনকেই আশীর্বাদ করলেন বিদ্যারণ্য।

প্রথমে সংবর্ত বললেন,"হে মহান, হে করুণাময়, আমার হৃদয় মহাতমসায় নিমজ্জিত হয়েছে। আমি আলো দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো সারাজীবন জ্ঞানপথে অগ্রসর হয়েছি, তবে আজ কীসের ভুলে এই কান্ড ঘটলো?"

অস্তিক আরো ম্রিয়মান, বললেন,"আমি আজ আক্ষরিক অর্থেই সর্বস্বান্ত। আমার সমস্ত চেতনা থেকে আলো অন্তর্ধান করেছে। অথচ এই আলোর সাধনাতেই আমার সারাজীবন কেটেছে। আমি এখন কী করবো?"

বিদ্যারণ্যের কন্ঠস্বর অতি সুরেলা ও গভীর, যেন পর্বতের উপর দিয়ে বয়ে আসা পরাক্রান্ত বাতাসের মতো। সেই আশ্চর্য সুরেলা গলায় রহস্যময় সুরে তিনি বললেন," তোমরা মোহগ্রস্ত হয়েছ। তাই আলো দেখতে পাচ্ছ না। অবশ্য তোমরাই প্রথম নও, আরো বহু মানুষ একই অবস্থায় আমার কাছে এসেছে বহুযুগ আগেও, আসবে বহুযুগ পরেও। কিন্তু তোমরা এখনও জ্ঞানী, শুধুমাত্র ছায়াচ্ছন্ন হয়েছ, তোমরা নিজেরাই খুঁজে বার করো কী হবে তোমাদের কর্তব্য। "

সংবর্ত লুটিয়ে পড়লেন বিদ্যারণ্যের চরণে, বললেন,"আমার আত্মা অকলুষিত, এই দগ্ধ হৃদয়ক্ষেত্র থেকে তাকে মুক্ত করে দিন। "

বিদ্যারণ্য ফিরে তাকালেন অস্তিকের দিকে, বললেন," অস্তিক, তোমারও কি একই প্রার্থনা?"

অস্তিকের ঠোঁট কাঁপলো শুধু, কোনো শব্দ উচ্চারিত হল না। কিন্তু বিদ্যারণ্য বুঝলেন আকুল মুক্তি আকাঙ্খা অস্তিকের মধ্যে ছটফট করছে।

তিনি বরাভয় মুদ্রায় হস্ত প্রসারিত করলেন। বললেন, "তবে তাই হোক, এই মোহ-আবরণ দূর হয়ে যাক, তোমরা আলোর মধ্যে মুক্তিলাভ করো। "

সংবর্ত আর অস্তিককে তুলে নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন গুহার সম্মুখে একটি পরিষ্কার সমতল স্থানে। সামনেই শুরু হয়েছে একটি গভীর খাদ, তার ভিতরটা ঘন কালো অন্ধকার। ওই পথেই সংবর্ত সুদূর ঊষাদ্বীপ থেকে এখানে এসে পৌঁছেছেন। ওই পথেই অস্তিকও যুযুধানবর্ষ থেকে এইখানে এসে পৌঁছেছেন।

সংবর্ত মনে করার চেষ্টা করলেন ঊষাদ্বীপের নির্জন গ্রীষ্মাবাসের সেই রাত্রিটি। মনে পড়লো না ভালো করে। কঠিন এক অবশ করা যন্ত্রণার কথা মনে আসে শুধু, তারপরে নিবিড় বিস্মৃতি। এক তরুণ, সাংবাদিক, সে চেঁচিয়ে কী যেন বলছিল হ্রদের পারে দাঁড়িয়ে, তিনি সেই হ্রদে নৌকা বিহার করতে করতে বই পড়ছিলেন, তখন ছিল দুপুরবেলা... তিনি ওদের ডাকে পাড়ে এলেন, কয়েকজন ছিল ওরা, ওদের মধ্যে

সবচেয়ে চৌখোস আর বলিয়ে কইয়ে যে ছেলেটি- সে ই বলছিল সবকিছু, পুরোটা শোনেননি তিনি, তার আগেই সবকিছু ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল তার সম্মুখ থেকে।

তারপরের কথাও মনে আছে কিছু কিছু- প্রজ্ঞা, তাঁর স্ত্রী, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে- তিনি চোখ মেলছেন, এও মনে আছে, পরে সে তাকে একটা ওষুধ খাওয়ালো- তাও মনে আছে। শেষ গ্রীষ্মের আকাশে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামছে, মেঘগুলো রঙীন- তাও মনে আছে।

তিনি সামনের লনে ঘাসে গিয়ে বসতে চাইলেন, প্রজ্ঞা তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে গেল সেখানে, তিনি আকাশে সন্ধ্যার আঁধার আঁচল বিছানো দেখতে দেখতে একটা একটা করে ফুটে ওঠা তারাগুলোকে দেখছিলেন। তাঁর চোখ জলে ভরে উঠে তারাগুলোকে ঝাপসা করে দিল। তিনি তখন নিজের মনে কার কাছে যে কী প্রার্থনা করছিলেন তিনি নিজেই ভালো করে জানেন না।

মধ্যরাত্রে, নিজের শয্যায় শুয়ে প্রথম তিনি অনুভব করলেন এক অন্যরকম অনুভূতি। তাঁর পাশে প্রজ্ঞা ছিল গভীর নিদ্রাভিভূত। তীব্র বেদনায় সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এলো সংবর্তের অথচ তেমন ভয় তাঁর করছিল না। ব্যথাকে ঠিক ব্যথা বলেও তাঁর মনে হচ্ছিল না। যেন তিনি এইরকমের একটা অভিজ্ঞতার কথা আগে জেনেছিলেন শুধু তাঁর জটিল সমীকরণের গোলকধাঁধায় , এখন সেটাই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করছেন। তিনি প্রজ্ঞাকে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়ালেন, কিন্তু ছুঁতে পারলেন না তাঁকে। নিঃসীম কালো অন্ধকার এসে ঢেকে দিল তাঁর সবকিছু।

যখন তিনি চোখ মেললেন, তখন এই গুহার সম্মুখে একটি প্রস্তরাসনে পড়ে আছেন। পাশেই ম্লানমুখ অস্তিক।

বিদ্যারণ্য তাঁদের বললেন, 'তোমরা দু'জনেই অচেতন অবস্থায় এখানে এসে পৌঁছেছ। অবশ্য সেই অবস্থায় ছাড়া তোমাদের আসার আর অন্য উপায় ছিল না। তোমরা তখন ছিলে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। তাই অন্ধকারের ভিতর দিয়েই তোমাদের আসতে হয়েছে। এবার তোমরা আমার সঙ্গে যাবে আলোর ভিতর দিয়ে। তোমরা প্রস্তুত?"

অস্তিক বললেন,"হ্যাঁ, হে মহান, আমরা প্রস্তুত। "

সংবর্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কোথায় যাচ্ছি ?"

বিদ্যারণ্য অপলক চোখে সংবর্তের দিকে চাইলেন, চেয়েই রইলেন, তারপরে যেন বহুদূর থেকে বয়ে আসা বাতাসের মতো সুরে বললেন," সংবর্ত, বিস্মৃতি তোমাকে অধিকার করেছে। স্মৃতির তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রে তাকে পরাভূত করো। তোমার দুর্লভ জ্ঞান তোমাকে একদিন বলেছিল "কোথায়" এই শব্দের কোনো অর্থই হয় না। " এই বলে তিনি মৃদু হাসলেন। তুষারপ্রান্তরে ছড়িয়ে পড়া জ্যোৎস্নার মত হাসি। সংবর্ত মাথা নীচু করলেন।

এরপরে তীব্র থেকে তীব্রতর আলোর মধ্যে ওঁরা যখন মিলিয়ে যাচ্ছেন- তখন শেষবারের মতো সংবর্তের মনে পড়লো সেই ছায়ানিবিড় শান্ত কুটিরখানি, সেখানে

অপেক্ষায় আছে তাঁর প্রজ্ঞা। কতকাল সে অপেক্ষা করবে? কোনো অন্য আলোর ভোরে তার সঙ্গে আবার মিলন হবে?

তিনি সৃষ্টির প্রথম রহস্য- আলোর প্রকাশ, জেনেছিলেন সারা জীবনের সাধনায়- এবার জানতে চলেছেন সৃষ্টির শেষ রহস্য- ভালোবাসার অমৃত। তারপরে আর কোনো বেদনা নেই, আর্তি নেই, অন্ধকার নেই- তিনি জানেন।

জনসন সিটি, টেনেসি, যুক্তরাষ্ট্র

মোস্তফা তানিম

ভবিষ্যতের গল্প

অয়নের মা অয়নকে স্কুলের পোশাক পরালেন। ব্যাগে খাবর ঢুকিয়ে দিলেন। ত্রিমাত্রিক ল্যাপটপটা সে ব্যাগে রাখতে চায় না। ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখে, যেন যখন তখন বের করতে পারে। ফারিয়া ইয়াসমিন তাকে বাসায় রেখেই পড়াতে চেয়েছিলেন। 'বর্ধিত বাস্তবতা' দিয়ে তো স্কুলের কাজ হয়ে যায়। এখন আবার যাবে উড়ন্ত শকটে করে। অবশ্য দপ্তরি এসে নিয়ে যাবে। আগামী বছর থেকে অয়ন একাই যেতে পারবে। ফারিয়া ইয়াসমিন পুরনো দিনের মানুষ। তিনি রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভিড়ও দেখেছেন। বড় বড় সড়ক দুর্ঘটনার কত ছবি দেখেছেন। এখন সেসব কমে প্রায় নেই হয়ে গেছে। ঢাকার রাস্তায় গাড়িঘোড়া অনেক কম। কিন্তু এই যে সবাই দেদার উড়ে বেড়াচ্ছে, গাড়িগুলো পর্যন্ত উড়ছে, তাতে তার অনেক ভয়-ভয় করে। উড়ন্ত দুর্ঘটনাগুলো ভয়ঙ্কর।

তবে অয়নকে তিনি পঙ্খীরাজ কিনে দেবেন। টাকা বেশি লাগে লাগুক, নিরাপত্তা বলে কথা। আমেরিকা আর ইতালির দুটো উড়ুক্কু গাড়ি গত মাসে ভেঙে পড়ল না? ছেলের জন্যে সব দেশি জিনিস কিনবেন তিনি। ওদিকে স্কুলটা নিয়ে যে সমস্যা, সেটা ঠিক না হলে তাঁর শান্তি নেই। বেশি টাকা দিতেও তিনি রাজি। ছেলে ভালো একটা স্কুলে পড়তে পারবে না, রোবোট দিয়ে পড়াবে, তা চলবে না। খাঁটি মানুষ দিয়ে যেখানে পড়ানো হয়, সেখানেই পাঠাবেন অয়নকে।

অয়নের জুতোয় লাল নীল আলো জ্বলতে নিভতে লাগলে। বিপ বিপ শব্দ হচ্ছে। দপ্তরি দাদু নিতে এসে গেছেন। তাদের বারান্দার গরাদের খানিকটা অংশ আপনা আপনি খুলে গেলো। বারান্দার মেঝেতে একটা গোল দাগ দেওয়া জায়গায় স্কুলের দপ্তরি তার উড়ন্ত শকটটি অবতরণ করালেন। শকটের গায়ে বাংলায় 'পঙ্খীরাজ' লেখা রয়েছে। অয়ন দৌড়ে গিয়ে পঙ্খীরাজের পেছনে, তার নির্দিষ্ট জায়গায় উঠে দাঁড়াল। দু'হাতে অবলম্বন দণ্ড দুটো ধরলো। ব্যাস, পঙ্খীরাজ আবার ওড়া শুরু করল – স্কুলের পথে।

ছেলেকে টাটা জানিয়ে মিসেস ইয়াসমিন ঘরে ফিরে এলেন। রান্নাঘরে এসে প্লাটিনামের পাতিল দুটোতে আজকের খাবারের রেসিপি ঢুকিয়ে দিলেন। আজ মেন্যু চিংড়ির দোপেঁয়াজা, বেগুন ভর্তা আর লাউ। অয়নের জন্যে চিকেন বিরিয়ানি। খাবার পরিবেশনের সময়টা ঢুকিয়ে দিতেই পাতিল দুটো কলকল করে বলে উঠলো, 'একদম

সময় মতো হয়ে যাবে খালাম্মা, গরম গরম। আজ খুব মজা করে রান্না করবো।' কী যে সব ন্যাকামি জিনিস বানিয়ে রেখেছে! অবশ্য শুনতে খারপ লাগে না। দ্রুত অফিসের জন্যে তৈরি হয়ে নিলেন তিনি। ওদিকে অয়নের বাবা গেছে আমেরিকায় বেড়াতে। কী যে খাচ্ছে ওখানে কে জানে? বুড়ি ওকে নিয়েই তবে ছাড়ল। যে এক বাজখাঁই ধরনের বুড়ি। এখন আবার ওকে আমেরিকায় রেখে না দিলেই হয়।

বেরুনোর আগে অয়নের নতুন স্কুল থেকে ফোন এলো। ওহ, দারুণ একটা খবর। অয়ন ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করেছে। কাল থেকে তাকে নতুন স্কুলে যেতে বলছে। মিসেস ইয়াসমিন একরকম আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। ওর বাবাকে এক্ষুণি জানানো দরকার। একেবারে ভোজবাজির মতো সামনের দেয়ালে অয়নের বাবার মুখটা ভেসে উঠলো। খুশি খুশি ভাব। নিশ্চয়ই তারও ভালো কোনও খবর আছে। মিসেস ইয়াসমিন একটা মিষ্টি ভ্রূকুটি করে বললেন, 'এই অসময়ে তোমার মুখ দেখতে হলো। না জানি দিনটা কেমন যাবে?'

একথা শুনে অয়নের বাবা জোরে হেসে উঠলেন। মিসেস ইয়াসমিন নিজের আনন্দটা গোপন রাখতে পারলেন না, তিনিও উচ্ছ্বলভাবে হেসে উঠলেন। তাতে ধ্বনি নামের পোষা যন্ত্রমানবটি আহ্লাদে আটখানা হয়ে অনেক রকমের আলো জ্বালিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তাদের চেয়েও দ্বিগুণ জোরে হাসতে লাগলো।

মার্কিন মুলুকে সবেমাত্র এসেছে রওনক। কোনোই ইচ্ছে ছিল না। তার নানি অনেক অনেক যুগ আগে এই মরার দেশে এসেছিলেন, বায়না ধরেছেন তিনি তাকে নিজের কাছে এনে রাখবেন। একশ' দশ বছর বয়স তো কম না! হায়াত মউত এর কথা বলা যায় কিছু?

তখন আমেরিকা ছিল শীর্ষে, ঠিক বাংলাদেশ এখন যেমন। যাই হোক, দেখতে দেখতে একমাস হয়ে গেল। টাকা প্রায় শেষ। কিছু কাজ তো করা দরকার। ওকে অনেকবার অভিবাসী হওয়ার জন্যে এদেশের সরকার চিঠি পাঠিয়েছে। সেরকম চিন্তা রওনক করছে না। কবে দেশে যেতে পারবে সেই দিন গুনছে সে। আজ এক ব্যাংকে চাকরির জন্যে গিয়েছিল। ছোটমোট কিছু করতে পারলেও আরও দু তিনটা মাস থেকে যাওয়া যায়। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে পড়লো বিপদে। দরখাস্তে সে লিখেছিল, প্রথম ভাষা বাংলা, দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি। তাতেই ম্যানেজার তাকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠালেন।

- তুমি বাংলা জানো ?

- হ্যা, জানি।

- কতটুকু? ওদের মতো বলতে পারো? মানে বাঙালিদের মতো?

- মানে? আমি তো বাঙালি!

চোখ বড় বড় করে তিনি বললেন, 'রিয়েলি? আমাদের বাংলা জানা মানুষ ভীষণ দরকার। সব বড় বড় লেনদেন বাংলাদেশের সঙ্গে। এই যে দেখ।'

তার পিছনের দেয়ালে অনেকগুলি কাগজপত্রের ছবি ভেসে উঠলো। ব্যাংকের হিসাবনিকাশের কাগজ। তাতে বড় বড় সংখ্যা লেখা। এতো বড় সংখ্যা যে সে চট করে পড়ে কুলাতে পারছে না। 'গ্রাহক' , 'প্রেরক', 'অগ্রিম', 'জমা', এমন অনেক কিছু লেখা।

ম্যানেজার বললো, 'তুমি পড়তে পারছো?'

- পারব না কেন?

- জিনিয়াস! জানো, এখানে বাংলা জানা এমন একটা মানুষ কত দূর্লভ? আর 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার' উপরে ভরসা করা যায় না। ব্যাংকের ব্যাপার তো, একটা ভুল হলে হয়তো পাঁচ হাজার কোটি টাকা ভুল জায়গায় চলে গেল।

ম্যানেজার তাকে বসিয়ে রেখে কাকে যেন ফোন দিলেন। মনে হচ্ছে আরেকজনকে এই মৌখিক পরীক্ষায় যোগ করবেন। কিছু কথা হওয়ার পরে পিছনের দেয়ালে একটা ডাকসাইটে মানুষের মুখ ভেসে উঠল। তিনি যে কামরায় বসে আছেন, সেটা অতিমাত্রায় ঝকমকে। তিনি হয়তো এই ব্যাংকের পরিচালক। নাকি মালিক স্বয়ং চলে এলো পরীক্ষা নিতে? ডাকসাইটে লোকটি বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাংলা জানো?'

রওনক ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে উত্তর দিল, "জ্বি, বাংলাই আমার ভাষা। ইংরেজি সামান্য শিখেছি , কাজ চালানোর মতো। কষ্ট করে ইংরেজি বলছি সে তো বুঝতেই পারছো।'

হর্তাকর্তা ধরনের মানুষটি বললেন, 'এই লাইনটার মানে বলতে পারবে?' পর্দায় একটা কাগজ দেখা গেল, বাংলায় লেখা। সেখানে একটি লাইনের নিচে লাল দাগ দেওয়া।

'বুঝব না কেন? পানির মতো সহজ। "তিনশ কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ টাকা এই মুহূর্তে জেনিফার মিশুলির খতিয়ান থেকে প্রত্যাহার করার অনুরোধ করা হচ্ছে"।'

কর্তা ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলেন। 'গুড ,ভেরি গুড। তাহলে কবে জয়েন করতে পারবে? তোমাকে হেড অফিসে নিয়ে যাওয়া হবে। সান ফ্রান্সিস্কোতে আমাদের হেড অফিস।'

মাত্র তিরিশ মিনিটের মধ্যে সব হয়ে গেল। বেতনের বহর দেখে রওনকের ভিমরি খাবার জোগাড়।

মিসেস ফারিয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'খবরটা বলেই ফেল। বিয়ে করলে নাকি আরেকটা? খুশি খুশি দেখাচ্ছে যে?'

রওনক হাওলাদার বললেন, 'আরে না, চাকরি পেলাম মাত্র। একটা ব্যাংকে। কাজ কি জান ? বাংলা ইমেইল-টেক্সট, তারপর বাংলায় লেখা ব্যাংকের কাগজ-পত্র, এসব পড়ে ওদের বুঝিয়ে দেওয়া। বেতন যা চেয়েছিলাম তার দ্বিগুণ দিচ্ছে।'

'ভালো খবর, কিন্তু তুমি দেশে আসবে না? ওখানেই থেকে যাবে না কি?'

'কী যে বলো! চাইলে কালই যেতে পারি। আমাকে বছরে মোটে একমাস থাকতে হবে এখানে। কয়েকটা মিটিংয়ের জন্যে। বাকি কাজ দেশে বসেই করতে পারব। নানিও খুব খুশি। তাঁদের আমলে নাকি এই দেশে থাকতে পারা বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার ছিল। বুঝলে না, পুরানা যুগের মানুষ তো।'

মিসেস ইয়াসমিনও খুশি। রওনকের জন্যে এমন কাজই ভাল। বেশি পরিশ্রমের কাজ ও করতে চায় না। আলসে ধরনের। আবার বাংলা ভাষায় দখলটাও ভালো।

'আচ্ছা, ওদিকের খবর কি? অয়ন কই?'

'এদিকেও ভালো খবর। জানো, অয়ন বাংলা স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এতদিন পরে আমাদের কপাল খুলল। বেতন একটু বেশি দিতে হবে, তবে একেবারে রক্তমাংসের শিক্ষক দিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় পড়াবে। কাল থেকে ওখানেই যাবে সে।'

রওনক হাওলাদারের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'যাক, এত চেষ্টার পর বাচ্চাটার একটা গতি হলো। তাহলে বুঝলে তো, সকাল সকাল আমার মুখ দেখলে কি হয়?'

'ইস , যা একখানা পোড়া মুখ! বাংলাটা না জানলে তোমার যে কী হতো? আবার সেই মুখ দেখাতে এসেছ আমাকে।'

এমনিতেই মনটা ভালো, স্ত্রীর বাঁকা কথায় মজা পেয়ে রওনক হাওলাদার শব্দ করে হেসে উঠলেন। মিসেস ইয়াসমিন কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। নিজেও খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়লেন। ওদিকে ধ্বনি খুব পুরনো একটা বাংলা গানের সুর ধরে নাচতে শুরু করলো, যেন সেও তাদের আনন্দে আনন্দিত। মিসেস ইয়াসমিন এ গানটা আগে শোনেননি। গানটা এরকম, 'আমি বাংলায় গান গাই....'। গায়কের গলায় একটা গর্ব এবং আনন্দের ভাব পরিষ্কার।

ধ্বনির সঙ্গে বড় পর্দায় রওনকও সুর ধরলেন। গলা বেসুরো হলেও বেশ ভালো লাগল মিসেস ইয়াসমিনের কানে। এতো সুন্দর একটা গান ছিল, তিনি জানতেনই না! গুনগুন করে তিনিও গেয়ে উঠলেন, 'আমি বাংলায় ভাসি বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই.... ।'

মিসেস ইয়াসমিন এর মাঝে একটা বাজখাঁই গলা শুনে আঁতকে উঠলেন। কে যেন ওপাশ থেকে বলছে, 'এই রওনক , এই গান কই পাইলি?'

এবার বুড়িকে দেখাও গেলো। তবে রাগ নয়, তার মধ্যেও একটা আমুদে ভাব। বললেন, 'ফেব্রুয়ারি মাসে ভালা একখান গান দিছস।' খনখনে গলাটা এই মুহূর্তে সুরেলা লাগলো।

বুড়িও গাইছে, '..আমি বাংলায় কথা কই..'

মিসেস ইয়াসমিনের মনে হচ্ছে, আজ যন্ত্রে-মানুষে, মানুষে-মানুষে, দেশে-বিদেশে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, অনাবিল এক আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে।

হার্নডন, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

মোস্তাফিজুর রহমান টিটু

পৌনঃপুনিক

মগবাজার থেকে মতিঝিল আসতে পুরো সোয়া ঘণ্টা লাগলো। সকাল সাড়ে সাতটার আগে বাসা থেকে বের হলে অবশ্য লাগে ২৫ মিনিট। প্রতিদিন সেরকমই বের হয় হাসান সাহেব। আজও বের হচ্ছিলো এমন সময় স্ত্রী সেলিনা এসে বলে...

- শোনো আজকে কি একটু বাজার করে দিতে পারবে। আসলে গতকালই দরকার ছিলো। ভেবেছিলাম কোনমতে শুক্রবার পর্যন্ত চালাতে পারবো। আজকে দেখি তেল নাই, পিয়াজ আর লবণও নাই। একটু করে দিয়ে যাবে।

- অয়ন তো বাসায় আছে। ওকেই বলো না। নরম করেই উত্তর দিয়েছিলো হাসান।

- অয়নকে দিয়ে তো একটা দুইটা জিনিষ আনানো যায়। এইসব বাজার কি পারবে? সব সময়ের মতো নরম ভীরু কণ্ঠে বলে সেলিনা।

- তোমার ছেলের বয়স কিন্তু একুশ। কচি খোকা না। আরো কয়েকটা কঠিন কথা বলতে গিয়েও থেমে যান হাসান সাহেব। কেমন ভীত মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে সেলিনা। আগে অনেক রাগ হলেও আজকাল কেমন মায়া হয় হাসান সাহেবের, ঐ ভীত মুখ দেখে।

- কি কি লাগবে মুখে বলবে নাকি লিস্ট করেছো?

- লিস্ট করা আছে।

তারপর বাজার করে অফিসে রওনা দিতে দিতে নয়টা পার হয়ে যায়। মালিবাগ মোড়ে বিশাল জ্যাম। কারণ হলো একটা বাস আর একটা বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে লেগে গেছে। এর মাঝে একটা বাসের মালিক মনে হয় নেতাগোছের কেউ। ব্যস ...আর কি ! এসব দেখতে দেখতে ঘেন্না ধরে গেছে। হাসানের রাগটা না হয় একটু বেশী...সবাই তাই বলে। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষের হয়তো অনুভুতিই নষ্ট হয়ে গেছে। অথবা এটাই নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে। নাহলে দিনের পর দিন এসব চলে কিভাবে!?

শাপলা চত্বরে যখন বাস থেকে নামলো হাসান সাহেব তখন ঘড়ির কাটা সকাল সাড়ে দশটা ছুই ছুই। জুলাই মাস। গরমে পিঠের দিকে শার্ট কিছুটা ভিজে গেছে। দা হাতে রাস্তার পাশে ডাবওয়ালাকে দেখে তেষ্টাটা তীব্র হয়। একবার ভাবলেন একটা ডাব কিনে খাই। কিন্তু গত মাসেই অফিসের শরীফ সাহেবের কথা মনে পড়লো। রাস্তার পাশের ডাব খেয়েই বেচারা আট দিন হাসপাতালে ছিলেন।

তিরিক্ষি মেজাজ নিয়েই চার তলায় নিজের অফিস রুমে ঢোকেন হাসান সাহেব। আজকেও এসি কাজ করছে না। গতকাল দুইজন লোককে দেখেছিলেন কাজ করতে। ফ্যানটা ছেড়ে টেবিলে বসতেই আপার ডিভিশন ক্লার্ক জলিল সাহেব রুমে ঢোকেন।
- স্যার এর মনে হয় আজকে একটু দেরী হইলো?
- হ্যা কেন, কেউ খুঁজেছিল?
- খোঁজার মানুষের কি অভাব আছে। জানেন না এই অফিস।
- জলিল সাহেব এসিটা কবে ঠিক হবে? গরমে তো মারা যাচ্ছি।
- কালকে তো দুইজন আসছিলো। বোঝেন না সরকারী অফিসের কাজ। দশ টাকার কাজে একশ টাকার বিল বানাইবো কিভাবে সেইটাই ধান্ধা। আমি খবর নেবো নে স্যার। দুই একদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। এখন এই ফাইলটা একটু ছাইড়া দেন স্যার। ক্লায়েন্ট অনেকদিন যাবত ঘুরতাছে।
- ঠিক আছে রাখেন। আমি একটু দেখে আপনাকে খবর দেবো। জলিল সাহেব আপনার বড় ছেলে কোথায় পড়ছে? ইচ্ছা করেই হাসান সাহেব অন্য প্রসঙ্গে যান। জলিল সাহেব সিবিএ এর নেতা। সে যখন নিজে ফাইল নিয়ে আসছে তখন বড়সড় কোনো ঘাপলাই আছে। এখন মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। আর মেসির মত ড্রিব্লিং করে ব্যাপারটা পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। এতদিনে এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন হাসান সাহেব।
- প্রাইভেট ইউনিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে স্যার। আগামী বছরেই বাইরে পাঠাইয়া দেবো। ছোটটাও এই বছর একই ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলো।
- খরচ কেমন?
- মেলা খরচ স্যার। কিন্তু কি করুম। পোলাপানের ভবিষ্যৎ ... যাই তাইলে স্যার। কল কইরেন। বলে রুম থেকে বের হয়ে যায় জলিল সাহেব।

আজকাল এক একটা ছেলে মেয়েকে পড়াবার খরচ এত বেশী ...বিশ বছর আগে কেউ চিন্তাও করতে পারতো না। নিজের একমাত্র সন্তান অয়নও একটা প্রাইভেট মেডিক্যালে পড়ছে। বাপরে যা খরচ। প্রয়াত বাবা মগবাজারের মত জায়গায় পৌনে তিন কাঠা জমি রেখে গেছিলো বলে একটু স্বস্তি। ডেভেলপারকে দিয়ে সেখানে ফ্লাট করা হয়েছে। ভাগে দুইটা পেয়েছেন। একটায় থাকেন আর একটা ভাড়া দেওয়া। এটা না থাকলে ...
- হ্যালো দাদা। ফোন আসাতে চিন্তার জাল ছিড়ে যায় হাসান সাহেবের।
- তুই কী বিকালে বাসায় থাকবি? ওপাশ থেকে বড় ভাইয়ের জলদগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসে।
- কেনো দাদা?
- নাহ তুই বাসায় থাকলে একটু আসতাম।
- অফিস থেকে বের হতে একটু দেরী হতে পারে। তুমি ঠিক সন্ধ্যার পরে চলে আসো।
- গতকাল নজরুল ভাই বাসায় এসেছিলো।
- কোন নজরুল ভাই?

- ঐ যে আব্বার কিরকম চাচাতো ভাইয়ের মেয়ের জামাই। গ্রাম থেকে আই এ পাশ করে আমাদের বাসায় আসলো চাকুরী খুজতে। যার জন্য তুই আর আমি এক মাস মাটিতে বিছানা করে ঘুমালাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আমাদের টু ইন ওয়ানটা নিয়ে যে সৈনিক ভাইদের জন্য অনুষ্ঠান ‘দূর্বার’ শুনতো ...আব্বা এদিকে পৌনে আটটায় বিবিসি শুনবে ...কিন্তু চাচাত ভাইয়ের মেয়ের জামাই দূর্বার শুনছে ... মনে আছে?
- খুব মনে আছে। এক মাস ঢাকা থেকে সে তার যোগ্য চাকুরী না পেয়ে গ্রামে ফিরে গিয়েছিলো। তা এসেছিলো কেন?
- আবারো চাকুরী। এবার তার নিজের মেয়ের জামাইয়ের জন্য। আরো কিছু মজার কথা বললো। তোকে বলবো। তোর সাথে আরো কিছু কথা আছে।
- ঠিক আছে চইলা আইসো।
- শোন একটা মজার জিনিষ জানলাম।
- কী?
- হার্ট এটাকের বাংলা কি জানোস? সন্ন্যাস রোগ। শরৎচন্দ্রের বইতে পড়লাম। অদ্ভুত না?

এভাবেই আরো কিছুক্ষণ আলাপ করে ফোন রাখেন হাসান সাহেব। মিজান সাহেব হাসান সাহেবের বড় ভাই। ছয় ভাই বোনের মধ্যে আড়াই বছরের বড় এই ভাইয়ের সাথেই ঘনিষ্ঠতা বেশী হাসান সাহেবের। ছেলেবেলায় একসাথে খেলেছেন, বড় ভাই একটু লম্বা হলেই তার ফেলে দেওয়া শার্ট, প্যান্ট পরেছেন এমনকি ভুল করে একই মেয়ের জন্য প্রেমপত্রও লিখেছেন। বছর দুই আগে সেনাবাহিনী থেকে কর্নেল হিসাবে অবসর নিয়েছেন বড় ভাই। বড় মেয়ে বিয়ে করে আমেরিকাতে, ছেলেটাও গত বছর কানাডা চলে গেলো পড়াশুনা করতে। শান্ত, নিরুপদ্রব কিন্তু প্রায় শূন্য ঘরে বড় ভাই মিজান সাহেবের এখন অফুরন্ত অবসর। প্রায়ই ছোট ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চলে আসেন। এমনকি এই অফিসেও দুই তিনবার এসেছেন। দাদার খুব ইচ্ছা মগবাজারে পৈত্রিক বাসায় ফিরে আসা। কিন্তু ভাবী উত্তরার বাসা ছেড়ে আসতে নারাজ। এ নিয়ে পারিবারিক টানাপোড়ন চলছে। হয়তো সে কথাই বলতে বিকেলে আসবেন দাদা।

এরপরে অফিসের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন হাসান সাহেব। ঠিক দুপুরে হঠাৎ সেক্রেটারি আসলো অফিসে। এরকম সময়ে যা হয় অফিসজুড়ে ব্যস্ততা বেড়ে যায়। যে লোক অফিসের টেবিলে নিয়মিত ঘুমায় সেও গভীর মনোযোগে ফাইল দেখতে থাকে। হাসান সাহেব সিনিয়র অফিসার বলে সারাটা সময় সেক্রেটারির সাথে থাকতে হলো। ঠিক দুইটার সময় সেক্রেটারি বিদায় নেবার পরে আবার নিজের টেবিলে এসে বসেন হাসান সাহেব। মাথাটা কেমন ঘুরছে। বছরখানেক আগে ডায়াবেটিস ধরা পরেছে। খাওয়া দাওয়ায় অনিয়ম করলেই এমন হয়। কিন্তু এই হতচ্ছাড়া অফিসে নিয়ম মেনে চলাও তো কঠিন। ব্যাগটা খুলে খাবারের বক্স বের করেন। দুটো রুটি, আলু আর পটলের সাথে শিং মাছের তরকারি, কাটা ছাড়াতে যেনো সুবিধা হয় সেইজন্য মাছের মাঝখানের টুকরা গুলো যত্ন করে দেওয়া। আর একটা বক্সে শসা, টমেটো, পিয়াজ, ধনেপাতা আর

কাচামরিচ। সব আলাদা আলাদা করা। আগে থেকে মিশালে নাকি সালাদের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। খেতে খেতে মফস্বলের মেয়ে স্ত্রী সেলিনার গভীর মমতাময় ভালোবাসা টের পান হাসান সাহেব। নিত্যকার মতো। হায় স্ত্রীর কাছে নিজের রাগ যেভাবে প্রকাশ করেছেন ভালোবাসাটুকু কী সেভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন? আজকাল মনে হয় মানুষ শুধু শারীরিকভাবেই প্রতিবন্ধী হয় এমন না। মনের আবেগ প্রকাশেও অনেকের প্রতিবন্ধকতা থাকে...নিজের যেমন আছে।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই মোবাইল বাজে। ফোনের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হলেন হাসান সাহেব। 'বড় ভাবী কলিং ' ...বড় ভাবী তো সাধারনত ফোন করেন না ...করলেও সেলিনাকে করে ...তাহলে?

- হাসান তুমি কোথায়? ফোন ধরতেই ভাবী জিজ্ঞেস করেন।

- আমি তো অফিসে।

- মিজানের কি জানি হয়েছে। আমি ইউনাইটেডে যাচ্ছি।

- কি হয়েছে দাদার?

- ড্রাইভার আপনি রং সাইড দিয়াই যান ...তাড়াতাড়ি করেন। উত্তরের বদলে ভাবীর এই কথাগুলোই ভেসে আসে। হাসান সাহেবও আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেন না। দ্রুত অফিস থেকে বের হন। মতিঝিল থেকে গুলশানে আসার পথে বাকি সব ভাই বোনকেই ফোন করেন।

হাসপাতালের সামনে সি,এন,জি থেকে নামতেই বড় বুবুর সাথে দেখা হলো। বড় বুবুর বাসা কালাচাদপুর বলে তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারছেন।

- দাদা কই? হাসান সাহেব জিজ্ঞেস করে।

- আই,সি,ইউ তে নিছিলো। কিন্তু জ্ঞান আছে বলে একটু পরেই সি,সি,উ তে নিয়ে গেছে।

- সি,এম,এইচে নিলো না কেনো?

- বড় বউ এর মামা এইখানের বড় ডাক্তার। সেই মনে হয় বলছে। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করছি। ডাক্তার তো বললো হার্ট এটাক। আরো কি জানি বলবে। তুই বুঝতে পারবি তাই তোর জন্য এইখানে দাড়াইয়া আছি।

- ঠিক আছে চলো।

ঝকঝকে তকতকে ডাক্তারের রুমে এসে বসেন হাসান সাহেব। 'দেখুন উনি ডায়াবেটিক রুগী বলে হার্ট এটাকটা সেভাবে টের পান নাই। এখন উনি ভালোই আছেন। তবে অনেক সময় সাবসিকুয়েন্ট এটাক হয় এবং সাধারনত পরের এটাকগুলো প্রথমটার চাইতেও অনেক খারাপ হয়। তাই পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা খুব গুরুত্বপূর্ণ।' গম্ভীরভাবে বলেন ডাক্তার সাহেব। ডাক্তারের রুম থেকে বের হতেই দেখেন হাসপাতালের করিডোর আত্মীয়- স্বজনে পরিপূর্ণ। এতো মানুষ...নিজের মানুষ দেখে কেমন যেনো সাহস আসে মনে ।

'হাসানের সাথে ফোনে অনেকক্ষণ কথা বললো। আজকাল তো আমার সাথে যত কথা বলে হাসানের সাথে তার চাইতেও অনেক বেশী বলে। তারপর বললো পেটে মনে

হয় গ্যাস হইছে। দুইটা মাইলান্টা দেওতো …’ বড় ভাবী সবাইকে বলছেন। এই একই কাহিনী আরো দশ বারোবার বলতে হবে বড় ভাবীকে। কোনো একবার শুনে নিলেই হবে। তাই হাসান সাহেব সেখানে আর দাঁড়ায় না। সি,সি,ইউ এর দরজার কাছে যায়। দেখে ছোট ভাই শোভন দাড়িয়ে আছে। ‘ভিতরে বড় বুবু আছে। এখনই বের হবে। একজনের বেশী তো ঢুকতে দেয় না। তুমি যখন আসছো তুমিই আগে যাও। আমি পরে যাবো।‘ শোভন বলে। একটু পরেই হাসান সাহেব ঢোকেন সি,সি,ইউতে। চারদিকে বড্ড বেশী সাদা। এর মাঝে দূরের কোনায় দাদা শুয়ে আছেন। হাসানকে দেখেই দূর থেকে হাসেন।

- আসলে আমার তেমন কিছু হয় নাই। তোর সাথে সন্ন্যাস রোগ নিয়া আলাপ করলাম না। ঐটাই মনে হয় সাইকোলজিক্যালি কাজ করছে। তবে এইখানে যখন আসছি এক দুই লাখ টাকা বিল না দিয়া তো যাওয়া যাবে না। যতই তোর ভাবীর মামা থাকুক না কেনো। কাছে যেতেই বলেন মিজান সাহেব।

- তোমাকে টাকা নিয়া চিন্তা করতে হবে না দাদা।

- আরে নাহ টাকা নিয়া চিন্তা করি না। জানোস একটু আগে না পুরানো একটা কথা মনে করে হাসি আসলো।

- কী কথা দাদা?

- তুই যে লুকাইয়া লুকাইয়া আমার ক্যাসিও ঘড়িটা পরতি আমি কিন্তু জানতাম। তুই যে ঘড়িটা পইড়া স্টাইল কইরা হাটতি। দূর থেকে দেখে আমার মজা লাগতো। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করেই আমি ঘড়িটা ড্রয়ারে রেখে যেতাম। কতদিন ইচ্ছা হইছে তোরে একটা ঘড়ি কিনা দেই। কিন্তু তখন তো অত টাকা …

- দাদা আমারো একটা কথা মনে হয় জানো।

- কী?

- সবাই যে বলে আমার রাগ বেশী এর কারণ মনে হয় তুমি।

- কী বলিস?

- মনে নাই একবার মাথা ন্যাড়া করলাম আর তুমি একটু পর পর মাথার চাঁদিতে চাপড় দিতে …তাই মনে হয় রাগ বেশী হয়ে গেছে …

- তাহলে এখন চাঁদিতে চাপড় দিলে আবার রাগ পানি হয়ে যাবে। দাঁড়া হাসপাতাল থেকে ফিরে সোজা মগবাজার যাবো। তোর ভাবীর কোনো কথাই আর শুনবো না। তখন সকাল বিকাল তোর মাথায় চাপড় দেবো …বলে হাসেন মিজান সাহেব। এর মাঝেই এক নার্স আসেন। ‘আপনারা এত কথা বলছেন। রোগীর ক্ষতি হবেতো। ওনাকে একটু রেস্ট নিতে দেন।‘

- ধুর বলুক। তুই আর একটু থাক। দাদা পাত্তা দিতে চান না।

- নাহ দাদা। আমি পরে আবার আসবো। তুমি এখন চুপচাপ শুয়ে থাকো।

সি,সি,ইউ থেকে বের হতেই বড় ভাবী একটা ফোন ধরিয়ে দেন। 'তামিম ফোন করছে। তোমার সাথে কথা বলতে চায়। আমি আসতে নিষেধ করছি। তুমি কথা বলো। ' বলে ভাবী ফোনটা দিয়ে চলে যান।

- চাচু বাবা কেমন আছে? সুদূর কানাডা থেকে দাদার ছেলে তামিমের গলা ভেসে আসে।

- এখন তো ভালো আছে। তবে ডাক্তার একটা কথা বলছে। দাঁড়া একটু দূরে গিয়ে বলছি। একটু আড়ালে গিয়ে একটু আগে শোনা ডাক্তারের কথাটাই হুবহু বলে তানিমকে।

- চাচু কালকে আমার একটা পরীক্ষা আছে। এটা না দিলে সময় টাকা দুইটাই নষ্ট হবে। পরীক্ষাটা দিয়েই আসি।

- ঠিক আছে তাই কর। মুখে বললেও মনে মনে একটু বিরক্ত হন হাসান সাহেব।

রাতে হাসান সাহেব হাসপাতালেই থাকেন। দাদা, কাছে গেলেই গল্প শুরু করেন বলে আলাদা জায়গায় থাকেন। সকালে সবাই আসলে তারপর হাসপাতাল ছাড়েন হাসান সাহেব। অফিসে একটা ফোন করে ছুটির ব্যবস্থাও করেন। তারপর বাসায় এসে ঘুমাবার চেষ্টা করেন। মনে হয় ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়েও ছিলেন। এর মাঝে সেলিনা এসে ডেকে তোলে। 'বড় বুবু ফোন করেছে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলো।' আধা ঘন্টা পরে যখন হাসান সাহেব হাসপাতালে আসেন তখন সব শেষ।

এর তিন সপ্তাহ পরে।

- কি বুবু ডাকছো কেনো? বড় বুবুর বাসার ড্রয়িং রুমে বসতে বসতে বলে হাসান সাহেব।

- এখানে বসলি কেনো? ফ্রেস হয়ে শোবার ঘরে যা। আজকে তো খেয়ে যাবি।

- নাহ বুবু। আজকে খাবো না। কী জন্য ডেকেছো সেইটা বলো।

- তুই নাকি খুব অশান্তি শুরু করছোস। ফিক্সড ডিপোজিট সব ভেঙ্গে ফেলতে চাস। অয়নের সাথে খ্যাচ খ্যাচ করোস।

- সেলিনা বলছে?

- কে বলছে সেইটা বড় না। মিজানের মৃত্যু আমাদের সবার জন্যই শোকের। তুই না হয় একটু বেশী ক্লোজ ছিলি। তাই বইলা এই বয়সে এইসব কি শুরু করছোস।

- বুবু ঠাণ্ডা হইয়ো বসো। তোমাকে কয়েকটা কথা বলি।

- বল।

- তোমার কী মনে হয় না অয়ন, তামিম এরা খুব স্বার্থপর একটা প্রজন্ম?

- কেন এই কথা কেন?

- তোমাদের কাউকে না বললেও ডাক্তার কি বলেছে সেটা কিন্তু আমি তামিমকে ভালোভাবে বলেছিলাম। সে বললো তার পরীক্ষা পরের দিন।

- তামিম তো আর এখানে ছিলো না। হয়তো বুঝতে পারে নাই।

- বুবু তুমি খেয়াল কইরা দেইখো এরা কেমন যেন। আমরা ছয় ভাইবোন ছিলাম। গ্রাম থেকে মেহমান আসলেই আমাকে আর দাদাকে মাটিতে শুইতে হইতো। সারাটা স্কুল কলেজ জীবন পার করলাম নিজের কোনো পড়ার টেবিল ছাড়া। সকালে একটা ডিম

ভাজি হইলে কমপক্ষে তিনজন খাইতাম। আর এখন আমাদের ঘরে ঘরে একজন কিংবা দুইজন সন্তান। এরা কিছু না চাইতেই অনেক কিছু পায়। সেদিন আমার একটা জামা অয়নকে দিলাম। আমি মাত্র একদিন পরেছিলাম। সে মুখের উপরে বললো আর একজনের জামা কাপড় পরা নাকি আনহাইজিনিক। অথচ আমার সারাটা ছোট বেলা কাটছে দাদার জামা কাপড় পরে। এরা আসলে একটা স্বার্থপর প্রজন্ম।
- কী সব যে বলস না। তোর সাথে...মিজানের সাথে... বাবারও তো অনেক লাগত। মনে নাই একবার বাবা আর একটু হইলে ক্যাসেট প্লেয়ারটা আছাড় মাইরা ভাইঙ্গা ফালাইতে নিছিলো।
- ঐটা তো অন্য ব্যাপার বুবু। বাবা মনে করতো আব্বাসউদ্দিন আর আব্দুল আলীমের পরে আর কোনো শিল্পী আসে নাই। আমি আর দাদা ব্যান্ডের ক্যাসেট কিনলে বলতো 'কাউয়া সঙ্গীত'। ব্যান্ডের গান বাবা মনে করতো কাউয়ার চিৎকার। ঐটা তো ভিন্ন জিনিষ।
- আরে একই। আসল কথা হলো এদের অনেক কিছু আমাদের সাথে মিলবে না।
- নাহ বুবু। আমি খেয়াল করে দেখেছি। অফিসের পিওনের ছেলেটাও মনে করে হাজার হাজার টাকা খরচ করে বাবা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াবে। বাবা যেভাবেই হোক পড়ায়ও। আমরা কোনোদিন এসব ভাবতে পারছি।
- হইছে তুই যেমন তোর মত, ওরাও ওদের মত। সংসারে অশান্তি করিস নারে ভাই।

আরো তিন সপ্তাহ পরে।

ডাক্তারের চেম্বারে হাসান সাহেব আর অয়ন বসে আছে। সব রিপোর্ট দেখে বেশ কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার মুখ তুললেন।
- দেখুন আপনার ছেলে মেডিক্যালের ছাত্র। ও মনে হয় কিছুটা বুঝতে পারছে। আপনার স্ত্রীর যেটা হয়েছে তার নাম সি কে ডি। ক্রনিক কিডনি ডিজিস। সমস্যাটা অনেক দিনের। উনি হয়তো চেপে গেছিলেন। খারাপটা আগে বলে নাই। ওনার দুইটা কিডনিই ৭০ শতাংশ অকেজো এবং এটা চিকিৎসা করলেও ধীরে ধীরে আরও খারাপই হবে।
- আরো খারাপ হলে সেটা আবার কী চিকিৎসা? হাসান সাহেব প্রশ্ন করেন।
- আমাকে পুরোটা বলতে দিন। চিকিৎসা মানে হলো খারাপ হবার রেটটাকে যথাসম্ভব ধীর করে দেয়া। তবে আসল ভালো খবরটা এখনো বলি নাই। ওনার যেহেতু ডায়াবেটিক কিংবা অন্য কোনো জটিল সমস্যা নাই এবং বয়সটাও যেহেতু মাত্র পঞ্চাশ পার হলো কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হলে উনি অনেকদিন সুস্থ থাকবেন। তুমি তো ব্যাপারগুলো কিছুটা জানো? শেষ প্রশ্নটা ডাক্তার সাহেব অয়নকে বললেন।
- জ্বি। কিডনি হয় একজন ডোনার কিংবা নিজের আত্মীয় স্বজন থেকে যোগাড় করতে হবে। অয়ন উত্তর দেয়।
- এখনো তাড়াহুড়ার পর্যায়ে নাই। আগামী ছয় কিংবা নয় মাসের মাঝে কিডনি পেলেই হবে। এর মাঝে ওষুধ চলতে থাকুক।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়ে হাসান সাহেব অয়নকে বলেন 'খবরটা মাকে দিও না। বলবে ওষুধ খেলেই ভালো হয়ে যাবে।' অয়ন এই যুগের ছেলেদের মত বিশ্রীভাবে কাঁধ নাচিয়ে উত্তর দেয়।

আরো তিন সপ্তাহ পরে।

গত এক সপ্তাহ যাবত ছুটিতে আছেন হাসান সাহেব। অবশ্য বাসার কেউ জানে না। প্রতিদিন নিয়ম মত অফিসের সময়ে বের হন। তারপর বিভিন্ন হাসপাতালে যান। বন্ধু ডাক্তার জামিলের পরামর্শে এমন করছেন। একটা নেটওয়ার্ক বিল্ডাপ করা যাতে একটা কিডনি পাওয়া যায়। আজকে অবশ্য জামিলের চেম্বারেই আসছেন।

- তুই বুঝতে পারছিস না কেনো। তোর কিডনি ম্যাচ করলেও নেওয়া যাবে না। তুই নিজেই ডায়াবিটিক রোগী।

ডাক্তার জামিলে বন্ধু হাসানকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

- আমি ডায়াবেটিক রোগী তো কী হইছে। আমার কিডনি তো এখনো ঠিক আছে। তাছাড়া ধর এক কিডনিওয়ালা লোকের কি ডায়াবেটিক হয় না।

- ক্রস ম্যাচ করাইতে চাস করা। কিন্তু আমি জানি তোর কিডনি কোনো ডাক্তার নিবে না। তুই এত অধৈর্য হয়ে যাচ্ছোস কেন্, বুঝলাম না। আর ভাবীর দিকের কিছু আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ কর।

- ওর দিকের আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ একটু কম। ও নিজেই কমাইয়া দিছে।

- কমাইয়া দিছে, তুই এখন বাড়া।

- তুই আসলে বুঝবি না জামিল। এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে সেলিনা আমার কাছ থেকে তেমন কিছু পায় নাই। কথায় কথায় রাগারাগি করছি। ও মফস্বলের স্কুল মাস্টারের মেয়ে। আমার অন্য ভাইদের বউদের চাইতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অনেক দুর্বল। এটা নিয়ে সব সময় ও কুন্ঠিত হয়ে থাকত। আর তাতেই আমার মেজাজ আরো বেশী খারাপ হত। অয়ন জন্মাবার পাঁচ বছর পরে ওভারিতে টিউমার হওয়াতে যখন ওভারি ফেলে দিতে হলো ...সেটাও সে নিজের আর একটা দোষ হিসাবে মনে করে। প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গেল ...আমি যে ওকে ভালোবাসি সেটাও মনে হয় বলি নাই ঠিকভাবে... শেষ কথাগুলো বলার সময় গলা ধরে আসে হাসান সাহেবের। জামিল একটু অবাকই হয়। হাসানকে সব সময় অন্যভাবেই দেখে অভ্যস্ত জামিল। বন্ধুমহলে হাসানের রগচটা স্বভাবের জন্য নামই ছিলো 'ঘাউরা হাসান।'

- ঠিক আছে তুই ক্রস ম্যাচ করা। আর চিন্তা করিস না। একটা ব্যবস্থা হবেই। জামিল বলে।

- তোমার কি হয়েছে? সেই রাতেই সেলিনা হাসান সাহেবকে জিজ্ঞেস করে।

- কই কিছু হয় নাই তো।

- কিছু একটা হইছেই। রাতের বেলা দুই তিনবার উঠে পড়। সকালে এক এক সময়ে অফিসে যাচ্ছ। অফিসে কোনো সমস্যা?

- আরে নাহ্ অফিসে আবার কি হবে। তুমি তো জানোই অফিস নিয়ে আমি বেশী চিন্তা করি না।
- হ্যা আমিও তাই ভাবি অফিস নিয়ে টেনশন করার লোক তুমি না ...তাহলে?
- আমার কিছুই হয় নাই।
- দেখ, আমার পৃথিবী খুব ছোট। পঁচিশ বছর আগে এই সংসারে এসে নিজেকে অসম্ভব ভাগ্যবতী মনে হয়েছিলো। এখনো তাই মনে হয়। সব সময় ভয়ে থাকি তুমি, অয়ন এই নিয়ে এই যে আমার ছোট সুন্দর পৃথিবী সেখানে না আবার কোনো সমস্যা হয়।
- তোমার এই ভয়টাই আমার দুচোখের বিষ।
- আমি জানি। তুমি যদি আমার চোখ দিয়ে দেখতা তাহলে বুঝতে। আজকাল কতকিছু শুনি দেখি। অথচ তোমার দিকে তোমার ছেলের দিকে তাকালে মনে হয় আহা আমার দুনিয়াটা এত সুন্দর...যদি নষ্ট হয়ে যায়। ভয় তো আর এমনি এমনি আসে না। সেলিনার কথাগুলো শুনতে শুনতে জলের ধারা বুক থেকে উঠে এসে চোখের কিনারায় জড়ো হয়।
- তোমার যত আজাইরা চিন্তা। এইসব আজাইরা চিন্তা না করে ওষুধগুলো ঠিকমতো খাইয়ো। তাইলে আমার উপকার হবে। শেষ কথাটা স্বভাবসুলভ চড়া স্বরেই বলেন হাসান সাহেব। জীবনে এই প্রথম নিজের আবেগ প্রতিবন্ধকতার জন্য তেমন খারাপ লাগে না হাসান সাহেবের।

ডাক্তারের চেম্বারে বসে আছেন হাসান সাহেব। এর পরের সিরিয়ালটাই হাসান সাহেবের। অয়নেরও আসার কথা। কোথায় নাকি আটকা পড়েছে। মায়ের অসুখ। কোন হুঁশ আছে ছেলেটার। তবে এই স্বার্থপর প্রজন্ম থেকে বেশী কিছু আশাও করেন না হাসান সাহেব।
- তাহলে একজন ডোনার অলরেডি পাওয়া গেছে। এখনো আরো পাঁচ- ছয়মাস সময় আছে। দেখেন আরো এক দুইজন পাওয়া যায় কিনা। ডাক্তারের কথায় চমকে যান হাসান সাহেব।
- ডোনার পাওয়া গেছে মানে?
- ফাইলেতো তাই লেখা। ডোনারের সব টেষ্টও করা হয়ে গেছে। সব পজিটিভ। আপনি জানেন না?
- আমি কি একটু ফাইলটা দেখতে পারি ডক্টর।
- নিশ্চয়।
- ফাইলের উপরেই বড় করে ডোনারের নাম লেখা। 'অয়ন ইসলাম'। এরপরে ডাক্তার আর কি বলে ঠিকমতো শোনা হয় না হাসান সাহেবের। হুঁ হা করেই বাকি সময়টা পার করে।
চেম্বার থেকে বের হতেই হন্তদন্ত অয়নকে দেখতে পান হাসান সাহেব।
- ইস্স্ একটুর জন্য মিস করলাম। কি বললো ডাক্তার। ক্রিয়েটিনিন লেভেল বাড়ে নাই তো? ডাক্তারের চেম্বারের করিডোরে হাটতে হাটতে অয়ন জিজ্ঞেস করে।
- নাহ।

- এত গম্ভীর হয়ে আছো কেনো। রাগ কইরো না। রাস্তায় যে কি জ্যাম আজকে চিন্তাও করতে পারবে না।
- তুই কিডনি দিবি একবার আমাকে বলারও প্রয়োজন মনে করলি না।
- এতে বলার কি আছে। মায়ের জন্য আমি কিডনি দেবো। আর ভুলে যাচ্ছো আমিও কয়দিন পরেই ডাক্তার হব। এক কিডনি নিয়ে দিব্যি ভালো থাকা যায়। বলে স্বভাবসুলভ কাঁধ নাচায় অয়ন।

কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ অয়নকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন আবেগ প্রতিবন্ধী হাসান সাহেব। স্বার্থপর প্রজন্মের ছেলে অয়ন অবাক হয়ে যে একটু কাঁধ ঝাকাবে তারও কোনো উপায় থাকে না। কাঁধে যে বাবা মুখ ডুবিয়ে বসে আছেন ...

ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া

মোহাম্মদ ইরফান

মাশাল্লা রাজকন্যা

১

‘চলো। উই আর ডান ফর দ্য ডে।’

ছোট্ট জওশনের ডাকে ফিরে তাকায় আলিয়া। আস্তে করে বলে, ‘হ্যাঁ চলো। তোমার কোচকে আস্ক কর নেক্সট গেম কবে?’

‘ইউ আস্ক হিম, আলিয়া।’ জওশনের গলায় তাচ্ছিল্য। যেন খেলা-প্র্যাক্টিস এসবের মত ছোটখাট বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তার মোটেও। আলিয়ার অতি সঙ্গত প্রশ্নটির সমাধান করার কোনরকম চেষ্টা না করেই গাড়ির দিকে এগোয় সে, হাতে ধরা পানির বোতলে চুমুক দিতে দিতে।

‘দি গেম ইজ অন সাতুরদে, নাইন ওক্লক, শার্প। ডোণ্ট ফরগেট হিজ জের্সি,’ পেছন থেকে কোচের গলা শুনে লজ্জিত হয় আলিয়া। ও কী শুনতে পেল? জার্সির জন্য অন্তত একটি ধন্যবাদ তো প্রাপ্য ছিল কোচের। ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেছন ফিরে সুন্দর করে হাসে আলিয়া কোচের দিকে তাকিয়ে। হাত নাড়িয়ে বিদায়ের ভঙ্গি করে।

‘সি, ইউ সাতুরদে’ প্রত্যুত্তর করে কোচ। কোচের কণ্ঠোচ্ছ্বাস স্পর্শ করে বুঝি আলিয়াকে। নিজেকে শাসন করে গাড়ির দিকে এগোয় সে দ্রুত। একাকী মহিলা ল্যাটিংগোর দিকে নজর দিয়েছে শুনলে প্রবল অস্বস্তি তৈরী হবে স্থানীয় বাঙালিদের স্বস্তিমণ্ডলে।

জার্সি, বল আর ক্লিট গাড়ির পেছনে ভরে জওশনকে পেছনের সিটে তুলে ওদের বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয় আলিয়া। ড্রাইভিং লাইসেন্সের লিখিত পরীক্ষা দিতে গিয়ে অন্য অনেক নিয়মের সাথে এ-ও শিখেছিল আট বছর হলেই চালকের পার্শ্বযাত্রী হতে পারে বাচ্চারা। জওশনের মা মানেনি – ‘ওইটুকুন বাচ্চা। ওকে সামনে বসাবে না তুমি।’ ফরমান জারী করেছেন তিনি প্রথম দিনই।

‘কোচ হেসুস হ্যাজ এ থিং ফর ইউ।’ পেছনের সিট থেকে জওশনের গলা শুনে থতমত খায় আলিয়া। অজান্তেই পায়ের চাপ পড়ে ব্রেকের ওপর। থমকে যায় গাড়ি। সশব্দে হর্ন দিয়ে সাবধান করে পেছনের গাড়ির চালক। সামলে উঠে আলিয়াদের

গাড়িটিকে দ্রুতগতিতে পাশ কাটানোর সময় মধ্যমা উঁচু করে আলিয়ার উদ্দেশ্যে খিস্তি করতে ভোলেনা চালকটি।

'অসভ্য ছেলে,' বিরক্তি চেপে রাখতে পারে না আলিয়া, ভুলে যায় পরের বাচ্চাকে অসভ্য বলাটা ঠিক শোভন নয় এদেশে। জওশন তার মাকে বলে দিলে বাড়তি আয়ের এই সুযোগটা হারাতে পারে আলিয়া, কোনরকম কারণ দর্শানোর সুযোগ ছাড়াই।

'অসভ্য কি মানে?' ছোট্ট জওশনের সরল প্রশ্নে হেসে ফেলে আলিয়া। বিদেশি-দেশির বাংলা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় আত্মপ্রসাদও বোধ করে খানিকটা।

'অসভ্য মানে ন'টি।' মগজ হাতড়ে প্রথম যে ইংরেজি শব্দটি মাথায় আসে সেটিই উগরে দেয় আলিয়া। ইংরেজি করে না দিলে বাংলা শব্দটিই আবার সবাইকে বলতে থাকবে জওশন, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে।

'ন-টি? নো-, আই এম নট নটি।' জওশনের আদুরে প্রতিবাদের কারণ ঠিক বুঝেনা আলিয়া। নিশ্চয় সে অন্য কোন মানে করেছে শব্দটির, যেমনটি করে সচরাচর। 'পাস আউট' শব্দযুগলের অর্থ যে পরীক্ষায় পাশ করার চেয়েও আরো অনেক ভয়াবহ, 'বগি' বলতে রেলেরে কামরা বোঝায়না - এসব শিখিয়েছে আলিয়াকে জওশনই। দশ বছরের ছেলের কাছে এসব নিয়ে নাস্তানাবুদ হতে প্রথম প্রথম ভালো লাগেনি আলিয়ার। ক্রমে সয়ে গেছে। বিশেষত যখন থেকে টের পেতে শুরু করেছে যোগাযোগের দুর্বলতাটা দু'তরফেই। একটা মায়াও পড়ে গেছে ধীরে ধীরে ছেলেটির ওপর, তার সারা পরিবারের ওপর।

২

বাশারের সাথে বিচ্ছেদের পর অকূল পাথারে পড়া আলিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন এঁরাই। আলিয়া যখন হন্যে হয়ে খুঁজছিল ছোটখাট যেকোন কাজ, দেশি মুদিখানা থেকে গ্যাস স্টেশনের পরিচিত মালিক সবাই যখন মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল বাশারের বাবা-মার ভয়ে, তখন এই জওশনের মা জোহরা ভাবীই নিজ থেকে ডেকে কাজ দিয়েছিলেন আলিয়াকে। সেদিনের কথা মনে হতেই চোখের কোণায় জল জমে আলিয়ার। জল গড়িয়ে প্রসাধন নষ্ট হবার আগেই গাড়ির আয়না দেখে ঠিক করে নেয় নিজেকে। পেছনের আসনে জওশন তখন বিভোর বৈদ্যুতিন বিনোদনে।

জোহরা বেগমের সাথে আলিয়ার প্রথম দেখা হয়েছিল এখানে আসার পরপরই, এদেশে আলিয়ার প্রথম সামাজিক অনুষ্ঠানে। বাশারের বাড়ির লোকেরা অনেক ধুমধাম করে বিবাহোত্তর সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল আলিয়াকে নিয়ে আসার পরই। আলিয়াকে বলা হয়েছিল, অতিথিদের সংবর্ধনা বলা হলেও কাগজে-কলমে সেদিনটাকেই তাদের বিয়ের দিন বলতে হবে। সকালবেলা এদেশের আদালতে গিয়ে কি সব সই-সাবুদ করেও এসেছিল, না এদেশের নিয়মে বিয়ে না করলে নাকি বেশিদিন এদেশে থাকা যায় না। আলিয়া পরে অবশ্য জেনেছিল, দেশে ধুমধাম করে বিয়ে করলেও বাশার তাকে এখানে এনেছে প্রেমিকা পরিচয়ে। এখানকার অভিবাসন কর্মকর্তাদের

কাছে বাশার যখন তাঁকে প্রেমিকা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয় আলিয়া ভেবেছিল সেটাই বোধহয় আমেরিকান কেতা। আলিয়ার সমস্ত সত্তায় তখন বাশার। তার মাথাতেই আসেনি তার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া প্রতি কথায় আল্লাহর শোকরগুজার করা স্বামী শত শত লোকের উপস্থিতিতে কাজির নেতৃত্বে রীতিমত দোয়া-কবুল পড়ে করা নিকাহ এত দ্রুত এত দক্ষতার সাথে ভুলে যেতে পারে।

প্রেমিকের অধিকার জাহির করার জন্য এয়ারপোর্ট ভর্তি লোকজনের সামনেই বাশার যখন বারবার তাকে জড়িয়ে ধরছিল, সম্বোধন করছিল 'ডার্লিং' 'হানি' ইত্যাদি নানান মধুর শব্দে, লজ্জায় রাঙা হলেও মনে মনে শিহরিত হচ্ছিল তখন আলিয়া। শ্বশুর-ভাসুরের নজরদারির বাইরে তার স্বামীও যে কতটা রোমান্টিক হতে পারে তা আবিষ্কার করে মনটা ভরে গিয়েছিল বুঝি আনন্দে। স্বদেশ-নিরাপত্তা দপ্তরের মোহর সেঁটে পাসপোর্টগুলো ফেরত দিতে দিতে দপ্তরের উর্দিপরা মহিলা যখন তরল গলায় বলে ওঠেন, 'হ্যাভ ফান গাইজ,' আলিয়ার মনে হয়েছিল সে যেন 'ফান'পুরীতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। খুশিতে পায়ের পাতার ওপর ভর করে দুহাত উঁচু করে বাশারের মাথাটা নামিয়ে এনেছিল নিজের মুখের কাছে, ছোট্ট একটি চুম্বন এঁকে দিয়েছিল বাশারের কপালে। ইমিগ্রেশনের পুলসেরাত পার হওয়া বাশার আলিয়ার আবেগভরা চুম্বনের উত্তরে একটু হেসেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে ললাটের তিলক মুছতে, বাবা-মা-ভাইয়া দেখে ফেলার আগেই।

বাশারের পরিবারের লোকজন অপেক্ষা করছিলেন ব্যাগ-বাক্স বুঝে নেয়ার জায়গাটাতে। বর-বধূ ফেরার দিন দু'য়েক আগেই ফিরে এসেছিলেন ওঁরা। কতকটা বরণের প্রস্তুতিতে, কতকটা ইমিগ্রেশনের ঝামেলা এড়াতে – সবাইকে একসাথে দেখে যাতে কোনরকম সন্দেহ না করেন ওনারা ।

ছোট্ট একটি মেয়ে দৌড়ে এসে আলিয়ার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। আলিয়া পরে জেনেছে, ওর নাম আয়েশা, বাশারের বড় ভাইয়ের মেয়ে। আয়েশার 'বৌ-আন্টি, বৌ-আন্টি' হইচই সবার নজর কাড়ে। ঘূর্ণায়মান বেল্ট থেকে মালামাল সংগ্রহে ব্যস্ত নানা দেশের যাত্রীরা আলিয়ার দিকে ফিরে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসলে আলিয়ার নিজেকে বেশ নায়িকা নায়িকা মনে হয়েছিল।

আলিয়ার সেই তারকানুভূতি মিলিয়ে যেতে সময় লাগে না। বাশারের মা এসে আয়েশাকে আলিয়ার কোল থেকে নামিয়ে আলিয়ার মাথায় ছোট্ট একটি সাদা টুপির মত পোশাক পরিয়ে দেয়। আশেপাশের যাত্রীদের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলেও মুখের স্মিত হাসি উবে যায় না এতটুকুও। শোভনীয় কসমোপলিটান কৌতূহলশূন্যতায় তাঁরা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েন ব্যাগ কুড়োনোয়। আলিয়া কিছুই বলতে পারেনা।

নীচু হয়ে শ্বাশুড়ির পা ছুঁয়ে সালাম করতে গেলে তাকে থামিয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরেন শ্বাশুড়ি, 'পা ছুঁতে হয় না মা, সালাম কর। আসসালামু আলাইকুম।'

আলিয়া থতমত খেয়ে হাত তুলে একে একে সবাইকে সালাম করতে শুরু করে। ইতোমধ্যে বেল্ট থেকে কুড়োনো সবক'টি ব্যাগ নিয়ে সগর্বে সবার কাছে ফিরে আসে

বাশার। কেশাবরণ পরা স্ত্রীকে কায়দামাফিক সম্ভাষণ করতে দেখে আরো প্রসন্ন হয়ে উঠে বাশারের মুখ।

বাশারের প্রসন্নতা লক্ষ্য করার অবকাশ হয় না অবশ্য আলিয়ার। তার মাথায় তখন একটিই ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। সাগর পেরিয়ে ভিনদেশে আসার সাথে সাথে বাঙালি ছেলেরা তাদের মাথার টুপি কি করে তুলে দিল মেয়েদের মাথায়? সেদিন রাতে বাশার তাকে গম্ভীর মুখে শিখিয়েছিল, 'এটা টুপি নয়, হিজাব। ছেলেদের টুপি পরা সুন্নত, আর মেয়েদের মাথা কাভার করা ফরজ। আর, শোনো, এগুলো নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করো না। বিপদে পড়ে যাবে।' বাশারের কথার ফরজ-নফল যাচাই করা হয়নি আর ছোটবেলা থেকে মা-খালাদের ঘোমটা দিতে দেখে আসা আলিয়ার। তবে এটুকু বুঝেছিল ব্যাপারটি গুরুতর।

৩

বাশার-আলিয়ার বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় অন্য অনেকের মতই জোহরা বেগম এসেছিলেন, সেজেগুজে, একটা উপহারের বাক্স নিয়ে। অতিথিদের প্রায় কাউকেই চেনে না আলিয়া। তবে আলিয়াকে দেখেই হাসিমুখে এগিয়ে আসছিলেন মহিলারা। সালাম আর ওয়ালাইকুম শেষে আলিয়াকে সবাই নিজের বিস্তৃত পরিচয় দিলেও ভারী কাতান শাড়ি, গা-ভর্তি গহনাগাটি, পার্লারে বিন্যস্ত করা চুল আর চুল ঢেকে রাখা নকশাদার হিজাব মাথায় ধরে রাখতে ব্যস্ত আলিয়া মনে রাখতে পারছিল না কিছুই। জোহরা বেগমকেও মনে থাকত না হয়ত না তার। যদি সেই ছোট্ট ঘটনাটা না ঘটত।

অন্যদের মত লম্বা সালাম না দিয়ে আলিয়ার মুখটা তুলে ধরে আলতো করে ওর চিবুকে চুম্বন করেছিলেন সেদিন জোহরা বেগম। একেবারে বন্ধুর ভঙ্গিতে আলিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'কি গো মেয়ে? কেমন যাচ্ছে?' এরপর আলিয়ার শ্বাশুড়িকে ডেকে নিয়ে সহাস্যে বলেছিলেন, 'একেবারে রাজকন্যার মত বউ পেয়েছেন ভাবী।'

'মাশাল্লা বলতে হয় ভাবী। বলেন, মাশাল্লা।' জোহরা বেগমের অভিনন্দনের উত্তরে উপদেশ বর্ষণ করেই অন্য অতিথিদের দিকে চলে যান আলিয়ার শ্বাশুড়ি।

হতভম্ব জোহরা বেগম দেখেন অন্য সব মহিলারা তাকিয়ে আছেন তার দিকে, কারো কারো মুখে মিটিমিটি হাসিও। দ্রুত নিজেকে সামলে নেন তিনি। সবাইকে শুনিয়ে বলেন, 'একদম, মাশাল্লা রাজকন্যা।' এরপরই আবারো আলিয়ার কাছ ঘেঁষে, যতটুকুতে কেবল সেই শুনতে পায় ঠিক ততটা নামানো স্বরে বলেছিলেন, 'কিংবা মাশল্লা রাজকন্যা।'

সেই রাতে বাশারকে এই কথা বলতে বলতে প্রাণ খুলে হেসেছিল আলিয়া। উত্তরে বাশার কেবল বলেছিল, 'জোহরা আন্টিদের কেউ পছন্দ করে না এখানে। ওনাদের সাথে বেশি কথা বলো না।'

৪

জোহরা আন্টিদের যে বাশারের বাড়ির লোকেরা অন্তত পছন্দ করেন না সেটি বুঝতে খুব একটা দেরি হয় না আলিয়ার। জোহরা আর জোহরার স্বামী দু'জনই প্রকৌশলী। দেশের পড়াশুনা শেষ করে বিদেশে পড়তে এসে পরিচয়, প্রেম এবং বিয়ে। বরাতজোরে দুজনের চাকুরিও হয়েছে একই শহরে। খুবই মিশুক দম্পতি, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মতই এ শহরে এসেও আয়োজন করেছে, করে যাচ্ছে নানান সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রবাস জীবনে ফেলে আসা দেশের পরিচয় তুলে ধরতে তাদের এই আপ্রাণ চেষ্টা এশহরের দেশিরা কতটুকু গ্রহণ করে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না জোহরা বেগম। সবার মুখেই একই ধরনের কথা। তাঁরা নিজেরা কতটা তারিফ করেন এ ধরনের গান-বাজনা, আর অন্যেরা, বিশেষ করে তারিফদারের অপছন্দের লোকেরা, কতটা সমালোচনামুখর এসবের ব্যাপারে।

একদিকে রয়েছে আট-দশ বছর বয়সী বাচ্চাদের বাবা-মায়েরা, যাদের একটাই দাবি – যে কোন ভাবেই হোক তাদের বাচ্চাদের মঞ্চে উঠতে হবে। জোহরা আর আনিস অবশ্য চায়ও যত বেশি সম্ভব বাচ্চাদের দিয়ে অনুষ্ঠান করাতে। এসব অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই তো পরবর্তী প্রজন্মের চেতনায় বাঙালি সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার, যাতে করে দু-চারশ বছর পরে আইরিশদের সেন্ট প্যাট্রিক্স্ ডে কিংবা হিস্পানিকদের সিংকো দে মায়োর মতই এদেশের সব শহরে বড় বড় বৈশাখী মেলা বসে বাংলা নববর্ষে। সমস্যা হয়ে যায় সেসব অভিভাবকদের নিয়ে যাদের আগ্রহ শেকড়ে নয়, শিখরে। এঁরা স্কুলে শেখা ইংরেজি ছড়া কিংবা ইউ টিউবে দেখা ব্রেক ডান্স যে কোন কিছু একটা দিয়ে ছেলেমেয়েদের স্টেজে তুলে দিতে পারলেই বর্তে যান, কষ্ট করে শেখাতে চান না আত্মজকে নিজ সংস্কৃতি।

অন্যদিকে আছে, বাশারের বাবা-মায়ের মত লোকেরা। এরা বহু বছর ধরে এশহরে বাস করার সুবাদেই কেবল বিশেষ মনোযোগ দাবি করেন যে কোন ধরনের সামাজিক জমায়েতে। এদের কিছুটা অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে অসুবিধেও ছিল না জোহরা-আনিসের। হাজার হোক এদের বাসায় গিয়েই তো প্রথম পরিচিত হয়েছেন শহরের অনেক লোকেদের সাথে। তবে সমস্যা হয়ে যায়, মঞ্চে উঠে এরা যখন নামতে চান না। নানান অপ্রাসঙ্গিক কথার ফাঁকে ফাঁকে বক্তা কতকাল ধরে এদেশে আছেন সেকথাটি বারবার বলে শুধু দর্শক শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতিই ঘটান না, অনুষ্ঠানেরও সৌন্দর্যহানি ঘটান।

৫

আলিয়ার বিয়ের বছরে জোহরা-আনিসের করা ঈদের অনুষ্ঠানে আলিয়া ও বাশারকে ফ্যাশন শো করতে ডাকলে প্রথমে কোন আপত্তি করেননি বাশারের বাবা-মা। আপত্তিটা আসে আলিয়াকে মঞ্চে দেখার পর। পর্দার অন্তরাল ছেড়ে দর্শকের সামনে যাওয়ার আগ মূহুর্তে জোহরা আস্তে করে আলিয়ার মাথার ঢাকনিটা তুলে নেয়। কিছুটা অবাক হলেও

বাধা দেয় না আলিয়া। দেয়ার সুযোগও পায়না খুব একটা। সাউন্ড সিস্টেমে ‘রমজানের ঐ রোজার শেষে’ বেজে উঠতেই আলিয়ার হাত ধরে স্টেজের দিকে টান দেয় বাশার। যেন গোটা কম্যুনিটিকে দেখাতে চায় তাঁর মাশাল্লা রাজকন্যা। কথা ছিল গানের দু'লাইন পর্যন্ত স্টেজে থাকবে আলিয়া-বাশার জুটি।

মঞ্চের সামনে বসা মায়ের মুখে দপ করে আলো নিভে যেতে দেখে থমকে যায় বাশার। মায়ের চোখজোড়া অনুসরণ করে দেখতে পায় আলিয়ার মাথার হিজাব উধাও। সাথে সাথে আলিয়ার হাত ধরে দ্রুত বেরিয়ে যায় মঞ্চ থেকে বাশার পরের জুটি প্রবেশ করার আগেই। ক’দিন পর বাশারের জীবনের মঞ্চ থেকেও বেরিয়ে আসতে হয়েছিল আলিয়াকে।

৬

‘থ্যাঙ্ক ইউ, আলিয়া,’ পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ শুনে অবাক হয় আলিয়া। সচরাসচর জোহরাই বুঝে নেয় জওশনকে।
‘জোহরার কাজে একটু ঝামেলা হয়েছে। ফিরতে দেরী হচ্ছে। একটু বসে যাও না, আলিয়া!’ আনিসের কণ্ঠে কী আহ্লাদ!
‘নাহ, আজ চলি আনিস ভাই। কাজে যেতে হবে একটু পর আমারও।’

৭

জীবন থেমে থাকেনি মাশাল্লা রাজকন্যার। জোহরা ভাবীর যত্ন, ছোট্ট জওশনের বায়না, আর হেসুস-আনিসদের মুগ্ধতায় ভালোই কেটে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ!

এল্ক গ্রোভ, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

মোহাম্মদ সাইফূল ইসলাম

তৃতীয় ভূবনে

১

প্রথম যেদিন তারা একে অপরের স্পর্শ অনুভব করেছিল উভয়ই একসাথে চমকে উঠেছিলো ভীষণ; ভয়ও পেয়েছিল অসম্ভব! এক অজানা অপার্থিব ভয়। দুজনেই ভেবেছিল, অদ্বিতীয় আমার এই রাজ্যে দ্বিতীয় কোন সে জন হানা দিয়েছে? তবে কি এতদিন ভুল জেনে এসেছি? দুইজনেই ঝাঁকুনি খেয়ে ঘরের দুই দিকে ছুটে গিয়েছিল। আচ্ছা, ওদের এই জায়গাটিকে কি ঘর বলা যায়? যেখানে ওরা এতদিন ধরে আছে সেটাকে মনে হয় ওদের আবাসন বলাই যায়; কিংবা জগত।অদ্ভুত এক অপার্থিব জগত।

প্রথম স্পর্শের পর কেটে গিয়েছে অনেকটুকু সময়।অতঃপর একজন একটু সাহস সঞ্চয় করে অপরজনের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। ঐদিকে অপরজন আবার বসে আছে নিশ্চুপ, কেমন যেন গুটিশুটি মেরে, মনে হয় সে একটু ভীতু টাইপের।অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আলতো করে অপরজনের হাত ধরে, এতক্ষণে সেও কিছুটা ধাতস্হ হয়ে উঠেছে।আস্তে আস্তে দুইজনের সব ভয় কোথায় উবে যায়, ভয়ের জায়গার গ্রাস করে তীব্র এক ভালোবাসা, একদম শতভাগ স্বর্গীয় ভালোবাসা।

২

ভাবের আদান প্রদান করতে প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট হয় তাদের।তাদের জগতে যে ভাষার কোনও অস্তিত্ব নেই! প্রথমদিকে শুধু একজন আরেকজনের হাত ধরে বসে থাকত। ইতোমধ্যে নতুন একটা ভাষা তারা আয়ত্ব করে নিয়েছে, হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে বিভিন্ন বিন্যাসের স্পর্শ এই ভাষার স্বরলিপি।তারা এর নাম দিয়েছে, ‘ছোঁয়া ভাষা।’

প্রথমজন আলতো করে ছুঁয়ে দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করে, ‘কে তুমি?’

‘আমি তো জানি না আমি কে।তুমি কি জান তুমি কে?’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে অপরজন।অতঃপর আঙ্গুলের ছোঁয়ায় উত্তর দেয়, ‘না, আমিও জানি না আমি কে।’

দ্বিতীয়জন একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, আমাদেরকে কি কেউ এখানে আটকে রেখেছে? আমরা কি কোনদিন এইখান থেকে মুক্তি পাব না?'

প্রথমজন বলে, 'আমরা কে, এখন কোথায় আছি, এখান থেকে কোথায় যাব, আমি কিচ্ছু জানি না!'

সে এবার হাত ছেড়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে দেয়ালটার কাছে এগিয়ে যায়। দেয়ালটাতে হাত দিয়ে ধাক্কা মারে, পা দিয়ে লাথি মারে, কিন্তু দেয়ালটা দাঁড়িয়ে থাকে অবিচল।

তারা আবার ভাবতে বসে যায়, কি আছে দেয়ালটার ঐ পাশে? আপাতত চিন্তা করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই তাদের।কিন্তু শত ভেবেও কোন কূল কিনারা করতে পারে না, ভাবতে ভাবতেই ওরা আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়।ওরা কি জানে যে, দেয়ালটার ঐপাশে হাজার রকমের শব্দ, হৈচৈ, কথাবার্তা হচ্ছে প্রতিনিয়ত? জানতে পারার কথা না, ওরা তো শুনতে পায় না।জানতে পারবে না তাদেরকে কেন্দ্র করে তোলপাড় ঘটে চলছে আরেকটি জগতে।

৩

হঠাৎ একদিন, একজন অপরজনকে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে উঠায়। সে একটু আড়মোড়া ভেঙ্গে ছোঁয়াভাষায় বলে, 'কি হয়েছে? ঘুম ভাঙ্গালে কেন?'

প্রথম জন বলে, 'আমার মাথার দুইপাশে একটু স্ফিত যে দুইটা জিনিষ আছে সেখানে কিছুক্ষণ পর পর কেমন যেন একটু কেঁপে কেঁপে উঠছে, কেমন অদ্ভুত একটা হালকা ঝিমুনির মতো অনুভুতি। আমার না খুব ভয় করছে!'

অপরজন কিছুক্ষণ তার মাথা ঝাকালো; ডানে, বায়ে ও উপরে নিচে। কিন্তু কোন কিছু অনুভব করতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চুপ হয়ে যায়। আরে, তাই তো! সেও তো অনুভব করছে। চরম অস্বস্তিকর এক অনুভূতি। এবার সবেগে মাথা ঝাঁ কাতে থাকে দ্বিতীয় জন, যদি প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ এই অনুভূতি থেকে মুক্তি পেতে পারে। নাহ্! সেই একই অনুভুতি!

এই নতুন অনুভুতির সাথে খাপ খেতে তাদের অনেক সময় লাগে। বেশ কিছুদিন পরে তারা আবিস্কার করে একটা নির্দিষ্ট বিরতিতে ঘরের ছাদের উপরের অংশটা কেঁপে কেঁপে উঠে আর সেই সাথে তাদের কানেও একটা ধাক্কার মতো লাগে। দ্বিতীয়জন কিছু একটা আন্দাজ করে, অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে দেয়ালের কাছে যায়। এতদিনে তারা এই নিকষ কালো অন্ধকারে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। না মানিয়ে তো উপায়ও নেই, তারা যে অন্ধ।

সে দেয়ালে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করে এবং কিছু অপরিচিত শব্দও তার কানে আসে। সে হঠাৎ করে চিৎকার করে উঠে। তার চিৎকারে অপরজন ভয় পেয়ে যায়, সে নিজেও বেশ অবাক হয়! তার গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে! সেই শব্দ আবার সে শুনতেও পাচ্ছে!

পরবর্তী বেশ কিছু দিন তাদের কেটে যায় নতুন ভাষায় অভ্যস্ত হতে। তারা এখন না ছুঁয়েও মুখ দিয়ে নানান শব্দ করে একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করতে পারে।

৪

কেটে যায় আরও কিছু সময়। কত সময়? এক মহাকাল? ঘুম থেকে জেগে চোখ খুলতেই প্রথম জন একটা ধাক্কার মতো খায়! দ্রুত চোখ বন্ধ করে ফেলে সে। একটু পর আবার পিটপিট করে খুলে অবাক হয়ে চারদিকে নজর বুলায়। দেখতে পায় চারদিক থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে গাঢ় অন্ধকারের অস্তিত্ব। এ এক অনন্য অনুভূতি! প্রথম বারের মত সে দেয়ালটা দূর থেকে দেখে, না ছুঁয়ে। আস্তে আস্তে ঘরের চারদিকে দেখতে থাকে আর ভাবে – কই, যতবড় ভেবেছিলাম এত বড়তো মনে হচ্ছে না এই ঘরটা!

এইবার অপরজনের দিকে দৃষ্টি যেতেই সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে তার। চমকে উঠে ভাবে, 'আরে ওতো অবিকল আমার মত! এইযে আমার মত হাত, আমার মত পা, মাথা, সব কিছুই তো আমার মত! তাহলে কি আমিই সে কিংবা সেই কি আমি? দুইজন কি দুটি আলাদা সত্তা নাকি একক কোনও কিছু?

এইসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সে তাকে ঘুম থেকে উঠায়। অপর জনেরও একই অনুভূতি, অবিকল তার মতো।

আবার তারা ভাবতে বসে, কোথায় বন্দি আমরা? কোথা থেকে এসেছি আমরা? এটাই কি আমাদের জীবন? আমরা কি কখনও দেয়ালের ঐ পাশে যেতে পারব না? এইটাই কি আমাদের একমাত্র ভুবন?

দেয়ালের অপর পার্শ্বে চলে যাওয়ার তীব্র এক আকর্ষণ জাগ্রত হয়ে দুজনের মনে। যে কোনও মূল্যে চলে যেতে হবে অদ্ভুত এই দেয়াল টপকে কিংবা ভেদ করে।

৫

আরও সময় গড়িয়ে যায়; যেতেই থাকে, যেতেই থাকে। হঠাৎ একদিন, প্রথম জনের চিৎকারে চমকে উঠে দ্বিতীয় জন। প্রথম জন চিৎকার করে বলছে, 'আমাকে কে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে! আমাকে বাঁচাও, প্রচণ্ড ভয় হচ্ছে, আমি তলিয়ে যাচ্ছি! বাঁচাও আমাকে।'

দ্বিতীয় জন আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাকে টেনে তুলে রাখতে, কিন্তু পারছে না! হাত ধরে রেখেছে, কিন্তু কুলাতে পারছে না। মনে হচ্ছে অশুভ কোনও শক্তি অন্ধকার কোনও গহবরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার অপর সত্তাকে। ধীরে ধীরে প্রথম জনের সম্পূর্ণ শরীর কোথায় যেন হারিয়ে যায়!

দ্বিতীয় জনের ভীষণ কষ্ট হতে থাকে, তীব্র একটা কষ্টের অনুভূতি; তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। তার কেবল মনে হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে ব্যর্থ একজন সে; যে তার একমাত্র সঙ্গীকে ধরে রাখতে পারেনি। রক্ষা করতে পারেনি তার দ্বিতীয় সত্তাকে।

ভাবতে থাকে, 'প্রথমজনের কি মৃত্যু হয়েছে?' চিৎকার করে উঠে সে। আকড়ে ধরে দেয়াল, এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকে হাত দিয়ে পা দিয়ে। এই কোন জগতে আমাদের বাস? এখানে মৃত্যু হলে কী পুনর্জন্ম লাভ করব ভিন্ন জগতে? মনে মনে আউড়াতে থাকে, 'ওহ! ঈশ্বর আমার অপর সত্তাকে রক্ষা কর। আমাকে রক্ষা কর।'

'আচ্ছা, সে কি এখন অন্য জগতে আছে? এই ভুবনের মৃত্যুর স্বরূপ কি এই যে, একদিন অন্ধকার গহ্বরে হারিয়ে যাবে এই জগতের সকল কিছুকে পেছনে ফেলে?'

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে অনুভব করে কি যেন তাকেও নীচের দিকে টানছে। ভয়ে স্থির হয়ে যায় সে।

ত্রিপলি, লিবিয়া

মৌ মধুবন্তী

ইউটার্ন হলো ফেরা হলো না

পুর্ণিমা উড়ছে পৃথিবীর বাইরে অনেক দূরে মঙ্গল গ্রহের দিকে ধাবিত রকেটে করে। জোছনার জলে আর ভিজবে না এই পৃথিবীর কোন বিছানা। এক পোটলা টোস্ট বিস্কুট তার হাতব্যাগে অপেক্ষমান।

সব গল্পের পেছনে আরেকটি গল্প থেকেই যায়। ভোরের আলো ফুটলেই তাকে জল আনতে কলসি কাঁখে বেরুতে হতো, এক হাতে চোখ কচলাতো ,আরেক হাতে কলসি কোমরে চেপে ধরত। আধ ময়লা শাড়ির আঁচল লুটাত মাটিতে। একটু আগে আগে বেরুত, সারা রাত পেটে চেপে রাখা ক্ষুধার কুমীর নড়াচড়া শুরু করে। শরীর বলে কথা। কত আর না খেয়ে থাকা যায়? ঘরে অন্যেরা খাবার পায়,কেউ দুই বেলা, কেউবা তিনবেলা। ওর ভাগে আধপেটা দিনে একবেলা। তার অপরাধ সে মেয়ে হয়ে জন্মেছে। গায়ে তার কৃষ্ণপক্ষ বাসা বেঁধেছে। হাতের গড়ন নিটোল বড়। পায়ের পাতা যেন তার নাচ ময়ুরী। নখে যদি নেইল পলিশ দিতে পারত, মাথা ঘুরে যেত যে কোন নাচ গুরুর। হাস্যকর কথা। সেই গ্রামে কেউ কোনদিন নাচ করেছে কিনা তার হদিস কেউ জানে না। আবার গুরু। এটা যেন লেখকের অতিবিলাসী স্বপ্ন। শাড়ির নীচে নেই যার পেটিকোট, আঁচলের নীচে নেই ছেঁড়াখোঁড়া কোন ব্লাউজ তার নখে নেইল পলিশ। স্বপ্নের ঘোড়ারোগ হয়েছে। আবোল তাবোল। গায়ের রঙের অহংকার নিয়ে বাসন্তী হতে পারত মিশেল ওবামা কিংবা মেগান মার্কেলের মত অন্য একজন খ্যাতিমান এ্যাক্টিভিস্ট।

আরে এসব কি ভাবছেন লেখকজী? না, লেখক ভাবছিলেন যদি হতো – এই আর কি। যদির কি কোন গদি আছে? গদি থাকলে ক্ষমতা থাকত। ক্ষমতা থাকলে বাসন্তীর গায়ে পুর্ণিমার চাঁদ বসত। আরে কী সব বলছি, জল আনতে দেরি হলে আর রক্ষে নেই। লম্বা উপোস দিতে হবে।

কলসি পুকুর ঘাটে কেওড়া গাছের আড়ালে লুকিয়ে কৃষ্ণপক্ষ গতর নিয়ে বাসন্তী হনহন করে পুকুরের পূব পার ধরে গাছের ভেতর দিয়ে দিয়ে খোলা মাঠে নেমে আসে। এই পুকুরের চার পারের নাম চারটা। এই পারের নাম মান্দার পার। অনেক মান্দার গাছ আছে এই পারে। পশ্চিম পারের নাম নারকোল পার। দক্ষিণ পারের নাম ক্ষেতি

পার আর উত্তর পারের নাম বাড়ি পার বা ঘাট পার। পুকুরের এই পারেই শুধু পাকা ঘাট আছে।

মাঠ পেরুলেই তার সইয়ের বাড়ি। সেখানেও আরেকটা পুকুর। বিশাল পুকুর। বেশি দিনের পুরনো পুকুর নয়। সাবধানে চলতে হয়। প্রায়ই পুকুরের পার ভাঙে। এই পুকুরের কোন পারের এখনো নাম পড়েনি। নতুন কিছু গাছ লাগিয়েছে ঠিকই কিন্তু বড় হয় নাই কোন গাছ। তার উত্তর পার পার হলেই বিশাল টিনের ঘরের পেছন অংশ। এই গ্রামে এমন বাহারি ও বিশালাকৃতি ঘর আর কারো নাই। সেই ঘরে আছে ছাব্বিশটা জানালা। প্রতিটি জানালায় গ্রীল লাগানো, শহরের মতো মোটা কাপড়ের গোলাপি রঙের পর্দা ঝুলানো আর জানালায় ঢালাই টিনের পাল্লা। পাল্লায় উপরে নীচে ছিটকিনি । বেশ আধুনিক। এই ঘরের ছাদ হলো তিন ধাপে। সামনের ধাপের নাম 'এল'- বারান্দার চালা। মাঝের মেইন ঘরের চালের নাম উড়া চাল। তার পরে ঢালু হয়ে ঝুলে থাকা পেছনের চালের নাম আম পাড়া চাল। বিরাট আম বাগানের বেশির ভাগ অংশ কেটে সাফ করে এই ঘর তোলা হয়েছে। তাই এই চালের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে নানা স্বাদের আমের গাছ। আম গাছের ফাঁক দিয়ে বাসন্তী উঁকি মারে জানালায়।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই পূর্ণিমা জানালা খুলে বিছানার উপরে একটা বাটিতে কয়টা টোস্ট বিস্কুট রেখে দেয়। আয়েসী মেজাজ তার। সকালে উঠতে মন চায় না। তার তো মর্নিং স্কুল নাই। দিনের স্কুলে যায় সকাল নয়টায়। ধীরে ধীরে উঠলেও কোন চিন্তা নাই। রাতেই মা তার জন্য টোস্ট বিস্কুট আর জেলি রেখে যায় পড়ার টেবিলে। তার এক অংশ ভাগ হয়ে অপেক্ষা করে বিছানার উপরে। বসন্তের রং যেখানে নয়ন জ্বালা করানো, সেখানে কৃষ্ণগতরের নাম কিনা বাসন্তী। নামের মতই তার মন। হাজার বকাতেও তার মন কালো হয় না। ভেতরের সেই আলো, সেই উজ্জ্বল বর্ণ কেউ দেখে না। যে দেখেছে সে এই বন্ধুটি। কখনো কখনো দু' চার মিনিট গল্প আলাপ হয়। আবার কখনো ঘুমের ভাণে পড়ে থাকা মানুষটির চিবুক ছুঁয়ে দিয়ে বিস্কুট নিয়ে দৌড়ে পালায় বাসন্তী । খেতে খেতে মাঠ পেরিয়ে কলসিতে জল নিয়ে বাড়ি ফিরে যায় সময়মতো। বাড়ি পৌঁছার আগেই কুলি করে দাঁত ও জিহবা পরিষ্কার করে আর আঁচলে দিয়ে মুখ মুছে নেয় ভালো করে। কেউ যেন টের না পায়।

কোন পুর্ব ঘোষণা ছাড়াই এই গল্পের এই দৃশ্যের যবনিকাপাত হয়। গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ। ম্যাট্রিকে পাঁচ সাবজেক্টে লেটার মার্ক নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে খবর পেয়েই মা তার ছেলেমেয়েদেরকে পোটলা বেঁধে রিকশায় চেপে বসে। বাসন্তীর সাথে বিদায় নেবার দরকার হয়নি। নানুর বাড়ি যাচ্ছে দুদিন পর তো ফিরেই আসবে। তাই একটা ছোট পোটলায় কিছু বিস্কুট বেঁধে জানালায় ঝুলিয়ে রেখে ম্যাট্রিক পাস ছাত্রী চলে যায় মায়ের সাথে নানুর বাড়ী।

নানুর বাড়িতে সেকি খাতির যত্ন। হুল্লোড়। ছোট খালা এক জোড়া কানের দুল কিনে দি তার তিল তিল করে জমানো টাকা দিয়ে। একমাত্র মামা সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেল। নানা চরে খবর পাঠালো দই নিয়ে আসতে। বড় খালা যত্ন করে নারিকেল পোলাও

করল। নানু নিজের হাতে মুরগির ঝোল রান্না করল, পুকুর থেকে তোলা কাতলা মাছের কালিয়া করল।

মামী রাগে গরগর করছিলো নিজের ঘরে। এতো আদিখ্যেতার কি আছে। মোটে ম্যাট্রিক পাস করেছে। কে আর পাত্তা দেয় মামীকে। সব খালাতো ভাইবোন মিলে গোয়াল ঘরের ছাদে পা লম্বা করে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকে প্রশ্ন করছে, সে এবার কোন কলেজে পড়বে? আগামীতে সে কি হবে? তাদেরকে মনে রাখবে কি? সব প্রশ্নের উত্তর দিলেও মনের মাঝে উঁকি দিচ্ছিল সেই দুটি চোখ যা জানালায় সেঁটে থাকতো। বিস্কুট নিত বলে কি বাসন্তী তাকে কিছুই দিত না? আঁচলে লুকিয়ে সে বরইয়ের দিনে বরই, পেয়ারার দিনে পেয়ারা, মালা গাঁথার জন্য গাছের গাঁদাফুল, বর্ষার কদম ফুল, কত কী এনে দিত। অথচ তার ভালো রেজাল্টের খবরটাও বাসন্তীকে দেয়ার সুযোগ পায়নি সে। মা এমন খুশী ছিল যে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারে নি। মাকে কত করে বলেছিল একবার বাসন্তীর সাথে দেখা করে আসি? মা বলেছিলো, দু'দিনের জন্য যাচ্ছি। ফিরে এসে দেখা করো। মিষ্টি নিয়ে আসব। সবাইকে মিষ্টি দিয়ে খবর জানাইও। মা নাকি মিষ্টিসহ গ্রামের সবাইকে পাসের খবর জানিয়েছিল। কিন্তু গ্রামের মানুষ সেই বিদ্যাধর মেয়েটিকে আর কোনদিন দেখেনি। এই মেয়ের দাদাকে দশদিন চৌকির উপর টেবিল,টেবিলের উপর চেয়ার দিয়ে বসিয়ে রেখেছিল, গ্রামের সবাই যেন দেখে, ইউনুস নামক ছেলেটি এন্ট্রান্সে অনার্স নিয়ে পাস দিয়েছে। আর নাতনিকে কেউ এক নজর দেখতেও পারেনি। এমন কি স্কুলের শিক্ষকেরাও নয়।

মা বলেছিলেন, এখন যদি রওয়ানা না হই, নানুর বাড়ি পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে। একলা মহিলা চারটা বাচ্চা নিয়ে রাতে একা যাওয়া একদম নিরাপদ নয়। অগত্যা মেনেই নিতে হলো।

তাকে আনমনা দেখে সব খালাতো-মামাতো জিজ্ঞেস করে, কীরে, তোর কি খুব দেমাগ হচ্ছে? এতো কী ভাবছিস?

এবার ঝর ঝর করে কেঁদে বলেই দিল যে তার জানালা বন্ধু বাসনন্তীকে সে বলে আসেনি। সবাই বলল, ওমা! দুইদিন মাত্র। কিছু ভাবিস না, ফিরে গেলেই তো দেখা হবে। তাইতো মাঝে একদিন মাত্র। ফিরে গেলেই দেখা হবে। কিছু কিছু যাওয়ার আর ফেরা হয় না। সেই থেকে আর কোন দিন সে গ্রামে ফিরে যাওয়া হয়নি তার।

রাতে পুর্ণিমার বাবা এলো ঢাকা থেকে। সবাই মিলে আসর বসাল। টেপ রেকর্ডারে গান শুনছে সবাই। সবার আলোচনার বিষয় হলো, মেয়ে ম্যাট্রিক পাস করেছে এখন সে কোথায় ভর্তি হবে। ছোট খালার আবদার, সে আমাদের বাজারে যে কলেজ আছে তাতে ভর্তি হোক। আমি তার যত্ন করবো। ছোট খালা তার থেকে মাত্র দুই বছরের বড়। তারা দুজন ভীষণ বন্ধু। নানা আর নানুর প্রস্তাব হলো, মেয়েকে এবার বিয়ে দিয়ে দাও। এই কথা শুনেই পুর্ণিমার মা-বাবার বুক ছ্যাত করে ওঠে। কী বলে আমার এই এতটুকু মেয়ে। শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে তর্ক করার মত জামাই সে নয়। টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে,

সবাই উঠে গেল রাতের খাবার খেতে। রাত তখন এগারটা। গ্রামের মানুষ এমন রাতেই খাবার খায়।

আজকাল পুর্ণিমা সেকথা ভাবতেই পারে না। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় রাতে সাপার খাওয়া শেষ। ফিগার সচেতন।। স্বাস্থ্য সচেতন আমেরিকান সে। পরেরদিন বিকালের ট্রেনে বাবা তার ম্যাট্রিক পাস মেয়েকে নিয়ে সোজা ঢাকায়। মেয়ের কলেজ ভর্তির অনেক ব্যাপার আছে। সব তিনি একাই সামাল দিবেন। পুর্ণিমার বুকের ভেতর কান্নার ঢেউ একটার পর একটা ভাঙতেই থাকে। কিন্তু বাবাকে সে বলতে পারে না।

রিকশায় করে আসার আগে যাকে সে ফেলে এসেছে, সেই বাসন্তী বিস্কুটের পোটলা হাতে, কেমনে পারলা আমারে না জানাইয়া চইলা যাইতে –বলে চিৎকার করে কাঁদলে, বাড়ির অনেকেই জানতে পারে তাদের এই বন্ধুত্বের গোপন কথা। দুজনেই মেয়ে বলে কেউ কিছু মনে করে নাই। তবে ছোট দাদা, গরগর করছিল, হিন্দুর সাথে মুসলমানের এতো কি খাতির? মজুমদার বাড়ির জানালা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেলো। বাসন্তী বাতাসে এ ঘরের জানালা আর ঝটিকা গতিতে খুলে যেতো না।

পুর্ণিমা ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তি হয়ে হলে উঠে গেল। শুরু হলো তার নতুন জীবন। স্বপ্নের চাদরে মোড়া জীবনে এখন তার অন্যতম লক্ষ্য ভালো রেজাল্ট করে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। ভর্তি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রেজাল্ট এবারো ফাস্ট ক্লাস। তার ভর্তি ঠেকায় কে? সাঁই সাঁই উঠে যাচ্ছে পুর্ণিমা উপরের দিকে। এস্কেলটর ছাড়াই পুর্ণিমা উঠে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেলো আরো একটি ফাস্ট ক্লাস।

তারপর প্লেনে চড়ে ঐ আকাশ পাড়ি দিয়ে এক্কেবারে বিদেশে, আমেরিকায় আরো বেশী পড়ার জন্য। কিন্তু পুর্ণিমার পেছন ফিরে যাওয়া হয় না। রিকশা থেকে ট্রেনে, ট্রেন থেকে প্লেনে চড়ে সেই যে পুর্নিমা আমেরিকায় এলো তিরিশ বছরেও আর তার দেশে ফেরা হলো না। দেখা হয় নাই সেই জানালার ওপারে বাসনতীকে, দেখা হয় নাই আর কোন খালাতো-মামাতো ভাইবোন, ছোট খালা বা নানুর সাথে, দেখা হয় নাই মা-বাবা, ভাইবোন কারো সাথে। এবার পুর্ণিমা কোথায় যাবে? পুর্ণিমা স্বপ্ন দেখে রকেটে চড়ে মঙ্গল গ্রহে যাবে। মঙ্গল গ্রহে লোক নিচ্ছে। সে গ্রহে সেও আদম হাওয়া হবে। কিন্তু আদমটা কে হবে সে জানে না। গেলে হয়ত কাউকে পেয়ে যাবে।

পুর্ণিমার জীবন শুধু সম্মুখে ছুটে চলার। পেছন ফিরে দেখার জন্য পুর্ণিমার এই পৃথিবীতে আগমন ঘটে নাই। পুর্ণিমার সাথে আর কোনদিন দেখা হয় নাই তার মা বাবা ভাইবোনের। 'তুই ফেলে এসেছিস কারে মন মনরে আমার'- এই গান শুনতে গেলেই পুর্ণিমা চোখের জলে নদী করে নিজেই সে নদীতে সাঁতার কেটেছে। পুর্ণিমা ফেলতে পারেনি রবি থাকুরের গান কবিতা। একসময় ইংরেজির সকল অধিকারকে সে পাশে রেখে বাংলা চর্চায় মেতে ওঠে। লেখে সে হাজারো বাংলা কবিতা, গল্প, উপন্যাস। তার সকল লেখায় কোন না কোনভাবে বাসন্তী এসে বসে থাকত আর মুচকি মুচকি হাসত। বাসন্তী তাকে বলত, শ্বশুরবাড়ির লোকের অত্যাচারে বিষ খেতে খেতে তোমার কথাই ভেবেছি। মরে গেলে তোমার কাছে যাওয়া সহজ হবে। পুর্ণিমা গান লিখেছে, 'শোন এক

বিকেলের কাহিনী, বাসন্তীটা মরে গেছে তবু দেখা হয়নি। সে গান সুর করেছিল পুর্ণিমা নিজে আর গানটি গেয়েছিল অশোক বাবু। দরাজ গলায় কণ্ঠস্বরে গভীর বিষাদ ভরিয়ে এই গান গেয়ে তিনি হলভর্তি দর্শককে কাঁদিয়েছেন। পুর্ণিমার কান্না কেউ দেখেনি।

পুর্ণিমার সরলরৈখিক জীবনে কোন ইউটার্ণ নেই। এটা সে যেদিন বুঝতে পারলো, সেদিন সে সারাদিন গাড়ি চালিয়েছে, বারে বারে ইউটার্ণ নিয়েছে আর ভেবেছে, এতো ছোট ইউটার্ণ নিয়ে কী সে তার ফেলে আসা শৈশবে, কৈশোরে ফিরে যেতে পারবে? এতো কিছু পারল, কিন্তু কী অমোঘ নিয়মে সে তার মেয়েবেলায় ফিরতে পারেনি? মা বাবা চোখে যে স্বপ্ন গুঁজে দিয়েছে ছোটবেলায়, 'তোমাকে অনেক বড় হতে হবে। অনেক বড়।' সে অনেক বড় হয়েছে। কিন্তু মা বাবা বলেনি, বড় হয়ে ফিরে এসো আমাদের কোলে। আর বলেনি বলেই তার আর ফেরা হয় নি। মা বাবা কেন ইউটার্ণ শেখায়নি? এই কষ্ট পুর্ণিমাকে সাপের মত পেঁচিয়ে ধরে। পুর্ণিমা ডানহিলের সাদা ধবধবে লেপ গায়ে দিয়ে হাঁটু ভাঙা 'দ'য়ের মত শুয়ে পড়ে।

পুর্ণিমা লিখল এক দীর্ঘ চিঠি। এক চিঠিতে সে সবাইকে জানিয়েছে তার রকেট চড়ে মঙ্গল গ্রহে যাবার কথা। এটা এতো দূরে যে ভাবলেও সে আর ফিরতে পারবে না। সবাই যেন এই পৃথিবীতে নিটোল ভালো থাকে। সে গ্রহে তার সাথে দেখা হবে বাসন্তীর, মা-বাবা,ভাইবোনের সাথে।

টরোন্টো, কানাডা

রশ্মি ভৌমিক

কর্কট

দীপু উল্টো হয়ে বসে, থুতনিটা চেয়ারের কাঠের তক্তার উপর আলতো করে ঠেকিয়ে আকাশকুসুম চিন্তা করছিল। অনলাইনএ নতুন বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে। মেয়েটার নাম রোজি।

শোবার ঘরে হঠাৎ কাশির আওয়াজ শুনে দীপু হুড়মুড়িয়ে চেয়ার থেকে পরে যাচ্ছিল। ডানহাতটা বাড়িয়ে মেঝেতে ভর দিয়ে নিজেকে সামাল দিল। সুখের বক্ররেখা নিম্নগামী।

এক দৌড়ে বিছানার পাশে এসে দেখে, বাটিকের চাদরে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। আম্মি যে রুমাল দিয়ে মুখটা চেপে আছে সেটাও গাঢ় লাল রঙে ভেজা। তার আম্মির ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। দুজনের চোখাচোখি হলো। অসহায় অশ্রুবিন্দুগুলি চোখের কোনায় আটকে আছে। বয়ে যাওয়ার আজাদী পায়নি। আম্মি দীপুকে খুব ভালোবাসে আর দীপুর কাছে জান্নাত ওর আম্মি।

গত চারবছর যাবৎ একটা সামান্য কেরানির চাকরি করছে দীপু। মাসের খরচায় বেতন ফুরিয়ে যায়। সঞ্চয় বলতে প্রায়ই কিছুই তার নেই। শখ করে একটা মোবাইল ফোন কিনেছে গত মাসে। তার গানের গলা বেশ ভালো। আম্মির কাছেই রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নজরুলগীতি শিখেছে। ফোনের ষ্টারমেকার এ্যাপ-এ সে রোজই একটা গান পোস্ট করে। অনেকগুলো লাইক আর কমেন্ট পায়। তার অনুগামীর সংখ্যাও প্রায়ই নয়শো। প্রত্যেকদিন বিকেলে এক ঘন্টা সে স্টারমাকেরের জগতে হারিয়ে যায়। পার্টি রুমে গিয়ে গান করে, অন্যদের গান শোনে। বেশ কয়েকজন ভালো বন্ধু হয়ে গেছে। রোজি তার মধ্যে একজন।

রোজি থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ওর দুটো ছেলেমেয়ে ৪ আর ৭ বছর। ছয়মাস আগে ওর বিয়ে ভেঙে গেছে। চাকরি করে আর ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করে ওর হাতে বলতে গেলে কোনো সময়ই থাকেনা দিনের বেলায়। রাতের বেলায় সে বড় একাকী বোধ করে। ক্লান্ত শরীর বিছানাতে এলিয়ে দিলেও কিন্তু তার মন চঞ্চল। ঘুম আসতেই চায় না। ঘুমানোর আগে স্টারমেকারে একটা দুটো গান করে আর শুনে মনটা হালকা হয়ে যায়। গানের গলা ওর মোটামুটি। তবে

গান শুনতে ওর খুব ভালো লাগে। বিশেষ করে দীপুর গান প্রতি রাতে শোনাটা ওর একরকম নেশার পর্যায়ে চলে গেছে।

দীপু যে গান পোস্ট করতো সেই গানগুলি অর্থবহ ও মর্মস্পর্শী। সুরের উপর দীপুর বেশ ভালো দক্ষতা। প্রত্যেকটি কথা সযত্নে উচ্চারণ করায় অর্থ ও ভাব দুটোই সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত, গানের প্রতিটি পংক্তিতে। রোজির একাকী মনে ছোটবড় সুখানুভূতির ঢেউ খেলে যেতো।

'মম জীবন যৌবন
মম অখিল ভুবন
তুমি ভরিবে গৌরবে
নিশীথিনী-সম
তুমি রবে নীরবে
নিবিড়, নিভৃত, পূর্ণিমা নিশীথিনী-সম
তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম...'

আজকের গানটা শুনতে শুনতে তার বড় বড় চোখদুটো সজল হয়ে উঠল। জামার হাতায় চোখ মুছে সে বালিশটাকে খানিকক্ষণ জড়িয়ে থাকল।

শোবার ঘরে বেশি আসবাবপত্র নেই। অধিকাংশটাই বড় বিছানা দখল করে নিয়েছে। কোনায় প্রসাধনী বস্তু রাখার জন্য একটা ছোট কাঠের টেবিল ও পাশে একটা চেয়ার । তার ঠিক ওপরেই, দেয়ালে লাগানো আছে একটা গোল আয়না। দশ মিনিট আগে টেবিলের সামনে বসে, রোজি তার লম্বা চুল আচড়াতে আচড়াতে, তার সুশ্রী মুখখানির প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই হেসে উঠেছিল। কে বলবে ওর পঁয়তিরিশ বছর বয়স?

ছিপছিপে আকর্ষণীয় গড়ন। কলেজে পড়তে পড়তেই বিবাহের প্রস্তাব এসেছিল। বিদেশে চাকরি করা পাত্র পেয়ে তার মা বাবা খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলেন। এই বিছানাতেই তাদের প্রথম সহবাস। শুয়ে শুয়ে রোজির সেই যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিগুলো মনে পড়ছিল। হাসিখুশি, সংবেদনশীল প্রকৃতির মেয়েটি চেয়েছিল ভালোবাসা। প্রতিদানে পেয়েছিল সমবেদনাহীন, পাশবিক যৌনসহবাস। নিজেকে আর্থিকভাবে স্বয়ংভর করাই যথেষ্ট হলো না। মন শক্ত করে তাকে রুখে দাঁড়াতে হয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আজ সে বড় একা। একাই, জীবনের নানান বাধা-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে, প্রতিদিন। তবু, এগিয়ে চলার একটা দুর্নিবার আশা প্রতিক্ষণে যেন তার মধ্যে প্রাণ ও সজীবতা ঢেলে দিচ্ছে।

বাচ্চা মেয়ের অজস্র খেলনার থেকে মাঝারি আকারের একটা টেডি ভাল্লুক সে নিজের ঘর নিয়ে এসেছিল। রাতের অন্ধকারে সেই টেডিকে দুহাত দিয়ে জাপ্টে ধরে কারুর সাহচর্য পাওয়ার বাসনা তাকে আবেগপ্রবণ করে। সম্প্রতি সেই টেডির নামকরণ করেছে দীপু।

সন্ধ্যেবেলা দীপু আম্মিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছে। ডাক্তার বলেছেন শিগগিরি একটা অপারেশন করলে আম্মির বাঁচার সুযোগ থাকবে।নাহলে রোগটা দ্রুত ছাড়িয়ে যাবে। নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব। কর্কট রোগের চিকিৎসায় অনেক খরচ। আব্বা দীপু ছোট থাকতেই হৃদরোগে মারা গেছিলেন। আপার বিয়ে হয়ে দিল্লিতে থাকে। মাঝে মাঝে আর্থিক সাহায্য করে, ওর স্বামীর সম্মতি পেলে।

অপারেশনের জন্য দু' লক্ষ টাকা জমা দিতে হবে। চিন্তায় দীপু খুব অসহায় বোধ করছিল। আপা পঞ্চাশ হাজার টাকা দু-তিন দিনের মধ্যে পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছে। দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাবলু আর পল্টু ওকে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিতে রাজি হয়েছে।

আজকাল স্টারমেকার পরিবারে যোগদান করা যায়। সেখানে থাকে দৈনন্দিন কাজ যা প্রত্যেক পরিবারের সদস্যকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। দীপু রোজ নতুন নতুন গান পোস্ট করত। গত তিনদিন ধরে গান করার কথা ভাবতেও পারেনি দীপু। আজ ভাবল স্টারমেকারে গিয়ে ফ্যামিলি ক্যাপ্টেন কে জানিয়ে দেয়া দরকার যে সে আম্মির অপারেশন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। মেসেজ-এ গিয়ে দেখে, সর্বনাশ! রোজির এতগুলো মেসেজ।

'কেমন আছো তুমি?'

'সব ঠিক আছে?'

'গান পোস্ট করছো না দেখছি।'

'আমার মেসেজের উত্তর দিচ্ছ না যে? রাগ করলে নাকি?'

'কি হল?'

'কি হল তোমার, একবার বল কিছু।'

দীপু দীর্ঘশাস ফেলে, 'রোজি ম্যাডাম, কেমন আছেন? আম্মির অপারেশন-এর জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম।'

দু মিনিটের মধ্যেই উত্তর এলো। 'শুনে খুব দুঃখিত। কি হয়েছে?'

দীপু লিখল, 'আম্মির ক্যান্সার হয়েছে। ফুসফুসের অপারেশন করতে হবে। অনেক টাকার ধাক্কা। আমি সেটার বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা করছি।'

'তাই স্টারমেকারে বেশ অনেক দিন আসতে পারবনা। আমি দুঃখিত রোজি ম্যাডাম।'

একটা লম্বা নিস্তব্ধতা। আধঘণ্টা পরে উত্তর এলো, 'আচ্ছা দীপু, আমি কি তোমার কোনো সাহায্য করতে পারি?'

আনন্দ আর দ্বিধাতে দীপু থমকে গেল। 'আমার বলতেই লজ্জা লাগছে এখনো এক লক্ষ টাকার বন্দোবস্ত করতে পারিনি, ম্যাডাম।'

রোজি তাড়াতাড়ি মাথায় একটা অঙ্ক কষল সমতুল্য প্রায় ১৩০০ ডলার। কলকাতা যাবার জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করেছিল। মা বাবার সঙ্গে দুই বছর হয়ে গেছে সামনা-সামনি দেখা হয়নি। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে তাঁরা দুজনেই সুস্থ আছেন।'

‘দীপু,আমাকে কিছু জরুরি তথ্য দিতে হবে। তোমার ব্যাঙ্ক, একাউন্ট, ঠিকানা, ফোন নম্বর এগুলো আমাকে জানালে, আমি তোমাকে টাকা পাঠাতে পারি।’
‘ম্যাডাম, আপনি আমার জন্যে খোদা। আমি যত তাড়াতাড়ি পারবো টাকাটা শোধ দিয়ে দেব।’

বোল্ডার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র

রেজা শামীম

নো ম্যানস ল্যান্ড

১

আজ সকালে দুটো অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিদিনের মত আজও ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঢুলু ঢুলু চোখে বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি।ব্রাশে পেস্ট মেখে আয়নার দিকে তাকাতেই নিজের চেহারায় কিছু পরিবর্তন চোখে লাগলো।বলতে নেই পুরুষ মানুষ হয়েও সুযোগ পেলেই আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি।আজকের পরিবর্তনগুলো চোখে লাগার মতই প্রকট।মাথার চুলগুলো বেশ ঘন মনে হচ্ছে।এরকম ছিলোনা।চুল কমে গিয়ে দুপাশে টাক বের হয়ে গিয়েছিলো।সেই টাক ঢাকার গবেষণায় প্রতিদিনের কিছুটা সময় ব্যয় হতো।জুলফির সাদা হয়ে যাওয়া চুলগুলো এখন কালো।গলার কাছে কিছু ভাঁজ পড়েছিলো, সেগুলোও আর নেই।একটু শুকনাও কি লাগছে নিজেকে!

আয়নায় কোন সমস্যা থাকতে পারে।আয়না ঘোলা থাকলে চেহারাও ঘোলা লাগে, তখন চেহারার খুঁটিনাটি চোখে পড়েনা।

অফিসের সময় পার হয়ে যাচ্ছে বলে এটা নিয়ে গবেষণা করার সময় নাই।ঝটপট রেডী হলাম।ওয়াশরুমের ড্রয়ারে ওয়ালেট, সেলফোন, গাড়ির চাবি একসাথে থাকে, ওগুলো পকেটে চালান করে দিয়ে শোবার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি কেয়া ডিসেম্বরের শীতে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে।মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছেনা।হয়তো লেপের মধ্যে ঢুকে আছে।ওর স্কুল বন্ধ।নইলে এতোক্ষণে হুলুস্থুল শুরু হয়ে যেত।ইলেন সকালে কিছুই খেতে চায়না।কিছু না খেলে দুপুর পর্যন্ত স্কুলে খালি পেটে কিভাবে থাকবে এটা ভেবে কেয়া ওকে জোর করে খাওয়াবেই।মা মেয়ের এই হুলুস্থুলে আমি নাক গলালে আমাকেও ধমক খেতে হয়। ইলেনকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে আমি অফিসে যাই।স্কুলে ঢুকেই ও ব্যাগটা কোনমতে ক্লাসের বাইরে ছুঁড়ে বন্ধুদের সাথে হৈ চৈ শুরু করে দেয়।দূর থেকে তা পাখিদের কিচির মিচিরের মত শোনায়।গেটের বাইরে থেকে এই দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখতে গিয়ে প্রায়ই আমার অফিসে দেরী হয়ে যায়।কিন্তু আজ কেমন নিষ্পাপের মত দুজন ঘুমাচ্ছে।বিদায় নিতে যেয়ে ওদের ঘুম ভাঙানোর কোন মানে হয়না।

ড্রাইভওয়েতে গাড়ি পার্ক করা ছিলো।গাড়িটা নতুনের মত চকচক করছে দেখে একটু ভ্রু কুঁচকালেও ভেতরে ঢুকে অবাক না হয়ে পারলাম না।নতুন গাড়ির যে ধরনের গন্ধ থাকে সেই ধরনের গন্ধ পেলাম।কেয়া কি কোন প্রোফেশনাল কার ওয়াশ থেকে গাড়ি ডিপ ক্লিন করেছে? ওরা কি নতুন গাড়ির গন্ধ ছড়ায় এরকম কোন সেন্ট ব্যবহার করেছে? হতেই পারে।

আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আর তখনই দ্বিতীয় অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটলো।যেটা ছিলো ভয়ের।

আমার অফিস বাসা থেকে খুব কাছে, পাঁচ মিনিটের পথ।শহরের ভেতরে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়।কিন্তু আমি কেমন করে যেন হাই ওয়ে ধরে চলে এলাম আধাঘন্টা দূরে আমার পুরানো অফিসে।যেন আমি গাড়ি চালাইনি, গাড়িই আমাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে।গাড়িতে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে শুনতে হয়তো একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

আমার পুরানো অফিস একটা কন্সাল্টিং ফার্ম।বছর দশেক আগে এই অফিসে কাজ করতাম আমি।এলামই যখন তখন মেরী জেইন এর সাথে দেখা করার যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।মেরী জেইন কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট।কোন এক অজানা কারনে আমার বউকে খুব স্নেহ করতেন।ক্রিসমাসে তাদের বাসার পার্টিতে নিমন্ত্রণ করতেন।দেখা হলে জড়িয়ে ধরে ছোট বাচ্চাদের যেমন মায়েরা আদর করে, তেমন ভাবে আদর করতেন।ভেবে এখন খারাপই লাগছে যে গত দশ বছরে তার সাথে একদম যোগাযোগ রাখিনি।

অফিসে আমাকে দেখে কেউ অবাক হলোনা।যেন আমি এখানে এখনও কাজ করি। প্রতিদিনই আসি।রুমের দরজায় নেমপ্লেটে এখনও আমার নাম লেখা 'ইমন চৌধুরী'। আমি রুমে ঢুকলাম না। দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে কিচেনের দিকে গেলাম।

কিচেনে মেরি জেইন এর সাথে দেখা।আমকে দেখে একটু জোরেই গুড মর্নিং বললেন। আমি দেরী করে অফিসে আসলে এভাবে বলতেন।কফি মেকারে ফ্রেশ কফি ব্রিউ করছিলেন।আমার দিকে ফিরে বললেন

-কফি চাও ইমন?

আমি হ্যাঁ বলার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম।আমার দিকে কফির মগ এগিয়ে দিতে দিতে বললেন

-খেয়া কেমন আছে?

এরা ক উচ্চারন করতে পারেনা।‘ক’ কে ‘খ’ এর মত শোনায়।

-ভালো

- ডিউ ডেট কবে?

একটু ভাবলাম।কেয়াতো গর্ভবতী না।আমার মেয়ের বয়স এখন নয় চলছে, কিন্তু আমার মুখ থেকে বের হয়ে এলো

-এইতো জানুরারীতেই ডেট।

-অলমোস্ট দেয়ার।শোন, আমাদের অফিস কেয়ার জন্যে একটা বেবী শাওয়ার পার্টি দেবো।তুমি ওকে আগে বোলোনা।ওর জন্যে সারপ্রাইজ।

আমার মাথা ঘুরে উঠলো।ঠিক দশ বছর আগের ঘটনা আবার ঘটছে।কেয়ার বেবী শাওয়ার হয়েছিলো।ও ঐদিন শাড়ি পরে এসেছিলো।সেই শাড়ি নিয়ে অফিসের মেয়ে সহকর্মীদের মধ্যে ছিলো তুমুল উৎসাহ।এটা কিভাবে পরতে হয়, কোথায় পাওয়া যায় ইতাদি।একজনতো অতি উৎসাহী হয়ে কেয়ার শাড়ী পরে ওদের হ্যালোউইন পার্টিতে ভারতীয় মেয়ে সেজেছিলো।আমি ছবিও তুলে রেখেছিলাম।

-কি ভাবছো?

মেরী জেইনের কথায় আমি বর্তমানে ফিরে আসি।

-শোন, বাচ্চা হওয়ার পর তুমিতো অবশ্যই পেটারনিটি লিভ নেবে।তার আগে যদি কোন প্রজেক্টের ডেডলাইন থাকে সেগুলো শেষ করো।অথবা জেসিকাকে তোমার পেন্ডিং কাজ গুলো বুঝিয়ে দিয়ে যেও।

আমি আচ্ছা বলার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালাম।কফি নিয়ে রুমে ফেরার সময় ভাবলাম বেবী শাওয়ার আর হ্যালোউইনের ছবিগুলো দেখি।পকেট থেকে ফোন বের করলাম। এখনকার আইফোন না, আগের দিনের সনি এরিকসন মডেল এর ফোন।স্ক্রীন এর ওয়ালপেপারে কেয়ার তরুণী ছবি।স্ক্রীনে লেখা তারিখটা আজকের হলেও সালটা দশ বছর আগের।

আজ আমার চল্লিশতম জন্মদিন ছিলো। কাল রাত ১২ টায় কেয়া যখন উইশ করেছিলো আমি তখন মন খারাপ করার অভিনয় করে বলেছিলাম

-চল্লিশের পর আর জন্মদিন আনন্দের না।এতদিন বয়সের আপ-হিলে উঠেছি।এখন থেকে ডাউন-হিলে নামবো মৃত্যুর দিকে।ইস এমন যদি হতো এখন থেকে প্রতি বছর আমার বয়স কমবে!

কেয়াও মজা করে মুনিঋষির মত আমার মাথায় হাত রেখে কণ্ঠ ভারী করে বলেছিলো

-তোর মনবাসনা পূরণ হবে বৎস!

আর এক রাতের ঘুমেই আমি দশ বছর পেছনে চলে এসেছি! হাস্যকর হলেও হাসতে পারছিনা বরং ডিসেম্বরের শুণ্য তাপমাত্রার শীতে নাকি ভয়ে আমার শরীরে একটা ঠান্ডা স্রোত টের পাই।

ঘোরলাগা মানুষের মত নিজের রুমে এসে কম্পিউটার চালু করি।ওপেনিং পাসওয়ার্ড চাচ্ছে।আমার আঙ্গুল যেন পাসওয়ার্ড জানে এভাবেই আমি টাইপ করলাম।কম্পিউটার চালু হল।কম্পিউটারের মনিটরের নীচে ঝুলে আছে কিছু স্টিকি নোটস।আজকের 'টু ডু' লিস্ট।আমারই হাতের লেখা।আমিও কেমন করে যেন অভ্যস্তের মত কাজ করতে শুরু করে দিলাম যেন আমি এই কাজ প্রতিদিনই করি, যেন আমি এই সময়েই থাকি...

সারাদিনে যথারীতি কয়েকবার কেয়া'র ফোন আসলো।দুপুরে লাঞ্চে যেন বিফ না খাই সেটা মনে করিয়ে দিলো। আর বিকেল পাঁচটায় এলার্ম বাজার মত কেয়া'র ফোন আসলো।পাঁচটা বেজে গেছে অথচ আমি এখনও অফিস থেকে বের হইনি এজন্যে একটু ভর্ৎসনা শুনতে হলো যেটুকু ভর্ৎসনা অফিসের বসের কাছেও শুনতে হয়না অফিসে একটু দেরী করে এলে।

বিকেলে বাসায় ফিরে এলে কেয়া দরজা খুলে দিলো।প্রথমেই চোখ পড়লো ওর পেটের দিকে।কেয়া প্রেগন্যান্ট! উচু হয়ে থাকা পেটের নীচে একটা হাত রেখে ঘুর ঘুর করেছে।যেন হাতটা সরালেই বাচ্চাটা পেট ফুড়ে বের হয়ে যাবে।আহা! মায়ের জাত। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমরা কিছুক্ষন নেটফ্লিক্সে মুভি দেখি।আজ মাথা ধরার অজুহাত দিয়ে আগে ভাগে শুয়ে পড়লাম॥কেয়া শুতে এসে আহ্লাদী গলায় বলে

-আমি চাই আমাদের মেয়েটা তোমার চেহারা পাক।মেয়েরা বাবার চেহারা পেলে লক্ষ্মী হয়।

তখনই আমার মেয়েটার কথা মনে পড়লো।বুকটা হু হু করে উঠলো।কেয়াকে বলতে চাইলাম 'কেয়া, তোমার মেয়ে দেখতে তোমার মত সুন্দর হবে, তুমি তার নাম রাখবে ইলেন, আমার নামের সাথে মিলিয়ে'। কিন্তু কিছুই বললাম না। কেয়াকে কোন কনফিউশন দিতে চাইনা।

আমি নিশ্চয়ই আমি কোন দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন দেখছি।কাল ঘুম থেকে উঠে দেখবো সব বর্তমান সময়ে চলে এসেছে।আর আমি এই গল্প সবাইকে মজা করে বলবো।মানুষ অবাক হয়ে বলবে এমনও হয় নাকি!

মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ রয়েই গেলো, এমনও কি হতে পারে কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবো আমি আরো পেছনের সময়ে চলে গেছি...

২

সকালে ঘুম ভাঙলো একটানা সুর করে পড়ার শব্দে।আমি চোখ খুলেই আবার চোখ বন্ধ করে ফেললাম।যা দেখছি তা পরিচিত কিন্তু অনেক পুরানো।পল্লব নাটকের রিহার্সাল করার মত করে নিউমেরিক্যাল এনালাইসেইসের দীর্ঘ সূত্র পড়ছে রুমের ভেতর পায়চারী করতে করতে।খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খানজাহান আলী হলের ৩২০ নাম্বার রুম।চার কোণায় চারটা খাট।তারই একটাতে আমি শুয়ে আছি।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে পল্লব ভানু'র গলায় বললো

-কি মশাই উঠছো? অখন খাইয়া পড়তে বসবা, নাকি পইড়া খাইতে যাবা?

আমি ভয়ে সিধিয়ে যাচ্ছি নিজের ভেতর।হচ্ছে কি এসব ! ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে আছি ওর দিকে

-কিরে তোকে দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন কোমায় থাকার পর তোর জ্ঞান ফিরে এসেছে। এখন কি শাবানার মত বলবি

-আমি এখানে কেন? আমার কি হয়েছে? হা হা!

বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও এটা সত্যি যে আমি আরো দশ বছর পেছনে চলে এসেছি। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি।পি এল চলছে।পরশু পরীক্ষা।

হঠাৎ কেয়'র কথা মনে পড়লো।ও কি টরেন্টোতে রয়ে গেছে একা? ইলেন কি ওর কাছে আছে! আমাকে ইতিউতি তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজতে দেখে পল্লব জিজ্ঞেস করলো

-কি খুঁজিস?
-আমার সেল ফোন
পল্লব এমন ভাব দেখালো যে সেল ফোন কি জিনিস সে জানেনা।আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম
-সেলফোন, ঐযে তোরা যাকে মোবাইল ফোন বলিস।
তাতেও লাভ হলোনা, বরং পল্লব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করলো।
-তোর ঘুমের ঘোর এখনও কাটেনিরে।কাল রাতে মনে হয় হেভী কোপ দিছিস।তুই বরং আরেকটু ঘুমা।
আমি মনের অজান্তেই হাসলাম।কোপ শব্দটা বিশ বছর পরে শুনলাম।ক্যাম্পাসে পড়াকে কোপ দেয়া বলতাম।
হলের টানা বারান্দায় হেঁটে হেঁটে শেষমাথার বাথরুম এর দিকে যাচ্ছি।আমাকে এখন কেউ দেখলে ভাববে শহরে এই প্রথম এসেছি গ্রাম থেকে।বাথরুমে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হলো না।সাদা বেসিনগুলো ময়লা হয়ে ময়লা রংটাই স্থায়ী হয়ে গেছে।পলেস্তরা খসা দেয়ালে নোংরা নোংরা ছবি ও কথা লেখা।মেঝে ভেজা।কমোডহীন বাথরুম থেকে গন্ধ বের হচ্ছে।যেটুকু না হলেই নয়, সেটুকু ফ্রেস হয়েই আমি বের হয়ে এলাম।
এমন নয় যে এখন অনেক সকাল, কিন্তু ছেলেরা রাত জেগে পড়ে বলে এখনও অনেকেরই ঘুম ভাঙেনি। সুনসান বারান্দা ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমার আবার কেয়ার কথা মনে পড়লো। ২০ বছর আগের কেয়াতো এই শহরেই থাকতো। আমি ওদের দু'বোনকে পড়াতাম।চট করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে এখনই কেয়াদের বাসায় যাবো।
আর দেরী করলাম না।একটা বেবি ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম টুটপাড়া কেয়াদের বাসার সামনে।কলিং বেলে চাপ দিয়ে ধরে রাখার মত চুড়ান্ত অভদ্রতা ও অধৈর্য আমাকে পেয়ে বসেছে।কয়েক মিনিটকে দীর্ঘ সময় মনে হচ্ছে।কেয়াই দরজা খুললো।অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো
-ইমন ভাই আপনি এ সময়ে!
কেয়া দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।পলক না ফেলে তাকিয়ে আছি ওর দিকে।কিশোরী মায়াভরা মুখ।পাতলা শরীর।এই শরীরের অলিগলি আমার কত চেনা।কেয়াকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছা খুব কষ্টে দমন করে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছি ওকে।ও কেমন একটু আড়ষ্ট হয়ে ওড়না ঠিক করায় ব্যস্ত হলো।
-ভেতরে আসেন।আজ কি সকালে পড়াবেন?
আমার সব মনে পড়ে গেলো।কেয়া ও রানু দুই বোনকে আমি সপ্তাহে তিনদিন বিকেলে পড়াই।
বসার ঘরে এক কোণায় একটা টেবিলে ওদের পড়াতে বসেছি।রানু খুব চঞ্চল।পড়ার চেয়ে গল্প করতেই সে বেশী পছন্দ করে।কেয়া শান্ত স্বভাবের।আমি কেয়াকে পছন্দ করতাম।আমার মনে পড়ে যায় এরকম একদিন সকালে পড়াতে এসে কেয়ায় অংক বই

এর ভেতর একটা চিরকুট দিয়ে যাই। রবীন্দ্রনাথের একটা গানের লাইন তুলে লিখেছিলাম

'মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে

ফিরেছো কি ফেরো নাই, বুঝিবো কেমনে'।

কেয়াও কিছুদিন আমাকে ততোধিক উদ্বিগ্নতায় রেখে আরেকটা চিরকুটে জানিয়েছিলো

'আসন দিয়েছি পাতি, মালিকা রেখেছি গাঁথি

বিফল হলো কি তাহা, ভাবি ক্ষণে ক্ষণে' ।

সেই থেকে কেয়ার সাথে প্রেম। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করার পর কানাডায় মাস্টার্স করতে যাওয়া। তখন কলিং কার্ড দিয়ে কেয়ার সাথে ফোনে কথা হতো। পাঁচ ডলারের কার্ডে কুড়ি মিনিট কথা বলা যেতো।

আজ পড়াতে গিয়েও একই ঘটনা ঘটলো। ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে কেয়ার খাতার পৃষ্ঠা ছিড়ে সেই গানের দুই লাইনই লিখলাম

'মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে

ফিরেছো কি ফেরোনাই, বুঝিবো কেমনে

কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে আজ একই চিরকুট আমি কেয়াকে না দিয়ে রানুর বইয়ের মধ্যে দিয়ে এলাম।সময় আমাকে নিয়ে খেলছে।আমিও সময়ের চালের বিপরীতে একটা পাল্টা চাল দিলাম। আমি যদি আবার বর্তমানে ফিরে আসি তাহলে কি আমি কোন প্যারালাল জীবনে যাবো যেখানে রানুর সাথে আমার সংসার হবে!

হলে যতক্ষণে ফিরেছি ততক্ষণে আমি সময়ের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। এরপর আমাকে দেখা গেলো সারাদিন 'হেভী কোপ' দিতে। পরশু পরীক্ষা। রাতে মিঠুর কাছ থেকে চোথা নিয়ে এলাম। পাশের রুম থেকে নিলু এলো পড়া বুঝতে। টুটুল দিনভর ঘুমিয়ে রাতে আসলো চোথা নিতে। টিভি রুম থেকে 'টিপ টিপ বরসা পানি' গান শুরু হলে কেউ একজন সাউন্ড বাড়িয়ে দিলে আমরা হুড়মুড় করে নীচে নেমে এলাম গানটা দেখার জন্যে। কয়েকবার নীচে নামলাম চা খেতে, আর প্রতিবারই যারা রুমে রুমে পড়ছিলো তাদের পেছনে লাগলাম, জ্বালানোর চেষ্টা করলাম।

-কিরে শালা এতো কোপাচ্ছিস কেন? যতই চেষ্টা করিস, A+ এর বেশী তো পাবিনা

মধ্যরাতে পড়া শেষ করে পল্লব ঘুমানোর আয়োজন করছিলো, তখন আবার আমার মনে পড়লো আমি একটা ব্যাকওয়ার্ড জার্নির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমি ভীষণ অসহায় বোধ করছি। সিগারেট খাবো বলে পল্লবকে নিয়ে হলের এক্সটেনশন ছাদে এলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে একটা ধোয়ার রিং বানিয়ে সেই বৃত্তের দিকে তাকিয়ে থেকে উদাস হয়ে বললাম

-পল্লব, কাল আমি চলে যাচ্ছি

-কি কইস? কোথায় যাবি পি এল এর মধ্যে?

-দশ বছর আগে।আমার ছেলেবেলায়।

পল্লবের বিস্মিত মুখ উপেক্ষা করে আমি বলতে থাকলাম

-আমার ফ্যামিলির সবাইকে একসাথে পাবো এক বাসায়।স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়বো। কপাল খারাপ থাকলে মাওলানা স্যারের হাতে মারও খেতে পারি।ছুটির পর মাঠে খেলবো।বৃষ্টি নামলে কাদাপানি মেখে ফুটবল খেলবো, সন্ধ্যা নামলে পড়তে বসবো, পাঠ্য বই এর নীচে আরব্য রজনী' বই পড়বো লুকিয়ে।রাতে সবার সাথে মেঝেতে মাদুর পেতে ভাত খাবো।

পল্লব এমন ভাবে আমার দিকে তাকালো, যেন সে একশত ভাগ নিশ্চিত যে আমি সিগারেটের ভেতর গাঁজা ভরে খেয়ে ভুলভাল বকছি।

-পল্লব জানিস, তুই একসময় ফেসবুকে লেখালেখি করবি।অনেক মানুষ তোর লেখা পছন্দ করবে

-ফেসবুক কি জিনিস, কোন সাহিত্য পত্রিকা?

আমি ওর দিকে তাকিয়ে রহস্যময় এক হাসি দিলাম।

-মডেলদের মতো দেখতে একটা মেয়ের সাথে তোর বিয়ে হবে।সাদা দাড়িতে তোকে চল্লিশেই বুড়ো দেখাবে, অথচ তোর বউকে তখনও কিশোরীর মত দেখাবে। একবার তুই প্যানিক এটাক নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে ডাক্তার তোর বউকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি রোগীর মেয়ে? হা হা হা।

হেভী ফ্লিলিংসে আছিসরে! গাঞ্জা পাইলি কোথায়? দে, আমিও এক টান দেই।হা হা হা। পল্লব রুমে ফিরে গেলো।আমি গেলাম না।ভাবতে এক ধরনের পুলক লাগছে।আজ রাতে ঘুমালে কাল সকালে আবারো দশ বছর পিছিয়ে পড়বো।ফিরে যাবো আমার দশ বছর বয়সের ছেলেবেলায়, যে ছেলেবেলায় কল্পনায় কত ফিরে যেতে চেয়েছি! পরিবারের সবাইকে একসাথে ফিরে পাবো।আমি কি আব্বাকে জড়িয়ে ধরে রাখবো। নিন্মবিত্ত বাবারা কথায় কথায় ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে ধরেনা।হয়তো ধমক দিয়ে বলবে ছাড় হারামজাদা, হইছে কি তোর?

রাতে সবাই মেঝেতে মাদুর পেতে খেতে বসবো।মা সামনে বসে ভাত তরকারী বেড়ে দেবেন।সবাই ভর্তা ভাজি ডাল খেলেও আমার পাতে হয়তো থাকবে গতদিনের তুলে রাখা এক টুকরো মাছ।পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্য হিসাবে এই বাড়তি পাওনা। সে রাতে আব্বা আম্মা'র মাঝখানে ঘুমাবো।পরের দিন সকালে সময় আরো দশ বছর পিছিয়ে যাবে যখন আমার বয়স শুণ্য।আমিহীন একটা দিন শুরু হবে পৃথিবীতে।আমি কি আবার জন্ম নিয়ে ফিরে আসবো এই সংসারেই? অথবা অন্য কোন সংসারে? নাকি শুণ্য থেকে কেউ ফেরেনা ? আমার পুলক গ্রাস করছে এক ধরনের আতঙ্ক।

সিদ্ধান্ত নেই আজ রাতে ঘুমাবোনা।ছাদের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আয়েশ করে সিগারেট ধরাই।রাত বেশী বাকী নেই।কোনমতে জেগে কাটিয়ে দেয়া যাবে।মাঝে মাঝে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলে জোর করে খুলে রাখি।

৩

ঘুম ভাঙলেও ঘুমঘোর কাটেনি। চোখ খুললাম না। কানে আসছে পাখির কিচির মিচিরের মত ছোট বাচ্চাদের হৈ চৈ এর শব্দ।হাসির শব্দ।বাচ্চারা কথা বলছে।শব্দগুলো দূর থেকে আসছে বলে বোঝা যাচ্ছেনা।কিন্তু তাদের একজনের কন্ঠস্বর আমার মেয়ে ইলেন এর মত।ও ওর বন্ধুদের সাথে আমেরিকান একসেন্টে ইংরেজীতে কথা বলছে। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি ইলেনের কথা স্পষ্ট করে শুনতে কিন্তু হঠাৎ ওদের কথা দূরে মিলিয়ে গেলো।কানে বাজছে একটানা ঢং ঢং করে বাজা ঘণ্টার শব্দ।এক হাতে লোহার গোল চাকতি উঁচু করে অন্য হাতে হাতুড়ি দিয়ে বেল বাজাচ্ছে আমার প্রাইমারী স্কুলের দপ্তরী।

বেকারসফিল্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

লুনা রাহনুমা

মিতুলের প্রাতঃভ্রমণ

আজ সকালে মিতুল প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে।সহজ ভাষায় যাকে বলে মর্নিংওয়াক।

মিতুলের সাথে প্রাতঃভ্রমণের ব্যাপারটি ঠিক যায় না।কারণ সকালে ঘুম ভাঙার পর যতক্ষণ সম্ভব হয় বিছানায় গা লাগিয়ে পড়ে থাকতেই বেশি ভালোবাসে সে।আজ দৈনিক রুটিনে ব্যতয় ঘটিয়ে ঘুম ভাঙার সাথে সাথেই ঠিক করল, হাঁটতে যাবে।এক্সারসাইজের ট্রাউজার নেই, তাই একটি জিন্সের প্যান্ট পরে নিলো।জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল বাইরে গাড়ির উপরে আইস জমে আছে।মাইনাস তিন ডিগ্রি টেম্পারেচার।হাতমোজা আর কানটুপি বের করে মোটা জ্যাকেটটি গায়ে চাপায় মিতুল।মোবাইল ফোনে সময় দেখাচ্ছে সকাল সাড়ে সাতটা।দরজা খুলে বাড়ির বাইরে পা দিয়ে মনটা খুশি হয়ে গেল মিতুলের।প্রতিটি সকালের একটা অন্যরকম স্নিগ্ধতা আছে।যারা বিছানার আরামকে উপেক্ষা করে ঘরের বাইরে পা ফেলতে পারে না তারা এই স্নিগ্ধতাটুকু কখনো ছুঁতে পায় না।

ক্রিসমাসের ছুটি চলছে এখন।করোনার কারণে মার্চ মাস থেকে মিতুলকে অফিসে যেতে হচ্ছে না।ওয়ার্কিং ফ্রম হোম।আর এখন ডিসেম্বরের শেষে খ্রিস্টমাস আর নিউ ইয়ার উপলক্ষে লম্বা ছুটি, চারপাশে একটা অলস ভাব।মিতুলদের বাড়ির সামনের বাগানটিতে চলে যাওয়া সামারের গ্লাডিওলাসের গাছগুলো শুকিয়ে পড়ে আছে।বাদামিরঙা শুকনো ঘাসগুলো নেতিয়ে আছে মাটির বুকের উপর।রাতের কুয়াশা সকালের ঠান্ডায় জমে বরফের কুচি হয়ে চিকচিক করছে কুচোনো রুপোর মতো।মনে মনে এক টুকরো রুপো খোঁপায় গুঁজে মিতুল সাবধানে পা ফেলে রাস্তায়।

একবার ভাবল ব্রিজের দিকে যাবে।কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মন বদলালো মিতুল। রাস্তার মাথা থেকে ঘুরে বায়ের দিকে টার্ন নিলো।মিনিট দশেক হাঁটলে লাইডেন লেগুন। ছোট মত একটি লেক।অনেকগুলো রাজহাঁস আর আমাদের দেশের পাতিহাঁসের মতো ছোট্ট হাঁসও থাকে লেকটিতে। মিতুলের ইচ্ছে হল লেকের কাছে গিয়ে একবার হাঁসগুলোকে দেখে আসবে।এই ঠান্ডায় হাঁসেরা কি পানিতে নেমেছে? নাকি লেকের পানি জমে বরফ হয়ে গিয়েছে! দেখার ইচ্ছে হল।ছেলেরা ছোট থাকতে প্রায় বিকেলেই ওরা পুরো পরিবার এই লেকের কাছে চলে আসতো কয়েকটা ব্রেড নিয়ে।মানুষ আসতে

দেখলেই হাঁসগুলো সব পানি থেকে উঠে এগিয়ে আসে খাবারের লোভে।হাঁসের দিকে ব্রেডের টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে খুব আনন্দ পেত বাচ্চারা।অনেকদিন আসা হয়নি এদিকটায়। মিতুলের ইচ্ছে হল লেকের কাছে গিয়ে দেখবে এই ঠান্ডায় হাঁসেরা পানিতে নেমেছে নাকি লেকের পানি জমে বরফ হয়ে গিয়েছে এখনই! মিতুল বন্ধুর মোবাইলে ছবিতে দেখেছে শীতকালে লেকের পানি জমে বরফ হয়ে গেলে হাঁসেরা তার উপরে স্কেটিং করে।

লাইডেন লেগুনে যাবার রাস্তায় ওল্ডহোমটি পড়ে।এজহিল কেয়ার হোম।বাংলাদেশে ফাইন্যান্স অফিসারের চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে ইংল্যান্ডে আসার পর অফিস জব না পেয়ে মিতুল এই হোমে কাজ নিয়েছিল।শুরুতে ভেবেছিলো আপাতত বুড়োবুড়িদের যত্নআত্তি করতে করতে কোথাও একটি ভালো চাকরি পেয়ে গেলে কেয়ার হোমের কাজটি ছেড়ে দেবে।ভালোকাজ কিংবা একটি অফিস জব পেতে মিতুলের প্রায় এক যুগ অর্থাৎ বারোটি বছরের মতো লেগে গেলো।দীর্ঘ বারো বছর এই কেয়ার হোমে কাজ করেছে সে।কাজের সাথে নিজে তিন বছরের একাউন্টেন্সি কোর্স করেছে। দুইটি ছেলের জন্ম দেয়া, লালনপালন করা আর সংসার করা, সাথে চাকরি আর লেখাপড়া সবকিছুই করার চেষ্টা করেছে।তাই হয়তো কোনটিই ঠিকমত করতে পারেনি।ঠিকমত মানে, উপভোগ করে করা হয়নি।তখনকার সেই `সময় নেই,` `সময় নেই` অনুভূতি এখনো তাড়া করে ফেরে মিতুলকে। অস্থির হয়ে থাকে মনের ভেতরটা। সারাক্ষণই মগজের ভেতর কেউ যেন দাবড়ে বেড়ায়: জলদি কর, জলদি কর, অনেক কাজ বাকি!

ওল্ডহোমটির পাশ দিয়ে যাবার সময় ভেতরে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলো মিতুল। পুরোনো কলিগদের কাউকে দেখা যায় কিনা।কারপার্কে বেশ কিছু গাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কলিগদের কাউকে দেখল না।পাঁচ বছর হয়েছে মিতুল এই হোমের কাজ ছেড়ে একটি সরকারি অফিসে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেয়েছে।গত পাঁচ বছরে সে একবারও এখানে আসেনি দেখা করতে। সুপারশপে বাজার করতে গিয়ে কলিগদের কারো সাথে দেখা হয়ে গেলে দূর থেকেই মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে গিয়েছে।এতো অভিমানের কারণটা যে কী, তা নিজেও ঠিক জানে না মিতুল।হয়তো কাজের ধরণ আর কলিগদের উপরে অভিমান নয়, নিজের উপরেই আসলে ওর সব অভিমান।যোগ্যতা থাকার পরেও নিজেকে উপযুক্ত আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারেনি বলে এই আত্মাভিমান! হয়ত।

তাছাড়া, বারোটি বছর কাটানো এই চাকরিস্থলটি ওকে অনেক বেদনাবহ দিনের কথাও মনে করিয়ে দেয়। পলাশের সাথে দাম্পত্যের শুরুর সেই কঠিন দিনগুলো, কয়েকজন নিষ্ঠুর কলিগের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পাবার দিনগুলো, প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী একটি তরুণী মেয়ের একটু একটু করে নিজের ভেতরে ক্ষয়ে যাবার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে এই কেয়ার হোমের স্মৃতির সাথে।এখন সেসব দিনগুলোকে মনে হয় যেন আগের জন্মের মিতুলের কাটানো জীবন ছিল সেসব।সময়ের সাথে দৌড়োতে দৌড়োতে ভীষণ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তরুণী মেয়েটি ঝুপ করে বার্ধক্যের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছে এক

লাফে।এখন মনে হয়, অতটা না ছুটলেও হতো।সময়ের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নয়। হয়তো সময়টাকে আরেকটু উপভোগ করা উচিত ছিল! কে জানে?

এজহিলে কাজ করার বছর পাঁচেক পর মিতুল একটি প্রমোশন পেয়ে কেয়ার এসিস্ট্যান্ট থেকে কেয়ার ম্যানেজার হয়েছিল। পদবীর সাথে সাথে বেতনও বেড়েছিল কিছুটা।এশিয়ান মেয়েকে নিজের সিনিয়র ভাবতে কয়েকজন ইংলিশ কলিগের খুব ইগো হার্ট হয়েছিল। লাঞ্চ ব্রেকে একদিন ঠাট্টাচ্ছলে মারিয়া নামের একটি কলিগ মিতুলকে বলেছিলো, `তুমি তোমার দেশে না থেকে আমাদের দেশে এসেছ কেন?`

কথাটির ব্যঙ্গ বুঝেও না বোঝার ভান করেছে মিতুল। অন্যের দেশে বিদেশী হবার নানা অসুবিধার সাথে একটি সুবিধা হচ্ছে, ইচ্ছে করলে ওদেরকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। `তোমার কথা পরিষ্কার বুঝিনি` ভাব করে অযথা ঝামেলা থেকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যায়। আজ মারিয়ার সেই কথাটি মনে পড়ে হাসি পেলো মিতুলের। "তোমার দেশ!" সত্যি, শব্দ দুটি খুব তীক্ষ্ণভাবে বুকে আঘাত করে।পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চিতে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকবার কথা।অথচ কণ্টকপূর্ণ দুর্ভেদ্য কিন্তু অদৃশ্য প্রাচীর তুলে খন্ড খন্ড করে আলাদা করা আছে মানুষের দেশ-ভাষা-সংস্কৃত -অভ্যাস।মারিয়া সেদিন "তোমার দেশ" কথাটি ঠিকই বলেছিলো। নইলে পনেরোটি বছর বিলেতে থেকে, বিলেতের আলো বাতাসে এই বাঙালি শরীর উন্মুক্তভাবে প্রবাহিত করেও পলাশ মিতুলকে কেন বলে, `এদের দেশের মাটি কী পাথুরে বাবা! আমাদের দেশের মাটি কত নরম! মায়ের বুকের আদরের মতো আমাদের দেশের মাটি!` ব্রিটিশ পাসপোর্টে নিজেকে ব্রিটিশ দাবি করে অধিকার আদায় করে নিতে বাঁধে না, অথচ নিজের দেশ বলতে এখনো বাংলাদেশের নামটিই মনে পড়ে ওদের।

ইংল্যান্ডে আসার পরের কয়েকটি বছরের কথা ভাবতে ভাবতে মিতুল লাইডেন লেগুন নামের লেকটির কাছে চলে আসে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে লেকের পানিতে কয়েকটি রাজহাঁস রাজার মতো পেখম মেলে সাঁতরাচ্ছে। রাজহাঁসের পেছনে জলের ভেতর হালকা ঢেউ তুলে চমৎকার নকশা তৈরী হয়েছে লেকের ময়লা পানিতে।পার্কের ঘাসগুলো বরফ জমে দাঁড়িয়ে আছে সুচের মতো টিকালভাবে।দেখে মনে হয়, ঘাসের গা হয়তো ছুরির ফলার মতো ধারালো হয়েছে।কিন্তু পা ফেলতেই ঘাসগুলো নরম হয়ে মাটিতে বসে গেলো। বাংলাদেশের লজ্জাবতী লতার কথা মনে পড়ে মিতুলের। ছোটবেলায় মাঠে মাঠে দৌড়ে যেখানে লজ্জাবতীর ঝাড় দেখতো, আঙ্গুল দিয়ে পাতা বুঁজে দেবার খেলায় মেতে উঠতো। চিরিচিরি পাতার লজ্জাবতীরা সামান্য ছোঁয়াতেই আঁচলে মুখ ঢেকে তাদের বাগানবাড়ির কপাট বন্ধ করে দিতো।লজ্জাবতীর প্রসারিত বাহু গুটিয়ে নেয়ার এই খেলা খুব আনন্দ দিয়েছে মিতুলকে শৈশবে।তাদের গোলাপি বেগুনি বলাকৃতির ফুল ছিঁড়ে নিজের গালে ঘষে ভাবতো রুজ লাগাচ্ছে গালে।

লেকের পাড়ে সাধারণত সকালে অনেক মানুষ হাঁটতে আসে। কিন্তু আজ কাউকে দেখা যাচ্ছে না।পেন্ডামিকের কারণে বেশিরভাগ লোকজন বাড়িতেই এক্সারসাইজ করছে। মিতুলের মনে হলো লেকের দিকে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। এই লেকের বদনাম

আছে।ড্র্যাগস নেয়া লোকজন এসে পড়ে থাকে লেকের পাশে ঝোপের ভেতরে।এবার ব্রিজের দিকে পা বাড়ায় মিতুল।আশেপাশের বাড়িগুলো দেখে আর দ্রুতলয়ে হাঁটার চেষ্টা করে।শরীরের ঘাম না বের হলে হেঁটে লাভ হয় না শুনেছে সে।রাস্তায় অল্প কয়েকটি গাড়ি চলে গেলো ধীরগতিতে।পিচঢালা পাকা রাস্তায় আইসিংয়ের কারণে গাড়ির চালকেরা খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে।একটি দোতলা বাস গেলো সামনে দিয়ে। ভেতরে দুই কী তিনজন মাত্র মানুষ বসে আছে।মিতুল নিজের হাত দুইটি জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটতে থাকে।রাস্তার উল্টোপাশে একটি লোক তার কুকুরকে নিয়ে হাঁটতে বের হয়েছে।এইদেশে মানুষ দুইবেলা করে কুকুরকে হাঁটাতে বের করে।কারণ না হাঁটলে কুকুর মলত্যাগ করে না।মলত্যাগ করা শেষ হলে কুকুরের মালিক পকেট থেকে পলিথিন ব্যাগ বের করে হাতে গ্লাভস পরে তাতে সেই বিষ্ঠা তুলে নেয়।যতক্ষণ পর্যন্ত রাস্তায় বিষ্ঠা ফেলার বিশেষ বিন না পাবে, ততক্ষন কুকুরের মালিক এই বিষ্ঠা তার পকেটে কিংবা হাতে করে হেঁটে বেড়াবে।নিজের কুকুরের ময়লা পরিষ্কার না করে ফেলে চলে যাওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।মিতুল এবার কিছুক্ষণ দৌড়ে নিলো।শরীরে বেশ একটা ফুরফুরে ভাব এসেছে ওর।মনে মনে ঠিক করলো এখন থেকে নিয়মিত মর্নিংওয়াক করবে সে।

মিনিট বারো হাঁটার পর মিতুল ফুট ব্রিজটির কাছে চলে আসলো।চওড়া একটি রাস্তার উপরে পায়ে হাঁটার ব্রিজ।এলডিন আর লাইডেন নামের দুই এলাকার মাঝখানে সেতুর মতো তৈরী হয়েছে ব্রিজটি।মিতুল ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে নিচের রাস্তায় গাড়ির যাওয়া আসা দেখতে লাগলো মন দিয়ে।এখানেও গাড়ির সংখ্যা আজ অনেক কম।একবার ভাবলো বাড়ি চলে যাবে নাকি এখন।তারপর মন বদলে এলডিনের পার্কের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর পাবের কাছে পৌঁছে গেল। পাবের পাশেই প্রাইমারি স্কুলটি।এই স্কুলে মিতুলের দুই ছেলে পড়াশুনা করেছে।বড় ছেলেটি এখন হাইস্কুলে যায়।ছোট ছেলেটি এখনো এখানেই আছে।স্কুলের পাশ দিয়ে যাবার সময় মিতুলের মনে পড়ে অনেক বছর আগের একটি দিনের কথা।

বড় ছেলে পুলক তখন এই স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছে।ইয়ার টু`তে পড়ে।প্রতিদিনের মতো সেদিন মিতুল ছেলেকে স্কুল থেকে নিতে এসেছে। পুলকের ক্লাসের সহকারী মিসেস হল মিতুলকে দেখে দৌড়ে আসলো।মিতুল ভেবেছিলো, নিশ্চয়ই পুলক দুষ্টামি করেছে।কমপ্লেইন করবে এখন।

মিসেস হল মিতুলের কাছে এসে বলেছিল, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করি?

- হ্যাঁ, বলো।

- পুলক বললো, তুমি নাকি স্কুলে যাও।লেখাপড়া করছো এখনো?

- আমি একটা কোর্স করছি।তার জন্য আমাকে কলেজে যেতে হয়।পরীক্ষাও দিতে হয়।

- আসলে আমরা সেদিন বাচ্চাদের নিয়ে এটা সেটা বানাচ্ছিলাম ওদের এক্টিভিটিস ক্লাসে। পুলক একটি ঝুনঝুনির মতো বানিয়েছে।তারপর আমাকে বললো, এটা আমি বাড়িতে

নিয়ে যাবো আমার ছোট ভাইয়ের জন্য।তাহলে আমার ছোট ভাইটা আর কান্না করবে না, এটা নিয়ে খেলবে আর আমার মা ভালো করে পড়তে পারবে।

মিসেস হলের কথা শেষ হয়ে যায়। মিতুল কথা বলতে পারেনি আর। ভদ্রমহিলা মিতুলের হাত ছুঁয়ে বলেছিলো, পুলকের মা, তোমাকে আমি সম্মান জানাই। আমি প্রার্থনা করছি তুমি পাশ করে লেখাপড়া শেষ করবে একদিন।

মিসেস হলের কথাগুলো মনে করে মিতুলের চোখে পানি চলে এলো।ঝাপসা চোখে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলের সীমানা পেরিয়ে বড় পার্কটির কাছে চলে এসেছে।পার্কে কয়েকজন নারী পুরুষ ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম করছে। তিনটি বাচ্চা সাইকেল চালাচ্ছে। একটি বাচ্চা অনেকক্ষণ ধরে জিপলাইনে ঝুলে আছে।মিতুলের হঠাৎ করে আবার জীবনটাকে খুব ভালো লাগতে শুরু করেছে।এখন পুরোনো কথা মনে করে মনে হচ্ছে মানুষের জীবনে পরিশ্রমের অধ্যায়টুকুতেও সব স্মৃতি শুধুই দুঃখের হয় না।অনেক প্রাপ্তি, ভালোবাসা, মমতার ছোঁয়ায় মাখা আছে চলে যাওয়া দিনগুলোর বর্ণিল নকশি কাঁথা।বিয়ের পর ইংল্যান্ডে এসে অনেকগুলো বছর খুব অর্থকষ্টে কেটেছে ওদের।বিয়ের আগে থেকে পলাশের সঞ্চয়ের স্বভাব না থাকায় মিতুল শূন্য থেকে শুরু করেছে সংসার।একটু একটু করে ওরা দুইজন বিদেশের মাটিতে নিজেদের একটি শক্ত অবস্থান তৈরী করেছে।কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করার মতোই ছিল সেই দিনগুলো।দুইজনের দুই শিফটে কাজ থাকতো প্রায়ই।দেখা হতো না, ঠিক করে কথা হতো না, একসাথে বসে খাবার সময় মিলতো না দিনের পর দিন।তবুও সেইদিনগুলো এখনো খুব রঙিন।ভীষণ প্রেমময়। ভালোবাসায় টইটম্বুর মনে হয় আজ ভাবতে বসে।

একটা ওয়ান বেডরুম ফ্ল্যাটে থাকতো ওরা।খুব পুরোনো স্যাঁতসেঁতে ছিল ফ্ল্যাটের শোবার ঘরটি। শীতকালে ঠান্ডায় ঘরের ভেতরেও কাঁপাকাঁপি করতো ওরা। পলাশ চাইলেও মিতুল ঘরের হিটার চালাতে চাইতো খুব কম।ইলেক্ট্রিসিটির বিল দিতে হবে বলে। রাতে ঘুমাতে যাবার আগে বিরাট আয়োজন করতে হতো ওদেরকে। উলের জাম্পার, হাত মোজা, পা মোজা, কানটুপি পরে ঘুমাতে যেত দুইজন।কোন কোনদিন পলাশ আর মিতুল যদি একসাথে কাজ শেষ করতো তাহলে দুইজন রাত দশটার পর চল্লিশ মিনিট হেঁটে বাড়ি ফিরতো।বাস ভাড়া বাঁচানোর জন্য দুইজন বাসে না উঠে হাত ধরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে হাঁটতো।খুব শীত লাগলে পলাশের জ্যাকেটের পকেটে নিজের হাত ঢুকিয়ে উষ্ণতা খুঁজতো মিতুল।এই শহরের প্রায় সব রাস্তাতেই লেগে আছে ওদের সেই সময়ের পথচলার গল্প। বাইরের লোকের কাছে কৃপনের কিচ্ছা মনে হলেও মিতুলের কাছে সেই কয়টি বছর খুব প্রেমের মতো লাগে। এখন সচ্ছলতার বিলাস-ব্যসনে যত খুশি গা ভাসিয়ে দিতে পারলেও মিতুল মিস করে শীতে বৃষ্টিতে কাঁপতে কাঁপতে পলাশের গায়ের সাথে মিশে শত শত পা ফেলে হাঁটার সেই মুহূর্তগুলোকে।এখন ওরা দুইজন দুইটি আলাদা গাড়ি চালায়।বৃষ্টি, বাতাস, স্নো-ফল কিংবা আকস্মিক কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ওদেরকে অসময়ে কাছাকাছি হবার সুযোগ করে দেয় না আর।

পকেট থেকে মোবাইল বের করে সময় দেখলো মিতুল।দেড় ঘন্টার মতো হেঁটেছে। এবার বাড়ি যাওয়া যাক।বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলো।রাস্তার পাশে একটি বাচ্চা মেয়ে তার মায়ের মাফলার ধরে টানছে আর খুব কাঁদছে। ঠান্ডায় মেয়েটির নাকটি টুকটুকে লাল হয়ে আছে।একহাতে চোখের পানি মুছছে আরেক হাতে নীল চুলের একটি পুতুলকে শক্ত করে ধরে আছে।মা আর মেয়ের কথা শুনতে পায় না মিতুল।অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে বলে ওর এখন বুকে হাঁফ ধরে গেছে।সামনে চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকার জিমটি বন্ধ দেখা যাচ্ছে।জিমের বিশাল কারপার্কে একটিও গাড়ি নেই আজ।মিতুলের বর পলাশ এই জিমের সদস্য।দ্বিতীয় দফায় করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় ওদের এলাকায় এতদিন টায়ার ফোর ছিল।এখন পুরো ইংল্যান্ডে ন্যাশনাল লকডাউন জারি হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকানপাট ছাড়া সবকিছু বন্ধ আছে। ফাঁকা রাস্তায় গলা খুলে গান গাইবার চেষ্টা করে মিতুল। হাঁ করে বুক ভরে শ্বাস নিলো কয়েকবার।গান গাইতে খুব ভালোবাসে সে।যদিও গলার স্বর বেশি ভালো না।তাই সে গান কেবল নিজের জন্যই গায়।

বাড়ির অনেকটা কাছাকাছি এসে খোলা মাঠে মাটির ঢিবির মতো একটু উঁচু জায়গায় উঠতে গিয়ে পা পিছলে সেখানেই বসে পড়লো মিতুল।ভেজা ঘাসে বসতে খারাপ লাগছে না ওর।ঘাসের ভেতরে ছোট্ট ছোট্ট নানা রকমের পাতা।ঘাসফুলগুলো এখনো কুয়াশা আর হালকা বরফের আস্তরে ঢাকা।মিতুল মুখ নামিয়ে খুব মন দিয়ে গাছগুলোকে দেখে। মায়ের কথা মনে পড়ছে।অনেক বছর আগে মা মারা গিয়েছেন।মায়ের জন্য মনটা কেমন করে উঠলো এই এক সকালে প্রাতঃভ্রমণে এসে।মৃত্যুর পর মায়ের সাথে আবার দেখা হবে কি? দেখা হলে মায়ের কেমন লাগবে? মিতুলের কেমন লাগবে? মায়ের সামনে বসে মিতুলের কি তখন ওর নিজের ছেলেদের কথা মনে পড়বে? পলাশও কি থাকবে তখন ওদের সাথে? জগৎ সংসারের এই মানুষগুলো কোথা থেকে আসে আর কোথায় চলে যায়! জীবনটাকে নিয়ে তাদের এতো আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন সকলই নিমেষে মিথ্যা হয়ে যায়! চোখের মনি, বুকের ধন কাউকেই আঁকড়ে ধরে থেকে যাওয়া যায় না।আর কোথায় যে যাচ্ছি সেও জানা নাই।একবার চলে যাবার পর কেউ এসে বলে যায়নি সেই জগতের গন্ধ কেমন! বর্ণ কেমন! রূপ কেমন! শুরু আর শেষ সম্পূর্ণই অজানা।মানুষ কেবল মধ্যটুকু নিয়েই করে যত রকম সম্ভব গীত রচনা।আবেগাপ্লুত হয় ক্ষণিক প্রাপ্তির উচ্ছলতায়।অনুরঁজিত হয় প্রেমে।আর স্নেহব্যঞ্জক সম্পর্কে সাজায় খুব যত্নে পরিবার নামের অতি মোহময় অথচ ক্ষুদ্র পরিধির জীবন-সম্পর্ককে।

মিতুলের প্রাতঃভ্রমণের সমাপ্তি হয়েছে।বাড়ি থেকে বের হবার পর অনেকক্ষণ পার হয়ে যাওয়ায় পলাশ মিতুলের মোবাইলে লোকেশন ট্র্যাক করে।মোবাইলে মিতুলকে অনেকক্ষণ একজায়গায় থেমে থাকতে দেখে পলাশের খানিকটা খটকা লাগে মনে, ঠিক আছে তো মেয়েটা? তাই চলে এসেছে ওর কাছে।পলাশের ডাকে সৃষ্টিজগতের জটিল চিন্তার বলয় থেকে বেরিয়ে আসে মিতুল এক ঝটকায়।টের পায় ভেজা ঘাসে বসে থেকে ওর শরীরের নিম্নাংশ ভিজে গিয়েছে।ঠান্ডা লাগছে খুব।পলাশের হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়

ঘাসের মাঠ থেকে।নিজের দুই করতল হাত মোজার উপরে বার কয়েক ঘষে ঠান্ডা হাত গরম করতে চেষ্টা করলো।তারপর পলাশের জ্যাকেটের পকেটে ডান হাতটি ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলো।পলাশ নিজের গায়ের সাথে চেপে রাখে মিতুলকে যতখানি সম্ভব, শীতের ছোবল থেকে আড়াল করতে চায় এই পৃথিবীর জীবনসঙ্গিনীকে।জগৎসংসারকে সবাই যতই বলুক না কেন, মায়ালোকের ঘোর, নিজের সন্তানদের জন্য তবুও বুকটা কেমন করে উঠে মিতুলের।ব্যাকুল হয়ে বলে, আমার ছেলেরা বাড়িতে একা আছে। জলদি হাঁটো পলাশ।

সুইন্ডন, যুক্তরাজ্য

শাহজাহান চঞ্চল

বিষাদে নীল হলদে পাখি

গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেল। এলোকেশী রোদ বাঁশঝাড়ের ডগা ছুঁয়ে পুকুরের পানিতে ঝিলমিল ছন্দ তুলে স্নান করছে। রোদে পোড়া শরীর নিয়ে বাতাস হয়ে আছে স্তব্ধ। সারাটা দুপুর সে পেয়েছে অসহনীয় কষ্ট। কেবলমাত্র একটু আগে সে রোদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে। ওষ্ঠাগত তার প্রাণ এখন। প্রাণীর নিঃশ্বাসের রসদ জোগানোর শক্তিটুকু ছাড়া একটুও বাড়তি শক্তি নেই তার শরীরে। সে তার প্রবাহমানতায় দোলাতে পারছে না গাছের পাতা, পুকুরের জল, পদ্মের পাঁপড়ি।

নীরবতা যেন স্বর্ণ ঈগল। বিকেলটাকে চেপে ধরে রেখেছে তার নখরের নিচে। চারিদিকে কেমন একটা দুঃখি দুঃখি ভাব। এই ভাবটা আরো গাঢ় হলো বেনে-বৌ নামের হলদে পাখিটার ডাকে। গাছের আড়ালে বসে আপন স্বভাবে পাখিটা ডাকছে - খোকা ডাকে, খোকা ডাকে, খোকা ডাকে।

বেনে-বৌ পাখিটার এই দুঃখজাগানিয়া ডাকে সচকিত হলো প্রকৃতি। নীরবতার স্বর্ণ ঈগলটা পালালো দূরে।

শমসের সাহেব তাঁর বাংলো ঘরের জানালায় চোখ ঢেলে দেখছিলেন ঝিম ধরে থাকা প্রকৃতি। বাংলো ঘরের অদূরে বাঁধা পুকুরের কোণে ফুটে থাকা লাল শাপলায় আটকে ছিলো তাঁর দৃষ্টি। সেখানে খেলা করছিল দু’ টি লাল ফড়িং। নিস্তব্ধতা ভেদ করে ফড়িং দুটোর পাখার ফড়ফড় আওয়াজ শমসের সাহেবের কানের কাছে এসে হামাগুড়ি দিচ্ছিল। তিনি মুগ্ধ ছিলেন ফড়িং দুটোর নানা কসরৎ দেখতে। কিন্তু বেনে-বৌর ডাকে শমসের সাহেবের তন্ময়তার তার ছিঁড়ে গেল। তিনি জানালা ছেড়ে বারান্দায় এলেন। সেখানে রাখা ইজি চেয়ারের একটি টেনে বসলেন। বারান্দায় ঝুলানো অর্কিডের টবগুলোর নিচ দিয়ে চোখ দুটকো প্রসারিত করলেন, হলদে পাখিটা যেখানে বসে ডাকছে সেই দিকটায়। তারপর চেয়ারে গা এলিয়ে বন্ধ করলেন চোখ। শুনতে থাকলেন বেনে-বৌর করুণ বিলাপ -খোকা ডাকে, খোকা ডাকে।

এক সময় ভাবনার অতলান্তে ডুবে গেলেন তিনি। যেন সন্ধান করতে চাইলেন, বেনে-বৌর- খোকা ডাকে- বলার রহস্য।

তার খোকা কি হারিয়েছিল দূর কোথাও, চোখের আড়ালে ? পাখি হয়ে এ- জনমে সে কী খুঁজে ফিরছে তার খোকাকে পৃথিবীময় ? হয়তোবা, হয়তোবা নয়। কিন্তু শমসের সাহেব হারিয়ে যেতে থাকলেন - খোকা ডাকে শব্দের গহিনে। তাঁর স্ত্রী মাহমুদা এসে বসলেন তাঁর পাশে। কিন্তু টের পেলেন না তিনি তাঁর আগমন। বেনে-বৌ ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে এক সময় উড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে তিনি পাশে বসা স্ত্রীকে দেখলেন। লক্ষ্য করলেন তার স্ত্রীর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে মুক্তোর মতো ক' ফোঁটা জল। তিনি গভীর মমতার হাতে মুছে দিলেন সে জল। পাশাপাশি অনুভব করলেন নিজের চোখও ভিজে আছে তার। পাঞ্জাবির শেষ প্রান্ত দিয়ে মুছে নিলেন চোখ।

তাদের খোকা আজ কতদূরে। সেই সাত সমুদ্রের ওপারে, গোলার্ধের শেষ প্রান্তে। ঘর সংসার পেতেছে সেখানেই। আহা খোকা কি কখনো ফিরে আসবে না, মায়ের বুকে, বাবার কাছে, শ্যামল মাটির সোঁদা গন্ধ বুকে নিতে ? রাতে যে ছেলের ঘুম আসতো মায়ের মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে। সাত সকালে ঘুম ভাঙতো বাবার হাতের স্নেহ স্পর্শে। ভোরের বাতাস গায়ে মেখে সবুজ প্রান্তর দিয়ে যে ছেলে হেঁটে যেতো অলক পণ্ডিতের পাঠশালার দিকে। ভালবাসত আকাশের নীল। হলুদ সর্ষে ক্ষেত। কাশবনে খুঁজে ফিরতো বাগডাশের বাসা। লক্ষীপেঁচা-আর ডাহুকের ডাকে যে আন্দোলিত হতো , বড় হয়ে গেছে বলেই কি তাকে ভুলে যেতে হবে এসব ? শ্যামল এ দেশে তার জন্য কি ছিল না কিছুই ? অর্থ, প্রতিপত্তি,মোহ মানুষকে কি ভুলিয়ে দেয় তার অতীত বন্ধন ? শিকড় কেটে কেমন করে পালায় মানুষ ?

- জানো মাহমুদা, একদিন আমাদের খোকা ফিরে আসবেই।শমসের সাহেব জোর দিয়েই স্ত্রীকে কথা কয়টি বলেন।

- হয়তো বা, নির্লিপ্তভাবে উত্তর করেন তার স্ত্রী।

- হয়তো কেন বলছো মাহমুদা – এ কথা হবে চরম সত্যি। যাযাবর পাখি যেখানেই যাক না কেন, এক সময় ঠিকই ফিরে আপন নীড়ে, বন্ধনের টানে। আর জীবনানন্দের দেশে যে জন্মেছে তাকে আসতেই হবে ফিরে - বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালবেসে।

- কি জানি জীবনানন্দীয় কথাগুলো সব আমার বোঝার মতো নয়। আমার খোকা ফিরে এলেই হলো ব্যস। আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। আঁচলের পাড়ে চোখ মুছে নিলেন শমসের সাহেবের স্ত্রী। কিন্তু শমসের সাহেবের সেদিকে দৃষ্টি নেই। আবেগে আপ্লুত তিনি। তাঁকে যেন কথা বলার নিশিতে পেয়েছে।তিনি বলেই যাচ্ছেন ...

- তোমার কি মনে আছে মাহমুদা, খোকা যখন হলো দুপুরইতো ছিলো তাই না ? আকাশ ভরা মেঘ ছিলো সেদিন। থেমে থেমে হচ্ছিলো বৃষ্টি। টুপুর টাপুর বৃষ্টি পড়ার ছন্দ ছিলো গাছের পাতায়। কিন্তু কী আশ্চর্য ! খোকা ভূমিষ্ঠ হবার পর আকাশের পূব পাশে বিরাট একটা রঙধনু উঠল। সবাই বললো ভাগ্যবান খোকা। জীবন হবে ওর রঙধনুর মতোই সাতরঙা।

- হয়েছেইতো, খোকার জীবনতো সাতরঙাই হয়েছে। কেবল আমাদের ফেলে গেছে বিষাদের নীল রঙে। কথাগুলো বলে কেঁদে ফেললেন শমসের সাহেবের স্ত্রী। চোখ মুছে আবার বলেনন – বৃষ্টির কোমল গান শুনতে শুনতে যার জন্ম হয়েছিল, তার হৃদয় কী করে রোদে পোড়া শুষ্ক মরুভূমির মতো হলো ? সবুজের হাতছানি, মায়ের আঁচল, বাবার স্নেহ ফেলে পরবাসের জনারণ্যে সে নিজেকে কেন মিশালো ?
- এ কেন' র একটা উত্তর আছে মাহমুদা। পুঁজিতন্ত্রের মন্ত্রসিদ্ধ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে মানুষের সুকোমল বৃত্তিগুলো খসে পড়ছে প্রতিনিয়ত। অর্থ আর প্রতিপত্তির ইঁদুর দৌড়ে নেমে পড়েছি আমরা সবাই। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলো অন্ধের মতো সন্ধান করছে বেঁচে থাকার মেকী অবলম্বন। কেবল একটু ভাল খেয়ে- পরে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাতে ছিঁড়ছে নাড়ীর বন্ধন।
- কিন্তু এর শেষ কোথায় ? স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন মিসেস মাহমুদা।
- শেষ তো অবশ্যই আছে মাহমুদা। কিন্তু এখনই নয়। এখন পৃথিবীর একাংশে চলছে প্রলোভনের উজ্জ্বল আতশবাজি। পৃথিবীর দরিদ্র অংশের মানুষগুলো তো এ প্রলোভনে ঝাঁপ দেবেই। ঝাঁপ দেয়া যখন স্তিমিত হবে, জ্বলে পুড়ে যখন পরিশুদ্ধ হবে এই মানুষগুলো , তখনই অনুভব করবে বন্ধনের টান। শুরু হবে ফিরবার পালা।
-কিন্তু সবাই কি ফিরবে ? স্বামীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন মিসেস মাহমুদা।
- না মাহমুদা সবাই ফিরবে না। সেটা সম্ভবও নয়। যারা ফিরবে হৃদয়কে প্রসারিত করেই ফিরবে। যারা ফিরবে না, তাঁদের উপায় নেই বলেই ফিরবে না। কিন্তু অন্তর্গত বিষাদে লীন হবে তারা প্রতিনিয়ত। একদিকে থাকবে শিকড়ের টান। অপরদিকে তারা হারাতে চাইবে না নিজের নতুন অবস্থান। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তারা ক্ষত বিক্ষত হবে অবিরাম। কিন্তু এই সব মানুষদের নিয় আমার ভাবনা নয়। আমাদের খোকাকে নিয়েই আমার ভাবনা। খোকা ফিরে আসবে - আমি গুণছি সেই প্রতীক্ষার প্রহর। শমসের সাহেব কথার ইতি টানতে পারতেন এখানেই। কিন্তু তিনি তা করলেন না। একটু দম নিলেন মাত্র। পরক্ষণেই আবার শুরু করলেন তার কথা…
- মানুষের কিছু স্বপ্ন থাকে মাহমুদা। আমারো ছিলো এবং আছে। সে স্বপ্ন খুবই সাধারণ মাপের। শৈশবের একটি স্বপ্ন ছিলো -- ডিঙি নৌকায় পাল পাল তুলে চলে যাব অনেক দূর। খুঁজে নেবো দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি। যেখানে ধানের সবুজ ডগা ক্রোশের পর ক্রোশ দোল খায় বাতাসে। আর এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি হিজল গাছ টুপটাপ সিঁদুর রঙা ফুল ছুঁড়ে দেয় জলের গায়। সে স্বপ্ন হয়েছিলো পরিপূর্ণ। সাথে বাবার পিটুনি- তিন তিনটি দিন বাড়ি থেকে লাপাত্তা থাকার কারণে। যৌবনে স্বপ্ন ছিল – আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা গাছ গাছড়ার পাহারায় ছোট একটি উঠোন। অদূরে বাঁধানো পুকুর। পুকুরের জলে মাছের গন্ধ গায়ে মেখে ফুটে থাকবে রক্ত বর্ণের শাপলা ফুল। আর উঠোনে রাঙা বউয়ের কোলে থাকবে চাঁদমাখা শিশু। মাহমুদা তুমি আমার বউ হলে। খোকা হলো চাঁদমাখা শিশু। সেই খোকা, আহা সেই খোকা বড় হলো – হলো পরবাসী।

কি হয়েছে আজ শমসের সহেবের? তিনি বলেই যাচ্ছেন অনর্গল। একমাত্রা শ্রোতা তার স্ত্রীর এসব শোনার ধৈর্য্য আছে কি-না শমসের সাহেবের তা ভেবে দেখারও নেই ফুরসত। তিনি শুরু করেন আবার ...

- মাহমুদা আমার আর একটি স্বপ্ন আছে যার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত।

- কি যে অলুক্ষণে কথা বল তুমি। মৃত্যুর কথা মুখে আনবে না কখনো। ভয়-বিহ্বল স্বরে স্বামীকে বলেন মিসেস মাহমুদা।

- মুখে না আনলেই কি মৃত্যুকে এড়িয়ে থাকা যাবে মাহমুদা ? মোটেই নয়। আমার এ স্বপ্নটা মৃত্যুর পরই হবে শুরু , আমি যখন ফকফকে শাদা কাপড়ে আবৃত হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকবো ছাউনিবিহীন পালকিতে। আমার সেই পালকি আমার খোকা আরো তিনজনকে সাথে নিয়ে কাঁধে করে এগিয়ে যাবে আমার শেষ ঘুমোবার ঘরে। পালকির পিছনে থাকবে অগণিত লোক। বলাবলি করবে তারা – শমসের সাহেব মানুষটা খারাপ ছিলো না। চোখ ভরা ছিল তার নিসর্গের রূপ। অনুভূতি ছিল চির সবুজ , জীবনানন্দের ছন্দে ভরা। এসব শুনে আমার খোকা ফেলবে দুফোঁটা চোখের জল। ব্যাস আর কী চাই ? আমার স্বপ্ন হয়ে গেল পরিপূর্ণ।

স্বামীর এসব কথায় শঙ্কিত হয়ে উঠেন মিসেস মাহমুদা। স্বামীর মুখের দিকে তাকান তিনি। দেখতে পান বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে সে মুখটায়। বড় মায়া হয় স্বামীর জন্য তার। কি জানি কি হয়েছে শমসের সাহেবের। তিনি যেনো সব কথা বলা শেষ করতে চাইছেন আজ

- মাহমুদা ,খোকাকে তো আমি শ্যামল বাংলার অনেক কিছুই দেখিয়েছি, শিখিয়েছি। খোকাকে দেখাবার কিছুই নেই আর। কিন্তু ওর ছেলেমেয়েদের আমি প্রাণ ভরে দেখাবো বাংলার রূপ। হাত ধরে ওদের নিয়ে যাব, যেখানে আছে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ। দেখাবো রোদভরা নীল আকাশের নিচে মাঠের পর মাঠ ভরা সর্ষে ফুলের দোল। পানির কিনারায় নুয়ে পড়া বাঁশঝাড় দেখাবো। দেখাবো হিজল-তমাল আর বাবলা গাছ। মাছরাঙার পালক ঝাড়া দেখাবো। ধান শালিকের সাথে দেখাবো তিলে ঘুঘু। পদ্মা পাড়ে নিয়ে যাবো ওদের। এঁকে দিবো ওদের চোখের তারায় চকচকে রূপালি ইলিশ। পাল তোলা নৌকার বনেদী চলন দেখাবো। শোনাবো ওদের – মনমাঝির কণ্ঠ ঝরা সুর। নদীর ঘাটে গাঁয়ের বধূ দেখাবো। দেখাবো নাটাই হাতে দূরন্ত কিশোর। দেখাবো অগণিত লতা-গুল্ম, শিখাবো তাদের নাম। পাখির কুজনে বটের ছায়ায় দাঁড়াবো। মেঘ ভাঙা রোদ মেখে ওদের কোন একদিন নিয়ে যাবো বৈশাখী মেলায়। ষড়ঋতুর অপরূপ রূপ ওদের হৃদয়ে দেবো গেঁথে। শোনাবো বেহুলা, মলুয়া, কঙ্কাবতী আর সোনাই বিবির শোকগাঁথা। বুঝাবো কত আছে ভালোবাসা , গাঙের জলে ভাসা বাংলাদেশ নামক এ করুণ ডাঙায়। আমি চাই মাহমুদা , আমার নাতি-নাতনিরা কখনো যাবে না খোকার মতো করে , বাংলার এ রূপ ছেড়ে পরবাসে- অবেলায়।

একটানা কথাগুলো বলে ক্লান্তি অনুভব করেন শমসের সাহেব। আর সেইক্ষণে মসজিদের মিনার থেকে আজানের ধ্বণি সুপুরির বাগান পেরিয়ে শমসের সাহেবের কানে প্রবেশ করে। স্ত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান শমসের সাহেব। ধীর পায়ে হেঁটে যান শানবাঁধানো ঘাটলার দিকে। ঘাটলায় বসে ওজু করেন গভীর দরদ দিয়ে। ওজু শেষে পয়ের গোড়ালির কিছুটা উপর পর্যন্ত ডুবিয়ে দেন পানিতে। বেশ প্রশান্তি অনুভব করেন তিনি এতে। তার পায়ের কাছে এসে ঘুরপাক খায় কয়েকটি চেলা-পুঁটি। তিনি হেসে উঠেন তা দেখে। পুকুরের কোণে রক্তশাপলার উপর এখনো উড়াউড়ি করছে একটি লাল ফড়িং। তিনি এক আজলা পানি নিয়ে ছেলেমানুষের মতো ছুঁড়ে দেন ফড়িংটার দিকে। উঠে দাঁড়ান শমসের সাহেব। উঠতে গিয়েই অনুভব করেন বুকের বাম পাশটায় প্রচণ্ড ব্যথা। তিনি বুক ধরে বসে পড়েন। একটু সময়ের ব্যবধানেই এলিয়ে পড়েন ঘাটলার কঠিন পাথরে। তার মুখ দিয়ে অস্ফুটে শব্দ বেরিয়ে আসে - খোকা, খোকার মা। রক্তশাপলার উপর উড়ন্ত লাল ফড়িংটা তখন উড়ে যায় অনেক দূরে।

রিয়াদ, সৌদি আরব

সামা আকবর

অর্জুনের সন্ধ্যা

শাবানা মুঠোফোনে নাম্বারের পাশে সংরক্ষিত ছবিটা দেখে। আরিয়ানের সাথে কদিন কথা বলা হয়ে ওঠেনি খুব একটা। হেনতেন ভেবে কীভাবে যেন দিনগুলো চলে যাচ্ছে। কত কথা ভাবে বলবে, জিজ্ঞাসা করবে, চায়ে নিমন্ত্রণ করবে। নারকেলের নাড়ু বানায় যত্ন করে, তারপর নিজ মনে কত কী ভেবে কাঁচের বোয়ামে ভরে ফ্রিজে রেখে দেয়। ছুতোয় ছুতোয় সকল ছুতো শেষ হয়ে আসে। ভাবে, 'কত আর বিরক্ত করা যায় একটা মানুষকে? তুমি যে কবে আমাকে একটু বিরক্ত করে বাধিত করবে?' আবার মুঠোফোনে সংরক্ষিত ছবিটা দেখে, তার ওপর হাত বুলায়।

আরিয়ানের সাথে শাবানার ফোনে দু'একবার কথা হয়েছে। আরিয়ান বিশ্বাস একজন নামকরা চিত্রশিল্প বিশেষজ্ঞ ও চিত্রশিল্প প্রদর্শক। সম্প্রতি দেশ পত্রিকায় লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত শাবানার একটি চিত্র প্রদর্শনীর খবর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি মুম্বাইতে শাবানার একটি প্রদর্শনী আয়োজন করতে ইচ্ছুক। চিত্রশিল্প জগতে আরিয়ানের নাম আলাপে আলোচনায় কয়েকবার শুনেছে শাবানা। তবুও, তার কাছ থেকে সরাসরি ফোন পেয়ে একটু অবাক না হয়ে পারেনি। প্রদর্শনী ঘটিত সকল ব্যাপার শাবানার ব্যক্তিগত সচিব দেখাশোনা করেন। আরিয়ানের ভরাট কণ্ঠস্বরে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় শোনার সময় বরাবরের মতো শাবানা সচিবের নম্বরটা ধরিয়ে দেয়ার তাগিদটা খুঁজে পায়নি। আরিয়ানের কণ্ঠস্বর ছিল একেবারেই অনন্য। হেডফোনে, আর সব শব্দ-বর্জিত নীরবতার নিবিড়তায় শাবানার কাছে মনে হচ্ছিল যেন শত সহস্র গম্ভীর স্বরের বাঁশি, একই সাথে থেকে থেকে বেজে উঠছে। মনে হচ্ছিল, এই কণ্ঠস্বর যেন তার কতই না পরিচিত। আরিয়ানের ঘোরলাগানো কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে, শাবানার ব্যক্তিগত ফোন নাম্বার আরিয়ান কীভাবে জোগাড় করলেন সেটাও জিজ্ঞেস করবার কোন ইচ্ছে রইলনা।

প্রদর্শনীর দিন-ক্ষণ শিগগিরই নিশ্চিত করা হবে ঠিক হলো। তার পরের কয়েকটি কথোপকথনকে ব্যবসায়িক আলোচনা না বলে দুজন পুরনো বন্ধুর স্মৃতিচারণ বললে খুব ভুল হবে না। দুজনার আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রথম আলাপ, তবে আশ্চর্যের কথা এই যে তাদের জীবনযাত্রা যেন একই নক্সার ভিন্ন রঙে প্রকাশ। সমাজের চাহিদা মেটানোর জন্য আটপৌরে সিদ্ধান্তের ফিরিস্তি বাদ দিলে, দুজনার অতি নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ,

আনন্দের উৎস, দুঃখের উৎস, আত্মার পরিচয়, স্বতন্ত্র হলেও যেন একই সুতোয় তোলা নক্সা।

চায়ের টেবিলে বইটি রাখা। পুরনো বইয়ের স্টল থেকে কেনা হলুদ হয়ে যাওয়া মলাট দেয়া বইটি কিনেছিল শাবানা। পুরনো বইয়ের প্রতি বরাবরই তার একটা আকর্ষণ ছিল । শাবানা থাকে কলকাতায়। যানজট আর পথিকের ভিড়ের মাঝেও পথের ধারে বইয়ের স্টল দেখলেই শাবানা বেহিসেবী ঝুঁকি নইয়ে মাঝে মাঝে গাড়ী থামিয়ে বই কিনত। কিছুদিন আগে তেমনি একটি স্টলে এই বইটা পেল। নাম 'অর্জুনের সন্ধ্যা'। ১৯২০ সনে প্রকাশিত। অপরিচিত লেখক, অর্জুনলাল রায়। বইটির প্রাচীনতা নাকি বইয়ের প্রথম পাতায় দু' ছত্র লেখা, কোনটা যে শাবানার আবেগমালায় এমন ঝড় তুলছিল, সে বুঝে উঠতে পারছিল না। তাতে লেখা ছিল,

উৎসর্গ – সন্ধ্যাকে
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা
তুমি আমার সাধের সাধনা
প্রতি জীবনে তোমারই,
–অর্জুন

সেদিন বাড়ি ফিরে খাওয়া, নাওয়া, পোশাক পালটানো ভুলে গিয়ে, এক বসাতেই বইটি পড়েছিল শাবানা। মনে হচ্ছিল সে যেন নিজের ডাইরি পড়ছে। সে যেন সন্ধ্যার সাথে কত পরিচিত, সন্ধ্যার ভাবনাচিন্তা যেন সব তার মাথায় ঘুরছিল। সে বারবার শাবানা থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে শাবানা হয়ে যাচ্ছিল। শত বছরের ব্যবধান যেন মাঝে একটি স্বচ্ছ পর্দামাত্র। এপার থেকে ওপার যেমন পরিষ্কার দেখা যায়, তেমন ওপার থেকে এপার।

বইটির দিকে তাকিয়ে শাবানা আলম আবারও সময়ের সমুদ্র পেরিয়ে সন্ধ্যা হালদারের জীবনে পা দিল।

১৯১৯

আমার নাম সন্ধ্যা। আমি আজ বিধবা হয়েছি। আমার এগার বছর বয়সে বিয়ে হলো, সতেরতে পা দিতে না দিতেই সিঁদুর মুছে গেল।

আমরা দুটি প্রাণ অচ্ছুৎ এক সম্প্রদায়ের বলে, মড়া শ্মশানঘাট পর্যন্ত নেয়ার জন্য কাউকে পাওয়া গেলনা। আমার ছেলেবেলার দুজন খেলার সাথী ছোটন আর শম্ভু আর গ্রামের অল্পবয়সী কিছু ছেলে এসে বললো, 'বৌদি, আমরা জাত মানিনা, আমরা নেব কার্তিক দাদাকে শ্মশান ঘাটে।

'মেয়েদের শ্মশান নাকি যেতে নেই।

ওরা বলল, 'আমাদের সঙ্গে চল, কাকে ভয়?'

হলোও তাই, আমি আর চন্দনা মাসি তাদের পেছন পেছন গেলাম। ঘাটে গিয়ে দেখি কাঠ, ঘি, এমনকী একজন অল্পবয়সী ব্রাহ্মণ পুরোহিত তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি দেরি করে হলেও তোমাকে চিনতে পারলাম। তোমার কণ্ঠ শুনে আমার মনে অল্প যা দ্বিধা ছিল, তাও দূর হয়ে গেল। আমি চিতার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। কার্তিক চিতায় কি শান্তিতে শুয়ে আছে। আমি দুঃখের মধ্যে যেন হাসলাম দেখে, এই লোকটির পাতে কোনোদিন ঘি পড়েনি তার চিতায় কত ঘি। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

হাতের দুগাছি কাঁচের চুড়ি গঙ্গার ধারে চন্দনা মাসি পাথর দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন থেকে এই একটা বস্ত্রই তোর সব'। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'আমি কেন যে বেঁচে থাকলাম, মাসি? একসাথে পুড়ে যদি মরতে পারতাম?'

হাতে গালটা ঠেকা দিয়ে মাটিতে বসেছিলাম, যেন জেগে থেকেও দুঃস্বপ্ন দেখছি। চিতার আগুনের তাপ তখনও পাওয়া যায়, ছোটন দৌড়ে এসে আমার পিঠে ধাক্কা দিয়ে বললো 'তোর বাড়ি দখল হয়ে গেল বলে, তুই দেখ গিয়ে'। সারা গায়ে কোন শক্তি খুঁজে পেলাম না, কীভাবে যে ওই পথ অতিক্রম করেছি মনে পড়েনা। বাড়ির বেড়াঘেরা চত্বরের সামনে দেখলাম যেন শত শত লোক । অবাক কাণ্ড, এতো লোক এতক্ষণ কোথায় ছিল?

বেড়ার যেই ফাটলটা আমরা দরজা বলি তার সামনে সেই ব্রাহ্মণ নিশ্চুপ, ঠায় দাঁড়িয়ে। আমি কোথায় যাব, কী করব কিচ্ছু জানিনা, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালাম। তুমি বলে উঠলে, 'কার্তিক আমার বাবার কাছে তার সকল ভিটে আর জমি বন্ধক রেখে চিকিৎসার খরচ চালিয়েছে। এই ভিটে, জমি, আর পুকুর সবই আমার বাবার'।

তুমি গ্রামে নামকরা উকিল মুকুন্দলাল রায় বাবুর বড় ছেলে, অর্জুনলাল রায়। তোমারই উদ্দীপনায় সেই তরুণ ছেলেরা জাতের ব্যবধানকে ভাঙতে চলেছে। শহরে নাকি জাতপাতের বালাই নেই বললেই চলে। সব জাতেরই মানুষ একই সাথে পড়ালেখা করছে, আপিস আদালতে কাজ করছে, একই সড়ক বেঁয়ে হেটে যাচ্ছে আসছে। কী আশ্চর্য, এতো কালের প্রথা বললেই হল মানিনা? আচ্ছা, যাবতো একদিন শহরপাড়ায়। দেখব তো সব সত্যি কিনা?

চমক ভাঙল তোমার কণ্ঠের শব্দে । তোমার কণ্ঠ শুনলে বরাবরই আমার মনে হতো, যেন শত সহস্র গম্ভীর স্বরের বাঁশি, এক সাথে বাজছে। তুমি আমার নাম নিয়ে বললে, 'সন্ধ্যা এখানেই থাকবে, এসব দেখাশোনা করবে। এভাবেই ঋণ শোধ হবে। আপনারা যদি কোনো দাবি নিয়ে এসে থাকেন, কাল কাছারিতে এসে আমার বাবার কাছে দরখাস্ত করে যাবেন।'

দুধে ফিটকিরি পড়ার মতো ভীড় হাল্কা হয়ে গেলো। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিড়বিড় করতে করতে সবাই মিলিয়ে গেল।

তুমি এগিয়ে এসে চন্দনা মাসির হাত ধরলে। মাসি এমন লাফ দিলেন যে মনে হলো ওনাকে অচ্ছুৎ কেউ ছুঁয়ে ফেলেছে। তুমি বললে, 'শম্ভুকে কাল সকাল সকাল পাঠিয়ে

দেবেন, চন্দনা মাসি। ওকে এখন থেকে সন্ধ্যার যাবতীয় জমিজমা, ফসল, পুকুরের চাষের আয়, দলিলপত্র ইত্যাদির হিসেব দেখার কাজ দেয়া হল। দেওয়ান সাহেবের কাছে সকল হিসেব মাসের প্রথমে বুঝিয়ে আসতে হবে।'

শম্ভু মাসির একমাত্র ছেলে। বয়েসে আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড় হলেও কাঁধ কাঠিতে আমার চেয়ে কিছু ছোট। একারণেই বোধ হয় আমি, ছোটন আর শম্ভু একসাথে হেসেখেলে বড় হয়েছি। মুকুন্দবাড়ির কত আম আর পেয়ারা যে গাছে ঝুলে ঝুলে খেয়েছি, সেই হিসেব চাইলে আজকে মহাবিপদ ছিল। ছোটনের ছোট বোন হেমলতা। তাকে দেখলে শম্ভু কেমন যেন বোকা হয়ে যেত। এই সেদিনও হেমলতার বয়স ছিল পাঁচ কি ছয়। ও শুধু উঠোনে বসে মাটির হাঁড়ি পাতিল নিয়ে কাদার পায়েস বানাতেই পারলেই খুশি। আমাদের সাথে নিলে পড়ে-টড়ে গিয়ে হাঁটু ছিলে ফেলবে, কাঁদবে, ঘুমিয়ে পড়বে .... উফফ মহাঝামেলা। কিন্তু শম্ভুকে সাথে নিয়ে ছোটনকে ডাকতে এলেই ওর যে কী হয়। শুধু শুধুই হাসে, পাশে বসে ওই সফেদার বিচির মিষ্টি আর কাদার পায়েসের কী যে প্রশংসা করতে থাকে, ইচ্ছে হয় পিঠে দুটো কিল বসাই। এখানেই বেলা করে দেবে, তারপর আম তো নয়ই, দারোয়ানের কাছে ধাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

আবারো তোমার ডাকে চমক ভাঙল। ফিরে আসতে হলো আবার, আজকের বিষধর অস্তিত্বে। 'মাসি, আপনি আজ রাতে সন্ধ্যার সাথে থাকবেন।' অনুরোধ করলে নাকি আদেশ, বোঝা গেলনা। মাসি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। আমরা বেড়া ঠেলে ভেতরে উঠোনে ঢুকলাম। তুমি কি ওখানটায় দাড়িয়েই ছিলে? কিছু মনে পড়েনা। কী লজ্জা, তোমাকে পিঁড়ি পেতে একটু গুড়-জলও এগিয়ে দিইনি। আবারও হাসলাম, তাই কী হয়, আমরা অচ্ছুৎ, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে। দাওয়ার উপর ধপ করে বসে পড়তেই শরীরটা ছেড়ে দিল। যখন চোখ মেললাম তখন সূর্য চোখে লাগছে। মাসি বোধ হয় গায়ে একটা কাঁথা দিয়ে দিয়েছিলেন। উনি আমার একচালা ঘরের চৌকাঠের ওপাশেই শুয়েছেন, যেন আমি উঠলেই টের পান। পরের কয়েকটা দিন নাকি কয়েকটা সপ্তাহ, ওই দাওয়ার ওপর যেন আমার ঠিকানা লেখা হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া, নাওয়া, এমনকি নিঃশ্বাস নেবার কথা ভুলে যাওয়াটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলো।

একদিন, কিছু লোক এসে চন্দনা মাসিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল, সন্ধ্যার ব্যাপারে অর্জুনবাবু খবর নিতে আসেন কিনা, ঐ বাড়ির আর কেউ এসেছিলেন কিনা, ইত্যাদি। মাসি জানিয়ে দিলেন যে শম্ভু রোজ ওঁদের কাছারিতে গিয়ে খবরাখবর পৌঁছে দিয়ে আসে।

পরদিন রাতে মাসি চালডাল আলু উঠোনে ইটের চুলোয় চড়িয়েছেন, তুমি এসে তার সামনে বসলে। বললে, যদি খুব অসুবিধে না হয়, আজ থেকে রাতে একবেলা তুমি নাকি আমাদের সাথেই খাবে। মাসি চোখ কপালে তুলে কিছু বলতে গেলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। আমি একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিলাম। তোমাকে ভাত বেড়ে দেবার জন্য তুমি অপেক্ষা করে রইলে, মাসি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরো দুটো

থালায় ভাত বাড়লেন। 'না ফোড়ন, না ঘি,' মাসি একটু পর পর বড় অনুশোচনা করতে থাকলেন। তুমি যেন তাতে অতিষ্ঠ হয়ে মাসিকে বলে উঠলে, 'চন্দনা মাসি, আপনার মনে পড়ে কি না, শম্ভু আর আমি ছোটবেলায় একসাথে খেলেছি। আমাদের বয়েস পাঁচ/ছয় বছর হয়ে গেলে আমাদের একসাথে আর খেলতে বারণ করে দিলেন ঠাকুমা।

তোমার কথা কিছুক্ষণের জন্য যেন ভাবনায় মিলিয়ে গেল, তারপর আবার শুনতে পেলাম বলতে, 'শম্ভুকে তারপর অনেকদিন দেখিনি। একদিন ভোরে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, দারোয়ান কাকু ওপার থেকে কথা বলছিল। দেখলাম শম্ভু, ছোটন আর সন্ধ্যা গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ছে। দারোয়ান কাকু তেড়ে উঠতেই আমি থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, 'কাকু, ওরা আমার বন্ধু, ওদের কিছু বলবে না। ওদের সাথে খেলতে মানা, এখানে এলে ওদের আনন্দটা দেখতে পাব। তুমি তাড়িয়ে দিও না'

'পরদিন সকালে দারওয়ান কাকু বাবাকে জানিয়েছিলেন কথাটা। উনি কাকুকে বললেন ঠিক আছে এই ছেলেমেয়েরা কত আর খাবে, তুমি কিছু বলোনা। আমি তখনও জানতাম না যে বাবা জাতপ্রথার বিরুদ্ধে খবরের কাগজে ছদ্মনামে নিয়মিত লিখতেন। আইনজীবী হওয়ার কারণে ঘনঘন কলকাতা যেতেন। ওনাকে কেউ কোনোদিন কিছু বারণ করে না। মনে মনে ইচ্ছে হতো আমিও একদিন বাবার কোটখানা গায়ে চাপিয়ে শহরে চলে যাই।

'স্কুল শেষ করে কলেজে পড়তে আমি কলকাতায় চলে গেলাম। রাতের ট্রেন নিয়ে সকাল হতে হতে মনে হল যেন আমি এক জগৎ পার হয়ে অন্য এক জগতে চলে এসেছি। সেখানে অনেক ছেলেদের সাথে পড়াশোনা, হোস্টেলে থাকা, চলছিল। একবারও কাউকে জিজ্ঞাসা করতে শুনিনি, তুমি কি ব্রাহ্মণ? কায়স্থ?'

'পরের শীতে আমার ঠাকুমা পরপারে চলে গেলেন। খবর পেয়ে আমি বাড়ি এলাম। ঠাকুমার জন্যই যেন আমাদের বাড়ির দিনপঞ্জিকাগুলো থমকে ছিল। বাবা ঠাকুমার সকল ইচ্ছানুযায়ী সৎকার ও যথাসময়ে শ্রাদ্ধ করলেন। পরের দিন বাবা আমাকে ডেকে বলেছিলেন, 'অর্জুন, তুমি তোমার সব বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করতে পার। ভগবান, ঈশ্বর, আল্লাহ, যে যেই নামেই ডাকুক না কেন, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সব নামেই সাড়া দেন। তিনি সবার ভাষা বোঝেন। তুমি যেমন তোমার মাকে মামণি ডাক, তোমার ছোট্ট বোন যেমন শুধু মাম মাম আওয়াজ করে ডাকে, তোমার মার কি কখনও বুঝতে কষ্ট হয়? তিনি কি তাতে রাগ হন কখনো? আর তোমার মা আর আমি তো মানুষ, ঈশ্বরতো অনেক বড়। ফিসফিস করে আরও বলেছিলেন, 'ঈশ্বরও জাত মানেন না।' বাবার ঠোঁটের কোণ দিয়ে সেদিন এক টুকরো হাসি উঁকি দিয়েছিল।

'এতো সহজ কথা, এটা কি কারও বুঝতে কষ্ট হয়? আমি কলেজে থেকে ভাবছিলাম বাড়ি ফিরে কীভাবে কথাটা, কাকে আগে বলব, 'আমি জাত মানি না। আমি সন্ধ্যাকে বিয়ে করবো।' বাবা সব সহজ করে দিলেন। সেদিন মনে মনে ঠিক করেছিলাম, বি এ পরীক্ষা দিয়ে এসেই বাবার সাথে কথাটা পাড়ব।'

এটুকু বলে তুমি সেদিন উঠে দাঁড়ালে। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে এতটাই ধীর গতিতে বেরিয়ে গেলে যেন মনে হলো ঝোলা গুড়ের সাগর ঠেলে হাটছো। আমি মাসিমার মুখের দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইলাম। কেন যেন মনে হল, একথাগুলো মাসির অজানা ছিল না। চুলোর আগুনে তাঁর মুখের উপর ছায়াগুলো এমন ভাবে নাচছিল, মনে হল উনি যেন কোন পাপের দায়ে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন।

পরদিন সকালে মাসি নিজের বাড়ি চলে গেলেন। হেমলতার বড় অবহেলা হচ্ছে, উনি আর দুদিক সামাল দিতে পেরে উঠছেন না। যাওয়ার আগে আমাকে কিছু কথা বলে গেলেন। বছর চারেক আগের কথা। অর্জুনবাবু নাকি তাঁর ঠাকুমার শ্রাদ্ধের পরদিন শম্ভুর কাছে কথা বলতে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ি বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে ওকে সাথে যেতে বলতে। সেদিন শম্ভুর কাছে জানতে পেরেছিলেন, আমার বাবার আকস্মিক মৃত্যুর কথা, গ্রামের চিরানন্দ কাকার ছেলে কার্ত্তিকের সাথে আমার তাড়াহুড়ো করে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা।

অর্জুনবাবু, শম্ভুর কথাগুলো শুনে, অনেক্ষন নীরবে বসেছিলেন, যেন ভাবছিলেন কি করলে এইমাত্র শোনা কথাগুলো না-শোনা করা যায়। যাবার সময়ে শম্ভুকে মৃদুস্বরে বলেছিলেন, 'শম্ভু, তুমি আমার সাথে দেখা করতে এসো। খেলার বয়স তো আর নেই, তবে তোমার সাথে এখন আর খেলতে বারণ নেই। '

চন্দনা মাসি দরজার আড়াল থেকে সব শুনছিলেন আর আঁচলের কোনা দিয়ে চোখ মুছছিলেন। ওনার বড় ইচ্ছে ছিল শম্ভুর চাল চুলো হলে আমাকে তাঁর বৌ করে ঘরে তুলবেন। তিনি শম্ভুকে দেখেছিলেন আমার পালকি কাঁধে তুলে নিয়ে ঘরের আঙিনা পার করে দিতে। সেদিন তাঁর কান্নার রোল অন্য সবার কান্না ছাপিয়ে শোনা গিয়েছিল।

কার্ত্তিক অসুস্থতায় শয্যাশায়ী থাকত বছরের এগারোমাস। চিরানন্দ কাকার, বাবামা মরা একটি মেয়ের ওপর নাকি তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমিজমার উপর দয়া হয়েছিল, কে জানে? গ্রামবাসীরা কিছু ঠাহর করার আগেই কাকা যতটা সংক্ষেপে ভগবানকে তুষ্ট রাখা যায়, অথচ উপাসকদের নিয়ে অযথা ব্যস্ত হতে না হয়, ঠিক ততটা করে বিয়ের ঝামেলা চুকিয়ে আমাকে সহায় সম্পত্তিসমেত ছেলের ঘরে তুলে নিলেন, আর অসুস্থ ছেলেকে আমার ঘাড়ে তুলে দিয়েছিলেন। আর আমি রাতারাতি কার্ত্তিকের সেবা-শুশ্রুষার ভারে ভূষিত হয়েছিলাম।

চন্দনা মাসি চলে গেলে আমি আমার শূন্য ঘর, উঠোন লেপে, নেয়ে, নিজেই রাঁধতে বসলাম। সেদিন রাতে তুমি এসে আমার চেহারা দেখেই যেন বুঝেছিলে, আর কোনো কথা বলা বাকি নেই। এবার নীরব প্রশ্ন নীরবতা দিয়ে জবাব দেবার পালা। সেই সেদ্ধ চাল ডাল তোমার থালায় তুলে দিলাম, কিছু আমি নিলাম। দুজনেই অল্প খাবার অনেকক্ষণ ধরে খেলাম।

ঘরে পড়ে থাকা দুটো নারকেল কুড়িয়ে নাড়ু বানিয়েছিলাম। ছোট মাটির ঘড়ায় তুলে হাতে দিয়ে বললাম, 'তুমি আর এসোনা। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। ওপাড়ার কামিনীকে আর হাফিজকে যেভাবে মেরে ফেলেছে। ওরা দুজন শহরে পালিয়ে যাচ্ছিল,

পথে গরুর গাড়ি থামিয়ে, মুখ-ঢাকা কজন লোক ওদের ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে যায়। গাড়িওয়ালা সোজা থানায় গিয়েছিলো, পুলিশের লোক নিয়ে ফিরে এসে ক্ষেতের মধ্যেখানে শুধু ওদের দুজন দুজনকে আঁকড়ে ধরে থাকা কাটা কোপানো লাশ পেয়েছিলো। তুমি শহরে চলে যাও, বিয়ে করো।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করবো।' অর্জুন স্থির, দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তোমার শহুরে পাগলামো শহরে গিয়ে করো, অর্জুনদা। কামিনী কুমারী মেয়ে ছিল, তাকে ধর্মের বাইরে বিয়ে করতে দেয়ার চেয়ে খুনের আসামি হতে রাজি গ্রামবাসী। তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে বিয়ে করবে নমশুদ্র সম্প্রদায়ের মেয়েকে, তাও বিধবাকে?'

উত্তরের অপেক্ষা না করে আমি আবারো বললাম , 'তোমার আসা যাওয়া খেয়াল করছে কিছু মানুষ। গতকাল এসে চন্দনা মাসিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে ওরা। আমি জানতাম তুমি আমাকে চাইতে। শম্ভু যেভাবে হেমলতার দিকে চেয়ে থাকে, তুমিও আমার দিকে ঠিক সেভাবেই চেয়ে থাকতে। আমি তোমার চাওয়াকে, তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু নিয়তির হিসেবে বড্ড গরমিল হয়ে গেছে, অর্জুনদা। তুমি আমার জন্যে হলেও বেঁচে থাকো। অন্য বিধবাদের মতো আমি আমার জীবন একা কাটাতে শিখে নেবো। আমার কারণে তোমার বিপদ হলে আমি ঈশ্বরকে কী মুখ দেখাবো? আমাদের এই বৃথা সংযোগ ঈশ্বরের হিসেবের ভুল ছাড়া আর কিছু নয়।'

'আমি তোমার এই বেহিসেবী, নিষ্ঠুর ঈশ্বরকে মানিনা।' অর্জুনের কণ্ঠে চাঁপা ক্রোধ, চোখে অশ্রু।

'আমিতো মানি। আমি তোমাকে এজীবনে পাইনি। যাত্রার শুরুতেই পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সামনের জীবনে আমি তোমাকে পাবই পাবো। ঈশ্বর আমার কাছে ঋণী।' আমার অশ্রু আর বাঁধ মানলনা।

'তুমি একটা পাগল।' চোখে জল নিয়ে তুমি হোহো করে হেসে উঠলে।

'হ্যাঁ তো!' আমিও হাসলাম। তারপর আবার দুজনের ওপর সেই ভারী নীরবতার যবনিকা নেমে এলো। রাতের আঁধারকে এত কৃষ্ণকালো আগে কখনো মনে হয়নি।

চুলোতে লাকড়িগুলো জ্বলে ভস্ম হয়ে গেছে, একটা দুটো জ্বলন্ত অঙ্গার তাও উঁকি দেয়। পূর্ব দিকটা ফর্সা হয়ে আসছে। আমি নড়ে চড়ে উঠে দাঁড়ালাম। তুমিও উঠে দাঁড়ালে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে অনেকক্ষণ। কী যেন খুঁজছিলে। খিল খিল করে অকারণে হেসে উঠতো যে মেয়েটি, আজকে যেন সে পাথরের প্রতিমা। তোমার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'অনেক বদলে গেছি আমি, তাই না? অনেক কিছু আমাকে বদলে দিয়েছে। আমিতো সব হারিয়েছি। তোমাকে পেয়ে হারাবোনা। এবার হারিয়ে হলেও, পরেরবার পাবো। এ জন্মে একাকীত্বকে আমি যক্ষের ধনের মতো বুকে জড়িয়ে রাখব। পরের জন্মে কাছাকাছি থেক যেন। '

'তুমি এ্সো, দাদা।' আমার কণ্ঠে শীতলতা তোমাকে চমকে দিল। তুমি ধীরে ধীরে পা ফেলে আমার আঙিনার প্রান্তে গিয়ে এ'কবার ফিরে তাকিয়েছিলে। হ্যাঁ, দেখেছি। তারপর তুমি বেড়া ঠেলে বেরিয়ে গেলে।

ঐ জনমে তোমাকে সেই শেষবারের মতো দেখেছিলাম।

২০২০

শাবানার দু'চোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরছে। এটা গল্পের বই নয়, এতে অন্য কারো কাহিনী লেখা নয়, এটা তারই জীবনকাহিনী থেকে ছিঁড়ে নেয়া কয়েকটি পাতা। কোন ঝোড়ো বাতাসে উড়ে গিয়েছিল। আবার সেই ঝড় উঠেছে। পাগলা হাওয়া এবার সেই হারিয়ে যাওয়া পাতাগুলো উড়িয়ে এনে তার গায়ের সাথে সেঁটে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্য-অর্জুন, শাবানা-আরিয়ান...এও কি সম্ভব? কিন্তু অসম্ভব বলে অস্বীকার করার উপায় কোথায়? সকল সংযোগের লক্ষণ কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দিতে পারলে শাবানার জীবনটা আগের মতই পরিপাটি, নির্ঝঞ্ঝাট থাকত। মনের মধ্যে বিরাট এক জটিল ধাঁধার টুকরোগুলো যেন নিজে নিজেই নিজ জায়গায় পড়ছে। একটি ধোঁয়াশাময় ছবি যেন ক্ষণে ক্ষণেই পরিষ্কার হয়ে উঠছে। প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর বিচ্ছিন্ন থেকেও শাবানা আর আরিয়ানের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত, প্রত্যেকটি ভুলের ভেতর যেন তাদের দুজনকে একে অপরের সাথে দেখা করিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র লুকিয়ে ছিল। শৈশবেও তারা দুজন অনেকবার একই শহরে, এমনকি একই পাড়ায় থেকেছে। হয়তোবা একই স্কুলে পড়েছে, একই মাঠে খেলেছে। শাবানার গায়ে বারবার কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগলো।

শাবানার ছবি তার আঁকা চিত্রকর্মের পাশে, পত্রিকা বা অন্তরজালে পাওয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তবে চিত্র-অধ্যক্ষের ছবি তেমন ছাপানো হয় না বললেই চলে। শাবানা অনেক খুঁজে আরিয়ানের তরুণ বয়েসের একটি ছবি অন্তরজাল থেকে উদ্ধার করে তার নিজের ফোনে সংরক্ষণ করে রেখেছিল।

আজকে সেই চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান। শাবানা ধীরে ধীরে গ্যালারির দিকে এগোচ্ছে। এবারই আরিয়ানকে প্রথম স্বচক্ষে দেখবে সে। শত বছরের সংযোগ রন্ধ্রে রন্ধ্রে টের পেল শাবানা। আরিয়ানের দীর্ঘকায় মূর্তির দিকে দূর থেকে তাকিয়ে তার নিজের অনুভুতিকে নিজেই বুঝতে পারছিল না। আকাঙ্খার সাথে উৎকণ্ঠা নেই, অভিনবতার সাথে অপরিচিতের ভয় নেই। পাবার আশার সাথে না পাবার ভয় নেই। মনে অসীম বিস্ময় নিয়েও দৃঢ়তার সাথে শাবানা চৌকাঠ পার হল। দূর থেকে দুজন দুজনার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। কাছে এলে যেন বাস্তবতার বিভ্রান্তি আর সমাজের ঠুনকো নিয়মকানুন, তাদের এই অপরিচিত পরিচয়কে, এই অজানা আস্থাকে, এই স্বচ্ছ স্বপ্নের আয়নাটিকে কোন ভীতি আর হিংসার ধ্বস আবারো চাপা দিয়ে দেবে।

প্রদর্শনী চলাকালীন সময়ে শাবানা আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে টুকিটাকি কথা আদান প্রদান করছিল, চিত্রকর্মের প্রেক্ষাপট, প্রকাশিত কিংবা অপ্রকাশিত ভাব, ছবিতে লুকনো সূক্ষ্ম ও স্থূল বার্তা, ইত্যাদি নিয়ে। অতিচর্চিত এই সংলাপগুলোর পুনরাবৃত্তি সেদিন যেন

তাকে খুব ক্লান্ত করে দিচ্ছিল। চোখের কোণ দিয়ে শাবানা সারাক্ষণ আরিয়ানকে খেয়াল করছিল। আরিয়ান সকল বাস্তবতা, লোকলজ্জা একেবারেই বিসর্জন দিয়ে কক্ষের কোণে একটি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে শাবানার দিকে অপলক তাকিয়ে ছিল। ফাঁকে ফাঁকে মুঠোফোনে ছবি তুলছিল, তাও শাবানারই। এরকম মনোযোগ পেতে শাবানা অভ্যস্ত হলেও এখনও তাকে সামান্য বিচলিত করত। আরিয়ানের এই আচরণ তার কাছে অস্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক মনে হয়েছে। তাতে তার একেবারে এতটুকুও অস্বস্তি বোধ হয়নি।

প্রদর্শনী শেষ হতে বেশ রাত হয়ে গেল। বিদায়ের সময় হয়ে এল। দরজা পর্যন্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দুজন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আরিয়ান বলল, 'এক নিষ্ঠুর ঈশ্বরকে আমি কখনই মানতে চাইনি।' শাবানা আরিয়ানের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ, এও কী হতে পারে? তারপর উত্তর দিল, 'আমার উপায় ছিল না।'

ইয়র্বা লিন্ডা, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

হুটুটু!

প্রাচীনকালে হোরাডো গ্রামের এক কৌতুহলী লোক ছিল যে প্রায়ই অদ্ভুত কাণ্ড করত। একদিন সে ভাবল চোখে পট্টি বেঁধে উদ্দেশ্যহীন হাঁটলে শেষে কী হবে? এই ভেবে সে চোখে পট্টি বেঁধে উদ্দেশ্যহীন দশ বছর হেঁটে পাঁচ হাজার মাইল দূরে হুটুটু গ্রামে পৌঁছল।

হুটুটু গ্রামের পুরুত-ঠাকুর মহা উৎসাহে জনগণের মধ্যে প্রচার শুরু করল, কি অচিন্ত্যনীয় ও নির্ভুল পদ্ধতিতে স্বর্গীয় তত্ত্বাবধানে একটা লোক পাঁচ হাজার মাইল দূর থেকে বন্ধ চোখে দশ বছর হেঁটে অন্য ভুল কোথাও না পৌঁছে অত্যন্ত সঠিকভাবে হুটুটু-তেই পৌঁছেছে। শুনে সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়ল। পুরুত এই স্বর্গীয় বৈজ্ঞানিক ঘটনা ও সেটার নির্ভুল পদ্ধতির জটিল ব্যাখ্যা আবিষ্কার করে তা আরো জটিলভাবে প্রচার করতে লাগল। সেটা যত দুর্বোধ্য মনে হলো মানুষের ভক্তিও ততই বেড়ে গেল। এতে জনগণের ওপর পুরুতের নিয়ন্ত্রণ বেড়ে গেল।

স্কুল-কলেজে এই স্বর্গীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পড়ানো শুরু হল। দেশের উন্নয়ন খাতের টাকা সরিয়ে এনে বিরাট দালান বানিয়ে তার সম্পত্তি ও পানি-বিজলির কর মওকুফ করে প্রচুর আসবাব ও যন্ত্রপাতি কিনে এর ওপরে সুগভীর গবেষণা শুরু হল। অনেক বেতন দিয়ে জাতির সবচেয়ে মেধাবী বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হলো, তাঁরা এই স্বর্গীয় তত্ত্বাবধয়ান ও অচিন্ত্যনীয় ঘটনার ওপর সুগভীর গবেষণা করতে লাগলেন। অন্যান্য গবেষণা ও উন্নয়ন হয় বন্ধ হয়ে গেল নয়তো কোনরকমে বেঁচে থাকল, যেমন নতুন হাসপাতাল ও স্কুল-প্রতিষ্ঠা, রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ ও পরিবহন, বেকারদের কর্মসংস্থান, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি। কিন্তু গ্রামের সবাই পুরুত-ঠাকুরের ওপরে খুব খুশি হলো।

হুটুটু গ্রামে মু'মনা নামে এক বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। সে একদিন সবাইকে বলা শুরু করল হোরাডো'র লোকটা হুটুটু গ্রামের কথা জানতই না, তাই সে হুটুটুতে যাবার জন্য রওনা হয়নি। কোথাও না কোথাও তাকে পৌঁছতেই হত, এভাবেই সে উদ্দেশ্যহীনভাবে হুটুটুতে পৌঁছেছে। এরপর কেউ হোরাডো থেকে চোখ বেঁধে একশ'কোটিবার রওনা হয়ে একশ'কোটি বছর হাঁটলেও কখনোই হুটুট গ্রামে পৌঁছাবে না। শুনে লোকেরা 'তাই তো' বলে গালে হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করল। জনগণ চিন্তাভাবনা করার মতো মহা অবৈধ কাজ করতে শুরু করেছে জেনে পুরুত-ঠাকুর খুব আতঙ্কিত ও ক্রূদ্ধ হয়ে পড়ল। সে

তাড়াতাড়ি মু'মনার ঘাড় ধরে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দিল, সেটা দেখে জনগণ হাততালি দিয়ে খুব আনন্দ করল। পুরুত ঠাকুর ঘোষণা করল স্রষ্টা মুমনা'কে বহিষ্কারের দিনকে ধর্মীয় মহোৎসবের দিন ধার্য্য করেছেন। সেই সাথে স্রষ্টা প্রতি বছর সেই দিন মহা উৎসবে ও আনন্দের সাথে উদযাপনের হুকুম দিয়েছেন। এতে লোকেরা আরো খুশি হয়ে চিন্তাভাবনা করার মত কঠিন ও অবৈধ কাজ বাদ দিয়ে মহানন্দে পুরুতের নেতৃত্বে আরো বেশী করে স্রষ্টার আরাধনা করা শুরু করল।

হুটুটু গ্রামে প্রতি বছর সেই পবিত্র দিনে অঢেল টাকা খরচ করে মহাসমারোহে সেই উৎসব আজও হয়ে থাকে।

এমনকি কঠিন মহামারি ও দুর্ভিক্ষের সময়েও।

টরোন্টো, কানাডা

হুমায়ূন কবির

বলরামের শেষ দিন

১

বলরাম সাহা আজও খুব সকালে উঠেছেন, যেমনটা উঠেছেন সারা জীবন। কিন্তু তার দীর্ঘ জীবনের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে একটু পরেই। তিনি এখনো জানেন না। দিনটি অন্যান্য দিনের মতোই নেহায়েত সাদামাটা। স্ত্রী এখনো ঘুমে, দেরিতে উঠার অভ্যাস, দশটা এগারোটার আগে উঠবেন না। কফির মগ হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন বলরাম। রান্নাঘরের পেছনে একটা বড় কাঁচের দরজা। দরজা ঠেলে বারান্দায় বের হয়ে একধাপ নামলেই প্রশস্ত ব্যালকনি। টিলার উপরে বাড়ি, ব্যালকনিতে দাঁড়ালে শহরের অর্ধেকটা দেখা যায়। বাড়ি কেনার সময় এই দৃশ্যপটটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। সামনে টেনিস কোর্ট, খেলার মাঠ, মাঠ পেরিয়ে লেক, লেকের পাড়ে হাঁটাপথ, ওই পাড়ে সমান্তরাল রেল লাইন – এক দৃষ্টিতে সব নজরে আসে। ঝমঝম বৃষ্টি বা তুখোড় তুষারপাত ছাড়া বলরামের আর সব দিন শুরু হয় এই অনাবিল পরিবেশের মুক্ত হাওয়ায়। কফি শেষ করার পর এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। ততক্ষণে ফুটন্ত সূর্যের উজ্জ্বল হলুদ আলো এসে তার চোখে মুখে আছড়ে পড়ে। জ্যামাইকান ব্ল্যাক কফির তেজ আর বুক ভরা শ্বাস তাকে সারা দিনের জন্য প্রস্তুত করে দেয়।

২

বলরাম সাহা এখন হিয়ারিং এইড ছাড়া কানে শুনতে পান না। বছর পাঁচেক আগে, সমস্যাটা যখন শুরু হয়, তখনো নিজে ঠিকমতো বুঝেননি। তার অফিস সহকারী ভ্যালেরি ধরিয়ে দেয় বিষয়টা। বেশ আমতা আমতা করেই বলেছিল আশঙ্কার কথা।
- যদি কিছু মনে না করো তো একটা কথা বলি?
- কী আশ্চর্য, ভ্যালেরি! আমাকে কিছু বলতে অনুমতি চাওনি তো কখনো আগে।
- না, মানে, বিষয়টা কীভাবে নেবে সেই চিন্তা করেই জিজ্ঞেস করলাম।
- বলো, বলো, তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।

- আমার মনে হয় তোমার কানটা একটু দেখানো দরকার ডাক্তারকে। আসলে আমার বাবারও এই সমস্যা ছিল, তাই আমি এ বিষয়ে জানি কিছুটা। আগে ভাগে ধরা পড়লে অনেক রেমেডি আছে।

মেয়েটি এত সুন্দর করে বলেছিল যে রাগ করার কোনো কারণ ঘটেনি। কিন্তু কয়েকদিন বেশ মন খারাপ ছিল। আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে বিষয়টা নিজে একদম বুঝতে পারেনি আগে। ভ্যালেরি ধরিয়ে দেয়ার পর এখন স্পষ্ট টের পাচ্ছে, মানুষজনের ভেতর সবার কথা আলাদা করে শুনতে বেশ অসুবিধা হয় তার। আওয়াজ না বাড়ালে টিভির কথাগুলোও ঠাহর করতে অসুবিধা হয়। বিষয়টা নিজে বেশ বুঝেছেন বলরাম, কিন্তু তার স্ত্রীকে সহজে বুঝাতে পারেনি।

- এও তোমার আরেক ভণিতা, আমার কথা শুনবে না তাই বলো, কানকে দোষ দাও কেন?

- এসব কী বলো তুমি, নন্দিনী। মানুষের কী সমস্যা হতে পারে না? আমার বাবারও তো কানের সমস্যা ছিল, দেখনি?

- তাই যদি হয় তো ডাক্তার দেখাও না কেন?

ডাক্তার দেখিয়েছে বলরাম। রোগের কাঠখোট্টা নাম, প্রেসবাইকিউসিস। ডাক্তার বলেছে, এর কোনো চিকিৎসা নেই, বরং ধীরে ধীরে বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে এই সমস্যা। অবস্থা খুব খারাপ হলে হিয়ারিং এইড লাগাতে হবে।

কথাটা শুনেই বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল বলরাম। কানে যন্ত্র লাগিয়ে কথা শুনতে হবে চিন্তা করতেই ডিপ্রেশন এসে ভর করে মনে। ঠিক করলেন অপেক্ষা করবেন, একদম শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন। বছর কয়েক পরেই তার রিটায়ার করার কথা, ওই পর্যন্ত যদি টেনেটুনে চালানো যায় তাহলেই হলো। বাড়ির ভেতরে যন্ত্র কানে লাগিয়ে শুনতে আপত্তি নেই, অস্বস্তিটা আসলে বাইরে বের হওয়ার সময়, জনসমক্ষে যন্ত্রনির্ভর প্রতিবন্ধীর জীবন অসহ্য মনে হয় তার কাছে।

কিন্তু বলরামের এই মনোভাব বেশি দিন টিকেনি, স্ত্রীর ক্রমাগত চাপের কাছে হার মেনেছে দ্রুত।

- শোন, তোমার এই না শোনার বাতিক কিন্তু আমাদের রিলেশনশিপে ফাটল ধরাচ্ছে। আমি কথা বলব আর তুমি শুনবে না, এটা কি ঠিক হচ্ছে?

- আহা, তেমন বড় কোনো সমস্যা তো হয়নি এখনো, আর ক'টা দিন অপেক্ষা করতে ক্ষতি কী?

- অনেক ক্ষতি, সেটা বুঝলে তো আজই দৌড়াতে ডাক্তারের কাছে।

বলরাম আর দেরি করেনি, বলতে গেলে দৌড়েই যেতে হয়েছে অডিওলজিস্টের কাছে। তবে সব কিছু শেষ হওয়ার পর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্ করলেন কানের ভেতরের ছোট্ট যন্ত্রটা আসলে বাইরে থেকে দেখাও যায় না। দারুণ কার্যকরী একটা বস্তু, এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছেন এটা তার অনেক আগেই নেয়া উচিত ছিল। বিষয়টা ধরিয়ে দেয়ার জন্য ভ্যালেরির কাছে বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বলরাম, তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো

নন্দিনীকে একবারও ধন্যবাদ জানানো হয়নি। কেন? হিয়ারিং এইড নেয়ার পরেও নন্দিনীর কথা না শোনা সম্পর্কিত অভিযোগ বন্ধ হয়নি, এজন্য? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার চাপাচাপিতেই যন্ত্রটা নিয়েছে সে। অতএব একটা সুন্দর ধন্যবাদ তো নন্দিনীর অবশ্য প্রাপ্য। বলরাম তার ভুলের হিসাব কষতে বসলেন, আহ্হা, বড্ড দেরি হয়ে গেছে! আসলে মনস্তত্ত্ব একটা জটিল বিষয়, এতে ভালো-মন্দ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের চেয়ে তাৎক্ষণিক মানসিক অবস্থানটাই মানুষের কর্মপদ্ধতি ঠিক করে। ভুল করা সহজ কিন্তু ভুল শোধরানোর জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টার প্রয়োজন, সেখানেও মনের কর্তৃত্ব।

বলরামের প্রতিটি জন্মদিনে একেকটি করে নতুন বছর যোগ হয় আর সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যগত দুঃসংবাদগুলোও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে একে একে। গত একবছরে ধরা পড়ল ডায়াবেটিস আর অস্টিওআর্থ্রাইটিস। গেল সপ্তাহে চোখের ডাক্তার ঘোষণা দিয়েছেন, তার মেক্যুলার ডিজেনারেশন এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। অর্থাৎ মেডিকেল পরিভাষায় বলরাম এখন লিগালি ব্লাইন্ড। কথাটা শুনে বলরাম হেসে উঠেছিলেন উচ্চস্বরে। কিন্তু ডাক্তার বেশ সময় নিয়ে বিষয়টার গুরুত্ব বুঝালেন তাকে। প্রথমত ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করা হবে, অর্থাৎ আর গাড়ি চালাতে পারবেন না। এবার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে শুরু করলেন বলরাম। ডাক্তারের উপদেশটা কানে বাজতে লাগল, ডিসেবিলিটির বেনিফিট-সহ এক্ষুণি তার কাজ ছেড়ে দেয়ার চিন্তা করা উচিত আর এর পর পরিপূর্ণ অবসরের প্রস্তুতি নেয়া দরকার।

বাড়ি ফিরে ডিনারের পর সংবাদটা জানালেন বলরাম। শুনেই নন্দিনী স্তব্ধ হয়ে বসে পড়ল সামনের সোফায়, বলরামের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন সটান, কয়েক সেকেন্ড পরে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন দুই হাতে মুখ চাপা দিয়ে। নন্দিনী শক্ত মেয়ে, কথায় কথায় কান্নার অভ্যাস নেই তাঁর। হতভম্ব বলরাম পাশে গিয়ে বসলেন, পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন অপ্রস্তুতভাবে।

- আহ্, দেখো দেখি, এতে কান্নার কী হলো? এটা হচ্ছে একটা লিগ্যাল ডায়াগনোসিস, আমি কি আসলে অন্ধ হয়েছি? এই যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট, মুখের সবগুলো ভাঁজ দেখতে পাচ্ছি, চুলের রঙ দেখতে পাচ্ছি, তোমার চোখের পাতা দেখতে পাচ্ছি, এমনকি তোমার ছোট্ট তিল...

খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে বলরাম খেয়াল করলেন নন্দিনীর ক্রন্দন ভারাক্রান্ত অক্ষিপুটের নিচে কুসুম আর্দ্র চোখ, শিশিরের মতো জল বেয়ে নেমে এসেছে ফর্সা গালের মাঝামাঝি, ঠোঁট দুটো ঈষৎ স্ফীত। বলরাম জানেন, কান্নাশেষে কোনো কোনো সুন্দরী রমণীর চেহারা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। নন্দিনী তাদেরই একজন, আটপৌরে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় নন্দিনীকে আজ তার ভীষণ আকর্ষণীয়া মনে হলো। নিকট অতীতের সকল অবহেলা-অনুযোগ ছাপিয়ে তার দুঃসংবাদ শুনে ক্রন্দনরতা নন্দিনীর এই মুহূর্তের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বলরামকে নিয়ে গেল পরিতুষ্টির আনন্দমার্গে। দীর্ঘদিন বলরাম এমনি একটি মুহূর্তের স্বপ্ন দেখেছেন, আজ তার মনে সন্দেহ নেই, এই নন্দিনীকেই ভালোবেসেছে সে আর এই নন্দিনীও তাকে ভালোবাসে। সান্ত্বনা দিতে দিতে অজান্তেই

নন্দিনীর গালে গাল ঘষতে লাগলেন বলরাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখ চলে গেল নন্দিনীর ঠোঁটে। দীর্ঘ আলিঙ্গনের শেষ পহরে বলরাম মনে করার চেষ্টা করলেন শেষ কবে নন্দিনীর ঠোঁটে চুমু খেয়েছেন তিনি। নাহ্, মনে করতে পারলেন না, চোখ আর কানের মতো তার স্মৃতিও বিকল হয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

নন্দিনী কয়েকদিন উচাটন হয়ে থাকলেও বলরাম কিন্তু ভয় পাননি তেমন। হয়তো নন্দিনীর সুপ্ত ভালোবাসার আবিষ্কার তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অথবা কানের সমস্যার পুরোনো অভিজ্ঞতাটাই তাঁকে পোক্ত করে দিয়েছে। স্থির মনে ধীরে ধীরে জরুরি কর্মগুলো গুছাতে শুরু করলেন। ইতোমধ্যেই স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে অগ্রিম রিটায়ারমেন্টের জন্য আবেদন করেছেন। ডিসেবিলিটি বেনিফিটের জন্যও আবেদন করেছেন। বাড়ির দলিলপত্র আর লাইফ ইন্সুরেন্স সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলো ঠিকঠাক করেছেন। উইল করার জন্য এটর্নির সঙ্গে কাজ শুরু করেছেন। এসবই করেছেন ঠাণ্ডা মাথায়, কোন উচ্চবাচ্য না করে।

সেই সঙ্গে ঘরে অনুশীলন শুরু করেছেন অন্ধের লাঠি নিয়ে হাঁটতে, যদিও ডাক্তার বলেছেন এখনও এর প্রয়োজন নেই। নন্দিনী কিছু বলে্ন না, অভিযোগ অনুযোগ সব এখন তার অতীত স্মৃতি। বলরাম প্রায়ই কসরত করেন চোখ বন্ধ করে এবং হিয়ারিং এইড ব্যবহার না করে স্পর্শের মাধ্যমে বুঝতে। জিনিসপত্র হাতড়ে হাতড়ে ঠিকই এখন টের পেয়ে যান কোনটা কী। দেখা ও শোনা বন্ধ করে দেখেছেন তার স্মৃতিশক্তি বেড়ে যাচ্ছে, চিন্তার ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে। অনেক কিছুই এখন বুঝেন যা আগে বুঝতে পারতেন না। এটাকেই কি মেডিটেশন বলে? নিজের ভিতরে অন্তর্লীন হওয়া, মনকে শৃঙ্খলমুক্ত করা?

৩

গেল রাতে বলরামের ঘুম ভালো হয়েছে, তবে ঘুম থেকে উঠেছেন প্রচণ্ড ঘাম নিয়ে। বুকে সামান্য চাপও অনুভব করেছেন, সাথে হালকা মাথাব্যথা। ভাবলেন নিয়মমাফিক কফির মগে কয়েক চুমুক দিলেই শরীরটা ঝরঝরে হয়ে উঠবে। হঠাৎ ঘরটাকে তার খুব গুমোট মনে হলো, চিন্তা করতেই মনে হলো আবদ্ধ ঘরে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। দরজা খুললেন, কফির মগটা হাতে নিয়েই বারান্দায় বের হলেন আগের মতো। চোখের সমস্যার পর একা বাইরে বের হন না, ডাক্তারের বারণ। আজ এই নিষেধ ভাঙ্গলেন।

দীর্ঘদিন পরে ব্যালকনিতে আসা। এই ব্যালকনি ছিল তার এবং নন্দিনীর খুব প্রিয় জায়গা। চেহারাটা আগের মতোই আছে, শুধু একটু বুড়িয়ে গেছে। বাড়ি কেনার পর প্রথম রাতেই খোলা আকাশের নীচে এখানে কাটিয়েছিলেন মাঝরাত পর্যন্ত। তারা ভরা চাঁদনি রাত ছিল সেটা। নন্দিনীর ভরা যৌবন ছিল। পৃথিবী আরও সবুজ ছিল। এইসব সুখস্মৃতি দুঃখ আনে, তাই পর্দা সরিয়ে দেয়ার মতো আলতো করে সরিয়ে দিলেন চিন্তাটুকু। বলরাম বেশ রপ্ত করেছেন ধ্যানযোগের এই কৌশল, ডিটাচমেন্ট!

চেয়ারে না বসে রেলিং ধরেই দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। গাছে গাছে রঙ ছড়ানো হেমন্তের ভোর, এই সময় পৃথিবী খুব সুন্দর, কিন্তু বলরাম এখন ঝাপসা দেখেন, সুন্দর পৃথিবীটাকে সুন্দর করে দেখার অধিকার হারিয়েছেন কে জানে কোন অপরাধে? হঠাৎ খেয়াল করলেন, আজ হিয়ারিং এইড ছাড়াও পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছেন। দূরের জিনিসগুলো স্পষ্ট না দেখলেও কাছের জিনিস দেখতে পাচ্ছেন কিছু কিছু। জানেন এইটুকুও শেষ হয়ে যাবে এক সময়।

বলরামের মনে হলো ঘুম থেকে উঠে নন্দিনী তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, নন্দিনীকে এবার বলবেন সামনের দৃশ্যগুলোর বর্ণনা দিতে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যেমন সঞ্জয় বর্ণনা দিয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের। বলরাম ধর্মে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ধর্ম নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা আছে তার। গীতার এই প্লটটা খুবই রহস্যময় মনে হয়েছে তার কাছে। বলরাম নিজেকে ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে উপস্থাপন করলেন। তার রাজ্য ছিল না, কিন্তু সংসার ছিল। সেই সুখী সংসারের ছেলেরা এখন কলহে লিপ্ত। সঞ্জয়ের জায়গায় এখন নন্দিনীর মুখে এই কলহের বর্ণনা শুনছে। তার মনে হলো, অন্ধ বৃদ্ধ অসহায় রাজন, কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থামাবার শক্তি নেই যার, দেখারও ক্ষমতা নেই, শুধু শুনে কী লাভ তার?

কিন্তু একটু চিন্তা করতেই বলরাম নিজেকে অর্জুনের জায়গায় দেখলেন। অন্যায়কে থামাবার ক্ষমতা আছে তার যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে। কিন্তু এত রক্তপাত কার বিরুদ্ধে? অর্জুনের মতোই পিছিয়ে থেকেছেন বলরাম। অর্জুনের ছিল কৃষ্ণ, বলরামের কেউ নেই। বস্তুত বলরাম বড়ই একা।

হঠাৎ বলরামের খেয়াল হলো নন্দিনী কিন্তু সশরীরে নেই, তবে কি তার ছায়ামূর্তি? কানে কানে ঠিকই ধারা বিবরণী দিচ্ছে – টেনিস খেলছে দুই তরুণী, সামনের মাঠে শরী চর্চা করছে প্রৌঢ় নারপুরুষ, লেক পারের জগিং ট্রেইল ধরে দৌড়াচ্ছে দম্পতি, সকালের ট্রেন গেল ভেঁপু বাজিয়ে, গাছে গাছে ঝরা পাতার মর্মর, এক ঝাঁক পরিযায়ী পাখি উড়ে উড়ে আসে যায়...

আশ্চর্য হয়ে বলরাম খেয়াল করলেন তার দৃষ্টি আর ঝাপসা নয় এখন, পুরোটা দৃশ্যই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন সামনে। ছিটকে নেটের বাইরে আসা একটি টেনিস বলের পেছনে ছুটছে হলুদ জ্যাকেট পরা একটি বালক। বলরাম দেখতে পাচ্ছেন বলটি দ্রুতগতিতে যাচ্ছে রাস্তার দিকে, একটি গাড়ি আসছে ধেয়ে। আতঙ্কিত বলরাম চিৎকার করে বলছেন ছেলেটিকে রাস্তার দিকে না যেতে। নন্দিনী ফিস ফিস করে জানাল ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। স্পষ্ট দেখলেন, লাল রঙের মার্সেডিজ গাড়িটি ধেয়ে এলো উত্তর দিক থেকে। ছেলেটা ছিটকে পড়ল রাস্তায়, চেহারাটা এক ঝলক দেখেই খুব চেনা মনে হলো, বহু বছর আগে যুদ্ধে নিহত তারই সন্তানের মুখ। ততক্ষণে হলুদ শাড়ি পড়া যে মেয়েটি গাড়ির দরজা খুলে উদভ্রান্তের মতো বের হয়ে এলো, সে যেন দেখতে অবিকল নন্দিনীর মতো। বুক চাপড়ে বারবার বলছে, এটা কেমন করে হলো, কেমন করে হলো?

বলরামের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো আবার আগের মতো। কল্পনা ছেড়ে এবার বাস্তবে ফিরে আসার কসরত করতে লাগলেন, কিন্তু পারছেন না। মাথা ঝিম ঝিম করতে শুরু

করল, ঘুম ও স্বপ্নের মাঝামাঝি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নিরুপায় হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন বলরাম। সহসাই স্মৃতির বায়োস্কোপ চালু হয়ে গেল। মাথা হেলিয়ে দিয়ে, চোখ বন্ধ করে স্বপ্নের দৃশ্যগুলোতে আত্মসমর্পণ করলেন বলরাম অনাবিল অনাগ্রহ সহকারে। শৈশব থেকে শুরু হওয়া সবগুলো দৃশ্য জ্যান্ত হয়ে ভেসে উঠছে। কিন্তু আবেগহীন বলরামের মনে হলো অবশেষে বিচ্ছিন্নতার সূত্র পেয়ে গেছেন, দৃশ্যগুলো আসছে একের পর এক, অথচ আনন্দ-অভিলাষ, রাগ-দুঃখ, ক্লেদ-ক্লেশ কিছুই অবশিষ্ট নেই তাতে, শুধুই ঘটনা। বলরাম এখন বোধহীন সুষুপ্তির জগতে ভাসমান। অতঃপর, তুরীয় দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলরামের মনে একসময় বিশাল সমুদ্রে এক বিন্দু লবণ কণিকার দ্রবীভূত হওয়ার মতো একান্ত উপলব্ধির জন্ম নিল হঠাৎ।

সেদিন হিমঝরা হেমন্তের ভোরে দেহত্যাগী বলরামের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল বলে ধরে নেয়া হয়। নন্দিনী তখনও গভীর ঘুমে। বস্তুত বলরামের একদা পরিচিত পৃথিবীর অর্ধেক অংশই তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। বাকি অর্ধেক জুড়ে প্রভাতী সূর্যের আলো।

জেলিকো, টেনেসি, যুক্তরাষ্ট্র

হৃদবাংলা ২০২১ প্রকাশনা উপলক্ষে
উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য পরিষদকে
আন্তরিক অভিনন্দন

আপনাদের বাংলা ভাষা প্রীতি ও সাহিত্যচর্চার স্পৃহা
অব্যাহত থাকুক

নাহিদা সরকার, এমডি
(নভেম্বর ১৯৬০- জুন ২০১৮)
স্মরণে

ফজলে মতিন, এমডি | তাসনিয়া মতিন, এমডি | সানিয়া মতিন

৩ প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা ৩

অতনু চক্রবর্ত্তী

আনন্দমোহন চক্রবর্তীর জীবন্ত পেটেন্ট

এই লেখাটা শুরু করবার আগে একটা প্রশ্ন করি আপনাদের।

আচ্ছা বলুন তো কিসের পেটেন্ট হয়?

আপনারা বলবেন, কোন নতুন ধরণের ধাতু আবিষ্কার, নতুন কোন রাসায়নিক উদ্ভাবন, ভৌত বিজ্ঞানে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা নতুন কারিগরি পদ্ধতির পেটেন্ট হয়।

কিন্তু জীবন্ত কোন কিছুর পেটেন্ট হয় কি?

আপনার কপাল কুঁচকোবেন। কেউ হয়তো আমতা আমতা করে বলবেনও, যে এ কেমন কথা বাপু! জীবন্ত কিছুর পেটেন্ট হয় নাকি? যদি হয়ও বা তার কৃতিত্ব তো প্রকৃতির। সেই কৃতিত্ব আবার মানুষ নেয় কেমন করে?

কিন্তু এই মানুষটি বলেছিলেন, জীবন্ত কোন কিছুর পেটেন্ট হতেই পারে। আর সেই কৃতিত্ব কোন মানুষ নিতেও পারে।

অবশ্য তার কথার পেছনে যুক্তি ছিল। মানুষটি সিউডোমোনাস ব্যাক্টেরিয়াকে জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অয়েল ইটিং ব্যাকটেরিয়ায় (তেল ভক্ষণকারী ব্যাকটেরিয়া) রূপান্তর করেছিলেন। এটা যখনকার কথা বলছি, এই ধরণের ব্যাক্টেরিয়া অবশ্য তখনও ছিল। শিল্পক্ষেত্রে এইসব ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব ছিল ব্যাপক। কিন্তু এদের ব্যবহার অর্থনৈতিকভাবে খুব একটা লাভজনক ছিল না।

সময়টা গত শতাব্দীর নব্বই এর দশকের গোড়ার দিক। তখন জিন প্রকৌশলের বৈপ্লবিক যুগ সবে ডানা মেলছে। যে মানুষটির কথা বলছি তিনি জেনেটিক ক্রস লিংকিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন এক ব্যাক্টেরিয়ার প্রজাতির সন্ধান দিলেন। এই প্রজাতিটি ভীষণ দ্রুত কাজ করতে সক্ষম, অর্থনৈতিক দিক থেকেও বেশ কার্যকরী। কিন্তু ঝামেলা বাধল তার পেটেন্ট চাওয়া নিয়ে। অজৈব ক্ষেত্রগুলিতে পেটেন্ট না হয় দেওয়া যায়, কিন্তু জলজ্যান্ত একটা ব্যাক্টেরিয়া তৈরির আবার পেটেন্ট হয় নাকি?

এই তর্কের সূত্র ধরে আমেরিকার পেটেন্ট অফিসের তখনকার কমিশনার ডায়মন্ড সাহেবের সঙ্গে লড়তে আদালত অব্দি গিয়েছিলেন এই বঙ্গসন্তান। রায়টা শেষপর্যন্ত

গেছিল ঐ বঙ্গসন্তানের পক্ষে। সেটিই ছিল আমেরিকাতে সর্বপ্রথম জিনগত ভাবে পরিবর্তিত জীব (genetically modified organism)-এর ওপর পেটেন্ট। আজও ডায়মন্ড বনাম চক্রবর্তী কেসটা মানুষের মুখে মুখে ফেরে।
এই বঙ্গসন্তানটির নাম আনন্দমোহন চক্রবর্তী। জন্মেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সাঁইথিয়ায়। শিক্ষাজীবনে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ও সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পড়াশোনা শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছিলেন। ২০০৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধি প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় শিকাগোতে স্কুল অফ মেডিসিনের অধ্যাপক ছিলেন। ব্রাসেল্সের ন্যাটো বা উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোটের বাণিজ্যিক উপদেষ্টা গ্রুপের সদস্য হিসাবেও কাজ করেছেন। ছিলেন আইনস্টাইন ইনস্টিটিউট ফর সায়েন্স-এর স্বাস্থ্য এবং বিচার বিভাগের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি শেষ করে আনন্দমোহন পাড়ি জমান মার্কিন মুলুকে। সেখানে গবেষক হিশেবে যোগদান করেন জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। এখানে থাকবার সময়ই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন সিউডোমোনাসের নতুন প্রজাতিটি। তখন অনেকেই সমুদ্রে বিভিন্ন যানবাহন, ট্যাঙ্কার থেকে ছড়িয়ে পড়া তেল বিশোধন নিয়ে গবেষণা করছিলেন। নতুন ব্যাকটেরিয়ার প্রজাতিকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের তেলকণাকে বিপাকের মাধ্যমে জলে দূষণের মাত্রা হ্রাস করাই ছিল তার এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার পেটেন্ট আইনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা ছিল যে কোন জীবন্ত বস্তু কখনওই পেটেন্টযোগ্য নয়।

“Living things were generally understood to not be patentable subject matter under Section 101 of Title 35 U.S.C.”

এদিকে আনন্দমোহন চক্রবর্তী পাল্টা যুক্তি দেখালেন। সিউডোমোনাস ব্যাকটেরিয়া প্রাকৃতিক - একথা ঠিক। কিন্তু তার জিনগত প্রকৌশল করে তাকে সমুদ্রের জলে ভাসমান তেলের দূষণ কমানোর কাজে লাগানো - এটা বৈজ্ঞানিক আনন্দমোহনের নিজের সৃজনশীলতার অবদান। সেখানে প্রকৃতির কোন হাত নেই।

এরপরের ঘটনা তো লেখার প্রথমেই বিশদে বলা হয়েছে।

কিন্তু এ-ই শেষ নয়। আনন্দমোহনের পরবর্তী জীবনের গবেষণা ছিল আরও চমকপ্রদ। পরবর্তীতে তিনি গবেষণা করেছিলেন আজুরিন নামের এক ধরণের ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন নিয়ে। যা থেকে ক্যান্সারের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াবিহীন ওষুধ তৈরি করা সম্ভব। এই গবেষণা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অব্দিও অগ্রসর হয়েছে।

আজুরিন নিজেও সিউডোমনাস ব্যাকটেরিয়া থেকে পাওয়া এক ধরণের প্রোটিন যেটিতে এমিনো এসিড রয়েছে সব মিলিয়ে ১২৮ টি। (প্রোটিন হল অনেকগুলো এমিনো এসিড দিয়ে তৈরি লম্বা শিকল।) এর গঠনে কিছু নির্দিষ্ট এমিনো এসিডের শিকল

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কাজ করে। এখন এই কাজটা ব্যাকটেরিয়া কীভাবে করে সেটা সম্পর্কে চলুন জানি।

আসলে কিছু ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যারা ক্যান্সারের কোষ দেখলেই কিছু প্রোটিন নিজেদের দেহ থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেয় ওই ক্যান্সার কোষের মোকাবেলা করবার জন্য। এই প্রোটিনগুলিকে বলা হয় এন্টি-ক্যান্সার প্রোটিন। এইসব প্রোটিন ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের মধ্যে ঢুকে যেসব প্রোটিন ওই ক্যান্সারকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে তাদের ধ্বংস করে। এখন আনন্দমোহন দেখতে চাইলেন ওই প্রোটিনের কোন অংশটি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কাজ করে। কারণ সেই অংশটিকে শনাক্ত করা গেলে পরবর্তীতে তা কার্যকরী ওষুধ হিশেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই পদ্ধতিতে প্রতিষেধক তৈরি করা বেশ উপকারী। কারণ আজকের দিনে প্রোটিন সংশ্লেষণ খুব ব্যয়বহুল বা শক্ত কাজ নয়।

আনন্দমোহনের এই ধারণা সত্যি হলো। তার গবেষণায় বেরিয়ে আসলো আজুরিন প্রোটিন থেকে পি২৮ (P28) নামের ২৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারা তৈরি পেপটাইড শিকলটি যা ক্যান্সার প্রতিরোধী ধর্ম প্রদর্শন করে। পরবর্তীতে এই প্রোটিন ব্যবহার করে যে নতুন ধরণের ক্যান্সারের প্রতিষেধক তৈরি করা হলো তার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গেল প্রচলিত অন্যান্য থেরাপির তুলনায় এই প্রতিষেধকটির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেকখানি কম। রোগীদের সেরে উঠবার হারও অনেক বেশি।

আনন্দমোহন চক্রবর্তীর হাত দিয়ে জন্ম নেওয়া এই নতুন ধরণের ক্যান্সার প্রতিষেধকের একটি ফেজ-১ (phase-I) ক্লিনিকাল ট্রায়াল (clinical trial) চালানো হয়। ২০০৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত শিকাগোতে চলা এই ট্রায়াল ছিল ১৫ জন চতুর্থ স্তরের (stage IV) গুরুতর ক্যান্সার রোগীর ওপর। এদের ক্ষেত্রে অন্য কোন ওষুধই আর কাজ করছিল না আর প্রত্যাশিত আয়ু ছিল সর্বাধিক ৬ মাস। অথচ ট্রায়ালের সময়সীমার শেষে দেখা যায় এই ১৫ জনের মধ্যে দুইজন পুরোপুরি সেরে উঠেছে। বাকিদের অবস্থাও অনেকটাই ভাল। এই ওষুধ শুধুমাত্র ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের বিরুদ্ধেই কাজ করে আর তাই আশেপাশের সুস্থ কোষেরও বিশেষ ক্ষতি হয় না। এইজন্যেই এই প্রতিষেধক ব্যবহারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও অনেক কম হয়। ২০২০ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র থেকে দেখা যায় পরবর্তী আরও বেশ কিছু ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে আজুরিন নিরাপদ একটি ক্যান্সার প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করছে। পরবর্তী পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের অগ্রগতিও আশাপ্রদ।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে মানুষটির জন্য বিশ্ব এই প্রতিষেধক পেল, যে মানুষটি এই অগ্রগতি দেখে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন, সেই মানুষটিকে আমরা এই ২০২০ সালেই হারিয়ে ফেলেছি। ২০২০ সালের ১০ জুলাই বাঙলার এই বরেণ্য সন্তান মৃত্যুবরণ করেন। যে অল্প ক'জন বাঙালি বিজ্ঞানী তাদের কাজ দ্বারা আন্তর্জাতিক গবেষণাক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়ে আছেন আনন্দমোহন তাদেরই একজন। আনন্দমোহন তাই রয়ে যাবেন গবেষণাক্ষেত্রে রেখে যাওয়া তার প্রতিটি দৃপ্ত পদক্ষেপে, থেকে যাবেন

অসংখ্য ক্যান্সার রোগীর বেঁচে থাকার আশার আলো হয়ে, অণুজীববিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রের কাছে 'প্রফেসর সিউডোমনাস' হয়ে।

(আনন্দমোহন চক্রবর্তীর নাম আমায় প্রথম জানান ডাক্তার সৌমিত্র চক্রবর্তী। - লেখক)

উদ্ধৃতি

১। Huang, F., Shu, Q., Qin, Z. *et al.* Anticancer Actions of Azurin and Its Derived Peptide p28. *Protein J* 39, 182–189 (2020).

২। Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

৩। Kevles, DJ (1994). "Ananda Chakrabarty wins a patent: biotechnology, law, and society". Hist Stud Phys Biol Sci. 25 (1): 111-35.

অবার্ণ, আলাবামা, যুক্তরাষ্ট্র

আনোয়ার ইকবাল

কালো আর ধলো বাহিরে কেবল...

১

সিডনি পয়টিয়ারের অস্কার পাওয়া ছবি ‘ইন দ্য হিট অফ দ্য নাইট’ ইউ এস আই এস-এর সৌজন্যে ঢাকায় বসে দেখা হয়েছিল সত্তর দশকের শেষভাগে। তারও কিছুদিন পরে বিটিভি দেখালো ‘রুটস’। কৃষ্ণবর্ণের মানুষেরা পশ্চিমা দেশগুলোতে যে নির্মম বর্ণবৈষম্য আর সাম্প্রদায়িকতার শিকার, সাহিত্য, পত্র পত্রিকা আর চলচ্চিত্রের কল্যাণে সে ব্যাপারে আমাদের একটা সচেতন ধারণা দেশে বসেই ছিল। আর গোটা আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে কালোদের ওপর সাদা ঔপনিবেশিক পশ্চিমাদের নির্মম নিষ্পেষণের বহু গল্প তো সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি। তবু, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর যখন আমেরিকা আসার ব্যাপারটা গুছিয়ে আনছিলাম, বর্ণবৈষম্য আর সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে তেমন একটা মাথাব্যথা আমার হল না। কি কপাল, দেশ ছাড়ার চব্বিশ ঘণ্টা পেরুতে না পেরুতেই সেই সাম্প্রদায়িকতা আর বর্ণবৈষম্যের মুখোমুখি হতে হল আমাকে।

ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় চৌত্রিশ বছর আগে বিলেতের মাটিতে। আশপাশের দেশগুলোতে কিছু যাওয়া আসা করলেও, পশ্চিমা দেশে সেই আমার প্রথম পদার্পণ। হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আমার লন্ডন-বাসী খালা যেমন যেমন বলে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমন করেই আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন খুঁজে পিকাডেলি লাইনের ট্রেন ধরেছি। গাট্টি-বোঁচকা সামলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। একটি খালি সিটের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, একপাশে দেখলাম দু’জনের একটা গদিমোড়া বেঞ্চের অর্ধেকটা খালি। বাকি অর্ধেকটা দখল করে যে ভদ্রমহিলা বসে আছেন তার বয়েস হবে সত্তরের কাছাকাছি। গাত্রবর্ণ ফ্যাঁকাসে লালের কাছাকাছি, বুঝলাম তিনি একজন বিলিতি মেমসাহেব। পরনে খুব পুরনো হয়ে যাওয়া ফুলেল নকশার একটি ফ্রক, মোজা-হীন পায়ে বহুব্যবহৃত একজোড়া জুতো আর হাতে জীর্ণ কুঁচকানো চামড়ার একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। পাশে গিয়ে বসতেই মনে হলো আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল তার। কিছুক্ষণ উসখুস করে একসময় সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, তারপর আমার

পা মাড়িয়ে একটু দূরে দুই সারি সিটের মাঝামাঝি একটি পোস্ট আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কামরাভর্তি প্যাসেঞ্জার, একটা আসনও খালি নেই। ছেড়ে যাওয়া সিটটাতে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে যিনি ঝুপ করে বসে পড়লেন, আন্দাজ করলাম তিনি আমার স্বদেশী। মুখ খুলতেই নিশ্চিত হলাম, পরিষ্কার সিলেটি ভাষায় তিনি আমাকে বললেন, 'দেখলেন বুড়ী কেমন রেসিস্ট?'
'মানে?'
'দেখলেন না আপনি পাশে বসেছেন বলে সে উঠে চলে গেলো?'
'তাই?'
মহিলার উঠে যাওয়াটা আমার কাছে কিছুই অস্বাভাবিক মনে হয় নি। ভেবেছিলাম হয়তো সামনের স্টেশনই তার গন্তব্যস্থল, তাই দরজার কাছাকাছি দাঁড়াতে সিট ছেড়ে উঠে গিয়েছেন। দেশি ভাইয়ের দেয়া ঘটনাটির এমন একটি সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা পেতে মনটা কেমন দমে গেল। বিলেত তো কেবল আমার ট্রানজিট, আরও পশ্চিমে, আমার আসল গন্তব্যে না জানি কি দুর্ভোগ অপেক্ষা করে রয়েছে?

২

কুন্তা কিন্তে-এর দেশে প্লেন চাকা ছোঁয়াতেই লন্ডনের ঘটনাটা আচমকা মনের পর্দায় ভেসে উঠল। আমেরিকা আসার রোমাঞ্চ ছাপিয়ে সাম্প্রদায়িকতা আর বর্ণবৈষম্যের দুশ্চিন্তা প্রথমবারের মতো আমাকে জাপটে ধরল। পা মাড়াবার মতো গাত্রবর্ণের মানুষেরা জেএফকে'র টার্মিনাল জুড়ে গিজগিজ করছে। ইমিগ্রেশন-কাস্টমস পেরিয়ে বাইরে এসে খালাতো ভাইয়ের দেখা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক বাবা, আমার দায়িত্ব এখন ওনার। আমার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, খিদা পেয়েছে, নাকি জার্নির ধকলে ক্লান্ত?' প্রথমে মিনমিন করে কয়েকবার না, না করে শেষমেশ ভেতর থেকে উগরে দিলাম, 'আচ্ছা ভাইয়া, সাদারা কি সত্যি খুব রেসিস্ট?' প্রশ্নটা শুনে ভাইয়া খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'কিছুটা, তবে টেনশন করার মত কিছু নয়।'
গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল ধরে কুইন্সের দিকে গাড়ি ছুটছে, নানা কথাবার্তার ভেতর একসময় এই প্রসঙ্গে নিজেই ফিরে এলেন, বললেন, 'দেখ, সাদারা হয়তো সাম্প্রদায়িক, কিন্তু ওরা চতুর জাত, সহজে তোকে ভেতরটা বুঝতে দেবে না। ওরা কোন সমস্যা নয়। বরং আমাদের সমস্যা অনেক জটিল কালোদের নিয়ে। এদেশে ওরাই দেখবি বেশি জ্বালাচ্ছে। গালাগালি করবে, মারবে, টাকা পয়সায় কেড়ে নেবে; গা বাঁচিয়ে চলতে হলে ওদেরকেই সমঝে চলিস। আর হচ্ছে পুয়ের্তোরিকান, এরা আরও বিপজ্জনক; মাগিং, চুরি, ডাকাতি আর অহেতুক হেনস্থা করাতে ওরা কালোদের থেকে আরেক কাঠি বাড়িয়া'
তাই নাকি? এ আবার কি ঝামেলা? লন্ডনের অভিজ্ঞতায় সাদাদের নিয়ে উৎকণ্ঠা এখনো মাথা থেকে গেল না, এর সাথে উনি আবার জুড়ে দিলেন কালো আর পুয়ের্তোরিকানদের? মনটা খারাপ করে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই আঁতকে

উঠলাম, রাস্তায় যা মানুষ দেখছি দুয়েকজনকে বাদ দিলে সবই তো হয় সাদা, নয় কালো, নয় পুয়ের্তোরিকান। এদের সবার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবো কীভাবে? একবার ভাবলাম বলি, ভাইয়া, আমার দরকার নাই এদেশে থাকার, গাড়ি ঘোরাও, জেএফকেতে ফের নামিয়ে দাও, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই!

৩

না! ফিরে যাওয়া হয় নি। গেলে হয়তো আমার বাকি জীবনটা এদেশের মানুষ আর সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা নিয়ে কাটত।
ছাত্রজীবনের আমেরিকায় আমার প্রথম চাকরি একটা ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে। আশির দশকের শুরুতে নিউইয়র্ক শহরে মাফিয়াদের তখনও প্রকাশ্য অবস্থান। এই রেস্টুরেন্টটা যে তাদের প্রিয় আড্ডাখানা, কাজে যোগ দিয়ে সেটা বুঝতে অল্প ক'দিন লাগল। রেস্টুরেন্টের মালিক নিজেও যে একটা ছোটখাটো সিন্ডিকেট চালান সেটাও দু'দিনেই টের পেয়ে গেলাম। ব্যাপারটা নিয়ে সাময়িক অস্বস্তি হলেও তেমন পরোয়া করলাম না। মালিকের ছেলে আমার সমবয়সী, সে-ই রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার। সপ্তাহ না ঘুরতেই ওর সাথেও ভালো অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল। শুধু সে নয়, বারটেন্ডার, শেফ, পিয়ানোবাদক আর ওয়েটার, যাদের সবার চাইতে ছোট একটা কাজ আমি করতাম, দেখলাম তারা কেউই আমার সাথে বস-গিরি করে না। রেস্টুরেন্টের মালিক বা ভয়ঙ্কর সব খদ্দেররাও না। উপমহাদেশীয় সামাজিক শ্রেণীবিভাজনে আমি অভ্যস্ত, প্রচলিত ধ্যানধারণার বিপরীত এই পরিবেশটা খুবই বিভ্রান্তিকর মনে হল।
সেই রেস্টুরেন্টের সহকর্মী আর ক্যাম্পাসে সহপাঠীদের নির্মল বন্ধু-সুলভ ব্যবহারে সাম্প্রদায়িক শুভ্রবর্ণভীতিটা তাড়াতাড়িই কেটে গেল। তবে কালো আর পুয়ের্তোরিকান সম্পর্কিত যে ভয়টা ভাইয়া আমার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন সেটা কিন্তু অত সহজে গেল না। সেসময় ভরদুপুরেও রাস্তার এপাশে দুটো কালো মানুষের উপস্থিতি দেখলে ওপাশের ফুটপাথে সরে যেতাম। পুয়ের্তোরিকানদের জটলা যেসব পাড়ায়, পারলে তার ধারেকাছেও ঘেঁষতাম না। পুয়ের্তোরিকানের ভয় কী করে কাটল সেটা পরে আসছে, তার আগে কালোদের নিয়ে কিছু কথা।
পেশাদারি জীবনে আমার আমার প্রথম চাকুরী যে ফার্মে, সেটা একটা সংখ্যালঘু মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যাকে এদেশে বলে 'মাইনোরিটি ওউন্ড কোম্পানি'। আমার কোম্পানির মাইনোরিটি মালিকেরা সবাই কালো। শুরুতে গা ছমছম করলেও, খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারলাম শিক্ষা, ভদ্রতা আর সফিস্টিকেশনের দিক দিয়ে এই কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থান যে কোন গড়পড়তা মানুষের উপরে। তবে কালো সম্প্রদায় নিয়ে ভুলটা ভেঙ্গেছিল এই চাকুরী শুরু করারও বেশ আগে। আমার এক বন্ধু প্রেমে পড়ে বিয়ে করলো কৃষ্ণাঙ্গিনী এক মেয়েকে। একবার সে আমাকে নিয়ে বেড়াতে গেল তার শ্বশুরালয়ে। শহর থেকে দূরে এক গ্রামে বিশাল একান্নবর্তী পরিবার। জামাই তার বন্ধুকে নিয়ে এসেছে, দেখলাম বাড়িতে ভালোই হইচই শুরু হল। না, মৌলভীবাজার বা

সুনামগঞ্জে শ্বশুরবাড়ীতে জামাই আর তার বন্ধুদের সম্মানে যেমন গোটা খাসি পড়ে যায়, জ্যাকিদের বাড়িতে ঠিক তেমনটি হয়নি; তবে খাসি জবাইয়ের কালচার এদেশে থাকলে সেটা যে ঘটতই তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণাঙ্গ একটা পরিবারকে সেই প্রথম খুব কাছে থেকে দেখা। ওর থেকেই পরিচিত হলাম তাদের আচার, ব্যবহার, আন্তরিকতা আর পারিবারিক বন্ধনের সাথে। জানাশোনা হল প্রতিবেশী আরো কিছু কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের সাথে। মনে হল যেন আমাদের দেশের কয়েকটা সহজ সরল মফস্বলী পরিবারের সাথে সময় কাটাচ্ছি।

ভিন্ন-জাতের মানুষ সম্পর্কে আমাদের প্রবাসীরা অনেকেই নানান ধরনের অস্বস্তিতে ভোগেন। কিন্তু কেন? যে দেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভিন্নবর্ণ, ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষেরা দরজা খুলে ধরে আপনাকে আগে ঢুকতে দেয়, রাস্তা পেরুচ্ছেন তাই গাড়ি থামিয়ে আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, চলতি পথের অচেনা মানুষগুলো আপনাকে শুভ সম্ভাষণ না জানিয়ে কখনো পাশ কাটিয়ে যায় না, তাদের নিয়ে কেন আমাদের এই অস্বাচ্ছন্দ্যটা? কারণ, এই মানুষদেরই কেউ একজন হঠাৎ এমন একটা কিছু করে বসে, যা প্রচলিত ভ্রান্তিগুলোকে অহেতুক প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে।

৪

সাম্প্রতিক ঘটনা; ক্লায়েন্টের সাথে মিটিং সেরে ফেরার পথে সাবওয়ের অপেক্ষায় ডিসি-এর জুডিশিয়ারি স্কয়ার স্টেশনের প্লাটফর্মে ওয়াশিংটন পোস্টের পাতা ওল্টাচ্ছি। সেই লন্ডনের মেমের বয়েসি এক বৃদ্ধা পাশে বসা । লক্ষ্য করলাম মহিলা আমার দিকে বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন। যে ভাবে সেটা করছেন সেভাবে এদেশে সাধারণত কেউ করে না। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমাকে কি কিছু বলতে চাইছ?’ ভদ্রমহিলা একটু ইতস্তত করে শেষে বললেন, ‘কিছু মনে করো না, তুমি যে কাগজটা ধরে আছো সেটা কি তুমি পড়তে পারো?’ আমি তো শুনে অবাক, ডিসি-এর মেট্রো এলাকাতে আমার মতো দেখতে মানুষকে আজকাল এধরনের প্রশ্ন কেউ করে না। তা ছাড়া ক্লায়েন্ট মিটিং বলে সেদিন পুরোপুরি ধোপদুরস্ত হয়েই বেরিয়েছি। শুধু পোশাক বিবেচনায়ও সেদিন আমার শিক্ষিত হিসেবে উতরে যাওয়া উচিৎ ছিল। রাগটা চেপে রেখে শান্ত স্বরেই বললাম, ‘আমি পারি, তুমি কি পারো?’ মহিলা বলল, ‘নিশ্চয়!’ মেজাজটা খারাপ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কথা বাড়ালাম না; প্লাটফর্ম কাঁপিয়ে ট্রেনটাও তক্ষুণি এসে গেল। ট্রেনের কামরায় মাত্র গোটাকয়েক যাত্রী। অসংখ্য সিট খালি তবু কেউ একজন এসে আমার পাশেই বসলো। তাকিয়ে দেখলাম সেই মহিলা। মহিলা আবার নূতন করে আলাপ শুরু করলেন, ‘তুমি কি আমার কথায় অফেন্ডেড হয়েছ?’

ভদ্রতা করে বললাম, ‘না!’

‘শোন, আমার প্রশ্নটা তোমার কাছে হয়তো অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। আসলে জানো, আমি যে অজ পাড়াগাঁয়ে জীবন কাটিয়েছি, সেখানে তোমার মতো মানুষ এ’পর্যন্ত দেখি নি। মেয়ের কাছে বেড়াতে এসে প্রতিদিন এখানে এতরকমের মানুষ দেখে আমি অবাক

হয়ে যাচ্ছি। তোমরা কারা, পৃথিবীর কোন প্রান্তে তোমাদের বাড়ি, এসব প্রশ্ন সারাক্ষণ মাথায় ঘুরতে থাকে। মেয়েটাকে জিগ্যেস করলেও ধমক খেতে হয়। কৌতূহল না মেটাতে পেরে অমন অভব্য প্রশ্ন করেছি।'

কথাটা শুনে যতটা অবাক হওয়া উচিৎ ছিল ততটা কিন্তু হই নি। কারণ, এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষেরা তো এমনই। তা ছাড়া, বহুদিন আগেই আমার পুয়ের্তোরিকান বন্ধু হেসুস গেরুলাইটিসও আমাকে আমার সেই ব্রিটিশ সহযাত্রীর সাম্প্রদায়িক আচরণেরও গ্রহণযোগ্য একটা সদুত্তর দিয়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, ভাইয়া যে পুয়ের্তোরিকানদের ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছিলেন তাদের অনেকের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। এক সন্ধ্যায় প্রায় নির্জন একটি রাস্তা ধরে হেঁটে আসছিলাম। এক জায়গায় আসতেই দেখলাম আমার বয়সী একটি ছেলে, হুডি দিয়ে মাথা ঢাকা, এক পা পেছন দিকে ভাঁজ করে পথের ধারের এক দালানের দেয়ালে ঠেকান, অন্য পা ফুটপাথে। আমি কাছাকাছি পৌঁছালে সে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। আমি শঙ্কিত হলাম। ভাবলাম, আজ আমার জান-মাল সবই হয়ত যাবে। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাতে সেই সন্দেহ আরও পোক্ত হল। নির্ঘাত ছুরি বের করবে। না। পকেট থেকে বেরোল সিগারেটের প্যাকেট, 'আগুন হবে তোমার কাছে?' কৃতজ্ঞচিত্তে লাইটার ঠুকে ওর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর সে আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। কথায় কথায় জানলাম ও একজন ভাবী আইনজ্ঞ, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ডক্টর অব জুরিস্প্রুডেন্সের ক্যান্ডিডেট। মনে মনে লজ্জিত হলাম, একচোখোমি জিনিসটা কি আমাদের কারও চেয়ে কম? দূর থেকে মানুষকে দেখে তাদের আমরা ঝটপট মাপতে শুরু করি। হেসুস আমার অ্যাপার্টমেন্টের কাছেই থাকত। আসা-যাওয়ার পথে দেখা আর আলাপে তার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। পরে একদিন বললাম, প্রথম দেখায় ওর সম্পর্কে আমি কি ভেবেছিলাম। সেসব নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা আর তর্ক-বিতর্ক সেদিন দীর্ঘ হয়েছিল। কী সব দুজনে আলাপ করেছিলাম, তার সবটুকু এখন আর মনে নেই; শুধু মনে আছে ও বলেছিল, 'আমাদের এই সমাজে রেসিজম বা ডিস্ক্রিমিনেশন যে একেবারে নেই, সেটা বলা খুবই ভুল হবে। তবে সাম্প্রদায়িকতা বনের বাঘ নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনের বাঘ। অচেনাকে নিয়ে মানুষের যে সহজাত ভীতি তা আমাদের মাঝে পারস্পরিক অবিশ্বাসের বীজ বপণ করে আর তার কারণেই আমরা একে অপরকে এড়িয়ে চলি। সেটাকেই আমরা বেশীরভাগ সময় সাম্প্রদায়িক বা বর্ণবৈষম্যপূর্ণ আচরণ বলে ভুল করি।'

পোটোম্যাক ফলস, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

আমীরুল আরহাম

স্বপ্নে ও বাস্তবতায় কবি ফার্নেন্দো পেশোয়া

মাথায় পর্তুগিজ টুপি পরে তিনি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন লিসবনে সিয়াদো এলাকায় তাঁর জন্মভূমির বাড়ি থেকে একটু দূরেই ক্যাফে চত্বরে। ১৯২০ সনের আদলে এই ক্যাফেটি এখনো সজ্জিত, কিন্তু ব্রাজিলের কফি বিক্রির জন্যে বিনা পয়সায় কফি পানের সেই ব্যবস্থাটি আর নেই। নিচতলায় নতুন করে ভেঙ্গেগড়ে নেয়া সেটিই এখন লিসবনের বিখ্যাত ক্যাফে বার এবং রেস্তোঁরা 'ব্রাসিলেইরা'। চোখে পড়ে গেল, ক্যাফের সামনেই প্রবাসী স্বদেশী একজন খেলনা বিক্রি করছেন। পাশেই একদল তরুণ, স্যাক্সোফন বাঁশি ও গিটার নিয়ে চল্লিশ দশকের অত্যন্ত জনপ্রিয় বিপ্লবী, ফ্যাসিবাদ বিরোধী ও নারীবাদী সেই গান 'বেলা চাও চাও' গাইছে। ক্যাফের ভিতরে বাইরে গিজগিজ করছে মানুষ। বাইরের চত্বরে চেয়ার খালি পেলেই টুরিস্টরা বসে যাচ্ছেন, আর অর্ডার দিচ্ছেন কফি আর ময়দা-ডিম-ক্রিম-চিনি আর দারুচিনি দিয়ে তৈরি লিসবনের জনপ্রিয় প্যাস্ট্রি 'প্যাস্তেই দ্য নাতা'। আর সুযোগ পেলেই ব্রোঞ্জের তৈরি তাঁর মূর্তির পাশেই খালি চেয়ারে বসে ছবি তুলছেন। আবার উঠে গিয়ে আরেকজনকে ছবি তোলার সুযোগ করে দিচ্ছেন। ব্রোঞ্জে নির্মিত মূর্তির এই মানুষটিই কবি ফার্নান্দো পেশোয়া।

'আমি কতোটা আমার? আমি কে? আমার ও আমার মধ্যে এই ব্যবধানটি কোথায়?' – এইসব প্রশ্নের একাধিক চরিত্রায়নের কবি ফার্নান্দো পেশোয়া পর্তুগালের ইতিহাসের সাক্ষী, তিনি আভোঁগার্দ (avant-garde) কবি। একাধারে জটিল, অস্থির, অন্তর্মুখী এবং আত্ম-আবিষ্কারে আত্মমগ্ন এই কবির জন্ম ১৩ জুন ১৮৮৮ এবং মৃত্যু ৩০ নভেম্বর ১৯৩৫।

প্রথমে ইংরেজিতে কবিতা লিখে পেশোয়া লেখালেখির জীবন শুরু করেন। এরপর তিনি পর্তুগিজ ভাষায় কবিতা প্রকাশ করেন বেশ কিছু জার্নাল ও ম্যাগাজিনে। অবশেষে, মারিও ডিসা-কার্নেইরো এবং যোশে দ্য আল্মাদা নেগ্রেরোস-এর সাথে পেশোয়া Orpheu সাময়িকী প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটির মাত্র দুটি প্রকাশনা হলেও এটিই ছিল পর্তুগালের সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম আধুনিকতার সূত্র-

পাত। 'অশান্তির গাথা' (Livro do desassossego -The Book of Disquiet) তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গদ্য রচনাবলী হিসেবে আজও বিবেচিত।

ফার্নান্দো পেশোয়া সাধারণ মানুষের কাছ থেকে খুব কম স্বীকৃতি নিয়ে বেঁচে ছিলেন, যদিও সমালোচকরা তাঁকে পাবলো নেরুদার মতই বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক আধুনিক কবি বলে অভিহিত করেন। ১৯১৩ থেকে ১৯১৮-এর মধ্যে পেশোয়া ইংরেজিতে শুধুমাত্র চারটি বই এবং পর্তুগিজ ভাষায় একটিমাত্র বই 'বার্তা' (Mensagem) প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কয়েকজন নিকটতম বন্ধুদের দ্বারা তিনি কবি হিসেবে প্রশংসিত এবং স্বীকৃত ছিলেন। অনেক সমালোচকরাই মনে করেন তিনি তাঁর জীবদ্দশায় জনসাধারণের কাছে আরও বেশি পরিচিত হয়ে উঠতেন যদি তিনি নিজের নামে তাঁর সমস্ত লেখালিখির করতেন। আজ অবধি পেশোয়ার কলমে রচিত ১৩৬টি ছদ্ম চরিত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে। এইসব চরিত্রগুলো সকলেই কবি লেখক দার্শনিক এবং সবাই যার যার বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। কল্পনা এবং বাস্তবতার আলোকে তাঁর সৃষ্ট এইসব চরিত্রগুলোর রাজনৈতিক মতামত, নান্দনিক ধারণা, অনুভূতি এবং ব্যক্তিত্বে ভিন্নতা আছে । রক্তমাংসের শারীরিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাথে এক একজনকে একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে তিনি একটা ভিন্নধারার সাহিত্য নির্মাণ করেছিলেন।

১৯১০-১৯২০ সালে, ভ্যালারি (Valéry), কোকতো (Cocteau), সেনদ্রা (Cendrars), অ্যাপোলিনায়ার (Apollinaire), লারবো (Larbaud) প্রভৃতি প্রতি-ভাবান কবিরা যখন প্রবল দাপটে সাহিত্যে নিজ নিজ জায়গা প্রতিষ্ঠা করে জেগে উঠছেন, তখন পর্তুগালে একজন কবি একাই এই সব কবিদের মধ্যে নিজেকে জায়গা করে নিচ্ছেন একাধিক নামে অথচ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন বিশিষ্টতা নিয়ে, এটা এক পরম বিস্ময় বলে অভিহিত করেছেন সমালোচকরা।

১৮৮৮ সালে লিসবনে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন পেশোয়া। পাঁচ বছর বয়সে পেশোয়া যক্ষ্মায় তাঁর বাবাকে হারান, তার কয়েক মাস পরেই তার ভাইকে। ১৮৯৬ সালে তাঁর মা তাঁকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান যেখানে তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে জীবন শুরু করেন। তাঁর সৎ বাবা দক্ষিণ আফ্রিকায় পর্তুগিজ দূতাবাসের কাউন্সেলার ছিলেন। জীবনযাপন এবং শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশে পেশোয়ার কাছে ইংরেজি বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষাতে পরিণত হয়। ঐ সময়েই তিনি ইংরেজির বহু কবি ও লেখকসহ মিল্টন এবং শেক্সপিয়ারের গুণমুগ্ধ পাঠক হয়ে ওঠেন।

মাত্র ১০ বছর বয়সে পেশোয়া 'আলেকজান্ডার সার্চ' নামে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। ১৯০৫ সালে লিসবনে ফিরে আসার পরে তিনি লেক্টস অনুষদে যোগ দিয়েছিলেন এবং বেশ কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন।

পেশোয়া পর্তুগালে ফিরে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। লিসবনে তাঁকে মানসিকভাবে সমর্থন দিতে পারে এমন কোনো পারিবারিক বৃত্ত ছিল না। ভ্রমণের ভিতরে তিনি বিচ্ছেদ-

বেদনার সুর শুনতেন। কৈশোরে মার সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং পরবর্তীতে লিসবনে ফিরে আসার পর তিনি আর কখনো বাইরে যাননি।

পেশোয়া প্রতিদিন নিঃসঙ্গ উদাসীনতার মুখোমুখি তাঁর কাব্যিক সৌন্দর্যকে যেমন উপলব্ধি করতেন, তেমনি বিশ্বের উদাসীনতায় একটা ক্ষণস্থায়ী বিস্ময়কর পরমানন্দ খুঁজে পেতেন।

টাগাস নদীর ডান তীরে অবস্থিত নিচু কিন্তু খাড়া পাহাড় লিসবনকে আঁকড়ে ধরে আছে। 'সাত পাহাড়ের শহর' এবং 'সাগরের রাণী' এমন অভিধায় খ্যাত এরকম শান্ত এবং অত্যাধুনিক লিসবনের প্রায় কেন্দ্রে হলো সিয়াদো। বর্তমান সিয়াদো ছোট্ট হলেও এটি লিসবনের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একটি এলাকা। রুয়া গ্যারেট, রুয়া কারমো, লা প্রাসা লুই দ্য কামোস-এর চারপাশে পর্তুগালের ঐতিহ্যবাহী থিয়েটার গ্যালারি ফ্যাশন ডিজাইনার সহ নামী দামী হোটেল, রেস্তোঁরা ও দোকান। পূর্ব থেকে পশ্চিম লিসবনের উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যবাহী স্থান ভ্রমণের জন্যে ২৮ নম্বর ট্রাম এই এলাকার উপর দিয়েই চলে গেছে সিমেটেরি প্রাজেরেস ক্যাম্পো উরিক থেকে মারতিম মনিজ।

পেশোয়া মা-বাবার প্রেরণায় কূটনীতি পড়ার জন্যে ১৯০৫ সালে ১৭ বছর বয়সে লিসবনে ফিরে আসেন। অসুস্থতা, লেখাপড়ায় মনোযোগের অভাব, খারাপ ফলাফল এবং বিশেষ করে স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী João Franco-এর বিরুদ্ধে ছাত্রদের ধর্মঘটের কারণে তাঁর কূটনীতি পড়ার সমাপ্তি ঘটে। তখন থেকেই তিনি নিজে লেখাপড়া করতে থাকেন এবং অধিকাংশ সময় লাইব্রেরিতে কাটান।

'যেদিন আমি শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম – দিনটি ছিল ১৯১৪ সালের ৮ মার্চ। আমি লম্বা একটি ড্রয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে একটি কাগজের টুকরো নিয়ে দাঁড়িয়ে লেখা শুরু করলাম' – বন্ধু অ্যাডলফ ক্যাসে মন্তেইরোকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন।

বস্তুত, পেশোয়ার লেখার ধরণ এমনটিই ছিল। ১৯১৩ থেকে ১৯৩৪ -এর মধ্যে The Book of Disquiet বইটি পেশোয়া এভাবেই ছোট ছোট নোট আকারে লিখেছেন। অনেক টুকরো টুকরো নোটবুকে লেখা তাঁর এই বইয়ের লেখক হিসেবে ছদ্ম লেখক চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর অফিসের এক কেরানি বার্নারদো সোয়ারেসকে। তাঁর মৃত্যুর ৪০ বছর পরে ৫২০টি টুকরো রচনা নিয়ে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিকে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সাহিত্যে জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে মনে করা হয়।

১৯১৪ সালের ৪ মার্চ, পঁচিশ বছর বয়সী অন্তর্মুখী, আদর্শবাদী, উদ্বিগ্ন কবি তার ছদ্ম সত্তায় 'পৌত্তলিক' প্রভুর উত্থান দেখিয়েছিলেন। আলবার্তো কাইরো, রিকার্ডো রাইস, এপিকিউরিয়ান স্টোইক এবং আলভারো ডি ক্যাম্পোস-এর মাধ্যমে সংবেদনশীল এবং মৌলিক লেখনীর পরিচয় যেমন দেন, অন্যদিকে ফার্নান্দো পেসোয়া নিজে পর্তুগিজ বা ইংরেজী ব্যবহার করে, কামোত্তেজকতা থেকে গুপ্তধর্ম, সমালোচনামূলক থেকে রাজনৈতিক, আদর্শিক এবং দার্শনিক এবং কাব্যগীতিময়তা থেকে রহস্যময় জাতীয়তাবাদ নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করেন।

পেশোয়ার মৃত্যুর পরে একটি গম্বুজ আকৃতির কাঠের সিন্দুকে টাইপ করা ২৭,৫৪৩ লাইন এবং প্রায় ৬০টি পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর এই সব লেখাগুলো ১৯৮২ সালে 'অশান্তির বই' (L'intranquillité) নামে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে তাঁর লেখা এই সব পাণ্ডুলিপি লিসবনের জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে।

গদ্য এবং কবিতা ছাড়াও রম্য নাটক এবং রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক অনেক লেখাই এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। তবে তাঁর এই বিশাল কাজের সম্পাদনার কাজ করছে পর্তুগিজ ন্যাশনাল লাইব্রেরি।

বার্নার্ডো সোয়ারেস (পেশোয়ার একটি ছদ্ম লেখক নাম) 'L'intranquillité" বই থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

> আমি জীবনকে একটি সরাইখানা বলে মনে করি যেখানে আমাকে থামতে হবে যতক্ষণ না নরক থেকে ধর্মরাজ যম না আসেন। আমি জানি না তিনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন, কারণ আমি কিছুই জানি না। আমি এই সরাইখানাকে একটি কারাগার হিসাবে বিবেচনা করি, কারণ আমি এর ভিতরে থাকতে বাধ্য। আমি এটিকে সামাজিকতার জায়গা হিসাবেও বিবেচনা করতে পারি কারণ আমি এখানে অন্যদের সাথে দেখা করি, আলাপ করি। আমি ধীরে ধীরে গান করি, কেবল নিজের কাছে, আমি সেই গান করি যা আমি অপেক্ষা করার সাথে সাথে রচনা করি।
>
> শূন্যতার মতো সবকিছু খালি..। আমি যখন চারপাশে তাকাই, অদ্ভুত একটা বাস্তবতাকে অবলোকন করি এবং ভাবি যে বাস্তবতা আমাকে নৃশংসভাবে হত্যা করছে কিনা। আমি দেখতে পাই অপাংক্তেয় বাড়ি, বিবর্ণ মুখ, অস্থির অঙ্গভঙ্গি। পাথর, দেহ, ধারণা – সবকিছুই মৃত। সমস্ত আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সবাই একই স্টপিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কিছুই আমাকে বলছে না। আমার কাছে কিছুই পরিচিত নয়, কাউকে চিনি না, কিছুই আমি জানি না। পৃথিবী হারিয়ে যাচ্ছে। আমার আত্মার গভীরে, এই মুহূর্তে একমাত্র বাস্তবতা, একটি তীব্র অব্যক্ত যন্ত্রণা, একটি দুঃখ, একটি আর্তনাদ, অন্ধকার ঘরে কেউ শব্দ করে যেন কাঁদছে।
>
> আমি স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই করিনি এবং এটিই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে আমার আত্মচিন্তা ছাড়া আর কোন উদ্বেগ ছিল না। আমার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় দুঃখ এটাই যে চলমান ভাবনার স্রোতে নিজেকে উপেক্ষা করে আমি দ্রুত সব ভুলে যেতে পারতাম।
>
> আমি কখনও স্বপ্নদর্শী ছাড়া অন্য কিছুই হতে চাইনি। কেউ কখনো আমাকে বেঁচে থাকার কথা বলেছে কিন্তু আমি সেদিকে মনোযোগ দিইনি। আমি সবসময় এমনই ছিলাম যেখানে আমি নেই এবং যা আমি কখনো হতে পারিনি। আমি যা নই, যা কিছু আমার নয়, তা থেকে আমি দূরে থেকেছি, কিন্তু আমার চোখে সবসময় কবিতা ছিল।
>
> আমি কখনো কিছু পছন্দ করিনি যা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। কোন কিছু অনুভব না করে, জীবনকে কখনোই আমি আমার কাছে আসতে বলিনি। আমি সুদূরের স্বপ্নে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছুই হতে চাইনি।

ভালবাসার জন্য আমি প্রলম্বিত দূরবর্তী স্বপ্নকে চেয়েছি। আমার নিজের অভ্যন্তরীণ ল্যান্ডস্কেপে সুদূর, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া জলচর, ক্রমশই বিলীন হয়ে যাওয়া স্বপ্নের ল্যান্ডস্কেপের দূরত্বের অন্যান্য অংশের মধ্যে একটি স্বপ্নময় মাধুর্য – অপরূপ একটি সুন্দর আমাকে ভালবেসেছে।"

এবার তাঁর কবিতা থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি:

ভাগ্য অনুসরণ করুন
গোলাপ ভালোবাসেন
জল দিন গাছে
বাকি সবটাই ছায়া
মাটি ধূলা ও ছায়ায়
বাস্তবতা কমবেশি আছে
যেটা আমরা চাই।
কিন্তু আমরা সবসময় একা
নিজেদের সমান।
একা বেঁচে থাকা মধুর
সাধারণভাবে বাঁচা
সর্বদা মহৎ এবং মহান
বেদিতে, পূজার আসনে
দেবতাদের জন্য
যন্ত্রণা দূরে ছুঁড়ে দিন
জীবনকে কাছে থেকে দেখুন
জীবনকে ডাকুন
কিন্তু প্রশ্ন করবেন না কোনো।
সে কিছুই করতে পারে না
আপনাকে উত্তর দেবার অবসর
দেবতার নেই ।
কিন্তু শান্তভাবে
অলিম্পাস অনুসরণ করুন
আপনার মন্দিরে
হৃদয়ের গভীরে।
দেবতারা শুধুই দেবতা
এবং এই জন্যেই তাঁরা দেবতা
কখনো ভাবেননা তাঁরা অপরের কথা।

পেশোয়া তার স্বপ্নকে লালন করার জন্যে দর্শনের অপরিহার্যতাকে গুরুত্ব দিয়ে-ছেন। দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা এবং মানসিক এক অস্থিরতার নির্যাসে পেশোয়া তার একটা কল্পজগৎ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সেখানে যে তিনি স্থির অবস্থান করতে পেরে-

ছিলেন, সেটা বলা যাবে না। সেক্ষেত্রে তাঁকে অনেকেই হতাশাচ্ছন্ন অদৃষ্টবাদী বললেও পেশোয়া তাঁর একটি লেখায় ভিন্নমত পোষণ করেন।

> আমার স্বপ্নগুলো যেন মূঢ় আশ্রয়, বজ্রপাত থেকে রক্ষা করার জন্য এক একটি ছাতা।
>
> আমি বিশ্বের কাছে কোন অভিযোগ করছি না। মহাবিশ্বের কাছে আমার কোন প্রতিবাদ নেই। আমি হতাশাবাদী নই। কিন্তু আমি কষ্ট পাই এবং অভিযোগ করি। হ্যাঁ, আমি জানি না কোন অদৃষ্ট শক্তি আমাকে ভোগাচ্ছে কিনা, অথবা মানুষমাত্রেই কষ্টে ভোগে কিনা। কিন্তু এসবের সঠিক অনুসন্ধান আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেনি। আমি কষ্টের মধ্যে বাঁচি, কিন্তু আমি জানি না সেটা আমার প্রাপ্য কিনা। আমি হতাশাবাদী নই, আমি বেদনাক্রান্ত ।

পেশোয়ার জীবনে প্রেম-ভালোবাসার কথা আমরা তেমন জানতে পারিনি। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের লেখায় তাঁর একাকীত্ব এবং নিঃসঙ্গতার কথা ফুটে উঠেছে।

> আমি জানি আমি একা
> সতত বেদনা বিদ্ধ করে হৃদয়
> না আছে বিশ্বাস, না আইন
> না চিন্তন না মধুর সুর
>
> শুধু আমি, আমিই
> কিছুই জানিনা আর
> অনুভব শুধু আকাশ
> মর্মে শুনি বেদনা নুপুর।

'আমি কেবল একবার সত্যিকারের ভালবাসা পেয়েছি' - তাঁর কৈশোরের স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবেই। পেশোয়া বলেন, প্রেম শুধু স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

'আমরা আসলে কখনো কাউকে ভালোবাসি না। আমরা যা ভালবাসি তা হল আমাদের কারু সম্পর্কে ধারণা। এটা আমাদের নিজস্ব ধারণা, একান্ত নিজের, যা আমরা ভালোবাসি।'

এখানে তাঁর 'প্রেমপত্র' কবিতাটিতে উল্লেখ করা যেতে পারে।

> প্রেমের অক্ষর শব্দ বাক্য
> সব হাস্যকর
> প্রেমের চিঠি সরস এবং হাস্যকর
>
> সমস্ত প্রেমের চিঠি
> হাস্যকর।
> প্রেমের চিঠি
> কখনই চিঠি নয়
> যদি না হয়

হাস্যকর।

অন্যদের মতো
আমিও লিখেছি
হাস্যকর
প্রেমের চিঠি ।

প্রেমের চিঠিতে যদি ভালবাসা থাকে
হতে হবে
হাস্যকর।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত,
যারা লেখেন না কখনো
প্রেমের চিঠি
তাঁরা আরও
হাস্যকর।

যে সময়টিকে পাওয়ার জন্যে
না-বুঝে লিখেছি
প্রেমের চিঠি
সেটি হাস্যকর।

এটিই সত্য আজ
এগুলো আমার স্মৃতি
সেই সব চিঠির মধ্যে
আবিষ্কার করি শব্দ
যেগুলো
হাস্যকর।

অতিরিক্ত শব্দ,
অতিরিক্ত অনুভূতি,
অবশ্যই
হাস্যকর।

১৯২১-এ অলিসিপোতে লেখা পেশোয়ার একটি সনেট। লিসবনের টাগাস নদীর মুখে অলিসিপো শহরের এই অংশে পোড়া মাছের সাথে গ্রিন ওয়াইট ওয়াইন নিয়ে নাচ ও গানে জেলে ও সাধারণ মানুষেরা তখন রাতভর মেতে থাকতো।

তোমার কথা আমার উপর অত্যাচার, নিষ্ঠুর অপঘাত
সাগরে উতল বেদনার ঢেউ, বিধ্বংস ভূধর
অস্থির উন্মাদ, তোমায় করিনা বিশ্বাস একবিন্দু
তবুও অবিশ্বাসে করব বসবাস তারও পাইনি কোন উত্তর
নক্ষত্রখচিত এই আকাশে আমি কি কোথাও আছি

অযত্নে-নিয়ন্ত্রণে সর্বক্ষণ আছি বেঁচে, নিরন্তর অসহায়
অনিষ্ঠ ভাগ্য জড়িয়ে আছে জীবনের কাছাকাছি
বিশ্বাস করা থেকে সমস্ত অন্যায় ভাগ্যের সত্যকে বাধা দেয়।
শুধু কল্পনায় দেখা জীবন মানে না দৃশ্য জগৎ
পোশাকি ভাবনায় জেগে থাকে অবিবেচক চোখ
সুন্দর পোশাকে তৈরি করে রোজ নতুন স্বপ্নজগৎ
মিথ্যা আবিষ্কার প্রতারণায় ভুলে যায় দুঃখ শোক

সবই সম্ভব অলীক এ-জীবন নিষ্ক্রিয় অলস ভাবনায়
স্ব-পরিচিত সত্য জেগে ওঠে বেদনা আর হতাশায়

১৯৯০ তে সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্ত মেক্সিকান কবি অক্টাভিও পাজ (১৯১৪-১৯৯৮) তাঁর প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধে (A Stranger to himself) পেশোয়ার কাজের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে পেশোয়াকে বুঝতে গেলে ফার্নান্দো পেশোয়ার স্বাক্ষরিত গ্রন্থের চেয়ে তার সৃষ্ট ছদ্ম লেখক সত্তা আলবার্তো কাইরো, রিকার্ডো রইস বা আলভারো ডি ক্যাম্পোসকে বুঝতে হবে। পেশোয়ার 'যাত্রার কিছু টুকরো চিত্র' ('Fragments d'un voyage immobile') গ্রন্থের মুখবন্ধতে অক্টাভিও পাজ লেখেন যে এই গ্রন্থে পেশোয়াকে একই সাথে একজন অসাধারণ এবং অতি সাধারণ একজন মানুষের প্রতিকৃতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকটি শিশুদের ছড়ার আদলে রচিত।এর সংগৃহীত টুকরোগুলো পড়লে আমরা একজন মুখোশধারী মানুষকে আবিষ্কার করি যিনি আমাদের কাছে হাজার হাজার পৃষ্ঠার বচন রেখে গেছেন, এবং তাতে নিশ্চিত হতে পারি যে তিনি নিজেই নিজের কাছে অজানা ছিলেন।

পেশোয়ার কল্পনাবিলাসী জীবনে বাস্তব কোন ভ্রমণ না থাকলেও তিনি ভ্রমণ করতেন লেখনীতে, তাঁর নির্মিত বিভিন্ন চরিত্রের সাথে। তিনি লিখেছেন, 'বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমি যখন একটি অকেজো ধ্বংসপ্রাপ্ত ফার্মের ইতিহাস লিখি; তখন একই সময়ে, আমার ভাবনায় সমান মনোযোগ দিয়ে আমি অস্তিত্বহীন একটি জাহাজের যাত্রাপথ ধ'রে সুদূর প্রাচ্যের ল্যান্ডস্কেপ অনুসরণ করি যার অস্তিত্ব কোথাও নেই।'

পেশোয়া যতো প্রসস্ত পরিসরে যেতেন, তত বেশি নিরপত্তার অভাব বোধ করতেন। জানা যায় তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সারারাত ঘুমাতে পারেননি, শ্বাসরুদ্ধ অস্থির হয়ে খুব ভোরে পালিয়ে এসেছিলেন। একটি লেখায় পেশোয়া জানাচ্ছেন যে 'আমি উদ্বিগ্ন বোধ করি, আমি বন্দী বোধ করি। হ্যাঁ, একটা দুঃখময় যন্ত্রণা আমাকে তাড়িত করে। আমি জানি না এই ঘটনাটি কেবল কি আমার, নাকি আজকের এই সভ্যতায় জন্ম নেয়া সকলের জন্যেই এই উদ্বেগ একটা বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।'

তিনি আর বলেন, ‘ভ্রমণের জন্য অস্তিত্বই যথেষ্ট। আমি দিনের পর দিন স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে যাই, দেহ থেকে দেহাতীত অথবা অদৃষ্টের ট্রেনে।’

‘আমি ভ্রমণ ছাড়াই যা দেখেছি তার একটি ধোঁয়াটে ছবি খুঁজে পাই আমি যখন ভ্রমণ করি।’

‘আমার ছোটবেলার কথা মনে আছে, আমার চোখে জল, কিন্তু সেগুলো ছন্দময় অশ্রু, গদ্যের বুনন।‘

‘আমি কিছুই নই বলে, আমি সব কিছু কল্পনা করতে পারি। আমি যদি কিছু হতাম, তাহলে আর কিছুই কল্পনা করতে পারতাম না।’

পেশোয়া অ্যালিস্টার ক্রাউলির বন্ধু ছিলেন। অ্যালিস্টার ক্রাউলি জাদুবিদ্যা, যৌনতা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, গুপ্তচরবৃত্তি, হিন্দুধর্মের অধিবিদ্যা তন্ত্রবাদ, এসব নানা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তেলেমা ধর্মের আলোকে তিনি ‘Book of the Law,’ জীবনে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মুক্তি, ‘Love is the law, love under will’- এমন একটি মতাদর্শের আলোকে ক্রাউলি স্বাধীন ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে অত্যন্ত বিতর্কিত হয়ে ওঠেন। পেশোয়া বন্ধু ক্রাউলির প্রভাবে প্রচুর রাজনৈতিক ও গুপ্তধর্মী লেখা লিখেছিলেন যে কারণে পরবর্তীতে তিনি গণতন্ত্রবিরোধী উগ্র চিন্তাবিদ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

ফার্নান্দো পেশোয়ার নিজের স্বাক্ষরিত এবং তাঁর নির্মিত বিভিন্ন চরিত্রের লেখা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম:

> যে অনুভূতিগুলো সবচেয়ে বেশি আঘাত করে, যে আবেগগুলো সবচেয়ে বেশি আঘাত করে, সেগুলো আসলে অযৌক্তিক; অসম্ভবকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ঠিক একারণেই যে সেগুলো অসম্ভব; সময়কে আটকে রাখতে না পারার জন্যেই আমাদের নস্টালজিয়া; লক্ষ্ বস্তুর অপ্রাপ্তির জন্যেই আমাদের ইচ্ছা; অন্য কারুর মতো না হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত নই, পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব নিয়েই আমাদের অসন্তোষ। আত্মার এই সব সূক্ষ্ম চেতনার টানাপোড়েন থেকেই আমাদের মধ্যে একটা দুঃখবোধ বা বেদনাদায়ক দৃশ্য তৈরি হয়ে আছে, যেখানে আমরা চিরন্তন সূর্যাস্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি।
>
> কোন বুদ্ধিমান ধারণা সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না যদি না এর সাথে কিছু মূর্খতা মিশে থাকে।
>
> আমার অতীত হল আমি যা হতে ব্যর্থ হয়েছি।
>
> আমি সবসময় ‘বুঝেছি’ বোধ টিকেই প্রত্যাখ্যান করেছি। ‘বুঝেছি’ মনে করার মধ্যে নিজেকে পতিতা বলে মনে হয়। আমি যা নই, সেটাই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে পছন্দ করেছি। সবকিছুকে সম্মান দিয়েই বলব, মানবিকভাবে আমি একজন স্বাভাবিক ‘অজ্ঞেয়’ থেকেছি।
>
> কোন কিছু বুঝতে পাওয়ার চেষ্টা থেকেই আমি নিজেকে ধ্বংস করেছি।

আমি বাস্তবতার জন্যে বেঁচে ছিলাম না, জীবন এসে আমাকে খুঁজে পেয়েছে।

আমি কিছুই না
আমি কখনই কিছু হব না।
আমি কিছু হতেও চাইনি।
তাছাড়া, পৃথিবীর সব স্বপ্নই আমার মধ্যে আছে।

আমি জীবন এবং কিছু মানুষের কাছ থেকে ভুগেছি। আমি বাস্তবতার মুখোমুখি হতে পারি না। এমনকি সূর্য আমাকে নিরুৎসাহিত করে এবং হতাশ করে। শুধুমাত্র রাতে আমি যখন একাকী, জীবন থেকে সব কিছু প্রত্যাহার করে নিই, ভুলে যাই এবং হারিয়ে ফেলতে পারি নিজেকে, বাস্তব বা দরকারী কোন কিছুর সাথে আমার আর যখন কোন সংযোগ থাকে না, ঠিক তখনই, আমি নিজেকে খুঁজে পাই এবং বেঁচে থাকার সান্ত্বনা খুঁজে পাই।

আমার আত্মা একটি লুকানো অর্কেস্ট্রা। আমি জানি না কোন যন্ত্র, কী বাঁশি, কোন বীণা, কোন ঢাক কোন ঢোল আমার মধ্যে শব্দ করছে, বিরামহীন বেজে যাচ্ছে। আমি শুধু নিজের মধ্যে শুনি সিম্ফনি।

১৯৩৫ সালের ২৯ নভেম্বর তীব্র পেটের ব্যথা এবং উচ্চ জ্বরে ভুগতে থাকলে পেশোয়াকে সাঁও লুইস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি তার শেষ কথাগুলো ইংরেজিতে লিখেছিলেন: ‘আমি জানি না আগামীকাল আমাদের জন্য কি নিয়ে আসবে।’

তিনি পরের দিন ৪৭ বছর বয়সে মারা যান। অত্যাধিক মদ্যপানের কারণে লিভার সিরোসিস তাঁর মৃত্যুর কারণ বলে মনে করা হয়।

প্যারিস, ফ্রান্স

আরিফ মাহমুদ

খাওয়ার জন্য বাঁচা, না বাঁচার জন্য খাওয়া?

গড়পড়তা আমেরিকান মহিলারা মাত্র সাতাশ মিনিট আর বাঙালি মহিলারা গড়ে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সময় প্রতিদিন রান্নাঘরে ব্যয় করে। বাঙালি নারীদের জীবনের বিশাল অংশ এই রান্নাঘরেই কেটে যায়। কয়েক সপ্তাহ আগে আমার প্রতিবেশী হ্যারল্ডের বাসায় আমাদের ডিনারের দাওয়াত ছিলো। সন্ধ্যা ছ'টার আগেই সাধারণত এরা ডিনার শেষ করে। একেবারে ঘড়ির কাঁটায় ঠিক ছ'টা বাজতেই ডিনার শুরু হলো। ডিনারের আয়োজন ছিলো টুনা ফিস, সালাদ, কিছু চিপস আর কোমল পানীয়। ব্যস। হ্যারল্ডের ওয়াইফ মেরি আর হ্যারল্ড আমাদের সাথে ক্লান্তিহীন আড্ডা দিলেন। রান্নার আয়োজন যেহেতু কম, আড্ডার আয়োজনতো সুন্দর হবেই। বুঝলাম, নিমন্ত্রণ মানে শুধু ভোজন না। নিমন্ত্রণ হলো আপনার জীবনের কিছু অংশ আর আমার জীবনের কিছু অংশ একসাথে পাশাপাশি বসে উপভোগ করা।

কেউ যদি বলে বাঙালিরা আড্ডাপ্রিয়, কথাটি ভুল। আমরা আসলে ভোজনপ্রিয়। আমাদের বাসায় কারো দাওয়াত মানেই বিশাল রান্নার আয়োজন। কে কত আইটেম বাড়াতে পারে ভাবীদের সাথে ভাবীদের চলে এর প্রতিযোগিতা। যেদিন অতিথিদের নিমন্ত্রণ বলতে গেলে এর এক সপ্তাহ আগে থেকেই শুরু হয় রান্নার আয়োজন। একেকটা রান্নার আয়োজন একেকটা ঘূর্ণিঝড়। এরকম ঘূর্ণিঝড়ের ভেতর সময় পার করে ঘরের বউ, ভাবী ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। সুতরাং সুন্দর পরিবেশে বসে আড্ডাটা হবে কখন?

রান্নাঘর আর বাথরুম দেখে মানুষের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পাওয়া যায়। হ্যারল্ডের ঘরে পা দিয়েই বোঝা গেলো – কত সুন্দর, পরিপাটি আর কত পরিচ্ছন্ন হতে পারে একটি ঘরের পরিবেশ। সুন্দর ঘর রাখার অন্যতম প্রধান কারণ হলো – ওদের রান্নার আয়োজন খুবই কম। আপনি যখন গরম তেলের ওপর দুনিয়ার নানা রকমের মশলা ছাড়বেন – সাথে সাথেইতো ঘর তেলতেলে হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। আর এই তৈলাক্ত গ্রীজ শুধু আপনার কিচেন নষ্টই করছেনা। আপনার উদরও নষ্ট করছে।

তবে কি আমেরিকানরা রান্না করেনা? না করলে এতো গ্রোসারি আইটেম যায় কই? জ্বি, করে। বেশ আয়োজন করেই করে। তবে একদিনে চৌদ্দ পনের পদ তৈরি করে – ডাইনিং টেবিলের এই মাথা থেকে ঐ মাথা পর্যন্ত খাবারের পসরা সাজিয়ে বসেনা। আমি

নিজেও বুঝিনা। এতো পদ দিয়ে একসাথে খাবার খেয়ে এতো ভূরিভোজনের দরকারটাই বা কি? কালকে মারা গেলে- আজকে বেশ করে খেয়ে নেন, ঠিক আছে। কিন্তু তাই যদি না হয় – তবে আজকে দুপুরে এক আইটেম দিয়ে খান। রাতের বেলা আরেকটা দিয়ে খান। এভাবে প্রতিদিন একেকটা আইটেম দিয়ে খেলেইতো নানা রকমের খাবারের স্বাদ পাওয়া যায়।

আমাদের পিকনিক মানেই ঐ খাবার দাবার। গাড়ীতে খাবার ঢোকাও, গাড়ী থেকে খাবার নামাও, খাবার সাজাও, খাবার রান্না করো, খাবার পরিবেশন করো, খাবারের পর এবার থালা, বাসন, বাটি, ঘটি গাড়িতে তোল। ব্যস, খাবারের আয়োজনের ভেতরই পিকনিক শেষ । একবার সমূদ্র দর্শন করতে গিয়ে দেখলাম – এক আমেরিকান কী সুন্দর করে ফোল্ডিং চেয়ার খুলে পানিতে পা ভিজিয়ে বসেছে। ঘন্টার পর ঘন্টা যায়। সে বসা। তার মাথার ওপর ছাতা। পাশে একটা ড্রিংক। বুঝা গেলো সে আজ মনপ্রাণভরে সমূদ্র দেখবে। আর আমরা – খাবার খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সমূদ্র দেখলাম। আর সমূদ্র দেখার পাশাপাশি এই দোকানে ঢুঁ মারলাম, আরেক দোকান থেকে বের হলাম, একটু এদিক ওদিক ঘুরলাম, রাজনীতি, কম্যুনিটি নীতি, ট্রাম্প, মোদি, গদি, হাসিনা, খালেদা, পাপিয়া, সাফিয়া, কাদেরি, তাহেরিসহ দুনিয়ার সব বিষয়ে বিপুল আলোচনা, হালকা বাকবিতণ্ডা, ঝাপসা মনোমালিন্য নিয়ে সমূদ্র জয়ের পাশাপাশি দুনিয়া জয় করে ঘরে ফিরলাম।

গত শনিবার। গ্রোসারি কিনতে যাবো। দেখি হ্যারল্ড। সেও আমার সাথে যাবে। আমাদের গ্রোসারির লিস্টি মাশাল্লাহ – এইগুলো একটার সাথে আরেকটা জোড়া লাগালে চাঁদের দেশে যাওয়া যাবে। মাংসের জন্য এক দোকান, মাছের জন্য আরেক দোকান। সব্জির জন্য ফার্মার্স মার্কেট। সেখানে আবার দেশি লাউ পাওয়া যায়না। যাও আরেক দোকান। কাঁচামরিচের জন্য আরেক জায়গায়। দুধ-ডিমগুলো আবার এইসব দোকানে ভালো পাওয়া যায়না। যাও আমেরিকান গ্রোসারিতে। বিশাল লিস্টের যুদ্ধ শেষ করে যখন ফিরছ্, হ্যারল্ড বললো - 'একটু দাঁড়াও।' এক ফাস্টফুডের দোকানে দাঁড়ালাম। হ্যারল্ড একটা স্যান্ডউইচ কিনলো। স্যান্ডউইচের অর্ধেক সে খাবে। বাকি অর্ধেক ওর বউ খাবে। ঝামেলা শেষ।

সেইজন্য ওরা নাসা থেকে স্পেসে যায়। আর আমরা বেডরুম থেকে কিচেন আর কিচেন থেকে বেডরুমে যাই। আর এর ফাঁকে ফাঁকে ইয়া বড় বড় ভুড়ি বানাই। স্পেশ স্টেশানে যাওয়ার সুযোগ আসলে আমরা খোঁজ নেব – কিমার জন্য ফ্রেশ গ্রাউন্ড বীফ, কাচ্চি বিরিয়ানির মশলা, ডালের জন্য পাঁচফোড়ন, খাওয়ার পর গোলাপজামুন, চায়ের সাথে বিস্কুট, পানের সাথে চুন, খয়ের এসব কিছু সেখানে ঠিকঠাক পাওয়া যাবে তো?

আমি একটা জিনিস পর্যবেক্ষণ করলাম। যার গ্রোসারির ট্রলি যত বড় – মেধা আর যোগ্যতায় সে তত ছোট। যারা দরিদ্র – অর্থের অভাবে খেতে পায়না – সেটা ভিন্ন কথা। মেক্সিকান আর আমাদের গ্রোসারির ট্রলিগুলো যেন একেকটা মুদির দোকান। চেকআউট লেনে দাঁড়ালে মনে হয় কোনো ছোট দোকান ঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছি। এতো বেশি

বেশি খাবার উদরে যায় বলে আমাদের মগজে আর বেশি কিছু যায়না। হিসপানিক আর ভারতীয় অধ্যুষিত এলাকায় আপনি কোনো ভালো লাইব্রেরি কিংবা কোনো ভালো বইয়ের দোকান পাবেন না। এগুলো পাবেন শুধু সাদা বিশেষ করে ইহুদি অধ্যুষিত এলাকায়। রান্না করে আর খেয়েইতো আমাদের জীবন শেষ। অধ্যবসায়ের অতো সময় কোথায়? বিল গেটস, মার্ক জুকারবার্গ, স্টিভ জবস ওনাদের সামনে কোনোদিনও ইয়াবড় খাবারের প্লেট দেখিনি। যেমন দেখেছি রাজা-বাদশাহ-আমীর ওমরাহদের সামনে।

প্রিয় ভাই, চাচা, বাবা, দাদারা দয়া করে বউ, ভাবি, বোন, চাচী, মাসিদের রান্নাঘরের একচেটিয়া জীবন থেকে মুক্তি দিন। আর ভাবী, আপা আপনারাও একজনের সাথে আরেকজনের রান্নার আইটেম বাড়ানোর প্রতিযোগিতা থেকে দয়া করে নিজেদের হেফাজত করুন। এক জনে পাঁচজনের জন্য প্রতিদিন পাঁচপদ রান্না না করে পাঁচজনে মিলে একপদ রান্না করুন। সম্পর্ক বাড়বে। ভালোবাসা তৈরি হবে। কষ্ট লাঘব হবে। কিচেনে আপনার সময় যত বাড়বে- ভাইয়ের ভুড়িও তত বাড়বে। আর এই ভুড়ি ভালোবাসা না। এটা সর্বনাশা। এটা জীবননাশা। জীবনধারণের জন্য খেতেতো হবেই। কিন্তু রান্নাঘর আর ভোজন যেন আমাদের পুরো জীবনটাই খেয়ে না ফেলে অধ্যুষিত দয়া করে সেদিকে একটু লক্ষ্ রাখবেন। সারাজীবন নারীমুক্তি নারীমুক্তি করলাম। কিন্তু নারীকেতো রান্নাঘর থেকেই মুক্তি দিতে পারলাম না।

লরেন্সভিল, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

আহমাদ মাযহার

বাংলাদেশের বাইরে বাঙালি জনসমাজে সংস্কৃতি চর্চার মনস্তত্ত্ব

১

এখন থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশের মানুষ অন্য দেশে, বিশেষ করে ইয়োরোপ, আমেরিকা, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে যাঁরা বসবাস করেছেন তাঁরা স্থায়ী হবার চিন্তা করতেন কমই। বাস্তবে যা-ই ঘটুক না কেন তাঁদের অধিকাংশেরই মনে এমন বাসনা থাকত যে এক সময় তাঁরা স্বদেশে ফিরবেন। যাঁদের দেশে ফেরার কথা ভাবার উপায় ছিল না তাঁদেরও অন্য দেশের সাংস্কৃতিকতার প্রতিকূলে নিজের সাংস্কৃতিকতা রক্ষার প্রয়াসে জোর থাকত না তেমন। সেজন্য নিজেদের প্রবাসী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না তাঁরা।

২

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের কর্মসূত্রে বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে সেইসব দেশে বসবাস করতে থাকেন; তাঁদের সেখানে নাগরিক হবার বা স্থায়ী হবার সুযোগ তেমন নেই। তা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরে বাংলাভাষী একটা জনসমাজ সেখানে এখন অস্তিত্বশীল। সে সব দেশেও রূপলাভ করছে বাংলাভাষীদের সাংস্কৃতিকতার অভিবাসী বিশেষত্ব। প্রবাসী মনোভাব নিয়ে দিনযাপন করলেও সেসব দেশের জনসমাজের সাংস্কৃতিকতার সঙ্গে আপন-সংস্কৃতির বৈপরীত্য মিলে এই অভিবাসীদের মনোজগতে প্রভাব রাখছে। ইয়োরোপের যুক্তরাজ্যে তো উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বহু বছরের বাংলাদেশি জনসমাজ রয়েছে – সেখানকার কথা আলাদা – সেখানকার বাংলাভাষীদের তো সাংস্কৃতিকতা ও মানসজগতই বাংলাদেশের চেয়ে ভিন্ন হয়ে উঠেছে এখন। এদিকে ফ্রান্স ও জার্মানির মতো দেশে নাগরিক হবার কিছু অবকাশ থাকায় স্বল্পসংখ্যায় হলেও সেসব দেশেও বাংলাভাষী সাংস্কৃতিক জনসমাজ আভাসিত হয়ে উঠেছে। আশির দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় গড়ে উঠেছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাভাষীয় জনসমাজ। অদূর

ভবিষ্যতে এসব দেশে বসবাসরত বাংলাভাষীদের জীবনবোধ বাংলার ভাবজগতে যে প্রভাব রাখবে তা অনুমান করা কঠিন নয়।

৩

এই পরিপ্রেক্ষিতকে মনে রেখে বলা যায় যে প্রবলভাবে আঁকড়ে থাকতে চাইলেও ভিন্ন দেশের ভিন্ন বাস্তবতায় বসবাসরতদের মধ্য থেকে 'বাঙালিত্বে'-এর কিছু সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ যেমন বাদ পড়ে যেতে থাকে আবার তাদের মধ্যে যুক্তও হতে থাকে অনেক অনুষঙ্গ। যাঁরা সিদ্ধান্তই নেন যে সেই অভিবাসিত দেশই তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের স্থান, সেখানেই ভিত্তি পাবে তাদের উত্তরপ্রজন্মেরও জীবনধারা। তাঁদের এ ভাবনা অন্তঃশীল থাকা অস্বাভাবিক নয় যে, নতুন বাস্তবতায় সংস্কৃতির যে রূপান্তর প্রক্রিয়া চলমান তা শেষ পর্যন্ত সেই ভিনদেশবাসীদের বাংলা সাংস্কৃতিক মানসকেই প্রভাবিত ও প্রতিসরিত করবে; প্রতিসরিত সেই দৃষ্টিভঙ্গি আবার যুক্ত হবে মূলধারার বাংলাভাষী মানসেরই সঙ্গে; মূল জনধারার সংস্কৃতিকেই তা শেষ পর্যন্ত সমৃদ্ধ করে তুলবে। পাশাপাশি এভাবেই অভিবাসিত ভিন্ন ভূখণ্ডে বাংলা সংস্কৃতিরও গড়ে উঠতে থাকবে প্রতিসরিত রূপ।

৪

শেষোক্ত বিষয়ে ভাবনার একটু গভীরে গেলেই প্রতীয়মান হবে যে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রিক পরিমণ্ডলে বাংলা সংস্কৃতির যে দুটি কেন্দ্র রয়েছে এখনই খুব স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও তার বাইরেও বাংলাভাষীদের অভিবাসিত দেশগুলোতে অনেকগুলো ছোট ছোট কেন্দ্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রটিতে যে ক্রিয়াশীলতা রয়েছে তাতে রয়েছে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যাকে হয়তো সীমাবদ্ধতাও বলা যায়।

সীমাবদ্ধতার কথা বলার আগে ইতিবাচকতাকেই একটু পর্যবেক্ষণ করা যাক। যারা পশ্চিমা বা বুর্জোয়া সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে অভিবাসিত হন তাঁরা যদি অভিবাসিত দেশের সাংস্কৃতিক আবহে এসে মানসিকভাবে ভিন্ন সংস্কৃতির তীব্র অভিঘাতে বিমূঢ়-বিষণ্ণ হয়ে না পড়েন তাহলে সে-সংস্কৃতির ভিন্নতার স্বরূপ অনুসন্ধান করতে থাকবেন, নিজস্বীকরণ করতে থাকবেন স্বীয় সংস্কৃতির আলোকে উপলব্ধ বাস্তবতাকে। এভাবে মূলধারার বাংলা সংস্কৃতিবোধে নতুন অভিজ্ঞতার যোগ, সংশ্লেষ ও সমন্বয় হবে; ক্রমশ তা হবে সম্প্রসারিত।

৫

স্বাধীনতা-উত্তর কালেই মূলত বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের অভিবাসন শুরু হয়েছে! প্রত্যক্ষভাবে তো এই অভিবাসন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা যোগ

করছেই পরোক্ষে বাংলাদেশের পণ্যসামগ্রী রফতানিতেও রাখতে শুরু করেছে বিশেষ অর্থনৈতিক ভূমিকা। এছাড়া বাংলাদেশের জীবনযাত্রায় যে তা এখনই নতুন নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিচ্ছে তা দেখবার জন্য খুব বেশি অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই!

৬

বিশ্বজোড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতাই অভিবাসন প্রক্রিয়ার গতিলাভের উৎস। এটা এমন একটা প্রক্রিয়া যা মানুষের জীবনযাপনের বাস্তবতাহেতুই চিরকাল চলমান থেকেছে। বাংলাদেশের ভেতরেও তো অভ্যন্তরীণ অভিবাসন সে দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিকতাকে প্রভাবিত করে চলেছে সবসময়। দেশের অভ্যন্তরের এই প্রক্রিয়া নিয়ে আমাদের মনে তেমন প্রশ্ন হয়তো জাগে না, বরং একে খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। অথচ দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরেও অভিবাসন প্রক্রিয়া একইভাবে জনমানসের রূপ বদল করে চলেছে।

বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে অভিবাসন এখন অনেক বেড়ে যাওয়ায় দ্রুতই এর সাংস্কৃতিক অভিঘাত বাংলাদেশের জীবনধায় দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রভাব ফেলছে আগের তুলনায় বেশি গভীরতায়! এই প্রভাবের প্রাবল্য বাংলা অঞ্চলের অভ্যন্তরে যেমন বাড়ছে তেমনি আবার দৃশ্যমান হয়ে উঠছে অভিবাসিত দেশের বাংলাভাষী জনসমাজের সাংস্কৃতিকতায়ও!

৭

কিন্তু এর বিপ্রতীপে এমন সীমাবদ্ধতার কথাও কি বলা যায় না যে, উন্নততর অর্থনীতি, নাগরিক পরিষেবা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এই জনসমাজের মানুষেরা বিচরণশীল ও সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে তাঁদের মধ্যে পশ্চিমা অভিবাসিত দেশগুলোর সাধারণ সাংস্কৃতিকতার অনুশীলনও অনেক কম দৃশ্যমান হয়। অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসিতদের অবস্থা অভিবাসিত দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিকতার আলোকে অনুসরণ করলে মনে হয় যে তাঁরা এক দিকে বাংলা অঞ্চলের বাইরে থাকার কারণে সেখানকার সামগ্রিক সাংস্কৃতিকতা থেকেও পিছিয়ে পড়া সংস্কৃতির মানুষ, অন্য দিকে অভিবাসিত দেশের রাষ্ট্রসংস্কৃতির সহজ সুবিধাগুলোকেও নিজেদের সাংস্কৃতিক বোধের আলোকে অনুশীলন করতে গিয়ে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে না পারায় আপন সংস্কৃতির অনুৎকর্ষিত রূপের ধারক হয়ে থাকছেন! এর কারণ তাঁরা যে দেশে অভিবাসিত হয়েছেন এবং সেখানে যে জনসমাজ তাঁরা গড়ে তুলেছেন তার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক মান সেখানকার সাধারণ সামাজিক বাস্তবতার সূত্রেই বাংলাদেশে অনুশীলিত সাংস্কৃতিকতার তুলনায় অনেক ঊন হয়ে থাকে।

৮

একটু পর্যালোচনা করলেই অনুভব করা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতায় যাঁদের সচ্ছল বলা যায় তাঁরা নিজদেশে যে বুর্জোয়া সাংস্কৃতিকতায় নিজেদের বিকশিত করে চলতে পারেন একই সাচ্ছন্দ্যে বা তার চেয়ে বেশি সাচ্ছন্দ্যে থেকেও অভিবাসিত উন্নততর অর্থনীতির দেশে গিয়ে তাঁরা সে দেশের বুর্জোয়া সাংস্কৃতিকতাকে ধারণই করতে পারেন না; এমনকি পারেন না অনেক প্রাথমিক ক্ষেত্রেও। এর পটভূমির গভীরে ক্রিয়াশীল রয়েছে আসলে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিকতার স্বভাব। এই সাংস্কৃতিকতাকে সচেতন অনুভব ও উপলব্ধিতে নিয়ে আত্মস্থ করার প্রয়াস না থাকলে যেমন অভিবাসিত দেশে নিজেদের উৎকর্ষ ঘটানো যাবে না তেমনি নিজ দেশ থেকে বয়ে নিয়ে আসা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষকে যাবে না অভিবাসিত দেশের সাংস্কৃতিকতায় চিনিয়ে দেয়া। এই চিনিয়ে দিতে না পারায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এইসব দেশে বসবাসরত অভিবাসীদেরই উত্তরপ্রজন্ম।

৯

আমি সাহিত্য-সংস্কৃতির সাংগঠনিকতায় বেড়ে ওঠা মানুষ। বর্তমানে নিউইয়র্কবাসী। নিউইয়র্ক নিউজার্সি কানেটিকাট বা ফিলাডেলফিয়া মিলিয়ে একটা উল্লেকখযোগ্য বাংলাভাষী জনসমাজের অস্তিত্ব অনুভব করি। এ কথা স্পষ্ট যে অভিযাত্রী ও সংগ্রামী মন আছে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে। আমরা সব সময়ই নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করি। বাংলাদেশ থেকে বহু দূরে থেকেও বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে না থাকলে নিজেকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির বন্দী মনে হয়। তাই উন্নত অর্থনীতির এই দেশে এসেও সবসময় নিজদেশ থেকে আসা মানুষের সাহিত্য-সংস্কৃতিলগ্ন সংগঠনের সংস্পর্শে থাকারই চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করেছি একই ধরনের অন্য সমাজের সাংগঠনিকতাকে।নিঃসন্দেহে এখানকার দীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আমাদের জনসমাজের ক্ষুদ্র প্রয়াসগুলোর তুলনা চলে না। তাই এ কথা মনে রেখেই আমি অনুসন্ধান করেছি এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠনগুলোর সাংস্কৃতিকতাকে, বিশেষ করে সেইসব সংগঠন যাদের অর্থসামর্থ্য এতই কম যে তাদের পক্ষে সরাসরি কোনো প্রভাব বিস্তার করা তো দূরের কথা এমনকি যাদের অস্তিত্ব পর্যন্তও অনুভূত হয় না। কিন্তু লক্ষ্ করেছি প্রাতিষ্ঠানিকতার ধারণায়, কোনো একটা কাজের পেশাদারিত্বের বোধে, ব্যক্তি ও সংগঠনের সম্পর্কসূত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও সাংগঠনিকতার মাত্রাজ্ঞানে তারা সরল অর্থেই সাংস্কৃতিক বোধেও উন্নত! এমনকি আয়োজনের গাম্ভীর্যের তুলনায় তাদের অর্থব্যয়ের কৃচ্ছ্রতাও রীতিমতো চোখে পড়ে; অন্য দিকে বাংলাভাষী জনসমাজের সংগঠনগুলোতে আয়োজনের তাৎপর্যের তুলনায় অর্থব্যয়ের আতিশয্য বা ব্যয়বাহুল্য তুলে ধরে সংস্কৃতির দারিদ্র্যকেই। এমনকি সাহিত্য-সংস্কৃতির সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের ব্যক্তিপরিচয়কে এমন দৃষ্টিকটু রকমের স্পষ্ট করে তোলেন যে সহজেই তাঁদের সাংগঠনিক আয়োজনের উদ্দেশ্যর অগভীরতা দৃশ্যমান হয়ে পড়ে।

১০

সাধারণ কৌতূহল থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা সম্মিলনীর সংগঠকদের সঙ্গে কথা বলে কিংবা নিজে সাংগঠনিকতায় অংশ নিয়ে অনুভব করেছি যে উন্নত দেশে অভিবাসী হয়েও নিজেদের কর্ম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের তাৎপর্য সম্পর্কে যেমন তাঁরা অসচেতন তেমনি যেখানকার রাষ্ট্রসংস্কৃতিতে তাঁদের বসবাস তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও উদাসীন। ফলে উন্নত দেশে বসবাস করেও সেদেশের রাষ্ট্রসংস্কৃতির উৎকর্ষের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কিত করতে তাঁরা সক্ষম হচ্ছেন অনেক কম মাত্রায়।

যে-সব সাধারণ মানুষ বাংলাদেশে থাকা স্বজনদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বাড়ানোর সংগ্রামে নিয়োজিত থাকেন তাঁদের বাস্তবতা বোঝা কঠিন নয়, তাঁদের কাছে এর বাইরে কিছুর প্রত্যাশাও না থাকা ভুল নয়, কিন্তু যাঁরা নিজেদের উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনস্ক এবং আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল বলে ভাবেন এবং সে সূত্রে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির যথার্থ ধারক বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে উত্তর-প্রজন্মের অগ্রিম কিছু প্রত্যাশা থাকা হয়তো অমূলক নয়। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে, তাঁদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, অর্থনৈতিক সামর্থ্যে কিছুটা উত্তরণ ঘটাতে পারলেও সাংস্কৃতিক মান অনুধাবনের প্রক্রিয়াগত অনুশীলনের চাইতে সাফল্যের মেকি দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়াসের মনস্তত্ত্ব তাঁদের মধ্যে বেশি ক্রিয়াশীল। ফলে তাঁরা যখন বাংলাদেশের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে নিজেদের অস্তিত্বের চিহ্ন প্রদর্শন করতে যান তা সেখানে প্রকৃত সমাদর পায় না। এই ধারার প্রয়াসই অতিরিক্ত দৃশ্যমান বলে এমনকি যাঁরা সচেতনতায় ও অনুশীলনে কিছুটা এগিয়ে থাকেন তাঁরাও থেকে যান অচিহ্নিত ও উপেক্ষিত। ফলে মনে হয়, সাফল্য প্রদর্শনের মেকি প্রয়াস থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত অর্জনাকাঙ্ক্ষার মনস্তত্ত্ব গড়ে তুলতে না পারলে বাংলার বাইরে অভিবাসিতদের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক ঊনতা কাটিয়ে উঠতে আরো অনেকটা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

চয়ন মল্লিক

বেহাগের বাহারে

রবিঠাকুর বেহাগের উপর যত অপূর্ব সব মন-কেমন-করা সুর তৈরী করেছেন, তেমনটি অন্য কোন রাগে পাওয়া যায় না। তাঁর কাছের লোকেরা বলে গেছেন বেহাগই ছিল তাঁর প্রিয় রাগ। এতটাই প্রিয় যে অনেকে তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন গানে বেহাগের মেজাজটি পেলেই তাকে বলেছেন 'রবীন্দ্র-বেহাগ'। রবিঠাকুর বেহাগের সুরে যে কী অনন্যসাধারণ সব গান সৃষ্টি করে গেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। এমনিতেই বেহাগ আমার ভীষণ প্রিয়, আর তাতে যদি যোগ দেই রবীন্দ্রনাথ, তাহলে তো কোন কথাই থাকতে পারে না। আমার কাছে বেহাগ মানেই ব্যাকুলতা; বেহাগ মানে না-পাওয়ার আকুলতা; বেহাগ মানে কূল-হারা বেদনায় নিজেকে হারানো। যখন প্রবল বাসনায় কিছু চাই, কিন্তু পাই না, সে আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতাকে যদি সুরে রূপ দেয়া যায় – সেই আমার কাছে বেহাগ। সেই বেহাগের উপর লেখা কয়েকটি গান নিয়ে আমার একান্ত ভাবনাগুলোই এক করতে চেষ্টা করেছি এখানে।

প্রথম গানটি বর্ষার। বর্ষা মানেই রবীন্দ্রনাথ। বৃষ্টি আছে আর বাঙালি আপনমনে 'আজি ঝরোঝরো' কি 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' গুণগুণ করে ওঠেনি, এমনটি খুব কম। এই গানটিও বর্ষার, আর বেহাগ রাগের উপর – 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে'।

রবীন্দ্র-বেহাগের এই গানটি লেখার পেছনের ছোট্ট গল্পটি বলে নিই এই ফাঁকে। তখন কবির বয়স ৭৮। ১৯৩৯ সাল। শান্তিনিকেতনের 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানের তালিম চলছে। শৈলজারঞ্জন মজুমদার (শিক্ষক, গায়ক এবং রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গানের স্বরলিপিকার) কবির কাছে আবদার করলেন নতুন কিছু বর্ষার গানের। তৈরী হল 'ওগো, সাঁওতালি ছেলে'। পরদিন এলো আরো একটি নতুন গান – 'বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল'। তৃতীয় দিন ভোরে শৈলজারঞ্জন ছোট একটা চিরকুটে 'বেহাগ' লিখে কবির লেখার টেবিলে রেখে এলেন। পেলেন এই গানটি। এমনি করে সে যাত্রা কবি লিখেছিলেন ১৬টি আনকোরা বর্ষার গান। (শৈলজারঞ্জন মজুমদার: 'যাত্রাপথের আনন্দগান')

এ গানটি যখনই আমি পড়ি, মনে হয়, এ যেন শুধু বর্ষার কথাই বলছে না। বলছে প্রিয়জনের কানে কানে বলা সেই কথাটির কথাও। 'অবিরাম বর্ষণধারে' যে সুর সৃষ্টি করেছে বাইরের প্রকৃতি, সেই সুরের উপর কথা বসিয়ে চলেছে মন। সে কথার কোন কারণ নেই, সে গানের কোন অর্থ নেই। শুধু বাদলমেঘের বেদন যেন জেগে ওঠে সেই সুরে। যে কথাটি এতদিন ছিল মনের অতল কোণে, স্বপ্নের গহীন গোপনে – আজ

‘বাদলের অন্ধকারে’ সেই কথাটি তার কানে কানে আবার বলবার সময় হয়েছে। সময় হয়েছে তাকে ‘যে কথা শুনায়েছি বারেবারে’, সে কথাটি আরও একবার বলবার।।

আমার অন্যতম প্রিয় একটি প্রেমের গান ‘বিরহ মধুর হলো আজি মধুরাতে’। বেহাগ মানেই প্রেমের ব্যাকুলতা; বেহাগ মানে প্রেমিককে কাছে পাবার আকুলতা; বেহাগ মানে বিরহ-বেদনায় প্রিয়মিলনের প্রবল বাসনা। সেই বিরহ যখন মধুর হয়, তখন বেজে ওঠে যে গভীর রাগিনী – সেই বেহাগ। সেই বেহাগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ৪৯ বছর বয়সে বেঁধেছেন এই গানটি। ‘রাজা’ নাটকের এই গানটি গীতবিতানের প্রেম পর্যায়ে রয়েছে।

নাটকে কখন কোন পরিস্থিতিতে এ গানটি গাওয়া হয় তার বিশদ ব্যাখ্যায় না গেলেও এটুকু বলা যায় যে এ গান রানি সুদর্শনার মনের কথা। রানি তাঁর না-দেখা ‘রাজা’-এর অপেক্ষায় বিরহিনী। তখন তাঁরই অনুরোধে এই গানটি তাঁকে নাটকের অন্য পাত্রপাত্রীরা গেয়ে শোনালেও পুরো গানটি যেন রানির অন্তরের কথাই বলে।

তবু, এ কি শুধু সুদর্শনার বিরহমিলন কথা? এমন গভীর প্রেমের সুর, এমন তীব্র মিলনের আকাঙ্খা কি সবারই মনের বাসনা নয়? ত্রিভুবনে যে সেই বাসনারাজিই বেজে চলে প্রকৃতি জুড়ে। নদীবনরাজি কাঁপে সেই বেদনাতেই। সেই তীব্র মিলনের বেদনায় যে সুর বেজে ওঠে সে সুর ‘অধীর অদর্শন তৃষা’ মিটিয়ে মেশে অশ্রুজলে – যেন আঁখিপাতে আনে মরীচিকার ছায়া। যার বিরহে এই গান, বাতাস যেন সুদূর থেকে তার আসার আভাস আনে। আর সেই সুগন্ধে পরাণ হয় দিশাহারা। আজ সেই মধুক্ষণে সবখানে যেন তারই বাণী শোনা যায়–আর মিলন আনন্দে বাজে মনের মঞ্জীর–সাথে সাথে।

সুর আর বাণীর মেলবন্ধনে এর চেয়ে বেশী, এর চেয়ে সুন্দর কিছু আর কী হতে পারে–আমার জানা নেই। সুরের মোচড়ে মোচড়ে মিলনতিয়াসা, প্রিয়র অপেক্ষায় প্রহর গোণা, তারপর মধুরাতে বিরহের মধুরতর হয়ে ওঠা–এ রবিঠাকুরেই শুধু পাই। বিরহ আর প্রেমের মিলনে বেহাগের এই রূপ এইখানেই পায় সার্থকতা।।

এবারের গানটি যেন বেহাগের কূল-হারা বেদনা’র, প্রবল আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা’র সুরের রূপ। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সেই এমন সুর, এমন বাণী, আর এমন ভাবগভীরতা, সে-ও বোধকরি রবিঠাকুরেই পাই। গীতবিতানে বিচিত্র পর্যায়ে গানটি কবি কেন রেখেছেন, আজ কিছুটা বুঝতে পারি। তিনি নিজেই হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে একে প্রেম বা পূজায় ঠিক মানায় না। এমন বিশ্বচরাচরব্যাপী হাহাকার কী কোথাও বাঁধা পড়ে?

যেন এক বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ‘আমি কেবলই স্বপন’ বলে শুরু হয় গানটি। আবার কিছু পরেই ‘বাতাসে আমি’ কিংবা ‘হতাশে আমি’ বলে যে সুরটি ধরি, তাতেও যেন হতাশার সেই দীর্ঘশ্বাসটিই প্রলম্বিত হয়। যে স্বপ্ন শুধুই আকাশকুসুম, তাতে যে বিষাদই থাকবে, তাতে যে ফল ফলাবার আনন্দগান বেজে উঠবে না, সেই তো স্বাভাবিক।

ছায়ার মতন মিলায় ধরণী, কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে।

অন্তরায় যদি মন দিই, দেখব সেখানেও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। প্রথম ছত্রের সুরেই সে বেদনা হাহাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম অংশে সে আর্তনাদ যেন স্বপ্নের পৃথিবী ভেঙে পড়ার কষ্ট; সে হাহাকার যেন চেনা বিশ্ব ছায়ার মতন মিলিয়ে যাওয়ার দুঃখ। আর দ্বিতীয় অংশটির সুরের গঠন, তার দু'পা এগুনো আর তিন পা পেছুনো চলন, ঠিক যেন ঘাটে আছড়ে পড়া ঢেউ–যে ঢেউয়ে নৌকা ভাসানো যায়, কিন্তু তাকে কূলে ভিড়ানো যায় না। শেষ ছত্রের শুরু হয় মানসপ্রতিমা গড়ার সুরে, মুদারার স-থেকে। ধীরে ধীরে সে সুর তারার গান্ধার ছুঁয়ে নেমে আসে মুদারার কড়ি মধ্যমে। যেন সে মিলায় আকাশে, ভেসে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে–যেমন করে কবির 'মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে আকাশে'।

> কিছু বাঁধা পড়িল না কেবলই বাসনা-বাঁধনে।
> কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর-সাধনে।

সঞ্চারীর বাণীতে যা দেখি, স্বরলিপিতে তাতে একটু ভিন্নতা পাই। 'কেবলই' আর 'শুধু এ' স্থান বদল করেছে স্বরলিপিতে। একটু ভাবলে যেন খানিক বুঝতে পারা যায় এই পাঠান্তরের হেতু। যদি বলি 'কেবলই বাসনা-বাঁধনে', মনে হয় যেন যাকে বাঁধতে চাই, সে 'বাসনা-বাঁধনে' ধরা না দিলেও অন্য কোনোভাবে তাকে বাঁধা গেছে। 'শুধু এ সুদূর-সাধনে' ধরা না দিলেও, সে অন্য সাধনায় কাছে এসেছে। কিন্তু যখন গাইছি 'কিছু বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা-বাঁধনে', আমি বলছি যে শুধুমাত্র বাসনার বাঁধনে, প্রতিদিনকার চাওয়ার বন্ধনে সে বাঁধা পড়ে না। কিন্তু, আমার নিত্যদিনের প্রয়োজনের মাঝে শুধু তো সেই বাসনা, সেই কামনা–আর সেই আমার ক্ষুদ্রতা। তাই তো সেই বিশেষ কিছুটি আমার আকাঙ্ক্ষার বেড়িতে বন্দি থাকে না। আবার তাকে ধরে রাখতে চাইলেও 'কেবলই সুদূর-সাধনে' কাজ হবে না। একই সঙ্গে সাধনা করতে হবে কাছেরও। নিজের একান্ত জগতটিকে না বুঝে শুধু 'আকাশ পানে হাত বাড়ালে'ই তাকে পাওয়া যায় না। 'সীমার মাঝে অসীম' কে পেতে চাইলে আগে তো নিজের সীমাটুকু জানতে হবে, তবে না অসীমের পানে চলার পাথেয় মিলবে।

> আপনার মনে বসিয়া একেলা অনলশিখায় কী করিনু খেলা,
> দিনশেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে॥

এ গানের শেষেও যেন শুরুর সেই দীর্ঘশ্বাস, সেই হতাশা। আভোগের প্রথম অংশের সুরে যেন 'অনলশিখা'র গনগনে আঁচ, যেন অগ্নিদেব রঙ্গভরে নেচে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু যেই সে আগুনের শিখা তারার ষড়জ থেকে নেমে এলো মুদারার পঞ্চমে, সে এলো স্তিমিত হয়ে, সুরেও ফিরে এলো সেই হাহাকার। আপন মনে, না বুঝে যাকে ভেবেছি আমার সকল চাওয়া-পাওয়ার পূর্ণতা, তার সবই আজ শেষের দিনে না-পাওয়া আর না-চাওয়ার আগুনে নৈবেদ্য হয়েছে। পড়ে আছে শুধু একমুঠো ছাই--শুধু শূন্যতা।

এই গানটির শুরু থেকেই বেদনার যে প্রবল স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে চলে, গান শেষ হয়ে গেলেও অন্তরের গভীরে ফল্গুধারার মতো সে বেদনা বয়ে যায়। দৈনন্দিন জীবনের হাজার ব্যস্ততার ফাঁকেও হৃদয়ের তারে বেজে ওঠে যেন সেই চিরহাহাকাররব–

'কিছুই তো হ'ল না...
...কিছুই না পাইলাম, যাহা কিছু চাই'।।

পরের গানটি 'পূজা' পর্যায়ের হলেও প্রথম ছত্রেই মন অন্য পথে ধায়। যেন মনে হয় বর্ষারই কোন গান। কবি কিন্তু নিজেও আশ্চর্যজনক ভাবে এই গানটিকে স্থান দিয়েছেন তাঁর বেশির ভাগ বর্ষার গান তিনি যে স্বরবিতানে সাজিয়েছেন, সেই কেতকী (স্বরবিতান ১১)-তে। অথচ, গানটি পুরোটা গভীরভাবে পড়লেই শুধু বোঝা যায় যে, কী আকুল প্রার্থনা তিনি প্রকাশ করেছেন এর প্রতিটি ছত্রে! শুধু সুর যেন তাঁকে প্লাবিত করে, এ-ই কবির চাওয়া পুরো গানটি জুড়ে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যদি এভাবে সুরের নাগাল পাবার ব্যাকুলতা এমন একটি গান দিয়ে প্রকাশ করে যান, আমি তো নগণ্য। ৫২ বছরের পরিণত রবীন্দ্রনাথ 'শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে' গানটি লেখেন ১৯১৪ সনে শান্তিনিকেতনে বসে।

রবিঠাকুর বেহাগের সুরে যে কী অনন্যসাধারণ সব গান সৃষ্টি করে গেছেন এই গানটি তার আর একটি উদাহরণ। অস্থায়ী দিয়েই শুরু করি। পুরো অস্থায়ীর সুরেই কেমন যেন এক চেনা ছন্দ রয়েছে। না, শুধু দাদরার ছন্দ নয়। আমি এতে পাই যেন বর্ষার জলধারার ছন্দটি।

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে।

প্রথম ছত্র যেন দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি দিয়ে শুরু হয়ে মুহূর্তে এলোমেলো হয়ে যায় অঝোর বর্ষণে। আবার দ্বিতীয় লাইনটিতে যখন গাইছি 'তোমারি সুরটি আমার', 'আমার' গিয়ে স্থির হয় শুদ্ধ-ন'তে, আর তখনই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয় সেই না-পাওয়া সুরের সঙ্গে মেলবার আকুলতা। মনের মধ্যে যেন কবির সেই চাওয়াটিই বেজে ওঠে কবিরই সুরে। কিন্তু সেই সুরের ধারাজল নয় কোন মুষলধারে বর্ষণ। এ সুর যেন ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে 'মুখের পরে, বুকের পরে'–ঠিক যেমন করে সুরটি বাঁধা কড়ি-ক্ষ্ম আর শুদ্ধ-ম'এর সহজিয়া সুরে।

যদি তাকাই অন্তরার দিকে, সুরের স্রোতে ডোবার তীব্র বাসনা পাই অন্তরার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে।

পুরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে–
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে ।
নিশিদিন এই জীবনের সুখের 'পরে দুখের 'পরে।।

দিনের প্রথম আলোর মতই সহজ, একমুখী অথচ কোমল সুরে তাঁর চাওয়াটি তিনি ব্যক্ত করেছেন অন্তরার প্রথমে। পরের সুরটি যেন আসে চুপে চুপে, পা টিপে টিপে, যেন

বা নিশীথের গভীর অন্ধকারের মতই নিঃশব্দে। যেন হঠাৎ করে অন্ধকারের ঘুম না ভাঙে, কিন্তু সুর যেন ঝরতে থাকে অবিরল। তারপরই আসে আবার সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তারার র্স-থেকে শুরু করে ওখানেই ঘুরে বেড়াতে থাকে যেন তাঁর বাসনার তীব্রতা সুরে সুরে–যেন সুর তাঁকে কখনোই ছেড়ে না যায়–সুখে দুঃখে যেন সে অচল থাকে।

> যে শাখায় ফুল ফোটে না, ফল ধরে না একেবারে,
> তোমার ওই বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে।

সঞ্চারীতে নিজেকে কবি তুলনা করলেন রিক্ত নিঃস্ব এক শাখার সঙ্গে–এমনকি নিজেকে কোন মহীরুহ বলতেও যেন তাঁর আপত্তি। তাই বোধহয় সেই রিক্ত শাখাটিতে ফুল না আসার, ফল না ধরার বেদনায় তিনি সুর বসালেন মুদারার স থেকে গ-এ ঘুরে ঘুরে। শুধু একবার একটু ছুঁয়ে আসা ম আর প কে, সেও যেন সেই না-পাওয়ার বেদনাকেই আরেকটু গাঢ় করে তোলা। তবু সেই শূন্য শাখাটিতেও প্রাণ জাগতে পারে, পারে সুরের দোলা লাগতে। আর সেই সুরময় বাদল বাতাসের দোলা যেন ঢেউ তোলে মুদারার প থেকে শুদ্ধ-ন পর্যন্ত সুরের দোলায়, সুরের ফুল ফোটায় কড়ি-ক্ষ থেকে প-এর মৃদুমন্দ ঢেউয়ের খেলায়।

গানটির শেষ স্তবকের সুরের সাথে অন্তরার সুরে মিল থাকলেও, এ সুর যেন সকল দৈন্যতা, জীর্ণতা ঘুচিয়ে মনের আনাচে কানাচে, 'স্তরে স্তরে' পৌঁছে দেয় বিন্দু বিন্দু সুর। সে সুরের ধারায় তৃপ্ত হয় জীবনের সকল অতৃপ্তি–মেটে আজন্ম তৃষ্ণা! গানটি তাই গাই মনে একথাই ভেবে -

> যা-কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার, জীবনহারা,
> তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা ।
> নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে, ভুখের 'পরে॥

এই-এটুকুই তো চাওয়া। শুধু তাঁর মত এমন কথার মালায় সুরকে গেঁথে চাইতে পারিনা। আমার তৃষ্ণাও তাই মেটে না।।

'আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে'– রবীন্দ্র-বেহাগে বাঁধা বহুলশ্রুত এই গানটিও গীতবিতানের 'পূজা' পর্যায়ে আছে। তবু কি ঠিক বোঝা যায়, এ কোন পর্যায়ের? যেখানে রবীন্দ্রনাথের গানে প্রেম আর পূজা একাকার হয়ে গেছে বারেবারেই, সেখানে এই গানটিকে বিশেষভাবে 'পূজা' পর্যায়েই কেন তিনি রাখলেন, ধরতে পারিনা। তাও আবার তাঁর পূজার গানের যে ৪৯টি দুঃখবোধ, দুঃখজয়ের গান রয়েছে, এই গানটিও সেই দুখজাগানিয়া গানগুলোর একটি। কিন্তু কেন এই 'দেখা-না-দেখায়-মেশা'?

আমার একান্ত ভাবনায় এর কারণ হিসেবে আমি এ গানেও পেয়েছি কবির চিরকালীন সেই অন্তর্দ্বন্দ্বটিকে। যে বন্ধুর জন্যে তিনি একা জাগেন, সেই বন্ধুটি তাঁর হৃদয়েশ্বর, নাকি তাঁর পরমেশ্বর, গানের শেষ পর্যন্ত সে দ্বিধা থেকেই যায়। তবে কবির অন্তরে কিন্তু কোন দ্বিধা নেই–নেই ভয়। তিনি তাঁর পরমপ্রিয়কে–হোক সে ঈশ্বর কিংবা মানুষ–হৃদয়ে বরণ

করবার জন্য সবকিছু নিয়ে প্রস্তুত। তিনি জানেন তাঁর নিঃস্ব বন্ধুটিকে। জানেন সে আসবে 'শূন্য হাতে', শুধু হাত দু'খানি নিয়ে–আর তিনি ভরবেন সেই শূন্য হাতের ডালি–নিজেকে তাঁর চিরবাঞ্ছিতের কাছে সমর্পন করে।

কার রিক্ততা তিনি পূর্ণ করতে ব্যাকুল, তার খানিকটা আভাস মেলে গানখানির অন্তরায় এসে। কর্মময় বিশাল জীবনের দিনগুলো তিনি কাটিয়েছেন চাওয়া পাওয়ার হিসেব মিলিয়ে। তখন মেলেনি সময় জীবনদেবতাকে কাছে ডাকবার, তাঁর পায়ে নিজেকে শূন্য করে দেবার। জীবনসায়াহ্নে এসে তাই তিনি পথ চেয়ে আছেন তাঁর পরমেশ্বরের–যিনি কিনা তাঁর হৃদয়েশ্বরও। কবি জানেন তাঁর জীবনবন্ধুর নিশ্চিত পথটি–যে পথের প্রান্তে তিনি বসে আছেন তাঁর আপনাকে বিলিয়ে দেবার আশায়।

গানখানির শেষ অংশে হৃদয়েশ্বরকে ছাপিয়ে উঠেছেন পরমেশ্বর–যাঁর প্রেমময় পরশে কবির হৃদয় 'পূর্ণ করা'। যে পূর্ণতার আলোয় আলোকময় হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের সকল দুঃখের আঁধার, সব না-পাওয়ার অন্ধকার। তাই আভোগে এসেই আমি পাই তাঁর 'নিশীথরাতে'র বন্ধুর নিশ্চিত পরিচয়খানি। সারাজীবনে যে কবি নিজেকে দেবার মত সময়টুকুও করে উঠতে পারেননি, ছিলেন ভুলে স্বয়ং 'আপনাকে', তাঁরই জীবনদোলাটিতে আজ টান লেগেছে। আজ বেলাশেষে তাঁর আর ভুলে থাকা হয়না জীবনের পরমবন্ধুটিকে– তাঁর জীবনদেবতাকে। যে বন্ধুর হাতে হাত রেখে কবি চলেছেন সারাজীবনভর, কিন্তু যাকে চিনে নিতেই কেটে গেছে তাঁর সারাটা সময়, সেই বন্ধুই আজ টেনে নেয় কবিকে সবদিক থেকে–চৌদিক আচ্ছন্ন করে ঘিরে ধরে তাঁকে। কবি হার মানেন সেই খেলায়, খুঁজে পান আনন্দলোক–মেলেন তাঁর 'চিরবন্ধু'র সাথে অমৃতপাথারে।।

গীতবিতানের পূজা পর্যায়ের শেষ চৌত্রিশটি গান 'শেষের গান'। এ গানটি সেই গান ক'খানির মধ্যে একটি। জীবনের সায়াহ্নবেলায় এসে পথের শেষের এই গানগুলোতে যেন কবি কেবলই খুঁজে ফিরেছেন 'কী আছে শেষে!' এ গানেও তাই। কবি'র সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন জয়ধ্বনি করছে শেষের সে দিনটির। সকলেই তৈরী পথের শেষে পৌঁছবার জন্য, অন্তহীন অনন্তকে বরণ করে নেবার জন্য।

> মেঘ বলেছে 'যাব যাব', রাত বলেছে 'যাই',
> সাগর বলে 'কূল মিলেছে-আমি তো আর নাই'॥

শেষের দিনেরই আহ্ববানে সাড়া দিয়ে মেঘ যেন বলে ওঠে 'যাব যাব'। তার যাবার আগ্রহও এই দু'বার 'যাব যাব' বলায় স্পষ্ট। রাতও তো তার সাথী। সেও যেন বিদায় নিচ্ছে সকলের কাছ থেকে। 'যাই'-এর প্রলম্বিত সুরেই তার বিদায় নেয়া। তবু মেঘের মত তার যেন তত তাড়া নেই। মুদারার শুদ্ধ নিখাদ থেকে শুরু হয়ে পঞ্চমে তার চলে যাবার বেদনাকে ছুঁইয়ে গান্ধার ঘুরে আবার গিয়ে থামে পঞ্চমে। এই সুরের খেলার পুরোটাই যেন আমাদের জীবনের বহু প্রিয়জনকে বিদায় জানানোর মতই–যেতে যেতেও মন ফিরে ফিরে চায়। তবু যেতে হয়। তাই সে রাতও চলে যায়–আর সব কিছুর মতই।

স্থায়ীর দ্বিতীয় ছত্রে অকূল সাগরেরও মেলে কূলের সন্ধান। এই খানে সুরের আসা যাওয়ার খেলাতেও যেন কূলে এসে তার ঢেউয়ের ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ার কলধ্বনিই শুনতে পাই।

> দুঃখ বলে 'রইনু চুপে তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে',
> আমি বলে 'মিলাই আমি আর কিছু না চাই'॥

যেকোনো শেষই দুখজাগানিয়া। আর এ গানের অন্তরার প্রথম অংশটি যেন সেই চিরন্তন সত্যকেই আবার প্রকাশ করেছে। দুঃখ যেন শেষের দিনের পদচিহ্ন। বিদায়বেলা আসবে, অথচ তার পায়ে পায়ে বেদনা আসবে না, তা তো হয় না। তাই সে মাথা পেতে নিয়েছে সে ভার। কিন্তু সে দুঃখও ভুলি যখন আমার সমস্ত সত্তাটি গিয়ে মেলে সেই পরমপ্রিয়'র পায়ে। তখন আমার আমিত্ব হয় সম্পূর্ণ। বাকী সব কিছুই হয় তুচ্ছ। তখন আমার সারসত্তাটি মিলায় সেই অনন্তের সাথে, তার 'সকল চাওয়ার বাহির দেশে' গিয়ে সে নেয় তার জীবনের কলসটি পূর্ণ করে। এই অংশের সুরেও সেই পূর্ণতার পরমানন্দটুকু বোঝা যায় সহজেই–তার সপ্তকে বাঁধা সুরটি আমাদেরও যাত্রী করে সেই আনন্দপথের।

> ভুবন বলে 'তোমার তরে আছে বরণমালা',
> গগন বলে 'তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা'।
> প্রেম বলে যে 'যুগে যুগে তোমার লাগি আছি জেগে',
> মরণ বলে 'আমি তোমার জীবনতরী বাই'॥

আমার 'আমিত্বের' সব কিছু পাওয়া হলেও সেই দিনান্তবেলার তরে পথ চেয়ে থাকে সারা বিশ্ব। আমাদের এই চেনা পৃথিবী তার সকল রূপরসগন্ধ নিয়ে বরণমালা সাজিয়ে অপেক্ষায় আছে কখন মিলবে তার 'শেষ'। অসীম আকাশ জেগে থাকে তার আশায় লক্ষ তারার প্রদীপ জ্বেলে–যেন সায়াহ্নবেলায় পথ চিনতে ভুল না হয়। প্রেম অনন্ত–কিন্তু সে-ও চায় এক প্রশান্তিময় নিদ্রা–চায় অন্ত হোক তার যুগ যুগান্তরের জাগরণের। শুধু সব কিছুর যে শেষ–যার পরে নাকি আর কিছু নেই–সেই মরণদেবতারই কোন ছুটি নেই। সে যে তাঁর জীবনতরীর কর্ণধার। যেন শেষ থেকে আবার শুরু করে দেওয়াটাই এই 'মানবজন্মতরীর মাঝি'র কাজ। তার কারণেই আবার শুরু হয় পথচলা। জীবন আবার চলে-- 'সহজ কঠিন, দ্বন্দ্বে ছন্দে' কেটে যায়, যতদিন না সে আবার পায় পথের শেষ।

এই গানটি নিয়ে যখন ভাবতে বসি, আমারও ঠিক এখান থেকেই ভাবতে সহজ হয়। আমার যেন ঠিক একে 'শেষ' বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন সব গিয়ে মিলছে সেই 'মোহানার ধারে' যেখানে রাত্রি এসে মেশে 'দিনের পারাবারে', যেখানে 'আঁধার আলোয়' মিলে যায়, যেখানে জীবন মেলে জীবনে। তাই তো বেহাগের 'বিরহ মিলন কথা'টি আমি এ গানে ভীষণ ভাবেই খুঁজে পাই। মনে হয়, বেদনার পর যেমন আসে সুখ, বিরহের পর মিলন, তেমনি শেষের পরে আসে শুরু। কবি নিজেই যদি বলে যান '... শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে', তাহলে শেষ কথা বলবার আমি কে?

রেজাইনা, সাসক্যাচুয়ান, কানাডা

জমির হোসেন

ইতালিয়ান লাল পাসপোর্টের গল্প

একটি দেশের নাগরিকের প্রথম পরিচয় পাসপোর্ট। আন্তর্জাতিক ভ্রমণে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর কারণ এটি জাতীয় পরিচয় বহন করে। ফলে আন্তর্জাতিক যে কোনো ভ্রমণের ক্ষেত্রে তা না হলেই নয়। এক কথায় এর কোনো বিকল্প নেই। আর সেই পাসপোর্ট যদি হয় বিশ্বের কোনো ক্ষমতাধর দেশের তাহলে এ রকম সুযোগ হাতছাড়া করতে কেই বা চায়? বিশ্বের সেই শক্তিশালী পাসপোর্ট হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ ইতালির লাল পাসপোর্ট।

এই একটি লাল পাসপোর্ট পেতে জীবন-যৌবন পার করে দিয়েছেন অসংখ্য বাংলাদেশি। বছরের পর বছর অতিক্রম করেও অনেকেই লাল পাসপোর্টটি পাননি। যদিও সময় বয়স দুটোই চলে যায়। যৌবনের শেষ সময়টুকু পর্যন্ত স্বপ্নের দেশ ইতালিতে কেটে গেল। তবু অনেকের সেই আশা পূরণ হল না। পাসপোর্ট পেতে আইনের প্যাঁচে পড়ে সরকারের লম্বা সময় বেঁধে দেয়ার ফলে টগবগে যুবক থেকে অনেকেই বৃদ্ধ হয়ে যান। কেউ আবার চলে গেছেন না ফেরার দেশে। এভাবেই লাল পাসপোর্ট পাওয়ার প্রতীক্ষা করে জীবন-যৌবন পার করে দিচ্ছেন বাংলাদেশিরা।

এর মধ্যে যেসব বাংলাদেশি দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিয়ম মেনে আবেদন করেছেন, তাঁদের অনেকেই লাল পাসপোর্ট পেয়ে বিশ্বকে পেয়েছেন হাতের মুঠোয়। কিন্তু লাভ কী? যৌবন যে শেষ হয়ে যায়। লাল পাসপোর্ট পেতে সময় লাগে একযুগ। ইউরোপে আসার সাধ কার না জাগে? সবাই আসতে চায় ইউরোপ এক নজর দেখতে। আর যারা বিভিন্ন উপায়ে ইতালি পাড়ি জমিয়েছেন, স্থায়ীভাবে থেকে নিজেকে স্বাবলম্বী করেছেন, ইতালিতে তাদের বিচিত্রভাবে সময় কাটে। ইতালিতে প্রথম প্রবেশ করার পর ওইদিন থেকে তাঁকে দশ বছর গুনতে হয় একটি লাল পাসপোর্ট পেতে। এর আগে স্টে পারমিট (ইতালিয়ান ভাষায় সৌজন্য) পাওয়ার পরপরই পাসপোর্ট পেতে একটি স্থায়ী ঠিকানা করতে হয়। এ স্থায়ী ঠিকানার মেয়াদ দশ বছর হওয়ার পর আইনগতভাবে নাগরিকত্ব পেতে আবেদন করতে পারেন যে কোনো অভিবাসী। এর একদিন আগেও আবেদন গ্রহণযোগ্য হয় না। এরপর নাগরিকত্ব প্রত্যাশী অভিবাসীকে নিয়মিত কাজ,

বার্ষিক আয়ের হিসাব-নিকাশ, দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রতারণার সঙ্গে জড়িত না হওয়া, অকারণে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না থাকা, দেশদ্রোহী কোনো কাজে সম্পৃক্ত না হওয়া এসব শর্ত অভিবাসী অফিসে যাচাই-বাছাই করার পর, সব ঠিক থাকলে আবেদনের পর দুই থেকে তিন বছর লাগে পাসপোর্ট হাতে পেতে।

কিন্তু ইতালির সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কট্টর অভিবাসী বিরোধী মাত্তে সালভিনি দুই বছরের পরিবর্তে চার বছর করেন, ফলে জমা দেওয়ার পর একজন অভিবাসীকে চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

অবশ্য গত বছর আইন পরিবর্তন হওয়ায় আবার চার বছরের পরিবর্তে চব্বিশ মাস করা হয়েছে। যার ফলে পাসপোর্ট পেতে একজন অভিবাসীর প্রায় ১৪ বছর লেগে যায়। ভাগ্য ভাল হলে কারো বেলায় একটু সময় কম লাগে তবে এরকম ভাগ্যবানের সংখ্যা নগণ্য। বয়স অনুপাতে অনেকে পাসপোর্ট পেয়েও কোন কাজ করতে পারেনা। যদি কারো বয়স ৪০ বছর হয় তার সাথে আরও ১৪ বছর যোগ হলে বয়স দাঁড়ায় ৫৪ বছর। বাংলাদেশে বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিকদের ২০১৯ সালের হিসাবে গড় আয়ু ৭২.৬। এর আগে ২০১৮ ছিল ৭২.৩ বছর। সেই দিক বিবেচনা করলে এ পাসপোর্ট ব্যবহারের পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়না। অর্থাৎ বেশি একটা লাভবান হওয়া যায়না।

পাসপোর্ট পাবার আগে পাসপোর্ট প্রত্যাশীকে শপথবাক্য পাঠ করতে ডাকা হয় অভিবাসী অফিসে। এ সোনার হরিণ ধরতেই অবৈধ-বৈধভাবে বাংলাদেশিরা ইতালিতে আসতে মরিয়া হয়ে উঠেন। কেউ পাড়ি দেন আটলান্টিক মহাসাগর, কেউ বা ভূমধ্যসাগর। কারো হয় জয়, কারো আবার পরাজয়। ঝড়ে যায় অনেক প্রাণ সাগরের মাঝে। তবু থেমে নেই ইউরোপের সোনার হরিণ ধরতে আসা বাংলাদেশিসহ অন্যান্য অভিবাসীরা। প্রতি বছর লিবিয়ার ত্রিপোলি হয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইতালির লামপোদোসা আসতে চেষ্টা করে এর মধ্যে অনেকের সলিল সমাধি হয়।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বপ্ন গড়ার জন্য কত মানুষ সাগর পাড়ি জমান। এরপর অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে কোন ভাবে বৈধতা পেলে আস্তে আস্তে একটা সময় সবুজ পাসপোর্টের সাথে লাল পাসপোর্টের পাওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করে। কারণ এই লাল পাসপোর্টটি এর আগে বিশ্বের মাঝে ক্ষমতার পরিমাপ হিসেবে তৃতীয় একটি অবস্থান দখল করেছিল, তবে বর্তমানে এর অবস্থান চতুর্থ।

ইউরোপীয় সঙ্ঘের শেনজেনভুক্ত ২৮টি রাষ্ট্র ভিসামুক্ত করা হয়েছে। ইতালির ভিসা (শেনজেন) কোনো পাসপোর্টে থাকা মানে আটাশটি দেশ নিশ্চিন্তে আরামদায়ক ভ্রমণ করা যাবে। তাই পাসপোর্টটির জন্য সবার আগ্রহ একটু বেশি। এছাড়া গ্লোবাল র‍্যাংকিং স্কোর হিসেবে এর অবস্থান ১৫৭। ভিসামুক্ত ভ্রমণ ১২৪ দেশে। ভিসাসহ ভ্রমণ ৩২টি দেশ। ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন ১৫ জানুয়ারি ২০১৬ একটি প্রতিবেদনে ইতালিয়ান পাসপোর্ট ছিল পৃথিবীতে এক নম্বর। বর্তমান এ তথ্যে পরিবর্তন এসেছে।

দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষার পর সোনার হরিণ পাওয়ার আশায় বসে আছে বছরের পর বছর প্রায় দুই লাখ বাংলাদেশিসহ অন্য দেশের অভিবাসীরা। ইতালিতে সাদা-কালো মানুষের

বৈষম্য থাকলেও ইউরোপে এটি একমাত্র মানবাধিকার ভাবাপন্ন দেশ যেখানে সহজে কোনো অবৈধকে নিজ দেশে ফেরত পাঠান হয় না। যার ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষ এ দেশটিকে ইউরোপে প্রবেশের জন্য ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে।

ইতালি মানবতার জন্য বড় একটি দৃষ্টান্ত ইউরোপে। এরকম একটি সমৃদ্ধ দেশে বাংলাদেশিদের বসবাস কয়েক যুগ ধরে। হাজারো বাংলাদেশি পেয়েছে দেশটির নাগরিকত্ব। আর অপেক্ষায় দিন গুনছেন আরো হাজার হাজার বাংলাদেশি।

রোম, ইতালি

নাভিদ সালেহ

ধরিত্রীর উষ্ণায়ন এবং জল দূষণ:
আলাস্কার আদিবাসীদের জীবনে এর প্রভাব

নউত্তর-পূর্ব আলাস্কার একটি গ্রাম শিশমারেফ (Shishmaref), যেখানে ইনয়ুপিয়াক (Iñupiaq) আদিবাসীদের বাস। বেরিং প্রণালীর উত্তরে, সেরিচেফ (Serichef) দ্বীপে এ গ্রামটি অবস্থিত। উষ্ণায়নের প্রভাবে সামুদ্রিক বরফ এবং permafrost (ভূগর্ভস্থ হিমায়িত অঞ্চল) গলতে শুরু করে, যা গত দশকে বছরপ্রতি দশ ফুট করে উপকূল বিলীন করে দিতে থাকে। প্রায় ১৭,০০০ বছরেরও বেশী পুরোনো এই বেড়ী দ্বীপমালা (barrier island) আজ বিলুপ্তির পথে। আজ ইনয়ুপিয়াক আদিবাসীরা তাঁদের হাজার বছরের সংস্কৃতি এবং আবাসস্থল ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বছর খানেকের ভেতরেই এ গ্রাম ছেড়ে অজানায় পাড়ি জমাবে ৫৬২ জনের এই আদি জনগৌষ্ঠী। শিশমারেফ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে একথা সত্যি, তবে এমনি আরো ত্রিশটি আলাস্কান আদিবাসী গ্রাম এবং তাঁদের প্রান্তিক জীবনধারা আজ হুমকির সম্মুখীন।

এই আলোচনায় উত্তর মেরু এবং সংলগ্ন আলাস্কার ঈষৎ হিমায়িত অঞ্চলের জলের ওপর উষ্ণায়নের প্রভাব কী হতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ (National Science Foundation) অনুমোদিত একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের প্রারম্ভিক জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। জলদূষণ বিষয়ক বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর জন্য পাঠককে ২০২১ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত নানা বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভে খুঁজে দেখবার অনুরোধ রাখছি।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের হার শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। মূলত শক্তির চাহিদা মেটাতে জীবাশ্ম জ্বালানী প্রজ্বলন করা হয়, আর এভাবেই greenhouse গ্যাসসমূহ (যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং ওজোন) বায়ুমণ্ডলে নির্গত হতে থাকে। বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে এই গ্যাসসমূহ জমা হয় এবং গ্যাসের স্তর পুরু হতে থাকে। সূর্যরশ্মির short-wave radiation স্ট্রাটোস্ফিয়ার থেকে বিকিরিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায় আর তার আংশিক পৃথিবীতে আপতিত হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে আবার কিছু অংশ বিকিরণ এবং প্রতিফলনের মাধ্যমে উর্দ্ধাকাশের

দিকে ধাবিত হয়। পুরু হয়ে যাওয়া greenhouse গ্যাসের স্তর, যা কিনা long-wave radiation শোষণে সক্ষম, তা এই বিকিরিত রশ্মির প্রায় পুরোটুকুই শুষে নেয়। আর এভাবে পুরু কাঁথার মতো ভূমন্ডলের ওপর বিছিয়ে দেয়া গ্যাসের চাদর উষ্ণ করে তুলতে থাকে আমাদের এই গ্রহটিকে। হালের উপাত্ত থেকে দেখা যায়, প্রতিবছর ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন greenhouse গ্যাস নির্গত করছি আমরা। পৃথিবীর উষ্ণায়নকে থামাতে গেলে এই সংখ্যাকে শূন্যে নামিয়ে নিয়ে আনতে হবে।[২] এই কাজটি অসম্ভব মনে হলেও, এ ছাড়া মানবজাতিকে রক্ষা করবার আর কোনো পথ নেই।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কিছু জটিল ভৌগোলিক এবং জৈব রাসায়নিক প্রপঞ্চের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে।[৩] আর সেটা মেরুঅঞ্চলের জলবায়ুর চরমাবস্থাতে যেন আরো প্রকটভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। উত্তর মেরুতে উষ্ণায়নের প্রভাবের বিশেষ প্রতিভাসকে Arctic amplification বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে, যা অতিপ্লাবন, সমুদ্রতীরের স্থলাভিমুখে অধিগমন এবং ভূমিক্ষয়ের জন্যে দায়ী।[৪] কেবল তাই নয়, উষ্ণায়নের প্রভাবে হিমবাহ (glacier) এবং permafrost গলিত হবার মধ্য দিয়ে বরফে জমে থাকা fossilized বা জীবাশ্মযুক্ত অণুজীব (অর্থাৎ ভাইরাস এবং ব্যাক্টেরিয়া), নাইট্রোজেন মৌল এবং জৈব কার্বন জলে নিঃসৃত হয়ে চলেছে। আলাস্কার প্রান্তিক জীবনধারা, যা প্রায় অনেকটাই জলনির্ভর, তা অণুজীব এবং উক্ত রাসায়নিক মৌলের দূষণের কারণে যে বিপর্যস্ত হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।[৫] এহেন জলদূষণের নজির দেখা গেছে উত্তর মেরু সংলগ্ন এলাকায়।

উত্তর গোলার্ধে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর সাথে সহাবস্থানের কারণে উত্তর মেরুঅঞ্চলের জল বরাবরই দূষণের শিকার হয়েছে। খনিজ ধাতু, বিষাক্ত জৈব রাসায়নিক মৌল এবং অন্যান্য দূষক, বায়ুপ্রবাহের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, এবং উত্তর ইউরোপের দেশগুলো থেকে উত্তর মেরুতে পৌঁছেছে আর মেরুঅঞ্চলের পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৬] সম্প্রতি আমার ব্যক্তিগত গবেষণাতেও আলাস্কার জলে আর্সেনিক আর অণুজীবের উপস্থিতি চিহ্নিত হয়েছে।[৭] অবিরাম দূষণের শিকার হয়ে আলাস্কার Yukon River basin-এর কিছু আদিবাসী জনগৌষ্ঠী স্বতোপ্রণোদিত হয়ে জল পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন।[৮] কানাডার নুনাভিক (Nunavik) অঞ্চলের একটি রিপোর্টে অণুজীব-গত জল দূষণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।[৯] উত্তর মেরুর জলের গুণাগুণ এ অব্দি গভীরভাবে বিশ্লেষিত না হলেও, মেরুঅঞ্চলের জলে উষ্ণায়নের কী প্রভাব পড়তে পারে তা Antarctica বা দক্ষিণ মেরুতে সম্পন্ন গবেষণা থেকে আলোকপাত করা সম্ভব।

দক্ষিণ মেরুর জল গবেষণায় দেখা যায় যে মেরুঅঞ্চলের বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য (geographic feature), এর জলের গুণে নিবিড় প্রভাব ফেলে। ২০০৯ সালে Nature পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সন্দর্ভ উল্লেখ করে যে হিমবাহ, জৈব (organic) কার্বনের একটি বিশেষ উৎস (প্রায় ৬ x ১০১২ কেজি), যা নিঃসরিত হলে জলের গুণাগুনে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে।[১০] একইভাবে, permafrost, যা আলাস্কার ৮৫ শতাংশ ভূমি জুড়ে

রয়েছে, তা গলিত হবার মাঝ দিয়ে নাইট্রোজেন মৌল, হ্যালাইড, সালফাইড, ইত্যাকার রাসায়নিক উপাদান নিঃসৃত হবার আশঙ্কা রয়েছে। এমনই রিপোর্টের খোঁজ পাওয়া যায় McMurdo Dry Valley-র Crescent Stream-এর জল পরীক্ষায়। [১১] মেরু-জলে অণুজীবের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গেছে হালের কিছু সন্দর্ভে।

মেরুঅঞ্চলের উপশূন্য (sub-zero) তাপমাত্রা থাকবার কারণে এমন ধারণা হতেই পারে যে অণুজীব এমন চরম আবহাওয়াতে জন্মাতে বা বেড়ে উঠতে পারে না। এ ধারণাটি নিতান্তই ভুল। -৩৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেও কিছু বিশেষ অণুজীবকে সক্রিয় অবস্থায় পাওয়া গেছে। [১২] হিমবাহের জলে ২,৫০০ প্রজাতির অণুজীবের উপস্থিতি দেখা গেছে। [১৩] একটি বিশেষ আবিষ্কার হলো এই যে মেরুঅঞ্চলের চরম আবহাওয়াতে যেসব অণুজীব জন্মে, তাদের প্রকারভেদ সে এলাকার জৈব কার্বন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক মৌলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। [১৪] তাই psychrophile বা চরম ঠাণ্ডাপ্রিয় অণুজীব একটি বিশেষ প্রোটিনের জ্যাকেট-এর সহায়তায় শীতের প্রকোপ থেকে নিজেদের রক্ষা করে এবং সুপ্তাবস্থায় থাকে। [১৫] উষ্ণায়ন এদের নিঃসৃত করে চলেছে আলাস্কার জলপ্রবাহে, যা জলের জৈব গুণাগুণকে পাল্টে দিচ্ছে ক্রমশই।

কেবল তাই নয়, permafrost-এর রাসায়নিক গঠনে নাইট্রোজেন মৌলের প্রাধান্য থাকায় এর microbiome পরিবর্তিত হয় জোরালভাবে। এধরণের পরিবেশে filamentous cyanobacteria, algae, Bacteroidetes, এবং Fistulifera pelliculosa diatom-এর আধিক্য দেখা যায়। [১৬] কেবল ব্যাকটেরিয়াই নয়, ভাইরাসও নিঃসৃত হয়েছে হিমবাহ আর permafrost থেকে। যেমন, ১৯১৮ সালের মহামারীর Spanish Flu Virus আলাস্কার তুন্দ্রা অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া লাশে চিহ্নিত করা হয়েছে। [১৭] আবার ২০১৬ সালে এনথ্রাক্সে আক্রান্ত হওয়া একটি ১২ বছরের ছেলের রোগের উৎস ছিল Yamal Peninsula-র permafrost-এ খুঁজে পাওয়া জমাট বল্গা হরিণ। [১৮] সাইবেরিয়ার permafrost-থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য সুপ্ত ভাইরাস (যেমন Pithovirus sibericum এবং Mollivirus sibericum)-এর সংক্রমণ ক্রিয়াও অক্ষুণ্ণ থেকেছে বলে জানা গেছে। [১৯]

হিমবাহের সবচেয়ে গতিশীল অংশ glacial ablation zone, যা থেকে গলিত বরফে প্রভাবিত হয়ে চলেছে সংলগ্ন নদী এবং অন্যান্য জলাশয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বর্তমান হার অক্ষুণ্ণ থাকলে অদূর ভবিষ্যতেই এর পরবর্তী স্তর বা equilibrium line-এ গলন শুরু হবে। আলাস্কার অধিকাংশ এলাকাতে permafrost এর গলিত হওয়াও প্রত্যাশিত। যে ব্যাপক জলরাশির সঞ্চার হবে এতে, তা কেবল প্লাবন আর ভূমিধ্বসেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, অণুজীব আর রাসায়নিক উপাদানে সমৃদ্ধ এ জল বদলে দেবে আদিবাসীদের জীবনধারাও। জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি, salmon মাছ শিকারে প্রতিবন্ধকতা, বন্য প্রাণীর ঘাটতি, এ সব মিলে এঁদের যাপিত জীবনে ছেদ যে অবশ্যম্ভাবী। আগামী তিন দশকে কী করে বদলে যাবে জলের গুণাগুণ, কী করে পাল্টে যাবে হিমবাহ আর permafrost-এর বিস্তার, তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা জরুরি। আমার

আলাস্কার মেরুঅঞ্চলের গবেষণা এই অজানার আঁধারে কিছুটা আলো ছড়াতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র

১. USEPA. Climate Impacts in Alaska https://19january2017snapshot.epa.gov/climate-impacts/climate-impacts-alaska_.html.
২. Gates, B. How to avoid a climate disaster: The solutions we have and the breakthroughs we need. 2021, Knopf Doubleday Publishing Group, New York, NY.
৩. Zhang, B.; Wu, X.; Zhang, G.; Zhang, W.; Liu, G.; Chen, T.; Qin, Y.; Zhang, B.; Sun, L. Response of Soil Bacterial Community Structure to Permafrost Degradation in the Upstream Regions of the Shule River Basin, Qinghai–Tibet Plateau. Geomicrobiol. J. 2017, 34 (4), 300–308.
৪. Myers, N. Environmental Refugees in a Globally Warmed World. Bioscience 1993, 43 (11), 752–761.
৫. Schuur, E. A. G.; Vogel, J. G.; Crummer, K. G.; Lee, H.; Sickman, J. O.; Osterkamp, T. E. The Effect of Permafrost Thaw on Old Carbon Release and Net Carbon Exchange from Tundra. Nature 2009, 459.
৬. Barrie, L. A.; Gregor, D.; Hargrave, B.; Lake, R.; Muir, D.; Shearer, R.; Tracey, B.; Bidleman, T. Arctic Contaminants: Sources, Occurrence and Pathways. Sci. Total Environ. 1992, 122 (1–2), 1–74.
৭. Rowles, L. S.; Hossain, A. I.; Aggarwal, S.; Kirisits, M. J.; Saleh, N. B. Water Quality and Associated Microbial Ecology in Selected Alaska Native Communities: Challenges in off-the-Grid Water Supplies. Sci. Total Environ. 2019, 711, 134450.
৮. Wilson, N. J.; Mutter, E.; Inkster, J.; Satterfield, T. Community-Based Monitoring as the Practice of Indigenous Governance: A Case Study of Indigenous-Led Water Quality Monitoring in the Yukon River Basin. J. Environ. Manage. 2018, 210, 290–298.
৯. Martin, D.; Bélanger, D.; Gosselin, P.; Brazeau, J.; Furgal, C.; Déry, S. Drinking Water and Potential Threats to Human Health in Nunavik: Adaptation Strategies under Climate Change Conditions. Source Arct. 2007, 60 (2), 195–202.
১০. Hood, E.; Fellman, J.; Spencer, R. G. M.; Hernes, P. J.; Edwards, R.; Damore, D.; Scott, D. Glaciers as a Source of Ancient and Labile Organic Matter to the Marine Environment. Nature 2009, 462 (7276), 1044–1047.
১১. Gooseff, M. N.; Van Horn, D.; Sudman, Z.; McKnight, D. M.; Welch, K. A.; Lyons, W. B. Stream Biogeochemical and Suspended Sediment Responses to Permafrost Degradation in Stream Banks in Taylor Valley, Antarctica. Biogeosciences 2016, 13 (6), 1723–1732.

১২. Madigan, M. T.; Martinko, J. M.; Bender, K.; Buckley, D. P.; Stahl, D. A. Brock Biology of Microorganisms Plus Masteringmicrobiology With Etext.; Pearson: London, U.K., 2014.
১৩. Choudhari, S.; Lohia, R.; Grigoriev, A. Comparative Metagenome Analysis of an Alaskan Glacier. J. Bioinform. Comput. Biol. 2014, 12 (02), 1441003.
১৪. Smith, H. J.; Dieser, M.; McKnight, D. M.; SanClements, M. D.; Foreman, C. M. Relationship between Dissolved Organic Matter Quality and Microbial Community Composition across Polar Glacial Environments. FEMS Microbiol. Ecol. 2018, 94 (7).
১৫. Bej, A. K.; Aislabie, J.; Atlas, R. M. Polar microbiology: The ecology, biodiversity and bioremediation potential of microorganisms in extreme cold environments. 2009, CRC Press, Boca Raton, FL.
১৬. Kohler, T. J.; Van Horn, D. J.; Darling, J. P.; Takacs-Vesbach, C. D.; McKnight, D. M. Nutrient Treatments Alter Microbial Mat Colonization in Two Glacial Meltwater Streams from the McMurdo Dry Valleys, Antarctica. FEMS Microbiol. Ecol. 2016, 92 (4), 1–13.
১৭. Taubenberger, J. K.; Hultin, J. V; Morens, D. M. Discovery and Characterization of the 1918 Pandemic Influenza Virus in Historical Context. Antiviral Therapy. 2007, pp 581–591.
১৮. Fox-Skelly, J. Long-Dormant Bacteria and Viruses, Trapped in Ice and Permafrost for Centuries, Are Reviving as Earth's Climate Warms. BBC. 2017.
১৯. Legendre, M.; Bartoli, J.; Shmakova, L.; Jeudy, S.; Labadie, K.; Adrait, A.; Lescot, M.; Poirot, O.; Bertaux, L.; Bruley, C.; et al. Thirty-Thousand-Year-Old Distant Relative of Giant Icosahedral DNA Viruses with a Pandoravirus Morphology. Proc. Natl. Acad. Sci. 2014, 111 (11), 4274–4279.

অস্টিন, টেক্সাস, যুক্তরাষ্ট্র

নাহার তৃণা

হৃদমাঝারে থাকেন তিনি

অধিকাংশ মানুষ তার পাওনা বরাদ্দকৃত সময়ের জন্য পৃথিবীতে আসেন এবং সময় ফুরিয়ে গেলে পরপারে গমন করেন। ক'জনাই আর গৃহত্যাগী পূর্ণিমার হাত ধরে রাজ্যপাট ছেড়ে পথে নামতে পারেন আত্মানুসন্ধানের তাগিদ থেকে? এমন তাগিদ সবার ভেতর জন্ম নেয় না। সবাই পান না তেমন সাড়া, কেউ কেউ পেয়ে যান আচম্বিতে। অপার্থিব একটা জগতের আলো এসে যেন এমন তরো মানুষদের হাতছানিতে ডাকে- 'আমি কে? আমি কে?' এই উপলব্ধি সদাই তাঁদের ভেতরে 'বিষের বালি' হয়ে তাগাদা দিতে থাকে...ক্ষ্যাপার পরশ পাথর খুঁজে ফেরার মতো নিজেকে জানবার তীব্র বাসনায় এমন মানুষেরা ঘর ছাড়েন।আলেক সাঁই এর খোঁজে হন আত্মনিবেদিত...এমন এক বোধের তাগিদ থেকে রাজকুমার সিদ্ধার্থ পথে নেমে পড়েছিলেন। সময়ের পথ পরিক্রমায়,উপমহাদেশে যখন সিদ্ধার্থ আলোকপ্রাপ্ত হয়ে গৌতম বুদ্ধে পরিণত হয়েছিলেন, তার কাছাকাছি সময়ে (শত বর্ষের মধ্যে) পাশ্চাত্যে আরো একজন আত্মানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। ঘোরাক্রান্ত মানুষটির স্পষ্ট উচ্চারণ ছিলো, 'নো দাইসেলফ!'

তারও প্রায় ২২০০ বছর পর উপমহাদেশে, ঠিক করে বলতে গেলে এই বাংলাদেশেই আরেকজন সেরকম আত্মানুসন্ধানে লিপ্ত হন গানে গানে।যিনি সেই অপার্থিবের ডাক শুনেছিলেন, মরিয়া হয়ে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলেন।না, তিনি কোনো রাজার দুলাল ছিলেন না, ছিলেন না কোনো জমিদারীতেও।তিনি এসেছিলেন সাধারণ মানুষের মাঝ থেকে।তিনি তাঁর আসল পরিচয়টিকে খুব যত্নে আড়াল করেছেন জীবনের সুদীর্ঘ সময় ধরে।

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই তাই তাঁর জন্ম পরিচয়ের পাঁজি-ঠিকুজি না হাতড়িয়ে জানাই, তিনি খুব সাধারণ মানুষ হয়েও আর সবার চেয়ে আলাদা।নিজেকে জানতে চাইবার গভীর আকুলতা, সমাজ মনষ্কতা আর মানবতাবাদী ভাবদর্শনের জন্য আজও তিনি অনন্য। আজও আমাদের জন্য পরম বিস্ময়ের এক আধার! নিজেকে 'ফকির' নামে আখ্যায়িত করেও যিনি লক্ষ -কোটি মানুষের ভেতর বাড়িতে ঢুকে গেছেন রাজকীয় ভঙ্গিতে।তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের হৃদয়ে লালিত লালন ফকির!

সহজ মানুষের সহজিয়া সাধনা

লালনকে নিয়ে অনেকেই তত্ত্বকথা লিখেছেন।কিন্তু লালন নিজে কোনো তত্ত্বের কথা বলেননি।গানের মাধ্যমেই প্রচার করেছেন তাঁর জীবন দর্শন।প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থেকেও একজন মানুষ কতটা জ্ঞানগর্ভ দর্শনের উদাহরণ রাখতে পারেন তার উজ্জল

দৃষ্টান্ত লালনের গান।এই গানের মাধ্যমেই তিনি সহজ মানুষ ভজার কথা বলে গেছেন। গানে গানেই নিজস্ব আয়নার প্রতিচ্ছবিতে 'মনের মানুষ' বা 'স্রষ্টার' সন্ধান করেছেন।গান ছিলো তাঁর ভজন-সাধনের মাধ্যম।তাই, লালনের গানের ভেতর দিয়েই তাঁকে বুঝবার চেষ্টাটা জরুরী।গানের মধ্যেই লালনের ভাবদর্শন খুজে পাবো।

লালন মরমী গান গেয়েছেন।তাঁর গান বোঝার জন্য মরমী চেষ্টার দরকার কোনো রকম মরমী বোদ্ধা না হলেও তাঁর গান, প্রতীকের আড়ালে থেকেই আমার মনকে যেভাবে আচ্ছন্ন করেছে, তাই ভাবি, যদি সত্যিই সে চেষ্টাটা করা যেত তবে কত অনায়াসে তাঁর গানের সবটুকু আনন্দ উপভোগের ভাগীদার হওয়া যেত! লালনকে সেভাবে বুঝবার সীমাবদ্ধতা তাই একটা খুব বড় আফসোস!

লালনের গান রচনার ব্যাপরটি ছিল ভারী অদ্ভুত।যখন তাঁর মনে গানের ভাব আসতো তখন তিনি শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলতেন, 'পোনা মাছের ঝাঁক' এসেছে।শিষ্যরা তখন তাঁর সামনে জড়ো হতেন বাদ্য-বাজনাসহ।শিষ্যদের মধ্যে মলম কারিগর, ভোলাই শাহ, শীতল শাহ,মনিরুদ্দীন শাহ এবং মানিক শাহ উল্লেখযোগ্য।লালন নিজে কখনোই কোনো গান পাণ্ডুলিপির আকারে লিখে রাখেননি।মনিরুদ্দীন শাহ এবং মানিক শাহ লিপিকার হিসেবে তাঁর গান লিখে রাখতেন।বাউল গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালনের গানের সাহিত্য গুন, সুর মাধুর্য, ইত্যাদি দিকে বিবেচনা করে বলেন,

> সবদিকে দিয়া বিবেচনা করিলে বাউল গান রচয়িতা হিসাবে বাউল লালন ফকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। মূল তত্ত্বজ্ঞতা, সাধনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ দিব্যদৃষ্টি, বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যক্তব্য ও ইঙ্গিত ব্যঞ্জনাময় করিয়া বলিবার কৌশল, সহজ কবিত্ব শক্তি প্রভৃতিতে তাঁহার গানগুলি বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পদ।

যেন এক দুরন্ত ঝড়ের নাম লাল

লালনের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা এমন এক সময়ে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাচ্ছে নানান বিপ্লবী ঘটনা। শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে পাশ্চত্য দুনিয়া হাঁটা শুরু করলেও ভারতবর্ষের কাঁধে তখন সিন্দাবাদের ভূতের মতো বৃটিশরাজ আসীন।বাংলার সমাজ অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশ তখন বৃটিশরাজ কর্তৃক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার গিনিপিগ। তাঁর জন্মের প্রায় ১৪ বছর আগে ঘটে গেছে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধের নামে প্রহসন।যা ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশভূতকে দীর্ঘস্থায়ী আশ্রয়-প্রশ্রয়ের পথ খুলে দেয়।বিশাল ভারত হয়ে যায় বৃটিশদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র।সমাজের উঁচু তলা থেকে শুরু করে নিচুতলার মানুষগুলো, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের শরীর জুড়ে এসব পরীক্ষার করাত দাঁত বসাতে শুরু করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামের যাঁতার তলায় অসহায় সমাজ একই সাথে, জমিদারদের অন্যায় শোষণ-শাসন, আশরাফ-আতরাফ; হিন্দুবর্ণ প্রথা, তথা জাত-পাতের বিপুল কোলাহলময় এক সময়ে লালন এক শান্তির কপোত হয়ে নেমে আসেন বাংলার সবুজ প্রকৃতির বুকে।শুধু জাতপাত বিরোধী গান লিখেই না, নিজের ললাট থেকে জন্ম পরিচয়টুকু মুছে ফেলবার বৈপ্লবিক সাধনায় তিনি গেয়ে ওঠেন,

'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে", "কবে হবে এমন মানব সমাজ গো সৃজন..' শান্ত পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন আলোড়ন ওঠে, সন্দেহ নাই, লালনের গানেও সমাজের অন্দর মহলে আলোড়নের ঝড় উঠেছিল। সময়ের হাওয়া হয়ত লালনের উপর ভর করেছিল।লালনের গান তাই বিপ্লবের শব্দ হয়ে সুর পেয়েছিল তাঁর গলায়! ঝড়ের মুখে লাগাম পরায় এমন সাধ্য কার? লালন তো এক দুরন্ত ঝড়ের নাম।তাই তাঁর গানকে কেউ বেঁধে রাখতে পারেনি, না কটাক্ষে, না তিরস্কারে, না সময়ের শক্ত প্রাচীর তুলে। তাই মৃত্যুর প্রায় দেড়'শ বছর পরও লালনের গানের আবেদন ফুরিয়ে যায়নি আমাদের কাছে।জাত পাতের কাঁটাতারে আঁটকে পড়া অসহায় সম্প্রদায় থেকে শুরু করে তাবত দুনিয়ার মানবতার কণ্ঠ হয়ে বাজতে থাকে সে গান।কে বলে মৃত্যুই শেষ গন্তব্য? কিছু কিছু মহৎপ্রাণ মানুষ মৃত্যুকে ছাপিয়েও বেঁচে থাকেন।লালনের গানের প্রয়োজন তাঁর সময়কালেও যেমনটা ছিল; আজকের সময়কালে দাঁড়িয়েও ততটাই জরুরী আমাদের জন্য।

সহজ কথা বলে যে গান সহজেই

লালনের গানের একটি বড় বৈশিষ্ট্য সহজ সরল ভাষার ব্যবহার।সহজ কথা তিনি খুব সহজেই তেমন ভাষার মারপ্যাঁচ ছাড়াই বলেছেন।একই কথা তাঁর সুরের ক্ষেত্রেও।অথচ তাঁর সমসাময়িক বহু বাউল, বিপুল সংখ্যক গান রচনা করলেও সেগুলো ভাষাগত দুর্বোধ্যতা, সাহিত্য গুণহীনতা, আর আকর্ষণহীন হওয়ার কারণে তেমনভাবে টিকে থাকতে পারেনি।এমনকি লালনের সময়কালে বাংলা সাহিত্যের ভাষাও ছিল অনেক জটিল।কিন্তু লালনের গান উপনিবেশ যুগ পার হয়ে বিশ্বায়নের যুগে এসেও আবেদন হারায়নি।বাণীর সহজবোধ্যতা আর মর্মস্পর্শী সুর-ছন্দের হাতধরে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মনে অনায়াস প্রবেশ ঘটেছে তাঁর গানের।লালন তাঁর গানে চিরায়ত বাংলার লৌকিক শব্দ আর ছন্দকেই ধারণ করেন।যে শব্দ আর ছন্দের মায়ায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন ঘোরগ্রস্থ! যে কারণে পরবর্তীতে তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় লালনের ভাব-ছন্দ ব্যবহারে অনুপ্রেরণা পান।'বলাকা' এরকম ছন্দের ঘোরেই আক্রান্ত একটি কবিতা।

লালনের ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় তাঁর 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে।সেসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবন্ধটি পাঠের সময় তিনি বলেন,

> ভাষার শব্দে অর্থ আছে, স্বর আছে।অর্থ জিনিসটা সকল ভাষাতেই এক, স্বরটা প্রত্যেক ভাষাতেই স্বতন্ত্র।"জল' শব্দে যা বোঝায় "water' শব্দেও তাই বুঝি, কিন্তু ওদের সুর আলাদা।ভাষা এই সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প।সেই রূপসৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব বাংলাভাষার আপন সম্বল পণ্ডিতরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন, কেননা, তাঁরা অর্থের মহাজন; কিন্তু, যাঁরা রূপরসিক তাঁদের মূলধন ধ্বনি। প্রাকৃত-বাংলার দুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহতপ্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে, সেই "অশিক্ষিত'-লাঞ্ছনাধারীর দল

যথার্থ বাংলাভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না।তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই।

'আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
আর-একটি-
এমন মানব-জনম আর কি হবে।
যা কর মন ত্বরায় করো
এই ভবে।'

এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটো বড়ো নানা ভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজে-ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।

প্রতীক-রূপকের মহাজন

বৈষ্ণব পদাবলী'র ঢংয়ে লালন তাঁর পদগুলো রচনা করেন, যা ছিল রূপক বা প্রতীকবহুল, কিন্তু তেমন দুর্বোধ্য নয়।আর সুর সংযোজনে ঢপ কীর্তনের রীতি অনুসরণ করেন।চিরায়ত বাংলার প্রাকৃতি যেমন উঠে এসেছে তাঁর লেখায়।একই সাথে আটপৌড়ে জীবনে ব্যবহার্য নানান বস্তুকেও তিনি রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন নিজস্ব কায়দায়। বাংলা সাহিত্যে এর আগে এভাবে আর কেউ প্রতীকের আড়ালে জীবনের গূঢ় রহস্যের কথা, গভীর জীবনবোধের কথা বলেছেন বলে (আমার) অন্তত জানা নাই।লালন তাই আমাদের চোখে প্রতীক ব্যবহারের এক বিস্ময়কর মহাজন- আড়তদারও বটে। তাঁর গানে, 'খাঁচা' 'পাখি' 'নদী' 'কূপজল' 'আগলা পুকুর' 'পদ্ম' 'জবা' 'নৌকা' 'ধতুরা ঘোটা' এমন অসংখ্য চিরায়ত বাংলা শব্দ রূপক/ প্রতীকের ব্যবহার দেখি।

'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।' প্রতীকের মাধ্যমে, তিনি খাঁচা হিসেবে আমাদের নশ্বর দেহ আর পাখি বলতে রুহ্ বা আত্মাকে বুঝিয়েছেন। এভাবে, 'তিন পাগলের হলো মেলা ন'দে এসে/ তোরা কেউ যাসনে ও পাগলের কাছে।' তিন পাগল বলতে তিনি, আমাদের তিন রিপু ঈর্ষা, লোভ, মোহ কে বুঝাতে চেয়েছেন। যার প্রলোভনে মেতে গিয়ে আমরা সব ভুলে যাই।ফলে আমরা আসল পাওনা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার বা মনের মানুষের সান্নিধ্য লাভ থেকে বঞ্চিত হই।কী চমৎকার ভাবে প্রতীকের আড়ালে তিনি করে গেছেন চিরন্তন সত্য আর সুন্দরের সাধনা!

তিনি শুধু নন ক্ষ্যাপা বাউল:

বাউল শব্দটি সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ থেকে আগত বলে ধারণা করা হয়।এ শব্দের অর্থ, পাগল বা সমাজ বিচ্যুত। আবার অনেকে মতে: বাউ বা বাতাস যারা সন্ধান করে বেড়াতো, তাদের বাউল বলা হতো।সেসময় তুমুল জাতপাতময় সমাজে এই শ্রেণীটি 'অচ্ছ্যুৎ" বা সমাজচ্যুত- পতিতদের শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হতো।লালন সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি।বলা ভালো প্রধানতম প্রতিনিধি।ভেবে নিলে বোকামিই হবে যে লালন আর

দশজন সাধারণ বাউলের মতো শুধুই একতারা বাজিয়ে পথে পথে গান গেয়ে, মাধুকরীর মাধ্যমে জীবন চালিয়েছেন, এবং মৃত্যু এসে ডাকলে চুপচাপ পৃথিবী ছেড়ে গেছেন। আলোচনার শাখা-প্রশাখা থেকে জানা যাবে, যে তিনি গান দিয়েই চিরায়ত গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত নানামুখী গোঁড়ামির মূলে আঘাতে সচেষ্ট ছিলেন।শুধু একতারায় সুর তুলে জীবন পার করেননি।

ভারতীয় সমাজ বিশেষত কলকাতা কেন্দ্রিক নাগরিক সমাজে তখন পলাশী যুদ্ধোত্তর একটা পরিবর্তনের ঢেউ লাগতে শুরু করেছে। রামমোহন রায় আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক কু-প্রথাগুলোকে হটিয়ে 'খোলা জানালা' নীতির আদলে সমাজ পরিবর্তনের তোড়জোড় শুরু হয়।ইতিহাসে ভারতীয় তৎকালীন সমাজ বদলের প্রমান্য সাক্ষ্য হিসেবে এসব লিখিত থাকলেও একই সাথে সেসময় গ্রামীণ সমাজে নীরবে লালন নামের মানুষটিও যে কাজ করে যাচ্ছিলেন, সে কথা সুস্পষ্ট করে লেখা নাই! সমাজবিজ্ঞানী কিংবা ইতিহাসবিদেরা লালনের জন্ম পরিচয়, তাঁর জন্মের সাল তারিখ বিচারে যতটা উৎসাহ বোধ করেন, লালনের সমাজ মনস্কতা তথা সামাজিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার ব্যাপারে ততটাই নিরুৎসাহী যেন। এটা অবাক হবার মতোই একটা ব্যাপার বটে! ঠিকভাবে এদিকটিতে আলো ফেলা হলে লালনের সমাজ সচেতনতার বিষয়টি আমাদের জন্য স্পষ্ট হবে।

গানের মাধ্যমেই তিনি প্রতিবাদ করেন জাতিভেদ, বর্ণপ্রথা, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িকতা এবং শাস্ত্রীয় শাসন-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে

> এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে/যেদিন হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রীষ্টান জাতি গোত্র নাহি রবে।' আরো " যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান/ নারী লোকের কি হয় বিধান/ ব্রাহ্মণ চিনি পৈতা প্রমাণ/ বামনি চিনি কিসেরে।', " জাত না গেলে পাইনে হরি/ কি ছার জাতের গৌরব করি ছুঁসনে বলিয়ে/লালন কয় জাত হাতে পেলে/পোড়াতাম আগুন দিয়ে।',"গঙ্গায় গেলে গঙ্গা জল হয়/ গর্তে গেলে কূপ জলই কয় বেদ বিচারে/ তেমনি সাঁইয়ের বিভিন্ন আকার/ জানায় পাত্র অনুসারে।

ইত্যাদি বারুদময় শব্দের গান ধর্মকে জিম্মি করে আখের গোছানো ধান্ধাবাজ, কূপমণ্ডূক সমাজ ও সমাজপতিদের প্রতি লালন দ্রোহের ইশতেহার যেন।

যুগ যুগ ধরে চলতে থাকা গ্রামীণ সমাজের সব কুপ্রথা-আচারের বিরুদ্ধে বলবার জন্য যে সাহস এবং মুক্তচিন্তার প্রয়োজন পড়ে, লালনের তা পুরোমাত্রায় ছিল।বলা ভালো সে যুগের তুলনায় বেশিই ছিল।তাই তিনি স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়েছেন একতারা হাতে।তাঁর ইতিহাস পাঠ করে আমরা এটাও জানতে পারি যে, প্রয়োজনে একতারা ফেলে লাঠি ধরতেও তিনি কসুর করেননি।এক্ষেত্রে কাঙ্গাল হরিনাথের ঘটনাটি স্মরণ করা যেতে পারে।সে সময় কুমারখালি থেকে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামের একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো।যার সম্পাদক ছিলেন কাঙ্গাল হরিনাথ।সে পত্রিকায় তিনি জমিদারদের অন্যায় নির্যাতন, জুলুমের কথা লিখেন, যা জমিদারের পছন্দ হয়নি।তাঁকে শায়েস্তা করবার জন্য পাঠানো হয় জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী।লালনের কানে শিষ্য মারফত

সে খবর পৌঁছানো মাত্র তিনি লাঠি হাতে শিষ্যদের নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে জমিদার বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়ান।লালনের এমন আচরণই প্রমান করে তিনি কেবলমাত্র একজন উদাসী বাউল নন, বরং সমাজমনস্ক, নীতির প্রশ্নে আগুয়ান একজন।তাই, রামমোহন-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যদি বাংলা রেনেসাঁসের নগরকেন্দ্রিক অগ্রদূত হন, তবে গ্রামীণ সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে লালনকে নির্দেশ করা যায় নির্দ্ধিধায়।যা অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথায় খুব স্পষ্ট, 'বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যে গুরুত্ব বাংলার লোকমানসের দেয়ালী উৎসবে লালনেরও সেই গুরুত্ব।'

তোমার সুরের আলো ছড়িয়ে গেল অনেকপ্রাণে-অনেকদূরে

'তুমি কেমন করে গান করে হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি ! বিস্ময়বোধের ঠিক কোন পারে বসে আরেক মহাগুণী মানুষ এমন কথা বলেছিলেন সেটা আমাদের বুঝতে কষ্ট হলেও অসাধ্য নয় এ বোধকে ছুঁয়ে দেয়া।যদিও এ গানটি রবীন্দ্রনাথ নামের আরেক বিস্ময় লালনকে উদ্দেশ্য করে লিখেননি।কিন্তু লালনের গান, ভাবনা তাঁকে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে তিনি বহুগান, কবিতা প্রবন্ধে বাউল তথা লালনভাবে ভীষণভাবে আলোড়িত হয়েছেন।যা বিস্তারিত লিখতে গেলে আরেকটা প্রবন্ধ হয়ে দাঁড়াবে।একথা ঠিক, সূর্য যখন উঠে তখন সে তার আলোতেই নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু কালো মেঘ যখন সূর্যকে ঢেকে দেয়, তখন সূর্যের সে আলোও অন্ধকারে মুখ ঢাকে। লালন এমন একটা পরিবেশে নিজের ভজন সাধন করতেন যা ছিল গ্রামীণ, গন্ডীবদ্ধ সীমানা।তার সৃষ্টির আলো গ্রামীণ চৌহদ্দিতেই আঁটকে ছিল যেন, যদিও তাঁর বিপুল সংখ্যক শিষ্য-ভক্তকুল ছিলেন।কিন্তু এ কথা তো সত্যি, বাউল নামের এই শ্রেণীটি ছিল তখন সমাজের 'অচ্ছ্যুৎ'।
তারা অশিক্ষিত, নোংরা- বিকৃত রুচির আচার দর্শনের অনুসারী এটাই সমাজের বেশির ভাগ, বিশেষ করে শিক্ষিত শ্রেণীর ধারণা ছিল।কিন্তু এই অশিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ কি এমন গান রচনা করতে পারে যা বোধের ঘরে টোকা দিয়ে খুলে দিতে পারে হাজারো দরজা! শিক্ষিত, নাগরিক মানুষগুলোর এই ভুল ধারণাটা ভাঙ্গতে যিনি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখেন।তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।সূর্যের আলোর সামনে থোকবদ্ধ অন্ধকারের মতো এসব ভুল ধারণার পলেস্তারা খসে পড়তে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের লালন প্রীতির হাত ধরে।যদিও লালনের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী, শ্রীমতি সরলা দেবী ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সাহায্যে লালন এবং গগণ মণ্ডল(হরকরা)এর গান ও জীবন নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন।কিন্তু তা যেন ততটা সাড়া ফেলে না, যতটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটে। রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তা থেকে প্রায় বিশটির মত গান নিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' ' পত্রিকার 'হারামণি' বিভাগে(যে নামাকরণটি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শই করা হয়) প্রকাশ করেন।শুধু তাই নয়, তিনি সেসব গান গণ মানুষের মধ্যে প্রচারেও অগ্রণী ভূমিকা নেন।অন্যদিকে মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন ছিলেন বাউল গানের সংগ্রাহক। তিনি রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে 'হারামণি'

শিরোনামে ১৩ খণ্ডে ৫ হাজারেরও বেশি লোকসঙ্গীত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংরক্ষণ করেন। লালনের গানের সংকলন হিসেবে এই 'হারামণি' একটি উল্লেখযোগ্য নাম।
বাউলদের ভাবে রবীন্দ্রনাথ এতটাই ডুবেছিলেন যে ১৯১৫ সালে 'ফাল্গুনী' নামে একটি নাটক রচনা করে তাতে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একতারা হাতে নৃত্যরত রবীন্দ্রনাথের যে ছবিটি আমরা দেখি তা ঐ নাটকেরই স্মারক চিহ্ন। এভাবে সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথ বাউল তথা লালন সম্পর্কে আকন্ঠ প্রশংসাসূচক মন্তব্য করতেন।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা জানিয়ে দেন যে, গ্রামের বাউলদের বিশেষত লালনের গানের ভাব এবং ভাষার প্রতি সুশীলসমাজ যদি অবজ্ঞার ভাব রাখেন তবে সেটা ভুলই হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রচারণা এবং তাঁর বিভিন্ন সুষ্টিতে বাউলভাবের প্রকাশ ঘটায় শিক্ষিত শ্রেণী নড়েচড়ে বসেন।লালন গ্রামীণ পটভূমি ছেড়ে শহর তথা সাহিত্যের বিরাট উঠোনে পা রাখেন। তার পরের ইতিহাস, বিস্ময়ের ঘোরে আক্রান্ত মানুষের আবেগের উচ্ছ্বাসে ভেসে যাবার ইতিহাস। অবশ্য একই সাথে লালনকে ক্রুশবিদ্ধ হবার যাতনাও সইতে হয়েছিল বৈকি!
রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সৃষ্টিতে বিশেষতঃ গানে বাউলভাবের বিশেষ প্রভাব লক্ষনীয়।তাঁর রচিত আমাদের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' লালন শিষ্য গগণ হরকরার 'আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে' এর অনুসরনে রচিত। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নস্হানেই একথা উল্লেখ করেছেন যে তাঁর 'জীবন দেবতা'র তত্ত্ব আসলে বাউলদের 'মনের মানুষ' তত্ত্বের ভিত্তিতেই রচিত।'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তায় সকল খানে।', 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি।' ইত্যাদি গানগুলো 'কে কথা কয় রে দেখা দেয় না,' 'বাড়ির পাশে আরশিনগর', 'কি সন্ধানে আমি যাই সেখানে, 'মনের মানুষ যেখানে' এসব গান অনুসরণে রচিত।এমনি মৃত্যুর দশদিন আগে রবীন্দ্রনাথ(২৭ জুলাই ১৯৪১ সাল) 'প্রথম দিনের সূর্য' নামে যে কবিতাটি রচনা করেন সেটিও তাঁর 'জীবন দেবতা' তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত বললে ভুল বলা হবেনা হয়ত, যা কিনা লালনেরই ভাবের অনুরণন।
রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক মাত্রায় বাউল তথা লালনভাবে আক্রান্ত ছিলেন এতে সন্দেহ নাই। যা তাঁর রচনাশৈলীতে প্রভাব ফেলেছিল বলে ধারণা করা হয়।লক্ষ করবেন সমসাময়িক সাহিত্যিকদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন এক সরল বাংলা ভাষায় রচনা করতে শুরু করেন গান কবিতা উপন্যাস। বঙ্কিম যুগকে পেছনে ফেলে সৃষ্টি হয় আধুনিক এক সাহিত্যের ভাষা। নতুন সেই বাংলা ভাষা আজ শতবর্ষ পরেও আধুনিকতার পোষাক পরেই আছে। সেই সহজিয়া বাংলা ভাষার অনুপ্রেরণার পেছনে লালনের প্রভাব থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সাথে সাথে আরো বহু প্রতিভাময় মানুষ যেমন, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লালনভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে গান রচনা করেন। নজরুলের উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে 'আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন,' 'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল' লালনের ভাবে রচিত। এছাড়াও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মীর

মোশাররফ হোসেন, কাঙ্গাল হরিনাথ, মিলে লালনের গানে প্রভাবিত হয়ে একটি বাউল গানের দল তৈরী করেন। এতে মীর মোশাররফ হোসেন এবং কাঙ্গাল হরিনাথ গান রচয়িতা হিসেবে খ্যাতি পান।

লালন যেখানে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন, সেই কুষ্টিয়াতে চাকুরি সূত্রে আসেন সব্যসাচী লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়। লালনের গানে তিনি এতোটাই আচ্ছন্ন ছিলেন যে তিনি চেয়েছিলেন, 'আমার শেষ জীবন কাটাতে চাই কুষ্টিয়ায়।বাংলাদেশের হৃদয় যেখানে।' যদিও তাঁর শেষ ইচ্ছা বাস্তবে রূপ নেয়নি ইতিহাসের পালাবদলের কারণে, কিন্তু আমৃত্যু লালনের প্রতি এই মুগ্ধতা বজায় ছিল। যার প্রমাণ মেলে লালনকে নিয়ে বিভিন্ন লেখালেখির মধ্যে দিয়ে। অন্নদাশঙ্করের মতো আরেক সব্যসাচী লেখক শওকত ওসমানও ছিলেন লালনের ভক্ত, তাঁকে নিয়ে তিনি একটি গল্প রচনা করেন। বাংলাদেশের অন্যতম কবি শামসুর রাহমানের কবিতা 'লালনের গান' কবিতায় ওঠে আসে মুগ্ধ লালন বন্দনা।বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে তাঁর উপরে রচিত হয়েছে অনেক গল্প-উপন্যাস, নাটক- সিনেমা এবং গান। আমাদের খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল লালনের জীবন ও গান নিয়ে 'অচিন পাখী' (১৯৯৬) নামে ৬০ মিনিটের একটি চমৎকার ডকুমেন্টারি তৈরী করেন। এছাড়া ২০০৪ এ তিনি একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'লালন' তৈরী করেন।অন্যদিকে পশ্চিম বাংলার চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ ২০১০ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যাযের 'মনের মানুষ' উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন।

শুধু বাঙ্গালী হৃদয়েই লালন তাঁর গানের বাণী আর সুরের মুর্চ্ছনায় আলোড়ন তুলেছেন তা নয়। বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর সৃষ্টি আলো ছড়িয়েছে আরো দূর দিগন্তে। বহু দেশের মানুষই এখন লালনকে জানতে, বুঝতে আগ্রহী এবং তারা কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়াতেও সে উদ্দেশ্যে এসে থাকেন। আমেরিকান কবি এ্যালেন গিন্সবার্গ বাংলাদশের প্রতি একটা হৃদ্যতা অনুভব করেছেন নানা কারণে। রবীন্দ্রনাথের মতো নোবেল লরিয়েট নন, গ্রামবাংলার সহজ মানুষের খোঁজে নামা ক্ষ্যাপা বাউল লালনই যেন তাঁকে বড়বেশি মুগ্ধতার বাঁধনে বেঁধে ফেলেন।লালনে অনুপ্রাণিত গিন্সবার্গ রচনা করেন 'আফটার লালন' নামের চমৎকার কবিতা।পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লালনের সৃষ্টিকে বুঝবার আগ্রহে হচ্ছে গবেষণা। নানান ভাষায় আজ অনুবাদ হচ্ছে লালন নামের এই অবাক গানেরপাখির সৃষ্টি। লালনকে জানবার এবং জানাবার আগ্রহ থেকে বাংলাভাষী শিক্ষার্থীরা বিদেশে বিভিন্ন সময়ে লালনকে নিয়ে নানা অনুষ্ঠান করে থাকেন।এরকমই একটি অনুষ্ঠান 'Man of the Heart' মঞ্চস্থ হয় নিউইর্য়কস্থ কারেইন থিয়েটারে। এধরনের পরিবেশনা বিদেশিদের লালন সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ায় বলে, প্রায় এমন উদ্যোগ নেয়া হয়ে থাকে।ইউনেস্কো লালন তথা বাউল গানগুলোকে 'Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity' হিসেবে সম্মানিত করেছে। লালনকে নিয়ে এই আগ্রহের ঢেউ ক্রমশঃ আছড়ে পড়ছে উপকূল থেকে উপকূলে, যা সত্যিই ভালোলাগার, গর্বের!

সারা জীবন যে মানুষটি নিজের জন্ম পরিচয়কে আড়ালে রেখে, ধর্মীয়গন্ডীর বাইরে থেকে মনের মানুষের সন্ধান করেছেন।তিনি এখন ছেঁউড়িয়ার মাটিতে গভীর ঘুমে মগ্ন।সুদীর্ঘ সময় ধরে নিজেকে ধর্মীয় কিংবা বংশ পরিচয়ের উর্দ্ধে শুধুই একজন 'মানুষ' পরিচয়ের যে সাধনা করে গেছেন, আমরা স্বার্থবাদী বেনিয়ামনস্ক মানুষেরা ঠিকই তাঁর কপালে ধর্মীও টীকা লাগিয়ে দিয়েছি! আজকে লালনের ছেঁউড়িয়াতে সব আছে, ব্যবসায়িক বুদ্ধি খাটিয়ে গড়ে তোলা বানিজ্যিক ইমারত, ব্র্যান্ড শিল্পীদের আনাগোনা, তাঁকে ভক্তির নামে আয়োজিত উৎসবে মদ-গাঁজার লাগামহীন মচ্ছব, যেগুলো লালনের আদর্শ বহনের পথে একটা প্রশ্নচিহ্নের জন্ম দেয় বলে মনে করি।এসবের মাঝে শুধু যেন লালন নিজেই নিজভূমিতে পরবাসী হয়ে গেছেন।এমন 'পণ্ডিতকানা'দের হাটবাজার দেখে দূরে কোথাও দাঁড়িয়ে ব্যথিত হৃদয়ে ক্ষ্যাপা বাউলটি কী বিড়বিড় করে গেয়ে ওঠেন,'না জেনে ফকিরি আটা/ শিরেতে পরলাম জটা/ সার হলো ভাং ধুতরা ঘোটা/ ভজন সাধন সব চুলোতে'? লালনকে সম্মান করতে গিয়ে অসম্মানের চূড়ান্তই হয়ে গেছে আমাদের অসহায় চোখের সামনে সাল ২০০৮ এ।বাংলাদেশে প্রবেশের সদর দরজার কাছেই সাধারণ মানুষের ভালোবাসা নিয়ে তৈরী হয় লালনের একটি ভাস্কর্য।কিন্তু মৌলবাদী চক্রের কুৎসিত আঘাতে সেটি ভেঙ্গে পড়ে! আর গড়ে তোলা হয়নি সেটি।ক্ষমতালোভী সব শিয়ালেরই এ ব্যাপারে এক 'রা।যুগে যুগেই সুবিধাবাদী চক্র তাদের চক্ষুশূল, আঁতে ঘা দেয় এমন ব্যাপারে হটকারীতা দেখিয়েছে।ভেবেছে মিনার, ভাস্কর্য ভেঙ্গে দিলেই সব চুকেবুকে গেলো।ধারণাটা যে মস্ত ভুল ইতিহাস তার স্বাক্ষী! তাই লালনের ভাস্কর্য ভাঙ্গবার বেদনা আমাদের পীড়িত করলেও বুকের আগল খুলে দেই তাঁকে সেখানে রাখবো বলে।নিজ দেশে লালনের ভাস্কর্য ভাঙ্গবার দুঃখ মুছিয়ে দিতেই যেন ফ্রান্স হাত বাড়ায়।আমরা ভাঙ্গলেও, অন্যদেশ লালনকে ভালোবেসে গড়ছে, এই আশাবাদ আনন্দ দিলেও খুব গভীরে কোথাও কী একটা এখনো খচখচ করে লালনভক্তদের! মেরুদণ্ডহীনতাই বুঝি এ জ্বলনের কারণ, কী জানি!

ছেঁউরিয়ার গ্রামীণ পরিবেশে নাম-যশের তোয়াক্কা না করে লালন নামের মানুষটি মগ্নচৈতন্যে সুর তুলে গেছেন গানের-ভাবের।নিজের গানগুলো পর্যন্ত তিনি লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে তেমন মনোযোগী ছিলেন না।তাঁর শিষ্যদের হাতে লিপিবদ্ধ ভুল বানান আর বানান বিভ্রাটজনিত কারণে মূলভাব পালটে যাওয়া পাণ্ডুলিপির উপর ভরসা করেই লালনের সন্ধানে নামতে হয়।এক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেখা যায় তাঁর লিরিকের ইচ্ছাকৃত রদবদলের হরিলুট।আবার অন্য কারো গান লালনের গান বলে চালিয়ে দেবার একটা হুজুগও মাঝে মধ্যে দেখা।ফিউশনের নামে মাঝে মধ্যেই চলে লালনের উপর অত্যাচার! নতুন প্রজন্মের অনেকে ফিউশনের নামে আমাদের ঐতিহ্যময় ভাঁড়ারে তাণ্ডব চালান, অসহায়ের মতো সেসব দেখা ছাড়া আমাদের যেন কিছুই করার নেই।কেউ বলার নেই। ফিউশন হোক, কিন্তু তা অন্যের মৌলিকত্ব ধ্বংস করে নয়, নিজেদের মেধার আঙ্গিনায়

দাঁড়িয়েই চলুক সেই সৃষ্টির আয়োজন। জেনেশুনে এমন ব্যবহার লালনের প্রতি ভালোবাসার নির্দশন হতে পারে না।বরং তা সত্য সুন্দরের পথে থাকা মানুষটির সাথে জুয়াচুরিরই নামান্তর।যা লালনের সত্যিকার অনুরাগীদের মর্মবেদনার কারণ।

রেশ থেকে যায় যে গানের

কত-শত গানই তো শুনি, কিন্তু খুব কম গানেরই থেকে যায় দীর্ঘমেয়াদী রেশ।খুব কম গানেরই আছে যেতে যেতে অস্তিত্বের কাছে ফেরার কথা বলবার ক্ষমতা।স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছি, আমি এতদিন কেন সেভাবে লালন নামের এই ভাবসাগর পাড়ে আসিনি! যদিও তাঁকে ধারণ করবার মত মরমী শিক্ষা আমার একদমই নেই।কিন্তু তারপরও খুব চেষ্টায় যে ক'টি গানের (নিজের মতো করে) মর্মোদঘাটনের চেষ্টা করেছি, অবাক হয়ে ভেবেছি, এমনটা কিভাবে সম্ভব! একজন অজ পাড়াগাঁয়ের ক্ষ্যাপা বাউলের পক্ষে! কত আধুনিক, আর উদার তাঁর প্রতিটা গানের বাণী-ভাব-সুর! লালন বাংলার মাটির গন্ধমাখা একজন সাধারণ মানুষ, যাঁকে খুঁজতে ছেঁউড়িয়াতে যাবার দরকার নেই। তিনি তাঁর গানের প্রত্যেকটা শব্দের ভাঁজে মিশে আছেন।আছেন বাংলার প্রকৃতিতে, সবুজ ঘাসের ডগায়।চাতকের কাঙ্খিত অমৃত বারিধারায়; যুথবদ্ধ অন্ধকারে মায়াবী জোনাকীদের আলোতে।প্রকৃতির সন্তান লালন।একজন সহজ মানুষ।যিনি 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ বিশ্বাসে ছিলেন বিশ্বাসী।একজন খুব সাধারণ মানুষ হয়েও যিনি অনন্য সাধারণ হয়েছেন তাঁর কাজে-চিন্তায় এবং মননে।তাই খুব অনায়াসেই তিনি আমাদের ভেতর বাড়িতে জায়গা করে নেন।আমরা বড় ভালোবাসায় তাঁকে হৃদয়ে লালন করি।তাঁকে ডাকি আমাদের দ্রোহকালের সঙ্গী হবার অপার আকুলতায়।কারণ লালনের স্বপ্নের জাতপাতহীন মানব সমাজ সৃজন এখনো সম্ভব হয়নি পৃথিবীর কোথাও।সেই সমাজ গঠনের স্বপ্নযাত্রায় লালন আজও একতারা হাতে আমাদের পথ দেখান!

তথ্যসূত্র

১. লালন সমগ্র, আবুল আহসান চৌধুরী(সম্পাদিত)
২. লালন ফকির ও তাঁর গান', অন্নদাশঙ্কর রায়
৩. বাঙলা ছন্দের প্রকৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪. The Complete Works of Rabindranath Tagore
৫. বেশ কিছু সংখ্যক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ।

এডওয়ার্ড্স্, ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র

নিরুপমা রহমান

আমার নজরুল, আমার গানের বুলবুলি

জগৎ জোড়া লোকের কাছে 'ঝাঁকড়া চুলের বাবড়ি দোলানো' বিদ্রোহী কবি তিনি, আবার সেই প্রবল দ্রোহের কবিই বাঙালির 'দুখু মিয়া'। 'চির-বিদ্রোহী বীর' এই কবি নিজেই বলেছেন 'চির-উন্নত শির' তাঁর। এমন প্রবলতর জানান যখন দিয়ে যাচ্ছেন কবিতার ছত্রে ছত্রে, সেই কবিই আবার সেই একই কবিতায় বলছেন 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য'। আর এই নিরন্তর গভীর বৈপরীত্যময়তাই নজরুলকে বাঙালির প্রাণের কবি করে তুলেছে। যুগ থেকে যুগান্তরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাই আপামর জনসাধারণ থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ জ্ঞানী গবেষক পর্যন্ত সকলের কাছে নজরুল তাই একই সঙ্গে দ্রোহের কবি, প্রেমের কবি। আমার কাছে নজরুল বড্ড বিশেষ, অতি আপনার। 'সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে' যিনি আমার সমগ্র সত্তা ছুঁয়ে আছেন, জুড়ে আছেন; যাঁর গানে গানে আমি নিরন্তর খুঁজে বেড়াই 'আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন' কে। সেই কোন সে শৈশবে গানকে নিয়ে আমার যে পথচলার শুরু কিংবা গান কে ঘিরে আমার যে একান্ত আপনার জগতের পত্তন, অবচেতনেই সেখানে নজরুল চির মূর্তমান।

আশৈশব গান – গানের সুর – সুরের বোধ আমার অন্তঃপুরে এক সুবিশাল জায়গা জুড়ে আছে। পরিণত বয়সে এসে আজ আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করি কীভাবে এই অনুষঙ্গ আমার মনোজাগতিক ভুবনকেই শুধু সংগঠিত করে নাই, সংগঠন করেছে আমার সমগ্র আত্মপরিচয়, আমার বাঙালিয়ানার বোধ। আর অবচেতনেই নজরুলের গান আমার জীবন পথের বাঁকে বাঁকে, এর প্রতিটি সন্ধিক্ষণে আমায় সঙ্গ দিয়েছে, দিয়েছে বৌদ্ধিক ভাবনার জন্ম, দিয়েছে সৃজনশীলতার প্রেরণা। যে কোন কঠিন মুহূর্তে আমি নিরন্তর অনুপ্রেরণা পাই 'যদি আর বাঁশি না বাজে' শীর্ষক অভিভাষণে গানকে নিয়ে নজরুলের নিজের বলা কথাতেই 'জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান-বেদনার গান গেয়ে যাব আমি। দিয়ে যাব নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে। সকলের বাঁচার মাঝে থাকবো আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা'।

জীবন এক চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিটি মানুষের জাগতিক বোধ-অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে তার জীবনাচরণের মনস্তাত্ত্বিক দর্শন থেকে তার সৃষ্টিশীলতা কিংবা সৃজনশীলতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে এই চলমান প্রক্রিয়া ভিন্ন থেকে ভিন্নতর স্বতন্ত্র মাত্রা পায়। তাই আজ অবচেতনে নয়, বরং সচেতনেই জানি আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের পথ পরিক্রমায় আমার চিরসখা গান আর গানের বোধকে যদি 'পার্থ' হিসেবে ভাবি, তবে নজরুলের গান 'পার্থসারথী' হয়ে আমাকে নিরন্তর চিনিয়ে যাচ্ছে চিরসখা 'পার্থ'কে, আর 'পার্থ'র চোখ দিয়ে জগত সংসারকে। সুতরাং জীবনের কঠিনতম সময়ে বারম্বার আমার 'পার্থসারথী'সম নজরুলের কাছেই ফিরে যাই, তাঁর গানের কথাতেই পরম পুরুষের কাছে সানুনয় নিবেদন করি 'পাঞ্চজন্য শঙ্খ' বাজিয়ে 'চিত্তের অবসাদ দূর কর কর দূর, / ভয়-ভীতজনে কর হে নিঃশঙ্ক'।

গবেষক নারায়ণ চৌধুরী যথার্থ লিখেছেন 'নজরুল সত্তায় যেন এক অফুরন্ত সৃষ্টির সঞ্চয় লুকানো ছিল, রূপকথার কল্পবৃক্ষে নাড়া দিলেই যেমন তার থেকে সোনা রূপা ঝরে পড়ত, তেমনি তাঁর গানের গাছে নাড়া দিলেই চাইতে না চাইতে রকমারী গানের ফল টুপ করে খসে পড়ত। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুল এক অতি অদ্ভুত সৃষ্টিশীল প্রতিভা। নব-নবন্মেষশালিনী সুর সৃজনের প্রতিভায় তিনিই তাঁর তুলনা, তাঁর আর কোন দোসর নেই।' আমার নজরুল সত্যিকার অর্থেই সেই রূপকথার কল্পবৃক্ষ। অথবা আমার নিজের মতো করে বললে নজরুলের গানের মাঝে আমি অনিঃশেষ এক গুপ্তধন ভাণ্ডারে মণি-মাণিক্য সন্ধান করে বেড়াবার আনন্দ খুঁজে পাই। যত পাই তত আরও খুঁজি, আরও কিছু পাবার আশে। সেই খোঁজবার আনন্দে নেই ক্লান্তি, নেই নিরাশা, নেই হারাবার ভয়। এ এক পরম আনন্দ। আর সেই খোঁজে নতুন কিছু পাবার আনন্দ যেমন আছে, তেমনি অবাক বিস্ময়ে দেখি আগে পাওয়া মণি-মাণিক্যও জীবনের এক এক বয়সে, এক এক স্তরে ভিন্ন ভিন্ন আলো ছড়ায় - বোধের ভিন্নতায়, ভাবনার পার্থক্যে নজরুলকে নতুন করে চেনায়। তাই বয়সে, বোধে, মননে, সৃজনে আমার বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আমার নজরুলও আমার কাছে প্রকাশমান হন, বিকশিত হন, উন্মীলিত হন।

খুব ছোটবেলাতে স্কুলে যাবারও আগে গান শেখবার শুরু আমার। আর সে একেবারে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। সে বয়সে রাগসঙ্গীতের রস, ভাব বা প্রকৃতি বোঝবার মতো বোধ বা বুদ্ধি কোনটাই ছিলনা আর তা থাকবার কথাও হয়তো নয়। অনেক পরে যখন জেনেছি চূড়ান্ত বৈপরীত্যময় প্রেম আর ক্রোধ যেই শব্দে একাকার হয়ে গেছে, হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে সেই রাগ শব্দটি এসেছে রঞ্জক থেকে; তখন বুঝেছি স্বরের বিন্যাসে গাঁথা সুরের লহরী মনকে রঞ্জিত করে বলেই না 'রঞ্জয়দি ইতি রাগ'। প্রেম আর ক্রোধ দুইই মনকে উদ্দীপিত করে, মন কে রাঙায়। ঠিক তেমনি সুরের খেলায় আর স্বরের মেলায় এই রঞ্জনা করবার যে প্রয়াস সেটাই রাগের আসল কথা। এখানে ব্যাকরণ নয়, বরং স্বরের বৌদ্ধিক আর সৃজনশীল মেলবন্ধনে সৃষ্ট সুরেলা অনুরণনের যে ভাবপূর্ণ ব্যাপ্তি সেটাই মনকে রাঙায়, চিত্তে দোলা দেয়। আর সত্যি বলতে আমার জীবনে রাগ সঙ্গীতে স্বর সঙ্গতির জ্ঞানের সঙ্গে এর রস আর ভাবের বোধের যে মিলন ঘটেছে তার উৎসমুখেও

দাঁড়িয়ে আছেন নজরুল। রসকষহীন ব্যাকরণে রাগের সত্যিকার পরিচয় মেলেনা, একে ছাপিয়ে প্রতিটি রাগের যে একটি চরিত্র আছে, রস–রূপ-ভাব আছে, নজরুলের গানই যেন তা আমাকে প্রথমে জানান দিয়েছিল। তাঁর গানে অভূতপূর্ব বাণীর সাথে সুরের যে মিশেল, আর তার যে চিত্রিত রূপকল্প আমার মনে খুব সহজেই সে বিভিন্ন রাগের রূপখানি এঁকে দিয়েছিল। সত্যিকার অর্থে তাঁর গানেই আমার বোধ জাগলো প্রথম 'রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বধৈঃ' – রাগের সরগম দিয়ে ছবি আঁকা যায়, আর তাতে চিত্ত হরণ করাও সম্ভব॥

আহির ভৈরব রাগে বাঁধা 'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারি' শুধু 'আহির' শব্দের অর্থ যে 'রাখাল' তাই মনে সারা জীবনের জন্য গেঁথে দেয়নি, চিনিয়েছিল সুরের সাথে বাণীর গভীর সম্পৃক্ততা। এঁকে দিয়েছিলো শিশুমনে ভোরবেলাকার এক অপূর্ব দৃশ্য যেখানে কোন এক সবুজ শ্যামল গ্রামে ঊষালগ্নে এক রাখাল বালক তার পোষ্যদের নিয়ে যাচ্ছে মাঠের দিকে। প্রত্যুষকালের রাগ আহির ভৈরবের প্রকৃতি শান্ত, এর সুরের আমেজে আছে ভক্তিরস। 'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারি' গানের বাণীর মাঝে প্রকাশমান রূপকল্প আর আহির ভৈরব রাগে বাঁধা এর সুর যে কারো মনেই এক শান্ত ধ্যানী যোগীর এক চিত্রকল্প এঁকে দেয় যেখানে কিনা জ্যোতির্ময় সেই যোগী নীরবে এসে দুয়ারে দাঁড়িয়েছেন – এ যেন আহির ভৈরব নিজেই 'বাঘছাল পরিহর, ধর নটবর বেশ, পর নীপমালা'য় সেজে ঋষিমূর্তি ধরে এসেছেন। এ গানের মধ্য দিয়ে রাগের যে চিত্রকল্প আমার মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল সে কোন ছোটবেলায়, তাতেই ঋষিরূপী আহির ভৈরবকে বড় আপনার লাগে। যতবার আহির ভৈরব রাগটি গাইতে বসি, ততবার এই ঋষিকে মনে মনে কল্পনা করে নিজেই এক 'আহিরিণী' হয়ে সানুনয় আকুতি জানাই 'ত্রিভুবন-পতি'কে যেন তিনি প্রিয় হয়ে দেখা দেন 'নবমেঘে চন্দনে ঢাকি অঙ্গজ্যোতি'।

অথবা সেই সে কোন ছোটবেলায় যখন বৃন্দাবনী সারং রাগে বাঁধা 'তৃষিত আকাশ কাঁপে রে' শুনেছিলাম তখন তৎক্ষণাৎ 'প্রখর রবির তাপে' তাপিত গ্রীষ্মদিনের কী দারুণ এক রূপকল্প সেই শিশুমনেই আঁকা হয়ে গেছিলো । তারপর জানলাম ফার্সি ভাষায় 'সারং' শব্দের অর্থ মেঘ হলেও সারং ঘরের রাগগুলোর ঋতু গ্রীষ্ম। কিন্তু গ্রীষ্মশেষের সেই গ্রীষ্মকালে খানিক মেঘের আভাস আছে, ধীরে ধীরে তার সঞ্চার আছে অল্পবিস্তর। ক্রমশ যখন জানা হলো বৃন্দাবনের প্রখর দাবদাহে মেঘের তৃষার মতোই বৃন্দাবন শব্দের মাঝে লুকিয়ে আছে শ্রীকৃষ্ণের অনুষঙ্গ পাবার আকাঙ্ক্ষা, তখন বৃন্দাবনী সারং রাগ হয়ে উঠলো আমার কাছে গনগনে তপ্ত দিনে মেঘের দেখা পাবার পরম আকুতি প্রকাশের সুর। আর তাতে বাঁধা গান 'তৃষিত আকাশ কাঁপেরে' তৈরি করে দিল গ্রীষ্মদিনের রূপকল্প, যা আমার একান্ত নিজস্ব।

আবার মেঘ রাগে বাঁধা 'শ্যামা তন্বী আমি মেঘ বরণা' কিংবা মিয়া মল্লার রাগে বাঁধা 'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা' সমস্ত ব্যাকরণের কাঠিন্য ছাড়িয়ে বর্ষাকে আমার কাছে এক শ্যামবর্ণা বাঙালি মেয়ের রূপে উপস্থাপন করে। আর এভাবেই হিন্দুস্তানি রাগের সুরে আর স্বরের সাথে আমার বাঙালিয়ানার সমাপতন ঘটে। পুরাণমতে পণ্ডিতেরা বলেন

গোবর্ধনলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর কনিষ্ঠাতে পুরো গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন, তখন মহাদেব ডমরু বাজিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করতে, সেই ডমরুর শব্দেই মেঘ রাগের সৃষ্টি। এর রস গম্ভীর। নজরুলের গানে আমার অন্তর্লোকে মেঘ রাগের চিত্রকল্প আঁকা হয় যেখানে 'অম্বরে জলদ মৃদঙ্গ' বাজায় আর মৃদঙ্গের গভীর গম্ভীর শব্দ আমাকে মেঘ রাগের গাম্ভীর্যের দিশা দেয়। আর রাগের স্বরবিন্যাস ছাপিয়ে মেঘ রাগ আমার কাছে বরষারূপী এক শ্যামাতন্বী জীবন্ত মানবী হয়ে ওঠে যে 'মুখে হাসি, চোখে জল' নিয়ে 'কদম কেয়ার ডালা' সাজায়। পূবালী হাওয়াতে ভেসে আসা বরষা আনে বিজলী, আনে মেঘ। চোখ বুজে যখনই মেঘ রাগের সুর ধরি, নজরুলের গানে আঁকা চিত্রকল্প আমার কণ্ঠে স্বর আর সুরের বিন্যাসে রাগের ছবি এঁকে যায় ।

সম্রাট আকবরের সভায় সঙ্গীত সম্রাট তানসেন জলদ গম্ভীর মেঘ আর ভারী উত্তাল বৃষ্টির সুরেলা ধ্বনিকে একসাথে ভেবে নিয়ে মিয়া মল্লার রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। এ রাগের রসে একই সাথে আছে গাম্ভীর্য আর স্নিগ্ধতা। কৈশোরে যখন এ রাগের চলন, ব্যাকরণ শিখছিলাম তখন এর সুরের রেশ মনে এনে দিলো নজরুলের গান 'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা'। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে এঁকে নিয়েছিলাম 'ঘন নীল বাসে অঙ্গ ঘিরে' থাকা 'ক্ষীণা তন্বী' যে কিনা 'জল ভারে নমিতা' আর 'ডাকে বিদ্যুৎ - ইঙ্গিতে' আর তার হাতে 'কুন্দ মালতী যুঁই ভরি থালিকা'। আর ঠিক এভাবেই মিলেমিশে যায় মিয়া তানসেনের রাগ ভাবনা আর নজরুলের শব্দবন্ধে আঁকা রাগের চিত্রপট। আমার এই কিশোরী বাঙালি মনে চিরকালের মত মিয়া তানসেন আর নজরুল মিয়া মল্লার রাগে একাকার হয়ে গেলেন।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে নবরসের কথা বলা আছে – শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রুদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। এই নবরস মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থা, আবেগ, অনুভূতি প্রকাশ করে। আমাদের জীবনের চড়াই-উৎরাই, উত্থান-পতন, সুখ-শোক-কান্না-হাসির গল্পগুলো এই স্বতন্ত্র অনন্যমাত্রিক নয়টি রসের দোলাচলেই গাঁথা হয়, উন্মীলিত হয় আমাদের জীবনের চিরচলমান প্রতিরূপ। আমাদের সঙ্গীতে শৃঙ্গার, শান্ত আর করুণ রসের প্রাধান্য দেখা যায়। আর কিছু কিছু সময় বীর রসের উপস্থিতিও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশমান হয়। শৃঙ্গার রসে পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, অভিমান, বিরহ, মিলন যেমন আছে, তেমনি আছে ভক্তিভাব। আর এখানেই মানবপ্রেম আর ঈশ্বর প্রেম একাকার হয়ে গেছে শৃঙ্গার রসে। নজরুলের গানে শৃঙ্গার রস এসেছে নানা ভাবে, নানা ঢঙে, নানা মাত্রায় আর নানা উপাচারে। শৃঙ্গার রসের যে গভীরতা, ভিন্নমাত্রিকতা আর অনন্যতা আছে নজরুলের গান আমায় সে বোধ দিয়েছে। আর সে কারণেই আভিধানিকভাবে শৃঙ্গার শব্দের বর্ণনা (আদিরস তথা কামনা বা সম্ভোগের বাসনা) ছাপিয়ে এর গভীর দ্যোতনা আমাকে শিখিয়েছে, জানিয়েছে বৌদ্ধিক ভাবনা আর মননের প্রয়োগে ভাষার শব্দেরা ভিন্নতর ব্যঞ্জনা খুঁজে পায়, পায় অনন্য মাত্রিকতা।

নজরুলের ঠুমরি আমাকে সেই ভিন্নতর শৃঙ্গার রস ভাবনার যোগান আর প্রমাণ দুই-ই দিয়েছে। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপাদান ঠুমরি শৃঙ্গার রসের অভিব্যক্তিতে

আর্দ্র। আপাদমস্তক প্রণয় রসে সিক্ত ঠুমরির বিষয়বস্তু মূলত প্রেম, মানব প্রেম। এর বাণীতে আছে মান-অভিমান, পূর্বরাগ-অনুরাগ, বিরহ-বিচ্ছেদযন্ত্রণা, চঞ্চলতা-প্রগলভতা, অভিসার-মিলনের পরম আকুতি। রাগের বিশুদ্ধতায় নয় বরং শৃঙ্গার রসের নানান উপাচারে বাণীর সাথে সুরের অভিব্যক্তি মিলিয়ে ঠুমরির চিত্রকল্প আঁকা হয়, এর ব্যঞ্জনা প্রকাশমান হয়। নজরুল অনায়াস দক্ষতায় হিন্দুস্থানি ঠুমরিকে একান্ত বাঙালির করে গেছেন। শৃঙ্গার রসকে ঘিরে বাঙালির ভাবনায় এনেছেন এক অভাবনীয় পরিবর্তন। তাঁর ঠুমরি যেমন বাংলা গানকে নতুন দিশা দিয়েছে, ঠিক তেমনি বাঙালির কল্পনাপ্রবণ প্রেমিক কাব্যিক সঙ্গীতভাবনায় জাগিয়েছেন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। তাঁর ঠুমরির আদলে উত্তর ভারতীয় ছাপ আছে হয়তো কিন্তু রসে, বশে সে একান্ত বাঙালির আর এখানেই, এভাবেই আমার নজরুল আমার ভাবজাগতিক অন্তর্লোকে আমার বাঙালিয়ানার সাথে আমার হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের জ্ঞান আর বোধের অনন্য সমাপতন ঘটিয়েছেন।

'পরাণপ্রিয় কেন এলে অবেলায়' কিংবা 'কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী' যখন গাই তখন এ গানগুলির বাণীর গভীর অভিব্যক্তি যেমন আমার মন কে স্পর্শ করে যায়, এদের মাঝে লুকিয়ে থাকা অভিমান আর আকুতি পূর্ণতা পায় পিলু রাগের সুরে। কাফি ঠাটে বাঁধা মিষ্টি রাগ পিলু প্রেমের রাগ, বিরহের রাগ - এই রাগের শৃঙ্গাররসে একদিকে আছে গভীর বিষণ্ণতা-অভিমান-বিরহ-মিলনের সানুনয় আকুতি আবার আছে ভক্তিরসও। তাই পিলু রাগের সুর যেমন আমায় একদিকে গানের বাণীর চিত্রকল্প আঁকতে সহায়তা করে, ঠিক তেমনি নজরুলের শব্দবন্ধ বারম্বার চিনিয়ে দেয় পিলু রাগের পথ পরিক্রমা, আমায় ভাসিয়ে নেয় তার সুরের ভেলায়।

আবার নাতিচঞ্চল শান্ত প্রকৃতির রাগ ভৈরবীতে ভক্তি ও শৃঙ্গার রসের ভিন্নতর প্রকাশ ঘটে। এ রাগে বাঁধা ঠুমরি 'না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়' তাই শুধু আমার কাছে প্রিয়সঙ্গ যাপনের পর ভোরবেলাকার বিচ্ছেদের কষ্ট মনে করায় না, ভাবায় জীবনের সব প্রিয় মুহূর্তগুলো বড্ড ক্ষণস্থায়ী অথবা প্রিয়সঙ্গ লাভে মনের যে গভীর অনন্ত অভিলাষ তা কখনোই হয়তো পূর্ণতা পায়না। কিংবা যখন গাই 'ফুল ফাগুনের এল মরশুম' তখন ভৈরবীর বারোটি স্বরের অনন্য ব্যবহারে শৃঙ্গার রস আমার কাছে ঠিক যেন জীবনের সব রঙ, সকল উপাচার ছুঁয়ে যাবার প্রয়াস মনে হয়। এ রাগে বাঁধা নজরুলের ঠুমরি তথা অন্যান্য গানে বিচ্ছেদ-বিরহ-অভিমান মিলেমিশে একাকার, সাথে আছে শাশ্বত প্রেমের সানুনয় আকুতি - সে প্রেম কখনো নশ্বর, কখনোবা অবিনশ্বর। তাই এ রাগ আমাকে চেনায় এক অনন্য নজরুলকে যাঁর জীবনটা ঠিক ভৈরবী রাগের শুদ্ধ-কোমল-কড়ি বারোটি স্বরের সমন্বয়ে আঁকা অনিঃশেষ দুর্দান্ত সৃষ্টিশীল এক মানুষের অভিযাত্রার এক প্রতিরূপ।

এই যে এতো নানান অনুভূতি, ভাব বা রসের কথা এলো, এ প্রসঙ্গে আমার একান্ত নিজের একটি ভাবনাও ভাগ করে নেয়া খুব প্রাসঙ্গিক হবে হয়তো। আমাদের মনোজগতে এই সমস্ত নানান অনুভব বা অনুভূতির উপলব্ধির ব্যাপারটা নানান স্তরে সাজানো। ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, ভিন্নতর অভিজ্ঞতায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই অনুভব আর অনুভূতিগুলো

ভিন্ন মাত্রা পায়, অনন্যতা পায়, স্বতন্ত্রতা পায়। আবার জীবনের পথ পরিক্রমার অভিজ্ঞতাকে আমি দেখি অনেকটা পেঁয়াজের মতো। এর খোলস ছাড়িয়ে যত গভীরে ঢুকি, এর উপলব্ধি তত তীব্রতা পায়। এর রঙ বদলায়, সাথে এর উগ্রতা, উচ্ছলতা কমে কিন্তু বাড়ে এর গভীরতা। নজরুল নিজেই বলেছেন '...আমার বেশ মনে পড়ছে। একদিন আমার জীবনের মহা অনুভূতির কথা। আমার ছেলে মারা গেছে। আমার মন তীব্র পুত্র শোকে যখন ভেঙে পড়ছে ঠিক সেই দিনই সেই সময় আমার বাড়িতে হাস্নাহেনা ফুটেছে। আমি প্রাণভরে সেই হাস্নাহেনার গন্ধ উপভোগ করেছিলাম। আমার কাব্য, আমার গান আমার জীবনের সেই অভিজ্ঞতার মধ্য হতে জন্ম নিয়েছে।' নজরুলের গানের বাণীতে, এর সুরের বৈচিত্রে আমি যেমন তাঁর জীবনের বাঁকে বাঁকে তাঁর অনুভব, অনুভুতি, উপলব্ধির পরিবর্তন দেখি; ঠিক তেমনি আমার জীবনেও বয়স, অভিজ্ঞতার পরিণতিপ্রাপ্তি আমার নজরুলকে আমার মতো করে বোঝাতে, জানাতে, চেনাতে আমার অনুভবে, বোধে, মননে ভিন্নতর মাত্রা উপলব্ধি করি।

আমি ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রী ছিলাম, সাথে তুলনামূলক সাহিত্য পড়েছি। এই পরিণত বয়সে এসে বুঝি জীবনের পথ পরিক্রমায় ভিন্ন ভিন্ন বয়সে, ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে যেমন একই কবিতা, গল্প, উপন্যাস কিংবা নিবন্ধ ভিন্নতর ভাবজাগতিক বোধ আর বৌদ্ধিক উপলব্ধির জন্ম দেয়, ঠিক তেমনি গানের বাণী, সাঙ্গীতিক মনন-চিন্তাও সময়ের সাথে, অভিজ্ঞতার সাথে, অন্তর্লোকে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা তৈরি করে, সৃষ্টি করে অভূতপূর্ব নিত্য নতুন দ্যোতনার। মানসচক্ষে এর রূপ-রস-ভাব যায় বদলে। আর এই বদলের বোধের মাঝে লুকিয়ে আছে অন্যরকম আবিষ্কারের এক আনন্দ।

বড়জোর বছর ছয়েক বয়স হবে বোধকরি তখন, যখন জৌনপুরী রাগে বাঁধা 'মম মধুর মিনতি শোন ঘনশ্যাম' গানটি শিখেছিলাম। তখন 'মধুর মিনতি' শব্দগুচ্ছের মানেই বা কী আর ঘনশ্যামের 'চরণ জড়ায়ে ধরে কাঁদিতে' পারার জন্য অতো সানুনয় আকুতিই বা কেন সে বোঝবার আমার বয়স বা মন কোনটাই কী আর ছিলো তখন! আর সেই গান বেছে বেছে কবি জৌনপুরী রাগেই বাঁধলেন কেন - সে ভাবনাতে লাগবার মতো মন আর মনন কোনটাই ছিলো না আমার তখন, থাকবার কথাও নয়। সে বয়সে গুরুর কাছ থেকে কণ্ঠে তুলে নেয়া আলাপ, খান দুয়েক বিস্তার সহযোগে তাল, লয়, সুর ঠিক রেখে গানটা গাইবার প্রয়াসটাই মুখ্য ছিলো। সকলের বাহবাটুকু মনে বেশ তৃপ্তিই হয়তো দিত। কিন্তু কৈশোরে যখন নতুন করে জানলাম জৌনপুরী রাগে নিবেদনের, আত্মসমর্পণের আকুতি আছে, আছে সনির্বন্ধ মিনতি তখন ছোটবেলাতে শেখা 'মম মধুর মিনতি শোন ঘনশ্যাম' গানটি অন্য মাত্রা নিয়ে এলো আমার সামনে! আরও পরে যখন শৃঙ্গাররসের ভিন্নমাত্রিকতার উন্মেষ হতে থাকলো ধীরে ধীরে আমার মনে, মননে আর বোধে, তখন জানলাম শৃঙ্গাররসের গভীরে থাকা বিরহের এক দুর্মর বিষন্নতা আছে। জৌনপুরীর কোমল গান্ধার সেই বিষণ্ণতাকেই ধারণ করে। শৃঙ্গাররসের সেই গভীর বিষণ্ণতা কোথাও গিয়ে ভক্তিরসে মেশে। যত এ রাগের রূপ-রস আমার মনে ধরা দিতে থাকল, তত বুঝলাম কেন নজরুল এই গান জৌনপুরী রাগে বেঁধেছেন, কেন বারবার

‘ঘনশ্যাম’ শব্দটি কোমল গান্ধার ছুঁয়ে যায়, কেনই বা ‘চরণ জড়ায়ে ধরে’ শব্দবন্ধ কোমল গান্ধারকেই স্পর্শ করে আসে। বয়স আর বোধ যত পরিণত হয়েছে, তত বুঝেছি ‘মধুর মিনতি’ শব্দযুগলে ভাব আর ভক্তির কী মধুর মিশেলই না হয়েছে অথবা ‘চরণ জড়ায়ে ধরে কাঁদিতে পারি’ শব্দবন্ধে কত গভীর আকুতি, সানুনয় নিবেদন আছে আর এর সুরেলা সাঙ্গীতিক প্রকাশের জন্য জৌনপুরীর চেয়ে আর উত্তম কীই বা হতে পারে! এমনিভাবে আমার জীবনভর নজরুলের চেনা গান, চেনা সুর নিরন্তর নতুন নতুন অর্থ, অনন্য সব বোধের জন্ম দিয়েছে। জীবন তাই সদাই নতুন কিছু খুঁজে বেড়াবার আনন্দে মশগুল থাকতে পারে। আমার অন্তরের সুরলোকে নজরুলের গান আমার তেমন বন্ধু যে শতরূপে শতবার ধরা দিয়েও কখনও পুরনো আটপৌরে হয়না – ‘তোমারেই আমি চাহিয়াছি প্রিয় শতরূপে শতবার / জনমে জনমে চলে তাই মোর অনন্ত অভিসার’।

আমার কাছে নজরুল এক চিরমুখর গানের বুলবুলি যাঁকে আমি চিনেছি তাঁর গান দিয়ে আবার আমার গানের বোধ বা মননের উন্মেষেও তাঁর গানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর গানের প্রতি তাঁর নিজেরও বড় পক্ষপাত ছিলো। তিনি নিজেই তো বলেছেন ‘আপনারা আমার কবিতা সম্পর্কে যা ইচ্ছা হয় বলুন কিন্তু গান সম্পর্কে নয়। গান আমার আত্মার উপলব্ধি।’ তাঁর গান যেমন তাঁর ‘আত্মার উপলব্ধি’ ছিলো, তেমনি তাঁর গান আমাকে আমার আত্মানুসন্ধানের নিরন্তর খোরাক যোগায়। গান ভালবাসতেন বিধায় বোধকরি নজরুল নিজেকে বসন্তের বার্তাবাহক গানের পাখিদের সহযাত্রী মনে করতেন। কাজী মোতাহার হোসেনকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন ‘কোকিল, পাপিয়া, বৌ কথা কও …… এরা ছন্নছাড়া, কেবলই ঘুরে বেড়ায়, শ্রী নাই, সামঞ্জস্য নাই, কোথায় যায়, কোথায় থাকে – ভ্যাগাবন্ড এক নম্বর। তবু আনন্দগান গেয়ে গেল এরাই। এরাই স্বর্গের ইঙ্গিত এনে দিল।’ নজরুলও আমার কাছে ঠিক এই বসন্তের পাখিদের মতোই, আশৈশব জীবনভর প্রতিনিয়ত যিনি আনন্দগান গেয়ে স্বর্গের ইঙ্গিত এনে দেন। আমার নজরুল খ্যাপাটে কিন্তু দীপ্তিময়; ছন্নছাড়া কিন্তু প্রজ্ঞাবান; অগোছালো কিন্তু ‘সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা’, যিনি কিনা নিজেই লিখেছেন ‘তোমার অনুরাগে, ওগো বুলবুল / মোর গানের লতায় ফোটে কথার ফুল’। তাই আমার মানসপটে যে নজরুলের নিত্য আনাগোনা তাঁকে নিয়ত বলি ‘তোমার বিনা তারের গীতি বাজে আমার বীণার তারে / রইল তোমার ছন্দ গাঁথা আমার কণ্ঠ হারে।’

মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালি ইমিগ্রেন্ট-কথা অমৃতসমান

দু'ভাবে বলা যায় এই গল্পটা।

প্রথমটা হলো, দেশী ইমিগ্রেন্টদের কথা অমৃতসমান। পার্থ ব্যানার্জী ভনে, শোনে পুণ্যবান।

আর দ্বিতীয়টা হলো, আমরা আজকে আমেরিকায় কোথায় থাকতাম, যদি এই 'কাল্লু,' 'কালুয়া' আর 'ইলিগাল ইমিগ্রেন্টরা' এদেশে না থাকত?

দ্বিতীয়টা দিয়ে শুরু করা যাক।

মার্কিন মুলুকের শ্বেতাঙ্গ চরমপন্থী মালিকদের দুশো বছর চাবুক, মব লিঞ্চ, রেপ আর এমেট টিল নামক কিশোর ছেলের চোখ উপড়ে নেওয়ার কু ক্লাক্স ক্ল্যান ইতিহাস চালানোর পরে উনিশশো চৌষট্টি সালের জুলাই মাসে সিভিল রাইটস এ্যাক্ট পাশ হয়েছিল।

এমনি এমনি পাশ হয়নি। প্রথমে কেনেডি এবং তাঁর হত্যার পরে ভিয়েতনাম-কুখ্যাত লিণ্ডন জনসন এই ঐতিহাসিক সমানাধিকার এদেশের দলিত আর 'নিচু জাতের' লোকেদের দিতে বাধ্য হন। রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিং, ম্যালকম এক্স, রোজা পার্কস আরো হাজার মানুষের দশকের পর দশক – বা বলা যায়, শতকব্যাপী আন্দোলনের ফলে, আত্মত্যাগের ফলে এই আইন পাশ করতে মার্কিন সরকার ও শাসকশ্রেণী বাধ্য হয়। এই আন্দোলনে কৃষ্ণাঙ্গদের পাশে ছিল হাজার হাজার শ্বেতাঙ্গ প্রগতিশীল আমেরিকান।

এই ইতিহাস আমরা পড়িনা আর। সবচেয়ে বড় কথা, আমেরিকার ভারতীয় অথবা বাঙালি ইমিগ্রেন্টদের কোনো ধারণাই নেই, এই আইন পাশ না হলে কিন্তু ঊনিশশো পঁয়ষট্টি সালে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি আইন পাশই হত না। এই আইনে প্রথম জাতীয়তা-ভিত্তিক জাতিবিদ্বেষী ইমিগ্রেশন আমেরিকায় বন্ধ হয়, এবং আমাদের সকলের জন্যে রাস্তা খুলে যায়। তার আগে পর্যন্ত আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ, খ্রীষ্টান, ইহুদি এবং ইউরোপিয়ান ছাড়া আর কারো বৈধ ইমিগ্রেশন হতো না। গ্রীন কার্ড আর নাগরিকত্ব তো দূরের কথা। সে আইনও সম্ভব হয়েছিল ওই মেক্সিকো আর ল্যাটিন আমেরিকার দেশ

থেকে আসা গরিবের গরিব শ্রমিকদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে। তার সঙ্গেও ছিল প্রগতিশীল আমেরিকানরা।

জনসন ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্যে কুখ্যাত হয়ে থাকবেন। কিন্তু দেশের মধ্যে তিনি দুটো ঐতিহাসিক আইন পাশ করেন যার ফলে দাসপ্রথা রদের রূপকার আব্রাহাম লিঙ্কনের মতই তিনি ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। যদিও লিঙ্কনের মহত্বের সঙ্গে জনসনের কোনো তুলনাই চলেনা।

মুশকিল হলো, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি ও ভারতীয় ইমিগ্রেন্ট এসব ইতিহাস জানে না, জানতে চায়ও না। ভাস্ট মেজরিটি, অর্থাৎ বলতে গেলে হয়তো আশি কিংবা নব্বই শতাংশ, এখনকার আই টি জেনারেশন আরো বেশি, তারা একদিকে নিজেদের উচ্চবর্ণের শ্বেতাঙ্গ বলেই মনে করে, এবং মিলিয়নেয়ার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে দিন কাটায়। আমেরিকার ব্ল্যাকদের তারা আগে নিগ্রো, নিগার জাতীয় সম্ভাষণে আপ্যায়িত করতো, এখন আফ্রিকান-আমেরিকান অথবা নিদেনপক্ষে ব্ল্যাক না বলে তাদের কাল্লু বা কালুয়া বলেই মোটামুটি ডেকে থাকে নিজেদের বৃত্তে। অন্য জাতির ইমিগ্রেন্টদের সম্পর্কেও বেশির ভাগ বাঙালি ও ভারতীয় ইমিগ্রেন্টদের কোনো শ্রদ্ধা নেই, অন্যদেরকে তাদের জানার কোনো চেষ্টাই নেই। চীনাদের আমরা ডাকি চিঙ্কু। আরও নানা জাতির মানুষ সম্পর্কে আমাদের নানা অশ্লীল ডাক নাম আছে।

রক্ষণশীল প্রজাতির মার্কিনিরা এদেশের সব সমস্যার জন্যেই কালোদের এবং গরিব ইমিগ্রেন্টদের যেমন দায়ী করে থাকে, ঠিক তেমনি এরাও, মোটামুটিভাবে সবাই মনে করে তারা নিজেরা ব্যতিক্রমী, শিক্ষিত, এবং সুযোগ্য ইমিগ্রেন্ট, যাদের এদেশের নাগরিকত্ব পাওয়া এবং তথাকথিত আমেরিকান ড্রীমের অংশীদারিত্ব পাওয়া এক প্রশ্নাতীত ঈশ্বরদত্ত অধিকার। ঠিক যেমন রক্ষণশীল হিন্দু ও বাঙালিরা এখন ভারতে মুসলমানদের এবং দলিত বা এসসি এসটি জাতীয় মানুষদের দায়ী করে থাকে দেশের সবরকম সমস্যার জন্যে। আজকের করোনা বিস্ফোরণ ও গণমৃত্যুর দায় কোনো একটা 'বহিরাগত শত্রু'র ওপরে চাপিয়ে দিতে পারলেই তারা খুশি। আর কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই।

সুতরাং, প্রায় সব শিক্ষিত ও পেশাদার শ্রেণীর বাঙালি ও ভারতীয় অভিবাসীই শ্বেতাঙ্গ ও উচ্চবিত্ত শহুরে পাড়ায় বা নির্জন শহরতলীতে থাকতে ভালোবাসে। আমরা যে ব্রুকলিন এলাকায় ব্ল্যাক প্রতিবেশী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকি, সেটা বোধহয় নব্বই শতাংশ মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত বাঙালি ও ভারতীয় কল্পনাই করতে পারেনা। আমাদের বাড়িতে অনেকেই বেড়াতে আসার আগে দুবার ভাবে 'কালুয়াদের' হাতে ছিনতাই বা খুন হয়ে যাবে না তো? একবার আমাদের পাশের বাড়ির কৃষ্ণাঙ্গ ব্রাদার ফিলিপ, যাঁর হাতে আমরা দেশে যাওয়ার সময় বাড়ির চাবি দিয়ে যাই, এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সেই সময়ে আমার এক বহুকালের বাঙালি বন্ধু বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি দরজা খুলে ব্রাদার কী'কে দেখে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠেছিলেন। এখনো মনে আছে। কিছু কিছু ঘটনা মন থেকে চেষ্টা করলেও মুছে ফেলা যায়না।অথচ আমাদের

তিন দশকের আমেরিকার প্রবাস জীবনে সবচেয়ে বেশি উপকার পেয়েছি এই গরিব নিম্নবিত্ত কালো মানুষগুলোর কাছেই। প্রথম গাড়ি চালানো শিখেছিলাম ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ে আমার কৃষ্ণাঙ্গিনী বান্ধবী লিসা হ্যারিসের কাছে। তার গাড়িতেই সে আমাকে শিখিয়েছিল বিনা দ্বিধায়। আমার স্ত্রী যখন আমাদের সন্তানকে নিয়ে গর্ভবতী। তখন আমাদের স্টুডেন্ট হাউসিংয়ের এক কৃষ্ণাঙ্গিনী মহিলা সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতেন আমাদের বাড়ি এসে। আমরা তখন কপর্দকশূণ্য। তাঁর মেয়ের ছোটবেলার জামাকাপড়, এমনকি বাচ্চার দোলনা, শোয়ানোর ক্রিব সবকিছু আমাদের দিয়ে দিয়েছিলেন। সেসব কথাও কখনো ভুলতে পারবো না।

কতবার আমার পুরোনো গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে ভয়ঙ্কর শীতে বরফের মধ্যে, অপরিচিত কৃষ্ণাঙ্গ কোনো মানুষ আমার গাড়ি নিজের গাড়ির সঙ্গে বেঁধে নিয়ে গেছে গ্যারাজে, আবার আমার বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে বিনা পারিশ্রমিকে। আর ওই যে বললাম, আমাদের পাশের বাড়ির ব্রাদার ফিলিপ কী, যে অনেকটা সেই আঙ্কল টমস কেবিনের বৃদ্ধ টমের মতো দেখতে, সে যে কত উপকার যে আমাদের করে গেছে সারাজীবন, তা বলে শেষ করা যায়না। কিন্তু উচ্চবিত্ত বাঙালিরা তাদের চেনেনা, চিনতে চায়না। আর নিম্নবিত্ত বাংলাদেশি ওয়ার্কিং ক্লাসের লোকজন ও তাদের পরিবার, যারা এই ব্রুকলিন বা কুইন্স, ব্রঙ্কস-এর মতো শহরের মাঝখানেই থাকে, তারাও প্রায় সবাই ব্ল্যাকদের অশ্রদ্ধা করে এবং আড়ালে গালাগালি করে। আমরা দেবতার অংশ, আর ওরা সব খুনি!

ঠিক আমাদের দেশে অর্থাৎ আমার দেশ ভারতে যেমন একজন মুসলমান বা দলিতকে কাছ থেকে না দেখেও তাদের সম্পর্কে কুৎসিত কথা বলা বা উপহাস করা একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে, সেরকম এদেশে একজন ব্ল্যাককে কাছ থেকে না দেখে, না চিনে তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলা প্রায় সব দেশী ইমিগ্রেন্টদের জীবনদর্শন। আমি নিজের চোখে দেখেছি, কোনো ব্ল্যাক বন্ধুকে দুর্গাপুজোতে নিয়ে এলে, বা ঈদের অনুষ্ঠানে, বাঙালি বা ভারতীয় তা পছন্দ করেনা। অথচ, আজকে তারা রক্ত না দিলে, প্রাণ দিয়ে তাদের স্বাধীনতার আন্দোলন, গণ অধিকার রক্ষার আন্দোলন না করলে আমরা কিন্তু একজনও এদেশে আসতেই পারতাম না। এলেও থাকতে পারতাম না। ওদের লড়াইয়ের ফসল সিভিল রাইটস এ্যাক্ট, এবং সিভিল রাইটস আইনের একটি অধ্যায় হলো ইমিগ্রেন্ট রাইটস। যে আইন আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ বহিরাগতদের আমেরিকায় আসা, থাকা এবং অর্থ রোজগারের পথ নিশ্চিত করেছে।

আমার লেখাগুলোতে গরিব আমেরিকানদের দুর্দশা, হতাশা, অসহায়ত্ব, দারিদ্র্য, ভগ্নস্বাস্থ্য ও এই করোনাভাইরাস মহামারীতে হাজারে হাজারে মৃত্যুর কথা পড়ে তারা যে নাক সিঁটকোবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে? একশ্রেণীর এরা আমার লেখাকে কষ্টকল্পনা বলে রিজেক্ট করে দেবে। কিংবা বলবে, আমি কমিউনিস্ট। পড়ে দেখবেও না ভালো করে। কিন্তু সবজান্তা ওপিনিয়ন দিয়ে দেবে চমৎকার। এই অভিজ্ঞতা আমার গত কয়েক বছরে বারবার হয়েছে। বাস্তব জগতে, এবং ভার্চুয়াল জগতে।

অন্য আর একদল আরো এককাঠি সরেস। তারা বলবে, এই গরিবের গরিবরা মরলে সমাজের কল্যাণ, কারণ এরা নাকি আমেরিকার সমাজ ও অর্থনীতির ওপর একটা বিরাট বোঝা। নিষ্ঠুরতা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছতে পারে, এদের সঙ্গে কথা বললে তা বোঝা যায়। এরাই এখন ট্রাম্প, কিন্তু ট্রাম্পের সাময়িক বিদায়ের পর মোদী-জাতীয় ফ্যাসিস্ট, আধা-ফ্যাসিস্ট এবং প্রায়-ফ্যাসিস্টদের গুণকীর্তন করে। ঠিক যেমন জার্মানিতে তিরিশের দশকে শিক্ষিত তথাকথিত লিবারালরা হিটলারকে প্রশংসায় তুষ্ট করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। ইতিহাসের চাকা ঠিক একশো বছর পরে ঘুরে গিয়ে আবার সেখানেই পৌঁছেছে। অনেকটা যেন একশো বছর আগেকার স্প্যানিশ ফ্লুতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, তার দ্বিতীয় ঢেউ, আর আজকের করোনাভাইরাস মহামারী এবং তার দ্বিতীয় ঢেউ আমেরিকায়, ভারতীয় উপমহাদেশে। এই লেখা যখন লিখছি, তখন করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ভারতের কোণে কোণে, গ্রামে শহরে উপশহরে হাজারে হাজারে নিরীহ নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে শেষ করে দিচ্ছে। দিল্লি, মুম্বাই, এলাহাবাদ, বেনারস, কলকাতা, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু ... চিতা জ্বলছে দিবারাত্র।

করোনার শিকার হয়েছেন আমাদের জীবনের দুই বাঙালি আলোকবর্তিকা – সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সস্ত্রীক, এবং শঙ্খ ঘোষ সস্ত্রীক। মিতা হক, সারা বেগম কবরী। এছাড়া আমাদের পরিচিত, পরিবার, পরিজন, বন্ধু, বান্ধবী দ্রুত চলে যাচ্ছেন একের পর এক। মৃত্যুর মিছিল চলেছে ভারতে, বাংলাদেশে। আমেরিকায় প্রায় ছ লক্ষ মানুষের মৃত্যু মাত্র এক বছরে। ভারতে আজ পর্যন্ত অন্তত দু লক্ষ। যা লুকিয়ে রাখা আসল সংখ্যার তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

এদেশে হাজার বঙ্গ সম্মেলন (যার নাম আমি দিয়েছি টাকা ওড়ানোর, টাকা পোড়ানোর হট্টমেলা), হাজার বাংলাদেশ সম্মেলন, গুজরাটি সম্মেলন, মারাঠি বা তামিল, তেলুগু কনফারেন্স এসব বিলাসবহুল জমায়েতে নাচাগানা, খানাপিনা এসব অনেক হয়। টাকা ওড়ে, টাকা পোড়ে। সোনার গয়না বিক্রি হয়। বিক্রি হয় জামদানি শাড়ি। কিন্তু আমেরিকার বাস্তব জীবন নিয়ে, বর্ণ, ধর্ম ও জাতিবৈষম্য নিয়ে, অর্থনৈতিক সঙ্কট নিয়ে, স্বাস্থ্যসঙ্কট নিয়ে, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস নিয়ে তেমন কোন আলোচনা হয় না। হলেও তা ওই দেশ থেকে নিয়ে আসা শ্রেয়া, যীশু, ইন্দ্রাণী, মুনমুন, রাইমা, সুস্মিতা, রানি, যুবরাজ, কোয়েল দোয়েল টিয়া রিয়া পাপিয়াদের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

কেন আজ একটা অল্পবয়েসী বাঙালি ছেলে বা মেয়ে ড্রাগ অ্যাডিক্ট বা কেন গরিব ইমিগ্রেন্ট বাঙালি ও ভারতীয়ের বাড়িতে অবসাদ ও আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি, অথবা কেন আমাদের প্রবাসী সমাজে নারীনির্যাতন খুব বেশি এসব 'অপছন্দের' বিষয়ে ওই সব হট্টমেলায় কোন কথা তেমন হয়না। কোন ইউনিভার্সিটি বা কলেজে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন বা সত্যজিৎ রায় চেয়ার তৈরী করে দেওয়া তো স্বপ্নের অতীত। বাঙালি প্রবাসীরা নিজেদের মধ্যে দেশের জাবর কাটা নিয়েই খুশি।

ইমিগ্রেন্ট বাঙালি, ইমিগ্রেন্ট ভারতীয় চিন্তাই করতে পারেনা, এদেশে বিরাট বাড়ি, বিরাট গাড়ি, বিরাট অর্থ, বিরাট স্টক মার্কেট, বিরাট ডলার এবং বিরাট স্বপ্ন ছাড়া বেঁচে থাকার আর কোন কারণ আছে। এরকম অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রা আমরা কখনো কল্পনাই করতে পারিনি। পারি না।

আমাদের মতো দুচারজন যারা আছি, রাস্তায় নেমে আমেরিকানদের সঙ্গে হাতে হাতে মিলিয়ে লড়াই করি, রাজনীতি করি, আবার দেশেও প্রতিনিয়ত অ্যাকটিভিজমের মধ্যেই থাকি, আমরা তাদের কাছে ব্রাত্যজন। এবং আমাদের কথা তাদের কাছে শান্তিনিকেতনে ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত।

জর্জ বিশ্বাস, দেখে যান, আপনি একা নন। আমরাও আছি।

ওই যে বললাম, ইমিগ্রেন্টদের কথা অমৃতসমান?

শেষ করব একটা গল্প দিয়ে। গল্প হলেও সত্যি। জীবনের ঘটনা।

আমরা তখন নিউ ইয়র্কের অলব্যানি শহরে থাকি। সাদার্ন ইলিনয় থেকে পিএইচডি সংগ্রহ করে প্রথম একটা পোস্টডক ফেলোশিপ জোগাড় করে স্ত্রী ও কন্যার হাত ধরে এখানে এসেছি। আগে যেখানে থাকতাম, সেখানে আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের নিদারুণ একাকীত্ব। জঙ্গলে আর ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা ঘুমন্ত শহর কার্বনডেল। কয়েকজন মাত্র বাংলাদেশি, আর তার চেয়ে আরো কম ভারতীয় বাঙালি। সেই নিয়েই মাঝে মাঝে দু' একটা রবীন্দ্রজয়ন্তী আর নববর্ষের অনুষ্ঠান করে সাড়ে চার বছর কেটে গেল। ভাঙা একটা গাড়ি, যা নিয়ে কাছের বড় শহর সেন্ট লুইসে যাওয়া যায় না। নির্বাসনের মধ্যে নির্বাসন।

অলব্যানি সেই তুলনায় মেট্রোপলিস। ট্রেন, বাস, ট্যাক্সি, ডাউনটাউন এলাকায় নিউ ইয়র্ক রাজ্যের রাজধানীর প্রাসাদোপম ক্যাপিটল বিল্ডিং, স্টেট মিউজিয়াম, স্টেট লাইব্রেরি। পাশেই হাডসন নদী বয়ে যাচ্ছে, যদিও শীত ছ'মাস, আর সেই শীতে নদীবক্ষ তুষারাবৃত থাকে।

রাস্তাঘাটও ছ'মাস বরফে ঢাকা। চার মাস শূন্যের নিচে তাপমাত্রা থাকে। ভীষণ নির্জন শহরতলী, সেখানে বাড়ি ভাড়া নেওয়ার আগে বাড়ির মালিক সাবধান করে দেন, এখানে থাকবেন? এখানে কিন্তু সবাই ... মানে ... বুঝলেন তো ... হোয়াইট। আপনাদের খুব একা লাগবে। যেটা বলেন না, সেটা হলো, তারা কেউ আপনাদের সঙ্গে ভালো করে কথাই বলবে না। আপনারা এই পাড়ায় বাঞ্ছিত নন।

কিন্তু বড় শহরের দুপাশে দুটো ছোট শহর রেনসিলিয়ার আর ট্রয়। অলব্যানি, রেনসিলিয়ার আর ট্রয় মিলিয়ে অন্তত শ খানেক বাঙালি। অলব্যানিতে একটা হিন্দু মন্দির আছে, সেখানে ভারতীয়রা আসে নানা পুজো পার্বণে। ওখানে গিয়ে বেশ জমে গেল। আড্ডা, গান, উইকেন্ডে কোনো এক বাঙালির বাড়িতে পার্টি আর খাওয়াদাওয়া লেগেই থাকে। প্রথম দুটো বছর বেশ কাটলো।

তখন ১৯৯৫। আমাদের তিরিশ পরিবারের বাঙালি এসোসিয়েশন। বলা বাহুল্য, শুধু পশ্চিমি বাঙালিদের, কারণ তাঁরা বাংলাদেশি বাঙালিদের সঙ্গে মেশেন না। দুর্গাপুজো,

নববর্ষ ইত্যাদি পালন করার জন্যে অবৈতনিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবেন। সেখানে এই অর্বাচীনের ইচ্ছে হলো প্রেসিডেন্ট হবার।

এমনিতে না হবার কোনো কারণই ছিলোনা, কারণ মদীয় প্রেসিডেনশিও গুণাবলী দ্বারা, গান, সংগঠন ক্ষমতা, নাটক নভেল আবৃত্তি করা গুণাবলীর রেজুমে খুব একটা মন্দ ছিলনা। কিন্তু এই তখন-যুবক নব্য বাঙালি তার উৎসাহের জোয়ারে বোঝেনি, গুণাবলী তার একটি কম, এবং, প্রবাসী ইমিগ্রেন্ট বাঙালির কাছে সেই গুণটিই সর্বাপেক্ষা প্রধান। আমি পোস্টডক ফেলো। আমার মার্সিডিজ গাড়ি নেই, আমার নিজের বাড়ি নেই, এবং আমার অর্থ নেই। আমার ঔদ্ধত্যে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে মার্সিডিজ ও বাড়িতে সুইমিং পুল-বাঙালিরা আমার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিলেন। এবং ওই ক্ষুদ্র বাঙালি কমিউনিটিতেই গোপন ব্যালটে ভোট হয়ে গেল, এবং এক ভোটে এই অর্বাচীন নব্যযুবক বাঙালি পোস্টডক প্রার্থী বিজয়ী হলেন। ক্রুদ্ধ মার্সিডিজ দল এই অন্যায়ের প্রতিবাদে বাঙালি ক্লাব ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, এবং আমরা যতদিন সেখানে ছিলাম, আর কখনো ফিরে আসেনি।

আমরা সেই শহরে ১৯৯৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ছিলাম। প্রতি বছর নাটক করেছি, ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছি, গান গেয়েছি, পিকনিক করেছি। দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজোতে কাছাকাছি অবস্থিত শহর বস্টন, সিরাকিউজ, রচেস্টার, বিংহ্যামটন থেকে বাঙালিদের ডেকে ডেকে নিয়ে এসেছি হৈহৈ করার জন্যে। আমার স্ত্রী সবাইকে ডেকে রান্না করে খাইয়েছে, প্রবাসী ইমিগ্রেন্ট বাঙালির যা দস্তুর। কিন্তু চিরকালই মনে হয়েছে, সেই ছেড়ে দিয়ে, ভেঙে দিয়ে চলে যাওয়া পরিবারগুলোর অভিশাপের কালো ছায়া আমাদের জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাকীরাও যেন গোপনে আমাদেরই দোষারোপ করেন এই সুখের খেলাঘর ভাঙার জন্যে।

দু হাজার সালে আমরা নিউ ইয়র্ক শহরে চলে এলাম। এখানে অনেক বাংলাদেশের বন্ধু হয়েছে। তাদের সঙ্গেও সখ্য হয়েছে অনেক। কিন্তু ভারতীয় বাঙালিরা আমাদেরকে তাদের মধ্যে ডাকেনি। আমরাও পূর্বের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বেশি মেলামেশা করিনি। এগারোই সেপ্টেম্বরের ট্র্যাজেডির পর রাস্তায় নেমে অনেক লড়াই করেছি। আক্রান্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি অনেক। বাংলাদেশি পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করে গেছি। পরিচিতি অনেক বেড়েছে।

মার্কিন বন্ধু অনেক হয়েছে। আমি দীর্ঘ চোদ্দ বছর নিউ ইয়র্কে এক শ্রমিক ইউনিয়নের অধ্যাপক-শিক্ষক। আমাদের ইউনিয়ন সদস্য সংখ্যা ত্রিশ হাজার। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণাঙ্গী, চীনা, কোরিয়ান, ক্যারিবিয়ান, হিস্প্যানিক। 'পৃথিবী আমারে আপন করেছে, ভুলেছি নিজের ঘর।' একসময়ের ইংরিজি বলতে না জানা এই ক্ষুদ্র, বাদামি গাত্রবর্ণের মানুষ এখন ওয়াল স্ট্রিটের মিছিল জমায়েতেও বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। আর রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতির ক্লাস পড়ানো তো আছেই।

এখন বহুকাল, প্রায় একুশ বছর নিউ ইয়র্ক শহরে থাকার পর মাঝে মাঝে অল্পচেনা বাংলাদেশি কেউ কেউ আমাকে থামিয়ে রাস্তায় জিজ্ঞেস করেন, ‘দাদা, আপনি কি ডঃ পার্থ? আপনার লেখা পড়ি। দাদা আপনি ইন্ডিয়ান, তাই না?’

তারপর বলেন একটু হেসে, ‘দাদা, আপনি কিন্তু বেশ ভালোই বাংলা জানেন!’

যাই হোক, সে অন্য গল্প।

নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

প্রণব বর্ধন

দারিদ্রের স্বরূপ অন্বেষণে

কলকাতার এক সঙ্কীর্ণ গলিতে আমি বড় হই। ছেলেবেলা আর তারুণ্য কেটেছে ঐ গলিতে একটি ছোট বাড়িতে গাদাগাদি করে। সেখানে সবসময়ের জল বা আধুনিক শৌচাগার কোনোটাই ছিলনা। সব ঘরে সাম্প্রতিক দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে গৃহচ্যুত উদ্বাস্তু আত্মীয়রা থাকতেন। বাবা শিক্ষক ছিলেন। ঠিক দরিদ্র ছিলেন না, তবে আত্মীয়দের আর্থিক সহায়তা করতে হতো। আয়ের উদ্বৃত্ত যা থাকত, সেটা ভালো বই আর ভালো খাওয়া-দাওয়ায় ব্যয় করতেন। এই দুটি ব্যাপারে খুব ছোটবেলা থেকেই আমার আগ্রহ এইভাবে জন্মায় । সেই সাথে ওঁর কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি যুক্তিপূর্ণ, নির্মোহ চিন্তার শিক্ষা, আর পৃথিবীকে খানিকটা তীর্যক দৃষ্টিতে দেখবার প্রবণতা।

আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িনি, কারণ বাবা নিজে আমাকে পড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাবার আগ্রহ ছিল গণিত, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতিতে। তাই ঐসব বিষয় আমাকে বেশি করে পড়িয়েছেন। বাবা জমিয়ে গল্প বলতে ভালোবাসতেন, আর এবিষয়ে তার ক্ষমতাও ছিল ঈর্ষণীয়। জীবনের সাধারণ আটপৌরে ঘটনাও তার তীক্ষ্ণ রসবোধে জারিত হয়ে এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠত যে শুধুমাত্র এই গুণটির জন্য তিনি অনেকের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। মা দুঃখ করে বলতেন বাড়িতে কোন বিপদে বাবা সামাল দেবেন কি, সেটা নিয়ে কী করে গপ্পো ফাঁদা যায়, তাই নিয়ে মেতে উঠতেন। আরো অনেক পরে বুঝেছি বাবার তীক্ষ্ণ তীর্যক দৃষ্টি, সুক্ষ্ম রসবোধ আসলে জীবনের নানান দুঃখ, সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বহুদিনের চাপা ক্ষোভ মোকাবেলার অস্ত্র ছিল।

ছেলেবেলার বেশ কিছুটা সময় শান্তিনিকেতনে মামাবাড়িতে কেটেছে। শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তরে মাঠেঘাটে অবাধে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছি, ফলে প্রকৃতিকে খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছে। সুযোগ হয়েছে পাশের গ্রামের অতিদরিদ্র ছেলেমেয়েদের সাথে ফল কুড়ানো, মাছ ধরা, খেলাধুলো করার।

শান্তিনিকেতনে ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, নাটক উপভোগ করে আমার বহু সময় কেটেছে। পাড়ায় একবার আমি রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকে অমলের

ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। আমাদের পাশের বাড়িতে নীলিমা সেন থাকতেন, কয়েক বাড়ি পর কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। দূর অতীতে শোনা এই দুই স্বনামধন্যা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠমাধুর্য আজ অবধি আমার কানে বাজে।

শান্তিনিকেতনে প্রতি বুধবার ভোরে এক গুরুগম্ভীর সভা বসত। পৌরোহিত্য করতেন সংস্কৃতের পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। ইনি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মাতামহ। সভায় ক্ষিতিমোহনবাবু প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করে তার ব্যাখ্যা করতেন। বলা বাহুল্য, আমরা ছোটরা তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতাম না। আমরা বসে থাকতাম বক্তৃতার মাঝে মাঝে অপূর্ব রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার জন্য। অমর্ত্যদার মায়ের কাছে শুনেছি, অমর্ত্যদা যখন খুব ছোট তখন উনি ওঁকে একবার বুধবারের সভায় নিয়ে যান। সেবার পৌরোহিত্য করছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। গুরুগম্ভীর বক্তৃতা, চারপাশে নীরবতা, কিছুক্ষণেই শিশু অমর্ত্যের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, সে বকবক করতে লাগল। মা শশব্যস্ত হয়ে চুপ করতে বলায় শিশুটি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তবে ও কেন কথা বলছে?'

আমি ছিলাম আমার দিদিমার আদরের নাতি। ভালোমন্দ যা রাঁধতেন, সবার আগে আমি চাখতে পেতাম। প্রতি রাতে যখন বাইরে শেয়াল ডাকত, টিমটিমে হ্যারিকানের পাশে বসে (তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে রাত আটটায় বাতি চলে যেত) দিদিমা আমাকে কত গল্প শোনাতেন। তাঁর পরিবারের গল্প, আর মোহময় সব রূপকথার গল্প যা ঢাকায় ছেলেবেলায় তিনি তাঁর মায়ের কাছে শুনেছেন।

কলকাতায় আমার জন্ম, কলকাতার প্রচলিত কথ্যভাষার সাথেই আমি বেশি পরিচিত, কিন্তু দিদিমার সাথে, বাবা-মায়ের সাথে আমি সব সময় ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায়ই কথা বলতাম।

আমার নিজের পরিবার দরিদ্র না হলেও ছোট বয়স থেকে আমি খুব কাছ থেকে কঠোর দারিদ্র্য দেখেছি। আমার হতদরিদ্র আত্মীয়স্বজন, কলকাতার গলিতে আমার ছোটবেলার খেলার সাথীরা (এদের কারো কারো মা কাছের গলিতে দেহব্যবসা করতেন), বা শান্তিনিকেতনে পাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরা (ওদের বেশির ভাগ বাবা রিকশা চালাত আর মা বাড়িতে ঝি-এর কাজ করত) – এদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল।

মাধ্যমিক স্তরে ইস্কুলে ভর্তি হবার পরীক্ষার দিন। রাস্তার যে ছেলেটার সাথে আমি খেলাধূলো করেছি, সেও ঠিক করেছে পরীক্ষা দেবে। ওর বাবা কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ছেলেকে পৌঁছুতে এসেছেন। ছেলেকে বললেন আমার খুব কাছাকাছি বসতে আর আমি যা লিখি তা হুবহু খাতায় টুকে নিতে। তারপর তিনি ছেলেকে এমন একটা কথা বললেন শুনে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। আজও সেকথা ভুলতে পারিনি। ছেলেকে বললেন, 'নিজে নিজে আবার কিছু লিখতে যাসনে, ভালো করেই জানিস তোর মাথায় গোবর ছাড়া আর কিসসু নেই।' ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে এভাবে খেটেখাওয়া মানুষেরা না জানি কত সন্তানের আত্মবিশ্বাস ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। টোকাটুকিতে অক্ষমতার জন্যই হোক বা ক্ষোভের কারণেই হোক, ছেলেটা পাশ করেনি।

ছোটবেলায় দারিদ্রের এই নিবিড় পর্যবেক্ষণই মনে হয় আমার মধ্যে দারিদ্রের অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব আর সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষণের আজীবন স্পৃহার ভিত্তি রচনা করেছিল। খুব কাছ থেকে আমি দেখেছি দারিদ্র্য মানুষকে কতটা হীন করে দেয়, আর দেখেছি তার বিরুদ্ধে দরিদ্র মানুষের (বিশেষ করে নারীদের) সংগ্রামে কি ধরনের ধৈর্য ও শৌর্য লাগে।

কলকাতায় আমাদের পাড়ার কাছেই শহরের অন্যতম সেরা স্কুল এবং সারা দেশের শীর্ষস্থানীয় কলেজ ছিল, সেই সাথে ছিল বিশাল বইয়ের পাড়া। আমি এ সবেরই সদ্ব্যবহার করেছি। কলেজ জীবন আর নিকটস্থ কফি হাউস আমার মনের দিগন্ত প্রসারিত করে দিল। তখনকার নানা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতা, তার ঘাত-প্রতিঘাত, সেসবে কিছুটা আত্মম্ভরিতা যদিবা ছিল, কিন্তু তার মাঝেই যেন আমি চিন্তামগ্ন মানুষের একটি বিশ্বব্যাপী পরিবারে সামিল হবার হাতছানি পেলাম। একই সময় সমমনা বন্ধুদের সাথে নিবিড় পাঠ, লেখালেখি আর নানান সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের প্রাণবন্ত, সমৃদ্ধ জগতের ঘনিষ্ঠ হলাম। কলেজ জীবনের শুরুতে আমার ঝোঁক ছিল ইতিহাসের দিকে। বিশেষ করে মার্ক্সবাদী ইতিহাসের দিকে। ইতিহাসে এলোপাথাড়ি নানা ঘটনা মার্ক্সীয় পন্থায় সুশৃঙ্খল কাঠামোতে বিশ্লেষণ আমাকে আকৃষ্ট করত, যদিও স্টালিন-শাসিত রাশিয়ার বর্বরতা আর আশেপাশের মার্ক্সবাদীদের গোঁড়ামি আমাকে বীতশ্রদ্ধ করেছে। ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ আরো ভালোভাবে বোঝার জন্যই শেষ পর্যন্ত অর্থনীতির দিকে ঝুঁকলাম।

যেসব প্রেরণাভিত্তিক প্রক্রিয়ার ফলে স্থিতিশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অনুপুঙ্খ ভিত্তি সৃষ্টি হয় সেটা আরো ভালোভাবে বুঝতে অর্থনীতিশাস্ত্র আমাকে সাহায্য করেছে। বাজার প্রক্রিয়ার নানান সীমাবদ্ধতা (এবং তার ফলে সৃষ্ট অসাম্য) আমাকে যেমন ক্ষুব্ধ করেছে, তেমনই আবার বিভিন্ন আর্থিক উপকরণের বিতরণ ব্যবস্থায় আর অদক্ষতা নিয়ন্ত্রণে তার অবাক-করা ক্ষমতা আমাকে চমৎকৃত করেছে। সমাজ সংগঠিত করার জন্য এমন কী নীতিমালা প্রণয়ন করা যায় যেটা বাজারের সংগঠন এবং সুনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার সাথে সামাজিক ন্যায়বিচার আর রাজনৈতিক জবাবদিহিতার মেলবন্ধন রচনা করতে পারে? এই খোঁজ অর্থনীতি নিয়ে আমার সমস্ত কাজের অনেকটা অধিকার করেছে। সেই 'বাজার সমাজতন্ত্র'-এর মডেল (যেখানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে মানুষের ব্যক্তিগত প্রেরণা ও তথ্যের প্রচণ্ড অভাবের বাধা) থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ে শাসনের বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে আমার সাম্প্রতিক কাজ পর্যন্ত একথা সত্যি । ১৯৮০ সালের দিকে আমি একটা আন্তর্জাতিক বিদ্বদগোষ্ঠীতে যোগ দিই। এঁরা গণতান্ত্রিক, সুষমসমাজ সমর্থক পণ্ডিত – এদের মধ্যে দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ আছেন। এঁদের এই বিশ্বাস এখনো অটুট আছে যে মার্ক্স কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন (যদিও তাঁর উত্তর অনেক সময়ই ভুল)। সেই সব প্রশ্ন যথাযথভাবে উত্তর দিতে হলে আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির ব্যবহার প্রয়োজন।

অর্থনীতি আমাকে সামাজিক চিন্তায় সুক্ষ্ম সুনির্দিষ্ট নজর যে কত মূল্যবান, এই কথাটা বুঝতে সাহায্য করে। তবে বিষয়টিতে বড্ড বেশি সঙ্কীর্ণ বিশেষজ্ঞতার উপর জোর এবং অগোছাল অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভাবনাকে সহজেই খারিজ করে দেবার প্রবণতা আমার ভালো লাগেনি। বিলেতের কেম্ব্রিজে যখন ডক্টরেটের অভিসন্দর্ভ নিয়ে কাজ করছিলাম, এবং পরে যখন মার্কিন দেশের ম্যাসাচুসেটস-এর কেম্ব্রিজে এম আই টিতে শিক্ষকতা ও গবেষণা করছিলাম, তখন আমি এই সুক্ষ্ম নির্ণয়ের বিষয়টি নিয়েই মত্ত ছিলাম। তখন মূলত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর আন্তর্জাতিক ব্যবসার গাণিতিক মডেল নিয়ে কাজ করছিলাম। যদিও এই সময়ে আমি অর্থনীতির শীর্ষস্থানীয় জার্নালে বেশ কিছু গাণিতিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি, একটা অতৃপ্তি আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। তার কারণ এসবের সঙ্গে দারিদ্রের বাস্তবতা বিশ্লেষণের দূরত্ব অনেকটা।

শিক্ষকতার তিন বছর শেষ হবার আগেই আমি এম আই টি ত্যাগ করি, কারণ আমার ভারতে ফিরে যাবার ইচ্ছে ক্রমশই প্রবল হচ্ছিল। দিল্লীতে আমি প্রথম ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট ও পরে দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ কাজ নিই। এর ফলে আমি ভারতীয় পরিসংখ্যান উপাত্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাই। বিস্তৃত জরিপের উপাত্ত নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে সচরাচর বড় আকারের জরিপে বা সর্বেক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত (বিশেষ করে ভূমি, শ্রম এবং ঋণ সম্পর্কিত গ্রামীণ কৃষি সম্পর্ক) নিয়ে জরুরি কিছু প্রশ্ন বাদ পড়ে যায়। ফলে আমি অধ্যাপক অশোক রুদ্রের সাথে একটা নতুন উদ্যোগ নিই – এতে এমন নিবিড়ভাবে গ্রামে মাঠপর্যায় গ্রামীণ কৃষি সম্পর্কের উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয় যার ফলে উৎপাদন সম্পর্ক সম্বন্ধে একেবারে অনুপুঙ্খ পর্যায়ে অর্থনৈতিক-নৃতাত্ত্বিক স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়, আবার জরিপের পরিধি নমুনাভিত্তিক রাখার ফলে গোটা অঞ্চলের সামগ্রিক অবস্থার গ্রহণযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া গেল।

এইধরনের জরিপের পদ্ধতি নিরূপণ করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ আর নৃতাত্ত্বিকরা কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিগত রীতি অনুসরণ করেন, তার সুবিধা আর সীমাবদ্ধতাগুলোই বা কী, এই নিয়ে চিন্তাভাবনা আরম্ভ করলাম। এই ভাবনার ফলশ্রুতি হলো আমার উদ্যোগে দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। সম্মেলনের মতবিনিময় 'অর্থনীতিবিদ ও নৃতাত্ত্বিক: পারস্পরিক আলোচনা' (Conversations between Economists and Anthropologists, 1989-2007) নামে দুই খণ্ডে সংকলিত হয়।

গ্রামীণ কৃষি সম্পর্কের পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নানান দরিদ্র কৃষি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন (দীর্ঘস্থায়ী) প্রতিষ্ঠানের অনুপুঙ্খ অর্থনৈতিক ভিত্তি বোঝার জন্য কী ধরনের তাত্ত্বিক মডেল নির্মাণ করা যায়, সেই সম্বন্ধে চিন্তার খোরাক মিলল। যখন এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করি তখন উন্নয়ন অর্থনীতিশাস্ত্রে আর্থিক ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপান্তর বা আরো উন্নত দেশের সাথে সার্বিক অর্থনৈতিক লেনদেন নিয়েই বেশিরভাগ কাজ হতো। যখন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলেতে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করি, গ্রামীণ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর আমার সম্মিলিত তাত্ত্বিক ও বাস্তব

অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাজের ওপর ভিত্তি করে একটা বই লিখি, তার নাম ‘ভূমি, শ্রম ও গ্রামীণ দারিদ্র্য’ (Land, Labor and Rural Poverty, 1984)। এছাড়া ‘কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক তত্ত্ব’ (The Economic Theory of Agrarian Institutions, 1989) নামে একটা বই সম্পাদনা করি। কয়েক বছর পর অর্থনীতিশাস্ত্র এইদিকে মোড় পরিবর্তন করে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে নজর দিচ্ছে দেখে প্রীত হয়েছি। বার্কলেতে থাকাকালীন সময়ে ১৮ বছর আমি ‘উন্নয়ন অর্থনীতি জার্নাল’ (Journal of Development Economics)-এর মুখ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি,। যতদিন সম্পাদক ছিলাম, জার্নালে যেন উন্নয়ন অর্থনীতিশাস্ত্রে চিন্তাভাবনার বড় বড় বাঁকপরিবর্তনের যথাযথ প্রতিফলন ঘটে, সেই বিষয়ে যত্নবান হয়েছি।

গবেষণা জীবনের গোড়া থেকেই সামূহিক রাজনীতির একটা বিষয় নিয়ে আমার আগ্রহ ছিল – সেটা হলো ভারতের মতো একটা আর্থসামাজিকভাবে বহুবিভক্ত সমাজে সম্মিলিতভাবে নীতিবাস্তবায়নে অক্ষমতা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অল সোলস কলেজে একটি স্মারক বক্তৃতামালা দেবার আমন্ত্রণ আমাকে এই বিষয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তাভাবনার সুযোগ এনে দিল। দীর্ঘমেয়াদী পরিকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পে সরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগের অপ্রতুলতা ভারতের বহুদিনের সমস্যা – এই নিয়ে আমার জল্পনা কল্পনা উপস্থাপন করতে গিয়ে আমি এই সমস্যার ব্যাখ্যা করলাম সম্মিলিত উদ্যোগ বাস্তবায়নে সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে। এই প্রসঙ্গে আমার অন্য একটি মত প্রকাশ করলাম, যে এই একই সামাজিক বহুবিভাজন যেমন ভারতে বিনিয়োগে অন্তরায় হচ্ছে, সেটাই আবার বহু বাধা সত্ত্বেও ভারতে গণতন্ত্র টিকিয়ে রেখেছে। পরস্পরের প্রতি আস্থাহীন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লেনদেনের ও বিবাদমীমাংসার উপায় হিসেবে ভারতে গণতন্ত্র টিকে গিয়েছে। এই বক্তৃতামালা ‘ভারতের উন্নয়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি’ (The Political Economy of Development in India - 1984) শীর্ষক সংক্ষিপ্ত বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই বই সম্পর্ক খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেও সতীর্থ অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বইটা তেমন আগ্রহ সঞ্চার করেনি, হয়ত অর্থনীতির চেয়ে রাজনীতি বেশি ছিল বলে।

স্থানীয় পরিবেশ সম্পদ (যেমন বন, মৎস্য সম্পদ, সেচের জল)-এর সাথে গ্রামীণ মানষের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত। বহুবিভক্ত সমাজের কারণে সামূহিক নীতিবাস্তবায়নের সমস্যার এই একই ধারণা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবেশ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে কী সমস্যা করে, সেটা বিশ্লেষণে প্রয়োগ করলাম। সম্মিলিত উদ্যোগ বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক বৈষম্যের তাত্ত্বিক তাৎপর্য নিয়ে কিছু কাজ করি। ভূমিবণ্টনে বৈষম্য জলসম্পদ ভাগাভাগিতে কীভাবে কৃষকদের সহযোগিতার ওপর প্রভাব ফেলে, সেই বিষয়ে আমার কিছু তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত মাঠপর্যায়ে গবেষণা করে তার যাথার্থ্য যাচাই করে দেখলাম।

আজ এত বছর পর কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের ‘সীমাবদ্ধতা’ সম্বন্ধে আরো নিশ্চিত হয়েছি, সেই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে – সে একটি জনগোষ্ঠীর যৌথ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণেই হোক বা স্থানীয় নির্বাচিত পঞ্চায়েতের সামাজিক পরিষেবা প্রদানেই হোক – ঠিক কী কী কারণে

সমস্যা হয় সেটা নিয়ে খোঁজ নিয়েছি। দিলীপ মুখার্জির সঙ্গে যৌথভাবে বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে একাধিক তাত্ত্বিক গবেষণার কাজ করি। সেই সাথে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ভূমিসংস্কার ও দারিদ্র্যমোচন কার্যক্রমে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রভাব কী, এই নিয়ে মাঠপর্যায়ে একাধিক জরিপ করেছি। এই প্রকল্পগুলো আর্থসামাজিক অসাম্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক পণ্ডিতদের একটি গবেষণাচক্রের কর্মকাণ্ডের অংশ। এক দশকের বেশি সময় ধরে ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশন এই উদ্যোগের অর্থায়ন করে। আমি এই উদ্যোগের যৌথ পরিচালক ছিলাম।

বহু দশক আগে যখন আমি এম আই টি-তে শিক্ষকতা করছি, তখন বিশ্বখ্যাত উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ এবং আমার অগ্রজতুল্য সহকর্মী পল রোজেনস্টাইন-রোডান আমায় জিজ্ঞেস করেন আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ কী। উত্তরে আমি বলেছিলাম, ‘খানিকটা বামঘেঁষা, তবে মার্কিনিরা বলবে বড্ড বেশি বামপন্থী। আবার ভারতের মার্ক্সবাদী বন্ধুরা বলবে যথেষ্ট বামপন্থী নয়।’

বাজার অর্থনীতির গতিশীলতার সাথে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের মেলবন্ধন রচনার জন্য আমার কাছে মনে হয়ে সামাজিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সবচাইতে ফলপ্রসূ হতে পারে। তবে সামাজিক গণতন্ত্রকে টেকসই আর গতিশীল করতে হলে তাকে কিছু বিষয় মোকাবেলা করতে হবে – পুঁজির ওপর কাঠামোগত নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে হবে, সুশাসনে শ্রমের ভূমিকা বাড়াতে হবে যাতে সেটা নতুন নতুন উদ্ভাবনার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে, পূঁজি ও রাজস্বের গণতন্ত্রায়ণ করতে হবে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ধনীর অর্থের দৌরাত্ম দূর করতে হবে।

ব্যবসা আর পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করবার ফলে যে কায়েমি স্বার্থ আজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কলকাঠি নাড়ে, এরা অত সহজে ক্ষমতা ছাড়বে না। সামাজিক আন্দোলন আর ব্যাপক গণজাগরণের কঠোর কাজটি তো আছেই, সেই সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য জগতের কিছু অংশকে হয়তো বোঝানো যেতে পারে যে সামাজিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকের অংশগ্রহণ, তাদের কল্যাণ ও উদ্যমের উন্নয়নের ফলে পুঁজিবাদ সংস্কার করে যেই কাঠামো তৈরি হবে, তাতে তাঁদের দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনশীলতা ও মুনাফার ক্ষতি হবে না। বরং এর ফলে পূঁজিবাদকে অদূরদর্শী অর্থগৃধ্নু পূঁজিবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

রাজনৈতিক অর্থনীতির জটিল জগতের প্রতি আমার গভীর আগ্রহের ফলে এক দিকে যেমন আমি মতাদর্শগত অতিসরল সমাধানের ব্যাপারে সন্দিহান হয়েছি, তেমন আবার সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের প্রতি মানুষের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টাকে সমীহ করেছি। আন্তোনিও গ্রামশি যথার্থই বলেছেন, অলীক স্বপ্নের হাতছানিকে এড়াতে গিয়ে যেন আমরা স্বপ্ন দেখতে ভুলে না যাই। এটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ।

(এই প্রবন্ধের প্রস্তুতিতে আশফাক স্বপন সহায়তা করেছেন।)

বার্কলে, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

ফারজাহান রহমান শাওন

ফুলপ্রান্তর ও অন্যান্য

প্রতিবছর সামারের তিনমাস আশপাশের বেশ ক'টা ফ্লাওয়ার ফার্মে যাই ফুল তুলতে, প্রতি সপ্তাহেই। মূলত আমার বন্ধু কেটির ফার্ম আর স্টেটান নামে একটা ফার্মেই যাই। আমার বন্ধু ঈভন আর জয়েস এরাই প্রতি সামারে এই কাজের সঙ্গী হত সাধারণত।

আজ গিয়েছিলাম স্টেটানে; এই সামারে প্রথম। কোভিড এসে এবার সামারটাই দিয়েছে উল্টোপাল্টা করে একদম।তবু আজ গিয়ে মন ভরে গেল। ভেবেছিলাম এবারের উল্টোপাল্টা তাপমাত্রায় ফুলেরা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারবে না বুঝি; আর মাঝ অগাস্ট হল একদম শেষের দিক ফুলের জেগে থাকার জন্যে। ওমা গিয়ে দেখি দিব্যি তারা চারপাশ আলো করে ফুটে আছে।

এই ফার্মে কেবল ফুলই চাষ হয়, হরেক রকম ফুল আর বিচিত্র সুন্দর সব পাতাগাছ। ফার্মের মালিক ফুল কাটার কেঁচি আর সাজি গুছিয়ে রাখে, পাশে পানির টিউবও আছে। প্রতি সাজি ৭ ডলার করে। একটু পানি নিয়ে সাজিতে নেমে পড়লেই হলো ফুলের ক্ষেতে..যে যতগুলো ফুল তুলে ভরতে পারে এক সাজিতে, এর কোনো লিমিট নেই। সারি সারি রং বেরং এর ফুল, চারপাশে মৌমাছি, ভ্রমর গুনগুন করছে..সুগন্ধ ম'ম' করছে চারপাশ। যতক্ষণ ওখানে থাকি মনে হয় স্বর্গের একটা টুকরো এই জায়গাটা যেখানে কেবল রঙ আর সুগন্ধ, প্রাণ আর ভালোবাসা, আনন্দ আর আলো.. ।

এ'দেশে ফুল সাজানোতে শুধু ফুল নয়, নানান পাতাও ব্যবহার করা হয়, সেই পাতাগুলোও এইসব ফার্মে চাষ করা হয়। আমরা মহাশখ করে খাই যে এসপেরাগাস, তার চিরল চিরল আঁকাবাঁকা পাতা ফুলের তোড়া সাজাবার বেশ জনপ্রিয় উপকরণ এখানে।মনে আছে প্রথমবার এসপেরাগাস গাছ দেথে আর তার পাতা দিয়ে flower bouquet এরেঞ্জ করা দেখে আমি মহা অবাক হয়ে গেছিলাম। মনে পড়ছিল ১২ ক্লাসে পড়া The Luncheon গল্পটি যেখানে এসপেরাগাস এর উল্লেখ ছিল।

ফুলের রঙীন ভাণ্ডারের সাথে ফ্লাওয়ার ফার্মে চাষ করা হয় নানা রকম প্রাকৃতিক সুগন্ধি ঔষধি গাছও। এর মধ্যে ল্যাভেন্ডার আর পুদিনা অন্যতম।ল্যাভেন্ডার প্রথম আমি দেখি একটা কনফারেন্সে স্পেনের মাদ্রিদ থেকে সালামাংকা শহরে বাসে করে যাবার

পথে রাস্তার দুই ধারে। সবুজের ফ্রেমে বেগুনি সেই স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হওয়া ল্যাভেন্ডার হাতে ধরতে না পারার দু:খ অনেক দিন ছিল। ২০১৬ তে এখানে প্রথম ফুলের ফার্মে গিয়ে ল্যাভেন্ডার ক্ষেতে আমি ২০ মিনিট কাটিয়েছলাম। আমার এ'দেশি বন্ধু কেটি খুব মজা পেয়েছিল। আমাকে গাদা খানেক ল্যাভেন্ডার কেটে তোড়া বানিয়ে দিয়েছিল। সেই ল্যাভেন্ডার আমার বাসায় প্রতিবছর আসে। এখন শুকিয়ে ঘরের কোণায়, বাথরুমে, ক্লজেটে বিভিন্ন জায়গায় তো রাখিই সেইসাথে ল্যাভেন্ডার দিয়ে চা বা ড্রিংকও বানাই পুরো বছরই। আমার নিজেরও ল্যাভেন্ডার গাছ থাকে পুরো বছর জুড়েই জানালার ধারে রাখা। ল্যাভেন্ডার স্নানের পানিতেও ব্যবহার করি।শুধু সুগন্ধ নয়, ক্লান্তিজনিত গায়ে ব্যথা চলে যায় ম্যাজিকের মতো সে জন্যেও। অপূর্ব অপার্থিব বেগুনি এই সুগন্ধি প্রকৃতির এক অসামান্য উপহার মানুষের জন্যে।

এই সবকিছুর সাথে এক অসামান্য সুগন্ধি ফুল হলো সুইট পিস বা মটরশুঁটির ফুল। এখানকার এই সুইট পিস আমার যতটা পছন্দ তার চেয়ে বেশি পছন্দ এর বেগুনি, সাদা, গাঢ় গোলাপি, হলদেটে তীব্র সুগন্ধি ফুলগুলো।এরা সাজিয়ে রাখার জন্যে তেমন যুৎসই নয় ফুলদানিতে। বেশিদিন তাজা থাকে না। প্রতিবার আমি কেবল সুগন্ধের জন্যে একটা ছোট্ট তোড়ার মতো বানিয়ে আনি এদের...

এই স্টেটান ফার্মের মালিক হলো জেনি নামের প্রায় ৭০ বছর বয়সি এক সদা হাস্যময়ী আমেরিকান ভদ্রমহিলা।জেনি Education মেজর নিয়ে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স করেছে কিন্তু তার পছন্দ ফার্মিং। তাই শিক্ষকতা করলেও একসময় একাজেই সে মনোযোগ দিলো পুরো। পুরো সামার জুড়ে আমার মতো অসংখ্য মানুষ আসে ফুল তুলতে।আশপাশের অনেক শহরে নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে ফ্লাওয়ার বুকে বানিয়ে সাপ্লাই করে সে। সপ্তাহে ২-৩০০ অর্ডার থাকে তার।মূলত অফিস গুলোতেই দেয় তবে অনেক বাসাতেও সাপ্লাই করে সে। তাজা ফুলের সাথে শুকনো ফুলেরও প্রচণ্ড চাহিদা ও বাজার রয়েছে।সারি সারি সূর্যমুখি আর অন্যান্য ফুল শুকাতে দেখি প্রতিবার গেলেই। জেনি অনেক বছর ভারতে ছিল শিক্ষকতার জন্যে, বাংলাদেশেও এসেছে বেশক'বার। সে অনেককাল আগের কথা যখন আমরা পাকিস্তানের অংশ ছিলাম। এটা প্রতিবার দেখা হলেই সে আমাকে মনে করিয়ে দেয়।

সেদিন সকালে সকালে গানের লাইভ করে শাড়ি না বদলেই গিয়েছিলাম ফারমার্স মার্কেট আর ফ্লাওয়ার পিক করতে।মাঝে একটু খেতেও গেলাম জয়েসকে নিয়ে। সে ইন্ডিয়ান/বাংলাদেশি খাবার পছন্দ করে, আমার বাসাতেও খায় সব সময়েই। কিন্তু রেস্টুরেন্টে গেলে কী অর্ডার করবো বোঝে না।শহরের একমাত্র ভারতীয় রেস্টুরেন্টে তাকে নিয়ে গেলাম আজ, তার উচ্চারণে, 'ন্যান এন্ড চিকেন বুনা' খাওয়াতে। ফুলের ছবিগুলোর সাথে তাই আমাদের পোজ দিয়ে মাস্ক ছাড়া ও মাস্ক পরা দু'রকম ছবি আছে ফারমার্স মার্কেটে আর কারমা রেস্টুরেন্টে।

পুরোটা সময় সবাই বেশ মজা আর কৌতূহল নিয়ে দেখছিলো ফারমার্স মার্কেটে শাড়ি আর টিপ পরা আমাকে।কয়েকজন কৌতুহলে বলেও ফেললো, 'Love your

outfit and that dot on forehead. Is it a symbol of marriage?' প্রতিবার শাড়ি টিপ পরলেই এই প্রশ্নটা গৎবাঁধা আমার জন্যে..হেসে জানালাম এটা part of my makeup. It has nothing to do with my religion. It's a custom for Hindus. ব্যাস সাথে সাথে প্রশ্ন, 'Are you a Hindu?' না বলতে অবাক হতেই ব্যাখ্যা করলাম, 'বাঙালিত্ব আর ধর্ম কী করে ভিন্ন। কী করে হাজার বছরের বঙ্গ জনপদের মেয়েদের তাম্বুলে ওষ্ঠা রাঙানো, কুমকুমের টিপ কপাল শোভিত করা আর চন্দনে চর্চিত শরীর তাদের জীবনধারার অংশ; এরসাথে ধর্মের কোনো যোগ নেই। ধর্ম আমার ইসলাম কি হিন্দু; কি বৌদ্ধ হতে পারে কিন্তু জাত হলো আমার বাঙালী, সেটাই আমার প্রথম পরিচয়। পরে যখন ফুল তুলতে এলাম এই একই প্রশ্ন করল জেনি।জেনি এর আগে শাড়ি পরা দেখে নি আমাকে । তাকে উত্তর দিতেই সে বললো, তার পূর্ব পাকিস্তানে ভ্রমণের সময় সে ওই প্রশ্ন কাউকে করতে পারে নি, ভারতেও বহু মানুষকে একই প্রশ্ন করেছে। আমার মতো করে অনেকে উত্তর দিয়েছে আবার অনেকে পুরো ভিন্ন কথাও বলেছে। ও আমাকে জিজ্ঞেস করল ধর্ম আর জাতীয়তাবাদের এই সহাবস্থানকে আমি কিভাবে নেই? ভেবে বললাম, আমার ছোটবেলায় এ'দুটো সাংঘর্ষিক ছিল না। সময়ের সাথে আমরা উন্নত হচ্ছি প্রযুক্তি আর জ্ঞানে কেবল মানুষ হিসেবে নিজের আত্মপরিচয় কি সেটা বোঝার বিষয়ে প্রাচীন থেকে প্রাচীনতর সময়ে ফেরত যাচ্ছি।

ফুল তুলতে এসে এই আলোচনা মোটেই আশা করি নি; দিনের শুরু হয়েছিলো আজ ঘন্টাখানেক আগে দেশের গান গাইবার একটা আয়োজন দিয়ে। শেষটাও সেই দেশ, জাতি নিয়েই কথা আর ভাবনায় গিয়ে ঠেকলাম..মনে হতে থাকল বঙ্গবন্ধু আর আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কেমন বাংলাদেশ দেখার স্বপ্নে জীবন বাজি রেখেছিলেন!

মস্কো, আইডাহো, যুক্তরাষ্ট্র

বিজন সাহা

সত্যের সন্ধানে

বিকেলের সূর্যটা গাছের ডালে আটকে থাকতে থাকতে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সন্ধ্যা নামি নামি করেও যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে কিসের অপেক্ষায়। ননীদি হ্যারিকেন মুছছে। ননীদি বাড়ির অনেক কাজের লোকের একজন। প্রায়ই আমাদের বাড়িতেই থেকে যায়। থাকলে ঘরে ঘরে হ্যারিকেন ও-ই পৌঁছে দেয়।
- ননীদি বাতি লাগাতে আর কতদূর?
- এই তো বৌদি সন্ধ্যা প্রদীপ দেখালেই বাতি জ্বলবে।
উচ্চবিত্ত হিন্দু বাড়ির ঝামেলার শেষ নেই। বাড়িতে তখন গোটা কুড়ি ঘর। সব ঘরের সামনে ধুপ আর সন্ধ্যা প্রদীপ দেখানো শেষ না হলে বাতি জ্বলবে না। এটা ধর্মীয় আচার নাকি কুসংস্কার নাকি ট্র্যাডিশন কে জানে। ছোটবেলায় মনে হত ধর্মীয় আচার, পরে ভাবতাম কুসংস্কার। কিন্তু সকালে যখন বিছানায় শুয়ে চায়ের অপেক্ষা করতাম মা বলতেন
- চা হয়ে গেছে, উঠে হাতমুখ ধুয়ে নে। চা কি বারান্দায় দেব নাকি বেড টি খাবি?

সকালে বা সন্ধ্যায় চা না খেলে জীবনটাই বৃথা হয়ে যেত, কিন্তু এটাকে তখন কুসংস্কার বলে মনে হয়নি, বরং ছিল ট্র্যাডিশন। কেন? অনেক কিছুই আমরা এভাবে ভাবতে অভ্যস্ত। সময়ের সাথে সাথে অনেক কুসংস্কারের জন্য মন খারাপ করে। এখন দেশে গেলে দিদি বা বৌদি যখন ঘরে বাতি দেখিয়ে বা তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে সুইচ অন করে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালায় সেটা দেখতে বরং ভালই লাগে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও ছোটবেলায় ফিরে যাওয়া যায়।

আমাদের শৈশব কেটেছে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনে শুনে আর সেভাবেই গড়ে উঠেছে ভাল মন্দের ধারণা। রাম আর পাণ্ডবদের বীরত্বে শিহরিত হয়েছি, তাদের জয় কামনা করেছি। কেন? সেটাও মনে হয় বড়দের দেখে দেখে। যদিও রামায়ণেই ইন্দ্রজিৎ

তাঁর খুড়ো বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেছিলেন তবুও তাঁকে কখনোই বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হয়নি। এমনকি মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ" পড়েও বিভীষণ কখনোই মীরজাফরের মত ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠেনি। কারণ? মনে হয় রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন বলেই রামের পক্ষে আমাদের এই পক্ষপাতিত্ব, ঠিক যেমনটি হেক্টরের বীরত্বের পরেও একিলিসের পক্ষ নিয়েছি প্যারিস হেলেনকে চুরি করায়। ভাবিনি কী মেঘনাদ, কী হেক্টর – এরা মাতৃভূমির জন্য লড়াই করছে, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে। তবে সময় বদলে গেছে। বদলে গেছে আমাদের ভাবনার জগত। এমনকি দেবতাও যদি অন্যায় করে আমরা প্রশ্ন করি। হ্যাঁ, আমরা এখন প্রশ্ন করতে শিখেছি। তাই রাম সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে ভুল করেছিলেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হয়। হয়তো বর্তমানে রাজনীতিতে রামের উপস্থিতি তাঁকে দেবতার আসন থেকে মানুষের মধ্যে নিয়ে এসেছে। আর তাই আমরা রামের অস্তিত্ব নিয়ে, তাঁর ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন করি, প্রশ্ন করি তাঁর প্রজা বাৎসল্য নিয়ে, নারীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

ছোটবেলায় বিভিন্ন লোকের মুখেই শুনেছি ঈশ্বরই সত্য, সত্যই ঈশ্বর। সত্যের সন্ধান মানেই ঈশ্বরের সন্ধান। বিবেকানন্দের ভাষায়,

তুমি কে কেন জন্ম কিসে বা কল্যাণ
এইরূপ প্রশ্ন করি লভ তত্ত্ব জ্ঞান
সে জ্ঞান লভিলে তব মোহ কেটে যাবে
তুমি আমি জীব জগতে পার্থক্য না রবে।

সেই সময় মনে হত যেহেতু বিজ্ঞান সত্যসন্ধান করে তাই বিজ্ঞান চর্চা করলেই ঈশ্বরের সেবা হয়। তাই অনেক দিন পর্যন্ত ঈশ্বর নিয়ে ভাবার কোন প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু বদলে যায়। ধীরে ধীরে মার্ক্সবাদী সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটে। বিশ্বাস করতে শুরু করি ঈশ্বরের অসারত্বে, সন্দেহ হতে শুরু করে তাঁর অস্তিত্বের সত্যতায়। তবে একটা সময় আসে যখন ভাবনা আবার অন্যদিকে মোড় নেয়। না, ব্যাপারটা এমন নয় যে ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে পাই। তবে এটা বুঝতে পারি বিশ্বাসের মতই অবিশ্বাসও একটা বিশ্বাস। বিশ্বাসীরা যেমন অন্ধভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে অবিশ্বাসীরা তেমনি অন্ধভাবে তাঁকে অবিশ্বাস করে। যেহেতু দু'দলই দু'টো সমান্তরাল বাস্তবতায় বাস করে তাদের মধ্যে যুক্তি কাজ করে না। তাহলে?

আমার গবেষণা কসমোলজির উপর। মহাবিশ্বের উৎস, তার বিবর্তন, গঠন, পরিণতি – এসবই কসমোলজির বিষয়। আচ্ছা, একজন লোক যখন অসুস্থ হয় তার জন্য কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ – ওষুধের আবিষ্কারক কে সেটা জানা নাকি কীভাবে এই ওষুধ ব্যবহার করা হয় সেটা জানা? তাই ঈশ্বর আছে কি নেই সেই বিতর্কে না গিয়ে প্রকৃতির রহস্য জানা চেষ্টা করাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? আর প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানই তো সত্যের অন্বেষণ।

এখন প্রশ্ন হল বিজ্ঞানী যে সত্যের সন্ধান করে তার রূপ কেমন? একজন সত্যান্বেষী হিসেবে তার উচিৎ শুধু কি নির্ভেজাল সত্য খোঁজা নাকি সে সেই সত্য খুঁজবে যেটা তার উপকারে না এলেও অপকার করবে না? আর তাই যদি হয় সে কি তখনও সত্যান্বেষী থাকবে, নাকি স্বার্থান্বেষী হবে? গবেষকদের প্রায়ই সে যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে সেটার প্রাসঙ্গিকতা, সম্ভাব্যতা, প্রয়োগ ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এর মানে হচ্ছে ইচ্ছে থাকুক বা না-ই থাকুক, বিজ্ঞানীকে ভাবতে হয় তার কাজ কারও উপকারে আসবে কিনা। অর্থাৎ সত্যের নয় সে বাধ্য হয় স্বার্থের খোঁজ করতে – হোক সেটা নিজের, অন্যের বা সমাজের স্বার্থ।

আচ্ছা কোপার্নিকাস বা গ্যালিলিও যখন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে বললেন, তারা কি কোন স্বার্থের কথা ভেবেছেন? পৃথিবী সূর্যের চারদিকে নাকি সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে – এ সত্য উদঘাটন কি সরাসরি কোন মানুষের ভাগ্য বদলে দিয়েছে? বরং এই সত্য ভাষণ তাঁদের ব্যক্তিজীবনে অনেক কষ্ট এনেছে। তবুও তাঁরা এটা করেছেন শুধুই সত্যকে জানার জন্য, জানাবার জন্য , অন্য কোন ভাল মন্দের কথা না ভেবেই। আর এই সত্যই পরবর্তীতে মানুষকে সাহায্য করেছে আরও বড় সত্য উদঘাটনে। এই যে স্বার্থের কথা না ভেবে সত্য সন্ধান করা, সত্য সন্ধানে প্রয়োজনে অপ্রিয় প্রশ্ন করা – সেটাই বিজ্ঞানমনস্কতা।

বর্তমান জগতের একটা বড় সমস্যা হল বিজ্ঞান এগিয়ে গেলেও মানুষ এগোয়নি, বিজ্ঞান মানুষের জীবনের অনেক বাহ্যিক চাহিদা মেটালেও, তার বিশ্বকে সুদূর প্রসারী করলেও মানুষের অন্তরকে সেই বিশালতা দান করতে পারেনি। বিজ্ঞান মানুষকে বিজ্ঞানভোগী করেছে, বিজ্ঞানমনস্ক করেনি। আর এই কথাটা অধিকাংশ মানুষের জন্যই সত্য। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফল ভোগ করেছে মূলত বৃহৎ পুঁজি। সাধারণ মানুষ যে কিছুই পাচ্ছে না সেটা ঠিক নয়, তবে এই বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই দেশে দেশে এসেছে উপনিবেশিক শাসন। আজ যে পৃথিবী মারাত্মক সব অস্ত্র সজ্জিত সেটাও তো বিজ্ঞানের কাঁধে ভর করেই। আবার যারা বিজ্ঞানকে স্বীকারই করে না সেই মৌলবাদী শক্তিও বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে পুঁজি করেই চালিয়ে যাচ্ছে তাদের হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম। আমরা যারা নিজেদের আলোকিত মানুষ বলে মনে করি তারাও পিছিয়ে নেই যদিও সেটা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেরা অনুধাবন করতে পারি না। প্রায়ই বৃহৎ পুঁজির প্রোপ্যাগান্ডায় অন্ধের মত তাদের অনুসরণ করি। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটার ২০০০ সালকে ১৯০০ মনে করে বিশাল বিপর্যয় ঘটাতে পারে সেই ক্যাম্পেইনের করা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আসলে আমরা নিজেদের সার্বিকভাবে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে পারিনি বলেই বিজ্ঞানে প্রতিনিয়ত এগিয়ে গিয়েও মানুষের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারিনি। উল্টা বলা যায় আমরা প্রতিনিয়ত পিছিয়ে যাচ্ছি, প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সাথে নানান রকম দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছি। আমার বিশ্বাস এখন যদি পরিবেশ নিয়ে কথা বলি সবাই হাত তুলে সায় জানাবে, অথচ কোন কথা আমাদের লিবারেল চিন্তার বিপক্ষে গেলেই সবাই

রা রা করে উঠবে। ইদানীং কালে হিড়িক পড়েছে নারী পুরুষের সমান অধিকারের নামে বাবা মার পরিবর্তে প্যারেন্ট ১ আর প্যারেন্ট ২ বলার। কিন্তু প্রশ্ন হল কাউকে তো ১ বা ২ হতে হবে। এক ফ্যামিলিতে বাবা ১ আরেক ফ্যামিলিতে মা ১ হলে তো সমস্যা। আসলে এটা তো অধিকারের প্রশ্ন নয়, ভাষার প্রশ্ন। আমরা যাতে একে অন্যকে বুঝতে পারি তাই ভাষার আবিষ্কার। আবার ইদানীং শুনি অনেক দেশেই আইন করা হচ্ছে শিশুই ঠিক করবে সে ছেলে না মেয়ে। কিন্তু আমাদের কাছে জিজ্ঞেস না করে প্রকৃতি অনেক আগেই সেটা ঠিক করেছে। পরিবেশ দূষণ যেমন প্রকৃতি বিরোধী, আমাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ, আমাদের নিজেদের ঠিক করা কে ছেলে আর কে মেয়ে – সেটাও কি একই রকম প্রকৃতির না হলেও আমাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ নয়? পৃথিবী বা প্রকৃতি আমাদের ছাড়াও টিকে ছিল, টিকে থাকবে। কিন্তু রাজনৈতিক ফ্যাশনের শিকার হয়ে আমরা এ ব্যাপারে মুখ খুলব না। আমরা রাজনৈতিক স্বার্থের কাছে সত্যকে বলি দেব। আর সত্যকেই যদি বলি দেই আমরা তাহলে বিজ্ঞানমনস্ক থাকব কীভাবে? কীভাবে নিজেদের প্রগতির ধারক ও বাহক বলব?

সত্যই যদি ঈশ্বর হন আর সত্যের সন্ধানই যদি বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হয় তাহলে ধর্ম আর বিজ্ঞানে এত শত্রুতা কেন? এই দু'জনার পথ এত ভিন্ন কেন? ধর্ম যদিও ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বভূতে বিদ্যমান মনে করে তবুও কি এক অজ্ঞাত কারণে ধার্মিকরা তাঁকে কেউ মন্দিরে, কেউ মসজিদে, কেউ গির্জা বা অন্য কোন উপাসনালয়ে বন্দী করে রাখতে চায়। মানে ধর্ম তথা ধার্মিক স্বার্থান্বেষী। অন্যদিকে বিজ্ঞান তার আবিষ্কৃত সত্যকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায় আর তাই সে সত্যিকার সত্যান্বেষী। আর সব চাইতে বড় কথা বিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কিছু নেই, ধর্মে আছে। আর ধর্মে শেষ কথা আছে বলেই সে পশ্চাৎগামী। সে ফিরে যেতে চায় তার রাম রাজ্যে, মদিনা সনদে বা অন্য কোথাও। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মুখগামী। সে অনবরত প্রশ্ন করে, জানতে চায়। তার জানার শেষ নেই, শেষ নেই তার জানার আগ্রহের। সবচেয়ে বড় কথা সে জানে প্রতিটি নতুন তথ্য তার সামনে অসংখ্য অজানা তথ্যের দ্বার উন্মুক্ত করবে। তার এই চলা অন্তহীন।

তবে এই দোষে কি শুধু ধার্মিকরাই দোষী? মোটেই না। আসলে ধর্ম মানে শুধু প্রথাগত ধর্ম বিশ্বাস নয়। যেকোনো বিষয়ে, এমনকি বিজ্ঞানে অন্ধবিশ্বাসও বিজ্ঞানকে ঐ ব্যক্তির জন্য ধর্মে পরিণত করে। মনে পড়ে আশির দশকের সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা যখন গরবাচেভ প্রায়ই লেনিনের কাছে ফিরে যাবার কথা বলতেন। কিন্তু সত্যিকার বিজ্ঞানে অন্ধবিশ্বাসের স্থান নেই। এখানে সব কিছুই গ্রহণ করতে হয় প্রশ্নের কষ্টিপাথরে যাচাই করে। আমরা যখনই কোন বিষয়ে, তা সে ধর্ম হোক, বিজ্ঞান হোক, রাজনীতি হোক, সামাজিক রীতিনীতি হোক, প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকি, অন্ধভাবে গ্রহণ করি তখন আমরা বিজ্ঞান থেকে, বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে দূরে সরে আসি। এটা যে সব সময় ক্ষতিকর তা নয়, তবে কোন কিছু যাচাই করে না নিলে ঠকার সম্ভাবনা বেশি।

আমাদের মনে রাখতে হবে একজন বিজ্ঞানীর তার পেশাগত জীবনে যেমন বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া দরকার, তেমনি সেটা দরকার পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনেও। ধরুন একজন প্রগতিশীল মানুষ মিটিং মিছিলে নারী অধিকারের কথা বলে বেড়ায় অথচ নিজের বাড়িতে নারীর প্রাপ্য সম্মান দেয় না, তাকে কি প্রগতিশীল বলা যায়? একইভাবে একজন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রগতিশীল আদর্শের আলো বয়ে বেড়ায় অথচ যখন রাজনীতির প্রশ্ন আসে তখন অন্ধভাবে রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে, আওয়ামী লীগ বা বিএনপিকে সমর্থন করে। তাকে কি আমরা বিজ্ঞানমনস্ক বলব? সে যে কাউকে সমর্থন করতেই পারে, যে কাউকে ভোট দিতেই পারে, এটা তার নাগরিক অধিকার। কিন্তু যে মুহূর্তে সে নিজের পছন্দের দলের প্রার্থীর দুর্বলতা বা প্রতিপক্ষের সবলতা অন্ধভাবে এড়িয়ে যায় সে তখন আর সত্যসন্ধানী থাকে না, স্বার্থান্বেষী হয়। নির্বাচন একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যেখান হারজিতের প্রশ্ন আসে তাই এটি অন্য ব্যাপার। কিন্তু স্বাভাবিক সময়েও যখন মানুষ এভাবেই চলতে বা বলতে থাকে সেটাকে কী বলা যায়? একই ভাবে এটা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখন আমরা প্রায়ই তালিবান, আল কায়েদা, আইএসএস এ সবের সমালোচনা করি। তবে সেটা করার সাথে সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে এর মূলে রয়েছে সভ্য দেশগুলোর পরস্পরের বৈরিতা, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান আক্রমণ, নিজেদের স্বার্থ কায়েম করতে আমেরিকার তালিবান, আল কায়েদা, আই এস এস ইত্যাদি গঠন। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের শুধু আধুনিক সভ্যতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এসবই উপহার দেয়নি, সারা বিশ্বের মানুষের জন্য অনেক দুঃখ কষ্টও নিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের মূল কথা সত্য সন্ধান, সমস্যার সার্বিক সমাধান। বর্তমান বিশ্বে আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তার সমাধানের জন্য আমাদের বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন জাতির গৌরবময় অতীতের সাথে সাথে তাদের রক্তাক্ত ও কলঙ্কময় ইতিহাসও স্মরণ করা দরকার। শুধুমাত্র সবকিছুর নিরপেক্ষ, নিবিড় ও গভীর অনুসন্ধান আমাদের পরম সত্যে পৌঁছে দিতে পারবে।

সত্য কোন ফ্যাশন মেনে চলে না, তার কোন ফ্যাশনের দরকার নেই। কিন্তু আজকাল আমরা প্রায় সবাই ফ্যাশনের পেছনে ছুটি। এখন সারা বিশ্বে নতুন ফ্যাশন – 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার'। এমনকি ফুটবলের মাঠেও। অবশ্য শুধু তারাই নয়, দেশে দেশে নির্যাতিত সব মানুষই তাদের দুর্ভাগ্যের হিস্যা চাইতেই পারে উপনিবেশবাদী শক্তির কাছে। যাদের পূর্বসূরিরা দাস হিসেবে আমেরিকা গড়ে তুলেছে শুধু তারাই নয়, যাদের পূর্বসূরিরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে পশ্চিমা বিশ্বকে উন্নতির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে তারাও হিস্যা চাইতেই পারে। কিন্তু কথাটা হল আজকে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি সেটা সবারই সম্মিলিত চেষ্টার ফসল। পুঁজি আর শ্রমের সম্মিলনে যে সারপ্লাস ভ্যালু গড়ে ওঠে সেখানে যেন আমরা পুঁজির ভুমিকাকেও অবজ্ঞা না করি। আসলে আমার মনে হয় সত্য হল জীবন। জীবনের কোন রং নেই বা বলা যায় সব

জীবনের রঙই এক, যেমনটা রক্তের। তাই সত্যান্বেষী যেকোনো মানুষের মূল শ্লোগান হওয়া উচিৎ ‘শোনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’।

আচ্ছা, পৃথিবীর সবকিছুর মতই সত্যও কি আপেক্ষিক? এর উত্তর হ্যাঁ এবং না দু’টোই। সত্য এক, তবে ব্যাখ্যা দেশে দেশে, যুগে যুগে বদলায়। একজন লোক যখন মারা যায় মৃত্যুটা চরম সত্য। তবে কীভাবে মরল, মানে মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণে বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন সময়ে এই মৃত্যুর বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। কারণ মৃত্যুটা প্রাকৃতিক নিয়ম, এর ব্যাখ্যা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়। আমরা জানি পদার্থবিদ্যার সুত্রগুলো সর্বজনীন, কিন্তু তারপরেও তাদের প্রয়োগ ঘটে স্থানীয়ভাবে। ইনিশিয়াল ও বাউন্ডারি ভ্যালুর উপর নির্ভর করে একই সূত্র বিভিন্ন সমাধান দিতে পারে। তাই যখন আমরা দেশ, কাল, পাত্র, সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন বিবেচনায় না এনে কোথাও ভিন্ন দেশের সফল মডেল আরোপ করতে চাই সেটা অনেক ক্ষেত্রেই বিপর্যয় ডেকে আনে। একজন বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হয়তো তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে এটা রোধ করতে পারবেন না, তবে নিরপেক্ষভাবে সত্যের কথা বলে, সত্য প্রচার করে সে মানুষকে সত্যান্বেষী করে তুলতে পারবে, বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে পারবে, সামাজিক বা গণমাধ্যমে প্রচারিত বিকৃত সত্য সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করতে পারবে, কারণ এসব মাধ্যম মানবতার নামে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থে কথা বলে, মানবজাতির জন্যে নয়। আসুন, সত্যের পাশে দাঁড়াই।

দুবনা, রাশিয়া

ভক্তি মজুমদার

সাহিত্য এবং শিল্প: সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

চারু ও কারু শিল্প, যার আওতাধীন সাহিত্য ও শিল্পকর্ম, - এর সাথে অর্থনীতির সংশ্রব নিয়ে আলোচনার প্রয়াস করছি। সংক্ষেপে, সাহিত্য এবং শিল্পের পরিধিটা জেনে নেয়া যাক। সাহিত্য-এর মধ্যে রয়েছে ছড়া, কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, কাব্য এবং মহাকাব্য। আর শিল্পের মধ্যে পড়ে সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রাঙ্কন, আলোকচিত্র, মৃৎশিল্প, খেলাধূলা এবং অভিনয়। সঙ্গীত শিল্পে আবার বিভক্তি রয়েছে - কণ্ঠ সঙ্গীত এবং যন্ত্র সঙ্গীত। অভিনয়ের আওতায় আসে ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি, নাটক এবং চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র ছাড়া অন্যান্য সব শিল্প মঞ্চে সরাসরি দর্শকদের উপস্থিতিতে পরিবেশন করা যেতে পারে। তবে গণমাধ্যম যেমন রেডিও-টিভিতেও প্রচারিত হয় ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি , গান-নাচ, একক নাটক-নাটিকা, সিরিয়াল নাটক-নাটিকা, ইত্যাদি। চলচ্চিত্র বা ছায়াছবি (সিনেমা) মূলতঃ চলচ্চিত্র শিল্প বা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীর আওতাধীন। এই ইন্ডাষ্টীর অধীনে চলচ্চিত্র নির্মাণকারী বিভিন্ন সংস্থা একটি কাহিনী অবলম্বনে স্বল্পদৈর্ঘ্য বা পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি প্রস্তত করার পর সেটি নিজ নিজ দেশের সেন্সর বোর্ডের অনুমোদনক্রমে দর্শকদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের ছাড়পত্র দেয়।

গীতিকারের প্রণীত গানগুলোকে জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য যেমন সুললিত কন্ঠের অধিকারী গায়ক-গায়িকার দরকার, তেমনি একটি গানকে নৃত্যকলায় উপস্থাপনের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নৃত্যশিল্পী আবশ্যক যারা মঞ্চে বা গণমাধ্যমে তাদের পারদর্শিতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন । যদিও একটি গানের মূল সৃষ্টিকারী তাঁরা নন, তবে পরিবেশনকারী অর্থাৎ 'পারফর্মার' হিসাবে তাদের পরিচিতি স্বীকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। তেমনি একজন সাহিত্যিকের পুঁথিগত উপন্যাস, নাটক বা ছোট গল্প-কে শ্রোতা বা দর্শকদের চিত্তবিনোদনের নিমিত্তে ঢেলে সাজিয়ে মঞ্চে বা প্রেক্ষাগৃহে পরিবেশনের আয়োজন করা হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে রং তুলিতে ঢেলে সাজিয়ে নবরূপে শ্রোতাকুলের শ্রবণমধুকররূপে পরিবেশন করা বা দর্শককুলের দৃষ্টিনন্দন ও চিত্তাকর্ষক করে গড়ে তোলার কাজটিই হল 'পারফরমিং আর্ট'। আর একাজে যারা যুক্ত তাঁদেরকে 'পারফরমিং আর্টিষ্ট' বলা যেতে পারে। একটি কাহিনীর মূল চরিত্রগুলোকে বাস্তবমুখীকরে দর্শকদের কাছে প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করার জন্য সৃজনশীল প্রতিভার

গুণসম্পন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীর যেমন আবশ্যক, তেমনি একজন উদ্যোক্তা এবং পরিচালকের দরকার যিনি গল্পের প্রতিটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়ার দক্ষতা রাখেন। একজন উদ্যোক্তা মূলতঃ এর সার্বিক অর্থায়নের ব্যবস্থা করেন, যাকে একজন চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী বলা যেতে পারে। সৃষ্টিকারীর সৃষ্টি মূলতঃ কাগজে লিপিবদ্ধ অবস্থায় আবদ্ধ থাকে, যাকে সৃষ্টির 'হার্ড ফর্ম' বলা যেতে পারে। পক্ষান্তরে, 'পারফরমিং আর্ট'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পীগণ সেগুলো যখন জনসমক্ষে প্রচারের ব্যবস্থা করেন তখন সেগুলো প্রদর্শনের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যা আর কাগজে থাকে না, আর এই পরিবর্তিত রূপ-কে 'সফট ফর্ম' বলা যেতে পারে। উচ্চমাত্রার তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ফলে যে কোন শিল্পের 'সফট ফর্ম' বর্তমান যুগে ক্ষদ্রাকৃতি ডিস্কে পাওয়া যায়, যা আজ থেকে প্রায় দু-তিন দশক আগে হয়তো কল্পনা করা যেতো না। বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের ফলে সঙ্গীত, নৃত্য, নৃত্যনাট্য এমনকি চলচ্চিত্রও ইউটিউব (YouTube) চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারে অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

শিল্প এবং সাহিত্য সৃষ্টি করার মূলে যে স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা এবং মানবতাবোধ তা অনস্বীকার্য, এবং এর সাথে জড়িত ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য ও বিনয়। সাহিত্য সৃষ্টি ব্যতীত শিল্পের বেশ কয়েকটি বিভাগের অস্তিত্ব কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব, বিশেষ করে ছড়া, কবিতা, গান, মঞ্চনাটক, গণ-মাধ্যম যথা রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিত সিরিয়াল নাটক, বা একক নাটিকা, এবং চলচ্চিত্র শিল্প। প্রতিটি গানের একজন গীতিকার এবং সুরকার থাকেন। কবিগণ অনেক গানের রচয়িতা এবং সুরকারও বটে, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজ্রুল ইসলাম এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। শিল্প ও সাহিত্য কর্মযজ্ঞের বিষয়টি অনেকটাই মনোজগতের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত| অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ মানবকুল তাঁদের মনের ভাবগুলোকে শিল্পে ও সাহিত্যে নান্দনিক রূপ প্রদান করেন, শব্দচয়নের দ্বারা উপস্থাপন করেন ছড়া, কবিতা, গান, নাটক ও সাহিত্যকে| আর এরসাথে রয়েছে মেধা, দক্ষতা, আবেগ-প্রবণতা, কল্পনাশক্তি ও সৃষ্টির ক্ষমতা। তবে জাগতিক বিবিধ ঘটনার ফলশ্রুতিতে লব্ধ অভিজ্ঞতার সাথে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, গীতিকার বা ছড়াকারের সৃষ্টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি কাহিনী বা গল্পের পটভূমি বাস্তবভিত্তিক হলেও, অনিন্দ্যসুন্দর কথামালার দ্বারা সেটির উপস্থাপন সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব সৃজনশীলতার দক্ষতা বা নিপুণতার উপর নির্ভরশীল। আর এই মনোজগতের কল্পনাগুলোকে বাস্তবে রূপদান তথা সৃষ্টি সুখের সাথে যারা জড়িত তাঁদেরকে অবশ্যই জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় এ কাজে নিয়োগ করতে হয়।

সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির মূলধারায় কল্পনাশক্তির প্রস্রবণ বা ফল্গুধারা হলেও এই সৃষ্টির জন্য একটি প্রেক্ষাপট আবশ্যক আর তা মানব জীবনকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র এগুলোর অধিকাংশেরই মূল উপাদেয় বিষয় হল প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালোবাসা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

প্রেক্ষাপটসমূহ। অনেক গানের নেপথ্যে রয়েছে সাহিত্যিকের সৃষ্ট রচনা, যেমন, সর্ববৃহৎ মহাকাব্য মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে কাজী নজরুল রচনা করেছেন তাঁর গান 'হে পার্থসারথি, বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ'। আমরা জানি যে তদানীন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানে, বর্তমান বাংলাদেশ, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করার ফলে সে দেশের আপামর জনগণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে| তার নামকরণ করা হয় '১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন' এবং প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারী-কে 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়| এই বিশেষ দিনটিতে বঙ্গসন্তানেরা নিজেদের বুকের রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন। এরই যুগপৎ ধরে বিগত কয়েক দশক যাবত সারাবিশ্বে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালিত হচ্ছে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেও প্রচুর সাহিত্য, গান, কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে।

এখন দেখা যাক, যারা শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির সাথে যুক্ত আছেন তাঁদের জীবনে অর্থনীতির কী প্রভাব। একজন মানুষের সমস্ত জীবনকালের মোট সময় খুবই সীমিত এবং সময়ের মূল্য কী তা সবার জানা। জাগতিক ঘটনা প্রবাহের লব্ধ অভিজ্ঞতা, মেধা ও সৃজনশীলতার সমন্বয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করে একজন সাহিত্যিক একটি উপন্যাস প্রণয়ন করার পর সেটি যদি কোন একটি প্রকাশক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং তার থেকে সেই উপন্যাসিকের যে পরিমাণ অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, সে অংকটি যখন তাঁর সেই উপন্যাসটিকে অবলম্বন করে একটি চলচ্চিত্র বা টেলিভিশনের জন্য একটি সিরিয়াল নাটক তৈরি করার পর সেটির মূল অভিনেতা-অভিনেত্রী, চলচ্চিত্রের প্রযোজক-পরিচালক যে পরিমাণ অর্থ লাভ করেন তাঁর তুলনায় যে নগণ্য হয়, তা বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয়, একজন শ্রমজীবী বা পেশাজীবী তাঁর কাজের বিনিময়ে তাৎক্ষণিকভাবে মজুরি বা মূল্য পেয়ে থাকেন, অথচ একজন সাহিত্যিক বা শিল্পী তাদের শ্রমের তাৎক্ষনিক মূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশা করতে পারেন না বা আশানুরূপ অর্থপ্রাপ্তি ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ, উপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপদান করার পর সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র শিল্পে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য 'অস্কার' পুরস্কার লাভ করেন। অথচ সেই চলচ্চিত্রের কাহিনীকার রয়ে গেলেন পর্দার আড়ালেই। 'মহাভারত'-মহাকাব্যটি নিয়ে কয়েকটি ভাষায় রচিত হয়েছে চলচ্চিত্র, টিভি সিরিয়াল, ইত্যাদি, এবং তা থেকে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছেন সেটির সাথে যুক্ত উদ্যোক্তাগণ। অথচ এই 'মহাভারত'-মহাকাব্যটির বাংলা অনুবাদ করে প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে গিয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহকে ঋণে জর্জরিত হয়ে অতি অল্প বয়সে দিতে হয়েছে নিজ জীবন।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ এবং একমাত্র মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর জীবদ্দশার শেষভাগে প্রচণ্ড অর্থকষ্টে ছিলেন। এমনকি জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময় দেউলিয়া হয়ে

পড়েছিলেন, অথচ তাঁর প্রপিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন অগাধ সম্পদের মালিক। এরূপ অনেক কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পী হয়তো রয়েছেন যারা সকলের অলক্ষ্যে জীবনের বাঁকে বাঁকে চরম আর্থিক সংকটে পতিত হয়েছেন বা হচ্ছেন যা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি তাঁরা এরূপ দুঃসহ অর্থকষ্টের বিষয়টি পূর্বানুমান করতে পারতেন, তবে সৃষ্টির তাগিদজনিত ভাবাবেগ থেকে সরে এসে হয়তো অর্থ উপার্জনের কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশের প্রয়াস করতে পারতেন।

এখানে প্রশ্ন এই যে, একজন সাহিত্যিক বা শিল্পী তাঁর কাজের বিনিময়ে আর্থিক অনিশ্চয়তা জেনেও কেন নিজেকে এ কাজে নিযুক্ত করেন। বিষয়টি অর্থনীতিবিদদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষনের আঙ্গিকে আলোচনা করা যেতে পারে। মূলতঃ বিষয়টি একজন সাহিত্যিক বা একজন শিল্পীর তাঁর কাজ বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে যুক্ত। সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থনীতিতে ‘Bounded rationality’ নামে ‘Institutional Economics’ বা ‘প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি’-এর অধীনে একটি ধারণা রয়েছে যা একজন মানুষ কি ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়। এর সংজ্ঞা বা ধারণাটি নিম্নরূপ:

> ‘Bounded rationality is the idea that rationality is limited when individuals make decisions. In other words, humans' ‘...preferences are determined by changes in outcomes relative to a certain reference level...’ as stated by Esther-Mirjam Sent (2018)[1] Limitations include the difficulty of the problem requiring a decision, the cognitive capability of the mind, and the time available to make the decision. Decision-makers, in this view, act as satisficers, seeking a satisfactory solution, rather than an optimal solution. Therefore, humans do not undertake a full cost-benefit analysis to determine the optimal decision, but rather, choose an option that fulfils their adequacy criteria.[2]
>
> Recent research has shown that bounded rationality of individuals may influence the topology of the social networks that evolve among them. In particular, Kasthurirathna and Piraveenan[24] have shown that in socio-ecological systems, the drive towards improved rationality on average might be an evolutionary reason for the emergence of scale-free properties. They did this by simulating a number of strategic games on an *initially random network with distributed bounded rationality, then re-wiring the network so that the network on average converged towards Nash equilibria, despite the bounded rationality of nodes. They observed that this re-wiring process results in scale-free networks. Since scale-free networks are ubiquitous in social systems, the link between bounded rationality distributions and social structure is an important one in explaining social*

phenomena। *[Kasthurirathna, Dharshana; Piraveenan, Mahendra (2015-06-11). 'Emergence of scale-free characteristics in socio-ecological systems with bounded rationality'. Scientific Reports. **5** (1): 10448.*

'স্যাটিসফেকশন' - এর সরাসরি বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় 'আত্মতুষ্টি'। অর্থাৎ, এই আত্মতুষ্টির সাথে পরমাত্মার নিবিড় সম্পর্ক। যেমন, একজন মানুষ অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে প্রচুর জাগতিক ভোগ-বিলাস সামগ্রী ক্রয় করে সেগুলো ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু বিলাস-সামগ্রীগুলোর সাথে প্রকৃত আত্মতুষ্টির সংশ্লেষ হয়তো নিতান্তই নগণ্য। তবে, সাহিত্য বা শিল্পকর্মের সৃষ্টির সাথে আত্মার প্রশান্তি এবং অন্তরের দাবিই মূখ্য। যিনি শিল্প বা সাহিত্য সৃষ্টি করেন তিনি তা তাঁর মনের আনন্দের ফল্গুধারা, আবেগের প্রস্রবণে সাড়া দিয়ে তাঁর সৃষ্টির ক্ষমতার প্রকাশ ঘটান। এটি এমনি একটি মননশীলতার বিষয় যা কেউ ইচ্ছা করলেই সৃষ্টি করতে পারেন না, বা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে পারেন না যে সৃষ্টির সাথে আত্মতুষ্টির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক এবং যা কড়ির মূল্যায়নের ঊর্ধ্বে।

উপরের নব্য বাউন্ডেড র‍্যাশান্যালিটি তত্ত্বে এটা লক্ষ্যনীয় যে, একজন ব্যক্তির, বাউন্ডেড র‍্যাশান্যালিটি-এর ভিত্তিতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অনেকাংশে, তার সামাজিক নেটওয়ার্ক বা পারিপার্শিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, অস্কার পুরস্কার বিজয়ী সত্যজিৎ রায় শিশুকালে পিতৃহারা হওয়ার পর তাঁর মাতা সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে তাঁর মামাবাড়িতে আশ্রয় নেন। সত্যজিৎ রায় ছেলেবেলায় তাঁর মামাদের বিভিন্ন ক্যামেরা নিয়ে কাজ করতে দেখেছেন। সে থেকে ওঁনার মনে সাধ জাগে ক্যামেরা নিয়ে কাজ করতে। পরিশেষে তিনি চলচ্চিত্র জগতের পরিচালকের কাজে নিজের মনের চাহিদা পূরণ এবং আত্মতুষ্টি লাভ ছাড়াও বিশ্বে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন।

উল্লেখ্য, প্রতিটি মানুষের জীবন প্রবাহে ব্যক্তিগত বা ঐহিক সুখ ভোগে, পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদন লাভে, বস্তুগত বিলাসদ্রব্যাদি উপভোগে ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে অর্থ একটি সুবিশাল ভূমিকা পালন করে। অর্থ ছাড়া এসব পার্থিব ভোগ-বিলাস, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সন্মাননা প্রাপ্তি অনেকাংশে প্রায় অসম্ভব। সুতরাং, একজন কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার বা শিল্পী তাঁদের যে অমূল্য সম্পদ সময় পরার্থে ব্যয় করেন, তাঁর সঠিক মূল্য বা মূল্যায়ন কী একটি জাতি বা দেশ কী করতে পারে? গুনীজনেরা কী তাঁদের সৃষ্ট কর্মের প্রাপ্য সন্মাননা সব সময় পেয়ে থাকেন? সুধী পাঠকদের উপরেই তা বিশ্লেষণের ভার রইলো। তাঁরা যদি তাঁদের এই অসামান্য প্রতিভা এবং মূল্যবান সময় যথার্থ উপায়ে অর্থ উপার্জনের শিল্প বা 'art of moneymaking' যা 'পারফরমিং আর্ট'-এর পিছনে প্রয়োগ করতেন, তাতে তাঁরা কিরূপ লাভবান হতেন তা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে এটাও সত্য যে অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পীদের অনেকেই সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, উইলিয়াম সেক্সপীয়ার, কবি কাজী নজরুল, ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর, পন্ডিত রবিশঙ্কর, পন্ডিত

ভীমসেন যোশী, হুমায়ূন আহমেদ, মাইকেল মধুসূদন, প্রমুখ। তবে এই সুবিশাল খাতে নিয়োজিত জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিতদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

এই শিল্পের গুণীজনেরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক কষ্টের মুখোমুখি হলেও, অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করলেও, সামগ্রিক কল্যাণ অর্থনীতির বিচারে তাঁদের অবদান অপরিসীম, যা অর্থের মানদণ্ডে নিরূপণের উর্ধ্বে। কবি কবিতা, গান ইত্যাদি রচনা করেছেন বলেই, ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখে রেখে গেছেন বলেই, নাট্যকার নাটক উপহার দিয়েছেন বলেই, চিত্রকর চিত্র অঙ্কন করেছেন বলেই, সঙ্গীতশিল্পী দরদ দিয়ে গান পরিবেশন করেছেন বলেই আপামর জনগণ আজীবন সৃষ্টির সে অগাধ সম্পদ ভাণ্ডার উপভোগ করার প্রশস্ত সুযোগ পাচ্ছেন। আর গুনীজনের এ সৃষ্টি সাধারণের অমূল্য জ্ঞান আহরণে, মানবিক উৎকর্ষতা বিধানে, প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনের অসাবলীল পথে আত্ম-নিয়ন্ত্রণে, দ্বন্ধ-বিষাদে ধৈর্য-ধারণে, সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে, রিপু দমনে, চিত্তের অবসাদ দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তেই অপরিসীম অবদান রেখে যাচ্ছে, যা শুধুমাত্র ব্যক্তি পর্যায়েই নয়, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এই অবদানকে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে মূল্যায়ন অসম্ভব। এ যেন বহতা নদীর মতো যা মানব কল্যাণে অবিরত সুমিষ্ট জল-ধারা কেবল দিয়েই চলেছে প্রতিদানে কিছুই না চেয়ে। কারণ এ শিল্প মানব মননে, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক শ্রবণ বয়ে আনে সুখ ও শান্তির প্রস্রবণ। আত্বঃসম্বরণ ধৈর্য-ধারণ, জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণের প্রজ্ঞা একটি দেশ ও জাতিকে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন-যাপনে, ন্যায়-অন্যায় বিচারে, সমাজে শৃংখলাবোধ জাগাতে এবং একটি প্রগতিশীল শান্তিপূর্ণ দেশ ও জাতি গঠনে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। হে কবি, হে শিল্পী, হে মহাজ্ঞানী, তোমারে করি গো প্রণাম। এজন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'বিদ্বান সর্বতঃ প্রজ্যতে'।

এ্যাবার্ডিন, যুক্তরাজ্য

মুসলেমা পারভিন

নির্বাসিত জীবনের দিনলিপি

১

শহরের নামটা কেমন খটমটে, কার্বনডেল। এই শহরেই থাকতে যাচ্ছি কতদিনের জন্য কে জানে! বাড়ি ছেড়ে এই প্রথম বেরিয়ে আসা - উচ্চশিক্ষা। শুনতে যতই আহামরি শোনাক না কেন এই মুহূর্তে সবকিছু ছেঁড়েছুড়ে দিয়ে ওই একটা শব্দের পিছনে ছুটে আসাটা বিরাট কিছু মনে হওয়া তো দূরের কথা, অর্থহীন মনে হচ্ছে। এমন কি জীবনে সব মায়ামমতার বন্ধন কাটিয়ে পড়াশোনা করার মত মহান উদ্দেশ্যকে কোন সুস্থচিন্তার ফসল বলেও মনে হচ্ছে না! যাই হোক, গন্তব্য প্রায় এসে গেছে, ম্যারিয়ন এয়ারপোর্ট। ওখানে কেউ একজন থাকবে আশা করছি। ওপর থেকে কেবল ঘন সবুজ বন দেখা যাচ্ছে, মিসিসিপি নদীকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি। কিন্তু এ তো কেবল জঙ্গল - crowded city ফেলে এ কোন জঙ্গলে এসে পড়লাম রে বাবা! এখানে কি লোকজন থাকে, থাকতে পারে? বাড়ির আশেপাশের জঙ্গলে বাঘ ভালুক ঘোরাফেরা করবে নাতো আবার! কে জানে কী আছে ভবিষ্যতের কুঠুরিতে!

২

পাখীর মত ছোট (২০ সিট) প্লেনটা ততোধিক ছোট ম্যারিয়ন এয়ারপোর্টে এসে থামল বিকেল পাঁচটার দিকে। সকাল বেলা নিউইয়র্ক থেকে রওনা হবার পর কেবল শিমুর বক্সে করে দেয়া নুডুলস খেয়েছি সেইন্ট লুইস এয়ারপোর্টে বসে। পেটে ছুঁচোর ডাক, কিন্তু সেটা ছাপিয়ে চরম অনিশ্চয়তা– যে ভদ্রলোকের পিক করতে আসার কথা তিনি আসবেনতো! তখন সেল ফোনের যুগ না। কার্ড ফোনের যুগ, কিন্তু আমি সেটাও ব্যবহার করতে জানিনা। জানলেও লাভ হত না কারণ আমার কাছে উনার ফোন নাম্বার ছিলনা। যাহোক, দেখলাম আরেকটি মেয়ে, সেও নতুন ছাত্রী, অপেক্ষা করছে। টুকটাক কথা বলতে বলতে অপেক্ষা করছিলাম, একসময় সেই ভলান্টিয়ার ভদ্রলোক এলেন। আমাদেরকে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবার জন্য ইউনিভার্সিটি তাকে পাঠিয়েছে। আমাদের দুজনের বাকসো পেটরা তুলে, উনি ড্রাইভ শুরু করলেন। খুব দূরে নয়, মিনিট

পনেরোর পথ। গাড়িতে তিনি জানালেন আমাদের কোন আপত্তি না থাকলে উনার বাড়িতে ডিনার করতে পারি। ইন ফ্যাক্ট উনার স্ত্রী রান্না করেছেন আমাদের জন্য। আমরা দুজনই এক মুহূর্ত দেরি না করে রাজি হয়ে গেলাম। সারাদিন প্রায় অভুক্ত, 'আরেকবার সাধিলেই খাইব টাইপ' সৌজন্য দেখানোর কোনই অবকাশ ছিলনা। যাহোক, উনার বাড়িতে গেলাম। তেমন কিছু মনে নেই। ফ্রেশ হয়ে এসে টেবিলে বসলাম। টেবিলে একটা বেকড ডিস (অচেনা) আর সালাদ। উনি জানতে চাইলেন আমাদের চিকেন খেতে আপত্তি নাই তো! তখন সম্মুখে যা পাই তাই খাই অবস্থা, আবার আপত্তি! যাহোক, ডিস টা ছিল চিকেন ক্যাসারোল। আমি ভাবলাম ওটা মনে হয় স্টার্টার, মূল খাবার আসবে পরে। একটু পর বুঝলাম ওইটাই ডিনার, সাথে সালাদ। আমি আসলে ভেতো বাঙালী, খালি পেটে প্রচন্ড ক্ষুধা থাকলেও খেতে তেমন পারলাম না। সালাদ দিয়ে পুষিয়ে নেবার চেস্টা করলাম। খাবার পর চা অফার করল, আমার মন খুশীতে নেচে উঠল! কিছুক্ষণ পর ঝকঝকে কাঁচের জগে বরফে সুসজ্জিত চা আসল! আমি ওই চা হাতে নিয়েছিলাম কিনা মনে নাই। তবে জন্মের শিক্ষা হয়ে গেছিল, অ্যামেরিকানরা চা বলতে আইস টি বোঝায়, জ্বাল দেয়া দুধ চা না। ওই দেখতে অতীব সুন্দর কিন্তু খেতে কী বলব জঘন্য তরল পদার্থটি আমি এই একুশ বছরেও খেতে পারি নাই। কত সহস্র দিন রাত্রি পার হল আটলান্টিকের এপারের দেশটায়, আমার আজও প্রিয় পানীয় ঘনদুধের চা।

৩

ইলিনয় অ্যামেরিকার সেন্ট্রাল টাইম জোনে। অগাস্ট মাস যদিও সামারের শেষ তবু দীর্ঘ দিন। সূর্য ডুবতে ডুবতে সাড়ে আটটা/ন'টা বেজে যায়। যেই ভদ্রলোক পিক করে ডিনার করালেন তার বাসায় ডিনারের পর গল্প চলতে থাকল, ক্লান্তি আর ঘুমে ঢলে পড়তে পড়তে আমি কোনভাবে চোখ মেলে রাখছিলাম, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছিলাম একই সাথে ঘড়িতেও। সূর্য কেন ডুবছেনা সেই ভাবনা উঁকি দিচ্ছিল, আর ভাবছিলাম কোথাও কোন বিছানা পেলে গা এলিয়ে দিতে দুই মিনিট ও দেরি করতাম না। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রলোককে তো বলা যায়না, ভাই গাল গল্প করার মত শক্তি নাই আর, দয়া করে যেখানে পৌঁছানোর পৌঁছে দিলে ধন্য হই! যদিও জানিনা কোথায় কি থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আমি কোন এপার্টমেন্ট ঠিক করে আসি নাই। ফরেস্ট হল বলে একটা ডর্মেটরি মত আবাসন নতুন ছাত্রছাত্রীদের দুই রাত ফ্রি থাকতে দেয়। ওদেরকে ইমেইল করে দুরাত থাকার জন্য রুম বুকিং দিয়েছিলাম। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক বললেন 'চলুন উঠা যাক'! আমি বারবার ভদ্রলোক বলতে খুব খারাপ বোধ করছি, কিন্তু আমি উনার নাম অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারছি না। কেবল মনে আছে উনি একটা চার্চে কাজ করতেন। আমরা আবার গাড়িতে উঠলাম, এবার সেই দেবদূতের মত ভদ্রলোক আমাদেরকে গ্রোসারিতে নিয়ে যাবার অফার দিলেন ফরেস্ট হলে পৌঁছে দেবার আগে। শরীর যদিও আর চলতে চাইছিল না তবু এই অফার ফিরিয়ে দেবার মত বোকা ছিলাম না। উনি আমাদের নিয়ে গেলেন ওয়ালমার্টে । ওটা

১৯৯৯ সাল। আমি অ্যামেরিকা আসার আগে কেবল সুপার মার্কেট শব্দটার সাথে পরিচিত ছিলাম কিন্তু তা কি জিনিস সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলনা। ওয়ালমার্টে ঢুকে সত্যি বলতে কি আমার মাথা ঘুরে গেলো। বিশাল কমপ্লেক্স, তিন তলা সমান উঁচু। পাওয়া যায় না হেন জিনিস ইহজগতে নেই, মাছ-মাংস, শাকসবজি, চালডাল, ওষুধপত্র, কাপড়চোপড়, সুঁইসুতো, থেকে শুরু করে সাইকেল, নৌকা সব ওই এক সুপারমার্কেটে আছে! কোনরকমে নিজেকে ধাতস্থ করলাম। ভদ্রলোক জানতে চাইলেন কি কি কিনতে চাই জানালে উনি খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন। অন্য মেয়েটা ছিল জাপানের, সে একটা কার্ট নিয়ে নিজের মত বাজার করতে শুরু করে দিয়েছিল। দ্রুত ভেবে নিয়ে মনে মনে লিস্ট করে ফেললাম, ব্রেড, দুধ, বাটার, চিনি, চা, চীজ ...... জানালাম উনাকে এক এক করে। আর আমার দুরবস্থার তখন কেবল শুরু। আমি বলি ব্রেড, ভদ্রলোক আমাকে ব্রেড এর আইলে নিয়ে গিয়ে বলল, 'What kind of bread?'! আমার পালটা প্রশ্ন 'মানে কি'? উত্তর আসল, 'Wheat, white, brown, whole grain, rye ......'। আমার মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবার অবস্হা, কয় কি! আবার জিগ্যেস করলাম, উনি আবার বললেন! আমি কিছুই বুঝলাম না! শেষে বললাম কোনটা কি দেখিয়ে বল, উনি দেখালেন। সাদা পাউরুটি দেখতে পরিচিত মনে হল, নিলাম। তারপর বাটার, একই প্রশ্ন 'What kind of butter?', আমার উত্তর 'মানে কি'! উত্তর 'সল্টেড, আনসল্টেড, ...'। কোনটা কিনেছিলাম আজ আর মনে নেই। তারপর আসল দুধ, 'What kind of milk?' আমার উত্তর 'মানে কি', উনার উত্তর 'Whole milk, 2%, fat free, lactose free, soy milk......'। উনি বলে যাচ্ছেন কিন্তু আমি কিছুই বুঝিনা আগামাথা, কেবল পরিচিত শব্দ খুঁজি। হোলমিল্ক বুঝতে পারলাম বাকি কিছু না বুঝলেও। চা আর চীজেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল। শেষে আসল চিনি। আমি ভাবলাম এইবার আর জটিলতা হবে না! গেলাম চিনির আইলে চিনি তুলতে, আমার মাথা পুরা খারাপ করে দিয়ে সেই একই প্রশ্ন, 'What kind of sugar?'। আমি মনে মনে ভাবি 'not again! Not with sugar!' আমি চোখ আকাশে তুলে জিগ্যেস করলাম চিনির ও আবার রকমফের আছে! ভদ্রলোক বলতে থাকলেন, 'brown sugar, beat sugar, cane sugar, granulated sugar........'। আর আমার অবস্থা 'ছাইড়া দে মা কাইন্দা বাঁচি'।

৪

তের তারিখ, রবিবার সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙলো বহুক্ষণ বুঝতে পারছিলাম না আমি কোথায়! জানালার ব্লাইন্ড ভেদ করে আলো ঢুকছিল তাই বোঝা গেল দিনের বেলা। আরেকটু ভালো করে চোখ মেলে আস্তে আস্তে বুঝতে চেষ্টা করলাম, আমি কোথায়, কেন! যেখানে ঘুমিয়েছিলাম সেই ছোট খাটের দিকে তাকালাম, বিছানার চাদর নেই, বালিশে কাভার নেই। শীমু ঠেসেঠুসে আমার সুটকেসে একটা কম্ফর্টার ঢুকিয়ে দেয়াতে গায়ে দেবার কিছু ছিল। একটু একটু করে মনে পড়ল, আমি ফরেস্ট হলের একটা রুমে,

গত রাতে এসেছি। অনেক রাতে এসে সুটকেস খুলে কেবল বালিশ আর লেপ বার করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঢাকা থেকে বিছানার চাদর এনেছিলাম কিন্তু খোঁজার ঝামেলায় যাইনি। ওই রবিবার সকালে চাদরহীন বিছানায় উঠে বসে কোথায়, কেন ভাবতে গিয়ে আমার সমস্ত জীবন যেন সামনে চলে এল। অ্যামেরিকা পৌঁছানোর দুদিন পর আমি উপলব্ধি করলাম বাবা, মা, পরিবার থেকে কতদূর চলে এসেছি। মাথার উপর আব্বার যে বটবৃক্ষের মত ছায়া থাকত আর আম্মার যে আশ্রয়, প্রশ্রয় তার থেকে সহস্র কোটি আলোকবর্ষ দূরে চলে এসেছি। হঠাৎ করে মনে হল আমি ডুবে যাচ্ছি চোরাবালিতে, আমাকে টেনে তোলার মত কোন হাত আর নেই। সেই দিন থেকে আমার আমির সমস্ত দায়িত্ব আমার একাই বইতে হবে। কেমন একটা পাঁজরের হাড় গুঁড়ো করে দেবার মত কষ্ট। ওইরকম কষ্ট, ওইরকম হাহাকার আমি আর কোনদিন অনুভব করিনি। উঠে নাস্তা করার কথা মনে হলনা, ধ্বংসস্তপের মত বিছানায় বসে রইলাম। আর অতীতের গলিঘুপচি হাতড়ে খোঁজার চেষ্টা করছিলাম কবে, কোন কুক্ষণে বিদেশ বিভুঁয়ে পিএইচডি করার দূরভিসন্ধি মাথায় আসছিল! ওই মুহূর্তটা আবার আমাকে দখল করে নিচ্ছে, লেখা আর এগুবে না এখন!

৫

ভাঙাচোড়া নিজেকে কোনরকমে গুছিয়ে নিয়ে নাসতা করলাম। চিনি দেয়া দুধে ভিজিয়ে দুই পিস পাউরুটি। মনে পড়ে বেশ অনেকদিন আমি মূলত দুধ-পাউরুটিই খেতাম। ঝামেলা ছাড়া খাবার। রুমে রেফ্রিজারেটর আর লাগোয়া বাথরুম ছিল। কিন্তু কোন কিচেন এমন কি মাইক্রোওয়েভ ছিলনা। চা বানানোর উপায় ছিলনা। খেয়ে ভাবতে শুরু করলাম, এখন কি করব! ওই দিনের মাঝে আমাকে থাকার জায়গা বের করতে হবে। বাংলাদেশি দু'চারজন ছাত্র আছে, আমি ইমেইল করে আমার আসার তারিখ জানিয়েছিলাম। তাদের মাঝে একজনের জবাব পেয়েছি যে তিনি শহরের বাইরে। আর যে জানে আমার কথা, সেই ফখরুল, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় মাস্টারস করে আমার একবছর আগে এসেছে। কিন্তু ও নিজে থেকে যোগাযোগ না করলে আমার করার উপায় নেই। রুমে কোন ফোন নেই। রবিবার বলে কমপ্লেক্সের অফিস বন্ধ। আমার বন্ধু শীমু বুদ্ধি করে ফোন কার্ড দিয়েছে সাথে। নীচে নামলাম কার্ড ব্যবহার করে ফখরুলকে ফোন করার জন্য। 'পোড়া কপাল' আর এতটাই নির্বোধ ছিলাম যে আধ ঘন্টা চেষ্টা করেও কার্ড দিয়ে কি করে ফোন করতে হয় বুঝতে পারলাম না। পুরো বিল্ডিং মনে হল জনমানব শূণ্য, কাউকে যে জিগ্যেস করব তেমন কাউকে পেলাম না লবি তে বসে থেকে। রুমে ফিরে গেলাম বিদ্ধস্ত মনে। ফখরুল শেষ পর্যন্ত এল নিজে থেকেই। আমার খোঁজখবর নিয়ে তারপর ওর বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা বলল, গরুর মাংস আর ভাত খেতে চাইলে। আমার মনে হয় ওইদিন দুপুরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গরুর ভুনা দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম। যাহোক, ওর এপার্টমেন্ট কতদূর জিগ্যেস করাতে জানলাম যে তা হেঁটে মিনিট পনেরর পথ। ওর তখন গাড়ি ছিলনা। হেঁটে রওনা দিলাম ফখরুলের

সাথে। ফখরুল দেখতে ছোটখাট কিন্তু হাঁটতে পারঙ্গম। আমি তো দৌঁড়ে হেঁটেও ওর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছিলাম না। পেছন পেছন বন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে ওর এপার্টমেন্টে পৌঁছালাম। খেলাম অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে। সাইফ ভাই কে ফোন করলাম ফখরুলের থেকে নাম্বার নিয়ে। উনার গাড়ি আছে, আমাকে বাড়ি খুঁজতে নিয়ে যেতে পারবেন।

আমি আসার আগে দু'একজনকে জিগ্যেস করেছিলাম আমার প্রাথমিক খরচ মানে বাড়ি ভাড়া নেয়া সহ টুকটাক খরচ আর মাস দেড়েকের বাজার সদাই, কি পরিমাণ লাগতে পারে। প্রায় তিন হাজার ডলারের মত লাগবে বলে জেনেছিলাম। আমি জানতাম আব্বা অতটা দিতে পারবেন না। হয়ত হাজার দেড়েক দিতে পারতেন কিন্তু আমি অতটাও চাইতে পারি নাই। মনে হয়েছিল কাজটা স্বার্থপরের মত হবে। আমি সাকুল্যে এক হাজার ডলার সাথে এনেছিলাম। সাইফ ভাই আমাকে সাথে নিয়ে বাড়ি খুঁজতে বের হলেন। বাড়ির লিজ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কথা উনিই বলছিলেন। সমস্যা হল সব বাড়ি লিজ নিতে দুই মাসের ভাড়া অগ্রিম আর ডিপোজিট দিতে হয়। আমি সেটা দিতে গেলে আমার হাতে কিছু থাকেনা চাল ডাল কেনার জন্য বেতন পাবার আগে পর্যন্ত। আমরা একের পর এক বাড়ি খুঁজে চললাম। ভাগ্য কোন সহায়তা করল না। সাইফ ভাই অসহায় বোধ করতে লাগলেন কিছু উপায় করতে না পেরে। এমন কি বললেন আমি চাইলে কারো থেকে ধার নেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমার মন সায় দিল না। পাঁচ সাতটা বাড়ি দেখার পর ভাবলাম যেই ফরেস্ট হল এ উঠেছি সেইখানে চেষ্টা করে দেখি অগ্রিম ছাড়া রুম দেয় কিনা! গেলাম ওদের অফিসে। এবার সাইফ ভাই মিরাকল করে ফেললেন। আমার ইউনিভার্সিটির টিচিং অ্যাসিসট্যান্টশিপের কথা বললেন, বেতন কবে পাব ইত্যাদি আর কি কি বলেছিলেন আমার মনে ও নেই। তবে লিজিং এজেন্ট আমাকে এক পয়সা অগ্রিম ছাড়া রুম দিতে রাজি হয়ে গেল। শুধু বলল আমার টি.এ. কনট্রাক্ট পেপারের একটা কপি জমা দিতে। আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। মাথার উপর একটা ছাদ অন্তত পাওয়া গেল। যদিও সাথে কিচেন নেই, রান্না করতে হবে তিনতলা থেকে একতলায় নেমে কমন কিচেনে। তবু তো নিজের একটা আবাস হল! নিজের একটা আবাস, আহা, নিজের আবাস!

কালামাজু, মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র

রিটন খান

পড়তে শেখার গল্প

আমরা যখন কোনো বই পড়তে বসি কিংবা পত্রপত্রিকার পাতা উল্টাই, অথবা মোবাইলে কোনো মেসেজ পড়ি – কখনো কি আমরা ভেবেছি যে আমাদের পড়ার ক্ষমতা কতটা বিস্ময়কর? কেন, কোন ভাবে পৃষ্ঠার বা স্ক্রিনের উপরের ছোটো ছোটো সারিবদ্ধ লাইনগুলো বিস্ময়করভাবে শব্দ বা বাক্য তৈরি করে জীবন্ত হয়ে ওঠে? কিভাবে আমাদের মস্তিষ্ক এই সক্ষমতা অর্জন করল?

বই পড়া ও পড়ানোর ইচ্ছা থেকে আমাকে অনেক ধরনের বই পড়তে হয়ছে। সেসব বই থেকে নির্যাসিত কিছু তথ্য আজ এখানে লেখার চেষ্টা করছি। মানব ইতিহাস, বিবর্তন ও মনোবিজ্ঞানের আলোকে মানুষের প্রথম পড়তে শেখার মজার গল্প, কিভাবে পাঠাভ্যাস আমাদের মস্তিষ্কের পুনর্গঠনে কাজ করে, এবং কেন কিছু মানুষ পড়া শিখতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ে?

মানুষ হিসাবে পাঠের সক্ষমতা আমাদের বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং মানুষ যখন লিখতে শুরু করেছিল তখন আমাদের মস্তিষ্ক পাঠ-সক্ষমতা অর্জনের জন্য নিজেকে নতুন ভাবে তৈরি করে তোলা শুরু করে। মানুষের পঠনপাঠনের ইতিহাস অনেক প্রাচীন এবং জটিল। তবে এটুকু নিশ্চিত যে আমাদের মস্তিষ্ক তখনই পড়তে শিখেছে যখন আমরা লিখতে শিখেছি।

অবশ্য মানুষ প্রথম কবে লিখতে শুরু করেছে সেটা ইতিহাসে সুনির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে বোঝা যায় যে কোনো নির্দিষ্ট ভাষার শব্দ বিভিন্ন বর্ণ দিয়ে লিখে প্রকাশ করার জন্য বর্ণমালা আবিষ্কারের বহু আগেই মানুষ চিহ্ন এঁকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ধারণ করত।

প্রাচীন উদাহরণগুলির অন্যতম একটি দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লম্বোস গুহায় পাওয়া যায়। সেখানে নৃতাত্ত্বিকরা কতগুলো ক্রসটানা দাগ খোদিত পাথর আবিষ্কার করেন যা মনে করা হয় আশি হাজার বছর পুরাতন। এক্ষেত্রে খোদিত দাগের অর্থ উদ্ধার করা না গেলেও মানব সভ্যতার শুরুর দিকে অর্থনৈতিক বিনিময় টুকে রাখার জন্য অনুরূপ চিহ্ন-খোদিত পাথর, মাটির দলা, শামুক প্রভৃতি ব্যবহার করত। তাই এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ব্লম্বোস গুহায় আবিষ্কৃত পাথরের গায়ের দাগগুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে আঁচড়ানো নয়, এর অর্থ আছে।

বিমূর্ত প্রতীক ব্যবহার করে কোনো বিষয়কে উপস্থাপন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ধারণ করে রাখার এই বুদ্ধিমত্তা ছিল মানব সভ্যতার বৈপ্লবিক আবিষ্কার। এতটাই বৈপ্লবিক যে এর ফলে আমাদের মস্তিষ্কের বড়ো ধরনের পরিবর্তন আসে।

আমাদের মস্তিষ্ক কোটি কোটি স্নায়ু কোষ ও নিউরন দিয়ে গঠিত। আমরা সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করি তার উপর ভিত্তি করে এই নিউরনের রয়েছে নিজেদের পুনর্বিন্যাস ও নতুন সক্ষমতা তৈরির বিস্ময়কর ক্ষমতা। বিজ্ঞানীরা এই অনন্যসাধারণ ক্ষমতার নাম দিয়েছেন 'neural plasticity'।

যখন মানুষ প্রথম পড়তে শিখল তখন তাদের মস্তিষ্কের নতুন ধরনের স্নায়বিক পথ তৈরি হলো যা তাদের দ্রুত গতিতে জটিল সব প্রতীক সনাক্ত এবং অর্থ উদ্ধারে সাহায্য করল।

একবার ভাবুন ছোটবেলায় পড়া শেখার বিষয়টি, তাহলে আপনি সেই রূপান্তরের কাজটি কতটা শক্তিশালী হতে পারে তা অনুধাবন করে বিস্মিত হবেন। মুদ্রিত এই অদ্ভুত চিহ্নগুলি পাঠের দক্ষতা এতটাই স্বতস্ফূর্ত হয়ে উঠে যে সামনের শব্দগুলি পড়তে হয় না, মস্তিস্ক এমনি বুঝে ফেলে।

স্নায়ুবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, আমরা যখন অক্ষরের মতো অপরিচিত চিত্রের দিকে তাকাই, তখন আমরা কেবল আমাদের মস্তিষ্কের পিছনে অবস্থিত ভিজুয়াল অঞ্চলের একটি সামান্য অংশ সক্রিয় করি। তবে আমরা যখন আমাদের পরিচিত বর্ণগুলো দেখি, তখন আমাদের মস্তিষ্কের সক্রিয়তা প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়। এটি কেবলমাত্র আমাদের চাক্ষুষ ক্ষেত্রগুলিকেই সক্রিয় করে তোলে না, মস্তিষ্কের যে অংশ ভাষাশিক্ষা, শ্রবণশক্তি এবং বিমূর্ত ধারণার জন্য বিশেষভাবে নিয়িজিত সেই অংশকে আরো কার্যকরী করে তোলে।

আমাদের পূর্বপুরুষরা পড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মস্তিষ্কে প্রথম তৈরি হওয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নতুন সংযোগটি হল মস্তিষ্কের পেছনের অংশ – angular gyrus – যেটি মানুষের যোগাযোগের কাজে এবং মস্তিষ্কের যে অঞ্চলগুলো বস্তুর পরিচিতি নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরিতে নিয়োজিত। এই নিউরোনাল ব্রেকথ্রুটি প্রথম দিককার কয়েকটি জটিল লিখন-পদ্ধতির ভিত্তি।

প্রথম বর্ণমালা আবিষ্কার

আমরা জানি যে বিশ্বের মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অঞ্চলে লেখার কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি লিখন-ব্যবস্থা হলো সুমেরীয় কিউনিফর্ম – কীলক বা ছোট্ট তীরের মতো সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে লিখন-পদ্ধতি যা দেখতে অনেকটা পাখির পায়ের ছাপের মতো দেখায় – এবং মিশরীয় চিত্রলিখন-পদ্ধতি বা হায়ারোগ্লিফ। এ'দুটি লিখন-পদ্ধতি ৩২০০ খ্রিস্টপূর্বে

মেসোপটেমিয়া (বর্তমানের ইরাক) এবং প্রাচীন মিশরে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে উদ্ভাবিত হয়েছিল।

উভয় পদ্ধতি প্রশাসনিক এবং হিসাবের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত। শুরুতে সেগুলো ছিল চিত্রানুকৃতি অর্থাৎ প্রতীকগুলি প্রায়শই তাদের উপস্থাপিত জিনিসের অনুরূপ হতো। যেমন 'বাড়ি' মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ অক্ষরটি উপর থেকে প্রাচীন মিশরীয় বাড়ির মতো আঁকা হতো – যেন দেবতারা সেটি দেখতে পান। এই চিত্রগুলি দ্রুত বোঝার জন্য আমাদের মস্তিষ্ককে ভিজ্যুয়াল ও ভিজ্যুয়াল সংক্রান্ত অঞ্চলগুলি – অর্থাৎ ভাষা প্রক্রিয়াকরণের সাথে জড়িত অঞ্চলের সঙ্গে উচ্চতর চিন্তায় নিয়োজিত সম্মুখ লোবের (frontal lobes) নতুন যোগাযোগ তৈরি করতে হয়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি লিখন-পদ্ধতি আরও জটিল এবং বিমূর্ত হয়ে ওঠে। মিশরীয় সভ্যতার শেষ দিকে হায়ারোগ্লিফের সংখ্যা দ্রুত প্রায় ৭০০ থেকে বেড়ে কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এখনো কিছু হায়ারোগ্লিফ একই সঙ্গে শব্দ এবং সেই শব্দের প্রথম সিলেবলের প্রতিনিধিত্ব করে। এই জটিলতার কারণে এই প্রাচীন লিপিগুলি আয়ত্তে আনতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল –যতদিন না প্রাচীন গ্রীকরা আবিষ্কার করতে পারলেন যে লেখালেখির প্রক্রিয়াটা আসলে এ-বি-সি'র মতো সহজ।

৭৫০ খ্রিস্টপূর্বের দিকে প্রাচীন গ্রীকরা আবিষ্কার করেছিল যে তাদের ভাষা সীমিত সংখ্যক শব্দে বিভক্ত হতে পারে এবং প্রতিটি শব্দ একটি অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে। তারা সম্ভবত ফিনিশীয়দের ব্যঞ্জনবর্ণ-ভিত্তিক লিপি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তবে তারা এক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। গ্রীক বর্ণমালা-পদ্ধতিটি ছিল প্রথম লিখন-পদ্ধতি যা শব্দ বা অক্ষরের প্রতিনিধিত্বকারী চিহ্নগুলিকে মিশিয়ে না ফেলেই সংক্ষিপ্ত সংখ্যক বর্ণ থেকে শব্দ সাযুজ্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছিল। এর ফলে গ্রীকরা সহজেই মুখের ভাষার সব ধরনের রূপ লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিল।

এই পদ্ধতির অনেক সুবিধা ছিল। প্রথমত বর্ণমালার সংখ্যা ছিল কম, অধিকাংশ মানুষ তাদের ভাষায় ব্যবহৃত সকল শব্দ ২৬টির চেয়ে কম সংখ্যক বর্ণমালা ব্যবহার করে প্রকাশ করতে পারত। এর ফলে আমাদের মস্তিষ্কের শক্তি এবং প্রচেষ্টার কষ্ট কমে আসে। সঙ্গে এই ব্যবস্থা আরো একটি সুবিধা বয়ে আনে – বর্ণমালা ব্যবহার করে লিখন-পদ্ধতি অনেক বেশি সহজ এবং বিভিন্ন ধরনের শতশত অথবা হাজার হাজার চিহ্ন ব্যবহার করে লিপিপদ্ধতির চেয়ে অনেক দ্রুত শেখা যায়।

সবচেয়ে সুবিধার কথা হলো, বর্ণমালা লিখন-পদ্ধতিতে মানুষ তার সমস্ত জটিলতায় মুখের ভাষা এবং অব্যক্ত চিন্তাভাবনা টুকে রাখতে পারে। এটি আমাদের অপ্রকাশিত সব মহৎ চিন্তা তৈরি ও প্রকাশে সক্ষম করে তোলে।

যে কারণে গ্রীকরা এই সময়ে – ৭০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বে – শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং রাজনীতিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করতে পেরেছে। এই বর্ণমালা লিখন-পদ্ধতিকে আমার লাল-সালাম (ধন্যবাদ)। আমরা আজও সেই গৌরবগাথা পড়তে পারছি।

শিশুদের পঠনপাঠন

অধিকাংশ পাঠ-বিশেষজ্ঞরা যদি কোনো একটি বিষয়ে একমত হন তা হল – শিশুদের কাছে পড়ার ক্ষেত্রে সঠিক সময় বলে কিছু নেই। কোনো শব্দ বোঝার অনেক আগেই শিশুদের মস্তিষ্ক সেটা পড়ার মতো দুরূহ কাজের জন্য প্রস্তুত নিজেকে করে তুলতে শুরু করে। মাত্র ৬ মাস বয়সেই অক্ষরের মতো ছোট ছোট চিহ্নগুলি সনাক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ভিজ্যুয়াল সিস্টেম শিশুদের পুরোপুরি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮ মাস বয়সেই শিশুরা বুঝতে পারে যে তাদের চারপাশের প্রত্যেকটি জিনিসের নিজস্ব নাম রয়েছে।

পরবর্তী বছরগুলোতে শিশুদের উপলব্ধি, মনোযোগ এবং ধারণাগত ব্যবস্থাগুলো অবিশ্বাস্য গতিতে বিকশিত হয়। এ কারণে এই সময়ে বাচ্চাদের পড়ে শোনানো তাদের মস্তিষ্কে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। যখন ছোট বাচ্চাদের পড়ে শোনানো হয় তখন তাদের নিজস্ব ভাষাগত কাঠামোটি আরও পরিশীলিত হয়ে ওঠে।

এর প্রভাব অসংখ্য গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। তার মধ্যে একটি গবেষণায় পঠনবিষয়ক গবেষক ভিক্টোরিয়া পারসেল-গেটস পাঁচ বছর বয়সী বাচ্চাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন যাদের দু'বছর ধরে সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচবার বই পড়ে শোনানো হয়েছিল, এবং তাদের তুলনা করেছেন এমন শিশুদের সাথে যাদের বেশি বই পড়ে শোনানো হয়নি। যখন তাদের ৫ম জন্মদিনে তাদের কাছে এই পাঠ অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাওয়া হয় তখন যে সকল শিশুকে প্রায়ই পড়ে শোনানো হয়েছে তারা দীর্ঘ বাক্যাংশ, তুলনামূলক জটিল বাক্য এবং বিশেষত 'সাহিত্যিক' পরিভাষা যেমন, 'একদা কোনো এক সময়ে' ব্যবহার করে কথা বলে। দুর্ভাগ্যক্রমে, বিপরীত প্রভাবটিও লক্ষণীয়। যে সব শিশু ভাষাগত বিবেচনায় পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে আসে, এবং যাদের খুব কম বই পড়ে শোনানো হয়েছিল, তারা কখনও কখনও তাদের সমবয়সীদের চেয়ে ৩ কোটি ২০ লক্ষ কম শব্দ জেনেছে। ফলে, তাদের শব্দভাণ্ডার খুবই সীমিত এবং পড়তে শেখায় তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়।

তাছাড়া শিশুরা খুব ছোট থাকতেই বইয়ের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিভিন্ন ডিজাইন বা ছবির সঙ্গের লেখা এবং গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে শিখলে পরবর্তী সময়ে পড়া শেখার কাজটি তাদের জন্য সহজ হয়ে ওঠে। প্রথমত শিশুরা আবিষ্কার করে যে একটি শব্দের সঙ্গে একটি চিহ্নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এরপর তারা বুঝে নেয়, প্রতিটা বর্ণের একটা নাম আছে, উদাহরণস্বরূপ 'ম' বর্ণটি, এবং যে শব্দকে তা উপস্থাপন করে, যেমন 'মা'! যেসব শিশুকে প্রায়ই পড়িয়ে শোনানো হয়, আনুষ্ঠানিক পাঠশিক্ষার অনেক আগেই তাদের মস্তিষ্কে ভিজ্যুয়াল অঞ্চলের সঙ্গে ভাষাগত অঞ্চলের সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে। শুধু তাই নয়।একটি ছোট বাচ্চাকে ড্রাগন, ধনুক এবং রাজকুমারের গল্প পড়ে শোনানোর ফলে সে অন্য ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বকে দেখতে এবং অন্যের

অনুভূতিগুলি বুঝতে শেখে। অন্যভাবে বলা যায় যে বই তাদের সংবেদনশীল হতে শেখায়। তাই আমার অনুরোধ অনেক ছোট বয়স থেকেই আপনার সন্তানকে পড়ে শোনান।

পড়তে শেখার শেষ নেই

পাঠক্ষমতা এবং বিশ্ব সম্পর্কে বাস্তব জীবনের জ্ঞান বাড়ার সাথে সাথে শিশুরা তাদের পঠনপাঠন থেকে টেক্সটের আরও অনেক সম্ভাবনা উন্মোচন করে। মস্তিষ্কের বাঁ পাশের অক্ষর-ডিকোডিং পথগুলি আরও কার্যকর হয়ে উঠলে, লিম্বিক সিস্টেম – আমাদের মস্তিষ্কের আবেগ সঞ্চালনের জন্য নিবেদিত অঞ্চলটি – পাঠ-প্রক্রিয়াতে আরো বেশি জড়িয়ে পড়ে। এইভাবে নবীন পাঠকরা উপহাস, রূপক এবং নানারকম দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে বুঝতে শেখে; তারা যা পড়ছে সেটা তাদের নিজস্ব গল্প ও চারপাশের বিশ্বের সাথে মিলিয়ে পাঠ করতে পারে। এই ধরনের পরিণত পাঠক একটি শব্দ পড়তে আধ সেকেন্ডেরও কম সময় নেয়। এবং এই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যেই অনেক কিছু ঘটে যায়। প্রথম ১০০ মিলিসেকেন্ডে আমাদের মস্তিষ্ক পঠিত শব্দের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে অন্যান্য জ্ঞানীয় ক্রিয়াকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভিজ্যুয়াল সিস্টেমটি পঠিত অক্ষরগুলি গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশেষায়িত নিউরোনাল পথগুলি থেকে রিডিং মেমরির অন্যান্য অংশগুলিতে প্রেরণ করে। আমাদের সক্রিয় স্মৃতি আমাদের মস্তিষ্কে যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ ভিজ্যুয়াল তথ্য ধারণ করে, ততক্ষণে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন মেমোরি চাক্ষুষ চিহ্নগুলির সম্পর্কে যা কিছু জানে তা পুনরুদ্ধার করে। পরবর্তী ১০০ মিলিসেকেন্ডে আমাদের মস্তিষ্ক অক্ষরগুলিকে তারা যে ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে এবং তাদের একত্রিত করে একটি অর্থবহ শব্দ গঠনে ব্যস্ত থাকে। এবং সবশেষে পরবর্তী ৩০০ মিলিসেকেন্ডে আমাদের মস্তিষ্ক ঐ শব্দ সম্পর্কে যা কিছু জানে সেগুলি পুনরুদ্ধার করে ঐ প্রেক্ষাপটে এটির অর্থ, সঙ্গে এর অন্যান্য সম্ভাব্য অর্থ এবং শব্দটি সম্পর্কে আমাদের আর যা যা জ্ঞান থাকতে পারে সেটি তৈরি জোগাড় করে। আমরা যত বেশি পড়ি, তত দ্রুত ডিকোডিং সম্পন্ন করতে পারে, এবং পাঠ-প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে আমাদের একটু বেশি সময় দিতে হয় – শব্দটি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করায়। আমাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে বই পড়ি তার সঙ্গে সম্পূরক জ্ঞান এবং জীবনের অভিজ্ঞতা যোগ করতে পারি। তাই পঠনপাঠনের প্রশ্নে আমাদের শেখার কোনো শেষ নেই।

পাঠ-বিকলত্ব (ডিসলেক্সিয়া)

লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, টমাস এডিসন এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মধ্যে মিল কী? তাঁরা সকলেই পাঠ-ব্যাধিতে (ডিসলেক্সিক) ভুগেছিলেন। 'শব্দ-অন্ধত্ব' হিসাবে পরিচিত

এই অদ্ভুত সমস্যাটি ১৮৭০ সালে প্রথম সনাক্ত করেন জার্মান গবেষক অ্যাডলফ কসমল, পরে বৈশ্বিক স্বীকৃতি পেতে কিছুটা সময় লেগে যায়। এটির দেরিতে আবিষ্কার এবং এর এখনও সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা না থাকার কারণ পাঠ-ব্যাধি (ডিসলেক্সিয়া) অনেক ধরনের হয়ে থাকে। ইংরেজি ভাষায় পাওয়া তিনটি প্রচলিত সাব টাইপ হলো: অক্ষর এবং শব্দ মেলানোর সমস্যা, পাঠের সাবলীলতা নিয়ে সমস্যা এবং উল্লিখিত দুটি সমস্যা একসঙ্গে থাকা। তবুও, পড়ার অসুবিধা আছে এমন প্রায় ১০শতাংশ মানুষকে এই শ্রেণির যে কোনও একটিতে নিশ্চিতভাবে ফেলা যায় না।

একইভাবে, গত একশ বছরের গবেষণার দিকে তাকালে দেখা যায়, মস্তিষ্কে ডিসলেক্সিয়ার বিভিন্ন সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

প্রথমটি হল পঠনপাঠনের সাথে জড়িত মস্তিষ্কের মৌলিক কাঠামোতে এক ধরনের ত্রুটি – উদাহরণস্বরূপ দৃষ্টি এবং শ্রুতি ব্যবস্থা। মিঃ এক্স নামক ফরাসি ব্যবসায়ীকে স্টাডি করার পরে কসমল এই তত্ত্বটি প্রস্তাব করেছিলেন। দুটি স্ট্রোকের কারণে – প্রথম স্ট্রোকে তার ভিজ্যুয়াল সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দ্বিতীয় স্ট্রোকে মস্তিষ্কের যে অংশটি ভিজ্যুয়াল সিস্টেম থেকে ভাষা অঞ্চলে তথ্য সরবরাহ করে সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় – এরপর মিঃ এক্স পড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

ডিসলেক্সিয়ার দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ পড়ার জন্য মস্তিষ্কের প্রয়োজনীয় প্রসেসিং গতি অর্জনের অক্ষমতা। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ডিসলেক্সিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তাদের দৃষ্টি, শ্রুতি ও মোটর সিস্টেমের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 'সময়ের ব্যবধান' তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, ডিসলেক্সিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা ভিন্নভিন্ন রঙ এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে বস্তুর নামকরণের কাজটি অনেক ধীর গতিতে করে থাকেন। এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার অন্যতম একটি কারণ হতে পারে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যথাযথ সংযোগের অভাব। উনবিংশ শতকে স্নায়ুবিশারদ কার্ল ওয়ার্নিকে ডিসলেক্সিয়াকে একটি বিচ্ছিন্নতা সিনড্রোম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন যা ভিজ্যুয়াল-ভার্বাল বা ভিজ্যুয়াল-অডিটরি সিস্টেমের সমন্বয়কে বিঘ্নিত করে। এই সম্ভাব্য ত্রুটি বলতে বোঝায় যে, ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত মস্তিষ্ককে পঠনপাঠনের বিভিন্ন উপায় বের করতে হয়। আধুনিক ব্রেন ইমেজিং দ্বারা বোঝা যায় যে ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা পড়ার জন্য স্বাভাবিক ব্যক্তিদের চেয়ে মস্তিষ্কের আলাদা সার্কিট্রি ব্যবহার করেন বলে মনে হয়।

ডিসলেক্সিয়া আসলে কোনও 'পাঠ-ব্যাধি' নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে মানুষের মস্তিষ্কের কখনোই পড়ার কথা ছিল না। ডিসলেক্সিয়ার আলাদা প্রবাহ মানুষের অন্যান্য দক্ষতাকে প্রভাবিত করে। শুধুমাত্র দা ভিঞ্চি, এডিসন এবং আইনস্টাইনই ইতিহাসে ডিসলেক্সিক প্রতিভা ছিলেন না। স্পেনীয় স্থপতি অ্যান্তোনি গাওদি-ও রয়েছেন যিনি বারসেলনায় তাঁর ডিজাইনকৃত পরাবাস্তব, রঙিন ভবনগুলোর জন্য বিখ্যাত। আরো অনেকের মধ্য থেকে বলা যায় পপ চিত্রশিল্পী অ্যান্ডি ওয়ারহল, অভিনেতা জনি ডেপ এবং বিনিয়োগ ব্যবসায়ী চার্লস শোয়াবের নাম।

১৯৬০ এবং ৭০-এর দশকে অগ্রগণ্য স্নায়ুবিশারদ নরম্যান জেশউইন্ড আবিষ্কার করেছেন যে, ডিসলেক্সিয়া প্রায়শই অস্বাভাবিক কথাবার্তা এবং স্নায়ুর মোটর প্যাটার্নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এর কারণ হলো ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের মস্তিষ্কের দুটি গোলার্ধকে আরও সুষমভাবে ব্যবহার করে। বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে তথাকথিত প্লানাম টেম্পোরাল–ভাষা প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে জড়িত মস্তিষ্কের একটি অঞ্চল – ডানদিকের চেয়ে বাম গোলার্ধে বড়। তবে ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্ল্যানাম টেম্পোরাল উভয় গোলার্ধে একই আকারের। ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা অন্যান্য বিভিন্ন কাজে ডান ব্রেইন সার্কিটকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

ডান-মস্তিষ্কের এই আধিপত্য ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের বৃহত্তর ভিজ্যুয়াল প্যাটার্ন স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিভা আছে বলে মনে করা হয়। তার নিজের নৈমিত্তিক পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা ডিজাইন, রেডিওলজি বা উচ্চ ফিনান্সের মতো ক্ষেত্রগুলির দিকে ঝুঁকছেন, যেখানে বৃহত্তর প্যাটার্নগুলো চিহ্নিত এবং ব্যাখ্যা করার দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ডিসলেক্সিয়া আজ একটি স্বীকৃত অবস্থা, আমরা এখনও ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যান্য দক্ষতা বিকাশের জন্য সঠিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি না। ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত শিশুদের এখনও সেটা নির্ণয় করতে দেরি হয়ে যায়, বা কখনো নির্ণয় করা হয় না; তাদের সঙ্গী এবং শিক্ষকরা তাদের পিছিয়ে রাখে। ফলে সমাজ কিছু আশ্চর্য প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ কারণেই কোনো শিশুর পঠনপাঠনের সুপ্ত সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সেটা দ্রুত কাটিয়ে ওঠায় তাৎক্ষণিক ও নিবিড় হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করা প্রত্যেক পিতা-মাতা এবং শিক্ষকদের দায়িত্ব। প্রাচীন গ্রীকরা যখন প্রথম লেখা শুরু করেছিল, তখন সবাই তাতে খুশি ছিল না। প্রাচীন গ্রীসে বসবাসকারী বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসের সময় লেখালেখি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তিনি এই নতুন প্রযুক্তিটিকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, লেখালেখির বিষয়টি মানবচিন্তাকে আরও জটিল করে তুলবে, আমাদের স্মৃতিশক্তিকে দূষিত করবে এবং সমস্ত লিখিত তথ্যকে সত্য মনে করে মানুষ বোকা বনে যাবে। মজার ব্যাপার হলো, সমালোচকেরা আজ ইন্টারনেট সম্পর্কে প্রায় সেই একইরকম সমালোচনা করে যাচ্ছেন।

এর ফলে আমাদের মনে এই প্রশ্নটি জাগে যে ডিজিটাল যুগে আমাদের পাঠ-মস্তিষ্কের কী হবে যখন আমাদের আঙুলের ডগায় প্রচুর পরিমাণে তথ্য রয়েছে এবং টেক্সট আগের চেয়ে আরও গতিশীল ও পরিবর্তনশীল? প্রযুক্তি কি আমাদের মস্তিষ্কের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি উন্মোচন করবে? নাকি উল্টো এটি কিছু কিছু দক্ষতা আমাদের ভুলিয়ে দেবে যা এটি তৈরিতে সহায়তা করেছিল? অতিরিক্ত আতঙ্কপ্রবণ হওয়ার কোনও কারণ নেই। শুধু মনে রাখবেন, সক্রেটিস লেখা নিয়ে কতটা সংশয়ী ছিলেন এবং আজ তাঁর উদ্বেগ কীভাবে হাস্যরসে পরিণত হয়েছে!

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তৈরি হওয়া নয়া পঠনরীতি যে করেই হোক আসবেই। আমরা যেহেতু নতুন একটি যুগে চলে এসেছি, পড়তে শেখার মাধ্যমে আমরা – প্রজাতি এবং

ব্যক্তি হিসাবে – কী অর্জন করেছি তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মধ্যে ক্ষতির কিছু নেই; বরঞ্চ সেই সম্পদগুলি ভবিষ্যতে আমাদের ধারণ করার চেষ্টা করা উচিত। লেখার ফলে আমরা আমাদের কথা এবং অব্যক্ত চিন্তা সংরক্ষণ করে রাখতে পারি এবং এটি সময় এবং স্থানকে অতিক্রম করে যায়। এর ফলে আমরা সম্পূর্ণ নতুন উপায়ে অন্যদের চিন্তাভাবনা এবং অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারি।

আমাদের আগের দিনের পঠনপাঠনের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ হল সময়, যা আমাদের ধরে রাখা উচিত। আমাদের ডিজিটাল যুগে এসে সময়কে খুব দুর্লভ সম্পদ বলে মনে হয়। কিন্তু সময়ই পার্থক্য করে দেয় কোনো টেক্সট হাল্কাভাবে পড়া এবং সেটাকে অতিক্রম করে আমাদের নিজস্ব ধারণা, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করার মধ্যে।

ডিসলেক্সিয়া দ্বারা আক্রান্ত হোক বা না-হোক, প্রতিটি শিশুকে পড়ার নানা দিক উন্মোচনের জন্য সঠিক নির্দেশনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য এর সমস্ত শক্তিশালী অভিব্যক্তি নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। পঠনপাঠন মানুষের সহজাত নয়। আমাদের প্রজাতিকে লেখার কৌশলগত বিকাশ ঘটাতে – আজকের পর্যায়ে সেটাকে আমরা যেভাবে পেয়েছি – অনেক বছর সময় লেগেছিল, এবং তা আত্মস্থ করতে আমাদের মস্তিষ্ককে বড় ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এজন্য পড়তে শেখা এখনও শিশুদের জন্য দীর্ঘ এবং কখনও কখনও কঠিন প্রক্রিয়া – বিশেষত তারা যদি ডিসলেক্সিয়ায় আক্রান্ত হয়। তবে পঠনপাঠন আমাদের মস্তিষ্ক, চিন্তাভাবনা এবং আমাদের সংস্কৃতি পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে, তাই প্রত্যেক মানুষের এটি শেখার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাধ্যের মধ্যে যা কিছু আছে তা করা উচিত।

যা যা আমাকে পড়তে হয়েছে

A History of Reading, Alberto Manguel
Curiosity, Alberto Manguel
Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World, Maryanne Wolf
How to Read Literature,Terry Eagleton
The Sixth Extinction: An Unnatural History, Elizabeth Kolbert
Overcoming Dyslexia: A New and Complete Science-Based Program for Reading Problems at Any Level, Sally E. Shaywitz
ABC of Reading, Ezra Pound
For the Love of Books: Stories of Literary Lives, Banned Books, Author Feuds, Extraordinary Characters, and More, Graham Tarrant
Wikipedia

আলফারেটা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

লিয়াকত হোসেন

প্রথম মহিলা নোবেল লরিয়েট সেলমা লর্গালফ

জীবন ও সাহিত্যকর্ম

নোবেল বিজয়ী সুইডেনের বিখ্যাত লেখিকা সেলমা অত্তিলিয়া লোভিসা লর্গালফ (সংক্ষেপে সেলমা লর্গালফ) ১৮৫৮ সালের ২০ নভেম্বর সুইডেনস্থ ভার্মল্যান্ডের র্মোবাক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সেলমা লর্গালফ ছিলেন লেফট্যান্টে এরিক গুসরাফ লর্গালফের চতুর্থ সন্তান। সেলমার শৈশব অনান্যদের মত ছিলনা। মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়েসে তাঁর দুটি পা অবশ হয়ে যায়। পরে অবশ্য ভালো হয়ে গেলে ও শৈশবে তিনি অন্যান্ত শিশুদের মতো খেলাধূলা করতে পারেননি। সে সময় অন্যান্য শিশুদের মতো গৃহেই সেলমার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। শিক্ষক র্মোবাক্কাতে এসে পড়াতেন এবং ইংরেজী ও ফরাসী দুটি ভাষাতেই সেলমা পারদর্শী হয়ে উঠেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর সেলমা লর্গালফ ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ সাল অবধি লান্সক্রোণায় প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস Gösta Berlings Saga (গস্টা বেরলিংস-এর কাহিনী). এরপর প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত ব্যাতিক্রমধর্মী পুসত্মক Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (নীলস হলর্গেসনের সুইডেন ভ্রমণ)। ঐ বইটি প্রকাশের পর সেলমাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯০৯ সালে সেলমা লর্গালফ তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি প্রথম নারী যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১৪ সালে সুইডিশ একাডেমির সদস্যপদ লাভ করেন।

লান্সক্রোনায় শিক্ষকতার সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস Gösta Berlings Saga লিখতে শুরু করেন। পত্রিকায় প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকাশ হবার পরপরই সাড়া পড়ে যায় এবং তখন তিনি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসটি প্রকাশে চুক্তিবদ্ধ হন। ১৮৯১ সালে যখন বইটি প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়েস মাত্র ৩৩ বছর। বইটি অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় ও চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। প্রধান ভুমিকায় অভিনয় করেন গ্রেটা র্গাবো। এর কিছুকাল পর প্রকাশিত হয় সেলমার আর একটি বিখ্যাত বই ‘জেরুসালেম‘। এই বইটিও খুব সাড়া

জাগায়। তিনি প্যালেস্টাইন ও জেরুসালেম সফর করেন।তাঁর সম্মানে জেরুজালেমের একটি সড়কের নাম করা হয় 'সেলমা লর্গালফ সড়ক'।
সেলমা লর্গালফের গল্প উপন্যাস নিয়ে প্রায় ত্রিশটি বই প্রকাশিত হয়।এর মধ্যে Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (নীলস হলর্গেসনের সুইডেন ভ্রমণ) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯০১ সালে সেলমা লর্গালফকে প্রাথমিক স্কুলগুলোর জন্য একটি সঙ্কলনের কাজে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন তাঁর বয়স তেতালিশ। ততদিনে তিনি লেখিকা হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস Gösta Berlings Saga তাঁর রচনাশৈলীর মুন্সীয়ানার স্বাক্ষর রয়েছে। সেলমা ছোটবেলা থেকেই রূপকথা ও লোকগাঁথা শুনে শুনে পরিণত বয়েসে ঐসব কাহিনীর বর্ণিল ভাষারীতিতে নিজের লেখনী সমৃদ্ধ করেন। লেখালেখিতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করার আগে একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষিকা হিসেবে সেলমা লর্গালফ দশ বছর স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তাই শিক্ষকরা যে সংকলন্বর জন্য তাঁর দ্বারস্থ হবেন সেটা আশ্চর্য কিছু নয়। একটি কমিটি গঠন করা হলো, এবং সঙ্কলনটিতে কী থাকবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরী হলো কিছুটা ইতস্তত করার পর সেলমা রাজি হয়ে পুরো কাজটিই নিজের হাতে তুলে নিলেন। বিচ্ছিন্ন ছোটগল্প এবং পদ্য বাতিল করে দিলেন। একটি পূণাঙ্গ রূপকথামূলক বই যা সুইডেনের ভৌগলিক পরিচয়কে তুলে ধরবে এবং শিশুদের দেশ ও জনগণ সম্পর্কে সচেতন করবে, এই ধরনের একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগুলেন তিনি।
ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলেন, অনেক জায়গা ঘুরলেন, ভূগোল ও প্রাণিবিদ্যাসহ অনেক বই পড়লেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে মতামত ও পরামর্শ নিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সব ধরনের বইয়ের পাঠক এবং তার কাছে বিশ্বসাহিত্য ছিল সোনার খনির মত, যা তাকে লেখার অনেক রসদ জুগিয়েছে। লেখার অফুরন্ত উপাদান থাকা সত্ত্বেও প্রসরাবিত বইয়ের সঠিক রূপটি খুঁজে পেতে তিনি সমস্যায় পড়লেন, কাজ পেছাতে থাকল। যখন তিনি পথ খুঁজে পেলেন, লেখা তরতর করে এগুতে থাকল। রুডইয়ার্ড কিপলিঙের Just So Stories বইটির ভাবধারা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং জীবজন্তুরাও মানুষের মত কথা বলবে ও চিন্তা করবে এই বিষয়টি তাঁর ভাবনায় ছিল। এভাবেই সেলমা তাঁর নিজের ভাবনাকে নানা চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাইলেন। তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনা ও জায়গা বর্ণনা করতে চাইলেন। শ্রেষ্ঠ ছবিটি হতে পারতো পাখির চোখে সুইডেন দেখা, আর এ ধরনের অভিযানের জন্য দরকার ছিল নীলস হলর্গেসনের মত একজন ক্ষুদে অভিযাত্রীর।
লেখাটা শেষ হবার পর বেশ ক'জন শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞ পাণ্ডুলিপি পড়লেন। সবাই মার্জিনে মন্তব্য লিখলেন যা বারংবার সেলমাকে ক্ষুব্ধ করছিল। তিনি পাণ্ডুলিপি কিছু পরিবর্তন করলেন, বিশেষ করে তথ্য সঠিক কিনা সেই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখলেন। পাণ্ডুলিপি পূণর্মূল্যায়ন মোটেও সহজ কাজ ছিলো না, কারণ প্রচুর লোক এতে জড়িত ছিল।

দক্ষিণের পাঁচটি অঞ্চলে নীলস হলর্গেসনের অভিযানের কাহিনীর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে, তারপর দ্বিতীয়টি। বইগুলো ব্যাপকভাবে সমাদৃত হল এবং খুব শিগগিরই দুই খণ্ড একত্র করে একটি সংশোধিত খণ্ড প্রকাশিত হলো। আজও এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। বইটি প্রায় ত্রিশটিরও বেশী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বইটি বাংলায়ও অনুদিত হয়েছে এবং সেলমার কোন একটি বইয়ের বাংলা অনুবাদ এই প্রথম। নীলস্ হলগের অভিযানের কাহিনী শুধুমাত্র স্কুলের পাঠ্য হিসেবেই থাকেনি। বইটিতে সেলমার যে প্রকৃতির প্রতি প্রবল অনুরাগ ফুটে উঠেছে তা প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি এমন একটি স্থান ও সময়ের বর্ণনা করেছেন যার অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত, এজন্যই তা মনে রাখা জরুরি। নতুন প্রজন্মের শিশুরা নীলস হলর্গেসনের চমকপ্রদ অভিযান আনন্দের সাথেই উপভোগ করে, সাথে প্রকৃতির প্রতি তাদের মমতা সৃষ্টি হয়।

সেলমা ও অবনীন্দ্রনাথ

লেখালেখির জগত সেলমাকে বিশ্বদরবারে পরিচিত করে এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সেলমা লর্গালফের সঙ্গে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগাযোগ ঘটে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নীলস হলর্গেসন বইটি সম্পর্কে জানতেন। এই প্রসঙ্গে লেখক ও অনুবাদক কুমার উৎপল তাঁর এক প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' পড়ে আনন্দ পাননি এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। হৃদয় নামের এক দস্যি বালকের হাঁসের পিঠে চড়ে বাংলা চষে বেড়ানোর কাহিনী পড়ে কখনো মনে হবে না কাহিনীটা অন্য কোথার থেকে নেয়া হয়েছিল। গল্পের মোড়কে বাংলার ভৌগোলিক কাহিনী এত বেশী দেশজ হয়ে উঠেছিল মনে হয়েছে এটা বাংলার মৌলিক গল্প। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা'-এর কাহিনী সেলমা লর্গালফের নীলস হলর্গেসনের কাহিনীর আদলে তৈরী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একটি বইয়ের নাম 'ৰীরের পুতুল'। বইটি সুইডিশ ভাষায় Östdockan নামে অনুদিত হয়েছিল, বইটির মুখবন্ধ লিখেছিলেন সেলমা লর্গারলফ। 'ৰীরের পুতুল' প্রথমে ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়, তারও মুখবন্ধ লেখেন সেলমা লর্গারলফ। পরে বইটি সুইডিশ ভাষায় অনুদিত হলে সেলমার মুখবন্ধটি রাখা হয়। ফরাসী ভাষায় 'ৰীরের পুতুল' অনুবাদ করেছিলেন আন্দ্রে কার্পেলেস। ফরাসী অনুবাদক আন্দ্রে কার্পেলেসের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সেলমা লর্গালফকে লেখা চিঠি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন আন্দ্রে কার্পেলসকে এবং অনুরোধ করেছিলেন চিঠিটা পৌঁছে দিতে। আন্দ্রে চিঠিটি মোবাক্কায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। এইভাবে যোগাযোগ হয়েছিলো অবন ঠাকুর ও সেলমার। এই সংক্রান্ত চিঠিপত্র রয়েছে সুইডিশ রাজকীয় পাঠাগারে। অবন ঠাকুর তাঁর লেখা চিঠিতে সেলমা লর্গালফের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন ও সেলমার সমস্ত বই বাংলায় অনুবাদ হোক সেই বাসনাও ব্যক্ত করেছেন।

আন্দ্রে কার্পেলেসকে লেখা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

18th May 1933
Calcutta

Dear Andrei,

The copy of my 'khirer Putul' reached me by mail. I was slightly unwell so I could not write to you earlier. I congratulate you and your publisher for the charming get-up and translation. It is almost like the original.
You will kindly write and give my best thanks to miss Salma Lagerlöf. Tell her that I shall allways remember her kindness to me with deepest respect and gratitude. I have made all my children read her books 'MarVaka', Nils Holgerssons' etc and I have also adapted her the first part of the adventures of Nils into Bengali which long ago. I wanted to publish—no books is so much interesting than her stories all of them worth doing in Bengali. But who will do it except your poor Abon dada? I enclose this postcard for madam Salma Lagerlöff. Please send it to her address with your own letter, tell her all that I feel I cannot put into words because I write very bad English and no French except 'Bonjour' and 'Silvouplis'. Therefore I make you my messanger + ambassador to the great authress.

With all best wishes
Yours sincerely
Abanindranath Tagore

সেলমাকে লেখা অবন ঠাকুরের চিঠি

Dear Mistress av Marvaka
Accept my sincerest thanks for the great kindness, your introduction to my little book 'khirer putul' has cheered me in my sixty third years. I wish you all honour and happiness.

Yours truly
Abanindranath Tagore
18th May 1933
Jora sanko
Calcutta.

সেলমা ও ফিনল্যান্ড

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে প্রতিবেশী দেশ ফিনল্যান্ড সোভিয়েত আগ্রাসন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। দেশটির তখন প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ অর্থ। সেলমা লর্গালফ তাঁর নোবেল পুরস্কারের স্বর্ণপদক সুইডিশ একাডেমি হতে নিয়ে ফিনল্যান্ড সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন, যাতে ওদেশের সরকার ও জনগণ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। এই ঘটনা প্রচণ্ড সাড়া জাগায় ও প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হয়। সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে ফিনল্যান্ড সরকার ধন্যবাদের সাথে সেলমার স্বর্ণপদক সেলমাকে হস্তান্তর করে। প্রতিবেশী দেশের প্রতি ভ্রাতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সেলমা লর্গালফ।

শৈশব বাড়ি

সেলমার শৈশবের বাড়ি যে বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটা ছিল স্থানীয় ধর্মযাজকের। ১৮শ শতকে মোবাক্কার জমিদার বাড়ি ধর্মযাজকের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। পরবর্তী সময়ে ১৮৫২ সালে জমিদার বাড়িটি সেলমার বাবা এরিক গুস্তাফ লর্গালফ ক্রয় করেন। কিন্তু আর্থিক কারণে ১৮৮৫ সালে বাড়িটি বিক্রি করে দিতে হয়। সেলমা তাঁর জন্মবাড়ির কথা ভুলেননি, তাই নোবেল পুরস্কারের অর্থ দিয়ে মোবাক্কার জমিদারী সহ শৈশববাড়িটি ক্রয় করেন এবং ঐ বাড়িতেই ১৯৪০ সালে ৮২ বছর বয়েসে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পর স্মৃতিবিজরিত বাড়িটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

তথ্য

সেলমা ও অবন ঠাকুরের চিঠিগুলো ড: কুমার উৎপল সূত্রে প্রাপ্ত।

স্টকহোম, সুইডেন

শামীম আজাদ

অভিক্রমণে ভাষা

পাখির কোন পাসপোর্ট লাগে না। তাদের কোন ভিসা বা ভস্ম মাখতে হয় না। তাদের জন্য নিয়োজিত নেই কোন বর্ডার পুলিশ। মানুষের জন্য মানুষই এর সবই তৈরি করা হয়েছে। মানুষেরাই মানুষকে আটকে দেয় তারকাঁটায়, বৈদ্যুতিন জালে, প্লেনের পাখায়। মানুষের বেঁধে দেয়া কানুনের কারণে কিছু মানুষ ডিঙি থেকে ডুবে যায় সাগরে, পিষে যায় চ্যানেল টানেলের ট্রেনের চাকায়, না খেয়ে শুকিয়ে মরে মরুভূমিতে। তারপরেও নানান কৌশলে, ভালোবাসায় ও বিদ্যায় যে ক'জন বেঁচে থাকে তাদের জোটে এক স্বত্ত্ববিহীন, মালিকানাহীন, গৃহবিহীন গৃহ। তখন তার একমাত্র রক্ষাকবচ ভাষা।

আমার আদি ঠিকানা সিলেটের মনুগাঙ। কিন্তু আমার জন্মক্ষণে আমার মা ছিলেন ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে। তাই ময়মনসিংহের মনোহর হাওয়ায় পুষ্ট হয়ে বাবার চাকুরীসূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে আয়ত্ত করেছি সকল সৌরভ। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় ছিলাম, বাংলাদেশ নির্মাণ-নৃতত্ত্বের আঁশে আঁশে সুবাসে ছিলাম আমিও। গত ত্রিশ বছর প্রবাসে দৈবের বশে ভিনভাষায় বাংলা ও বাংলাদেশের কথা, কবিতা এবং গল্প বলে ও লিখে চলেছি। বল ভরসা ছিল এবং আছে সেই বঙ্গজন্মেই। যেমন লিপিবদ্ধতার আগেও হোমারের কাহিনী ছিলো, কাহ্ন'র মতো শ্লোক ছিলো। কিন্তু কে আর অতীতের খোঁজে হাঁটে? এদের কাছে অতীত তো আরেক বিদেশ বিভূঁই।

এখানে, বিলেতে ইতিহাসের শিক্ষক পড়ায় ক্রীতদাসের, বন্যার ও মানুষের বাঁদর কাহিনী। কিন্তু ডিয়ার টিচার, একবারও কি ভেবেছেন আপনাদেরও বহু আগে তারা মুক্ত ছিল? তাদের নিজের ভাষা ছিল? পশু বধের পর পুড়িয়ে খাবার প্রক্রিয়া বের করেছিল তারাই? তাদের মাটি তাদেরই ছিল? যাযাবর বাণিজ্যে কার নৌকা আগে মাটি ছুঁয়েছে সেটার চাইতে আরাধ্য হওয়া উচিত ভাষা। নিজ ভাষা। একটি ভাষা বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপলব্ধিতে গ্রথিত করা। সারমেয়ের মত শব্দ করা নয়, সব রকম ইঙ্গিতে সঙ্গীতে সংযোগস্থাপন। তা নিজ ভাষার ছাঁচে বসিয়ে দিলেই সম্ভব।ভাষাবীজই অভিবাসীর প্রথম বপন।

আমাদের যে প্রাকৃত বাংলা আছে, বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তারও নানা রূপ আছে। উপভাষা নামে তা বজায় আছে আদরের সঙ্গেই। কিন্তু দেশে আজ এক অদ্ভুত কথামালার আগ্রাসন ঘটেছে। একটা বিশেষ 'প্রাকৃত' প্রবেশ করেছে, শুধু কথা বলায়

নয় এমনকি লেখা, টিভি, টেলিফোন, রেডিও, মোবাইল ও সামাজিক মাধ্যমে।- যা কিনা লেখা ও পড়ার নির্ভরতা ছাড়িয়ে একাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এর কিছু কিছু শব্দ বাংলায় বানান করাও কঠিন। কিছু সাহিত্যিক ও নাটক নির্মাতাও তা ব্যবহার করেন বা করে চলেছেন। ইথারে ইথারে সে সব ক্রিয়াপদ শুনে শুনে দেশের বর্তমান প্রজন্মের 'বলা' গেছে বদলে।

'শোনা' থেকেই মানবের বলা। বলা থেকে লেখা। আর লেখা থেকেই পড়া। আমি নিজের লেখা থেকে পড়তে গিয়ে একদিন দেখি আমার প্রয়োজনের নিমিত্তেই আমার 'বলা' নানা প্রাপ্তি থেকে প্রভাবিত হয়ে গেছে। কিন্তু আমার কিছু লুটও হয়ে গেছে। আর এ লুটপাটের পরিব্যাপ্তির প্রতিসরণ বুঝতে পারি বাংলাদেশে গেলে। দেখলাম শুধু আমি না ইথারে ইথারে স্নায়ু অবশকরা শব্দ শুনে শুনে 'বলা' বদলে গেছে দেশের মানুষদেরও। রোগ ধরা পড়ে দেশে গেলে। কিন্তু দেশে পা দিয়েই ঠিক সাথে সাথে উপলব্ধি করতে পারি না। পারি একটু দীর্ঘ সময় অবস্থানের পর, ভাষা-নির্ভর কোন ক্লাশ নেবার সময়। যেমন দৌড়ে থাকলে পাশের কিছু দেখা যায় না- দম নিলে যায়। তখন দম নিয়ে পরীক্ষিত বাটখারা নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এনে যাচাই বাছাই করে নিজ ভাবনা তুলে ধরার চেষ্টা করি। আর করতে গিয়ে গিয়ে বুঝি অনায়াসে পেয়েছি বলে তার অনাদর করা যাবে না। করলে ক্ষতিগ্রস্থ হব যুগপৎ আমি এবং আমার টেবিলে ঝুঁকেপড়া শিক্ষার্থীরা।

ভাষা প্রবাহে শূন্যস্থান বলে কিছু নেই। যা পাওয়া যায় তাই ভাষার খাদ্য, ভাষার নিঃশ্বাস, তেল ও তরল। যতটা পারা যায় বা পাওয়া যায় ততটা নিয়েই টিকে থাকতে হয় সুগৃহিনীর মতো। লক্ষ্য ও মোক্ষ হয়ে উঠবে যা পরীক্ষিত, সংযোগসফল, প্রাকৃত কিন্তু নিশ্চিত এবং সুগম্য।

ভাষা সমভাষীদের মধ্যে হাঁটে একভাবে, সংকর প্রবাহে তা ভিন্ন এবং জনে জনে তার চলা বিবিধ। তুলাদনণ্ডেও তাদের এক করা যায় না। যাবার কথা না। সব ধারাই চলে। সাধারণ মানুষ নিজ গরজেই এর প্রাকৃত ধারা রাখে অব্যাহত। তাই হয় জনগণের ভাষা। প্রান্তজনের সখা ও শব্দ।

আমি এখন নিজ বাসভূমে পরবাসী – নোম্যাড সালমান রুশদী বা অরুন্ধতী রয় নই বলে, বাংলা ভাষায় বলেই নিজেই আমার মাখন গলানোর পদ্ধতি বের করেছি। নিয়ত দেশে গিয়ে তরুণ-তরুণীদের জন্য শিল্পক্লাশ নিয়ে বিলেতে যা শিখেছি তা উজাড় করে দিয়ে উজ্জীবিত হয়ে লন্ডনে ফিরি। তাই হয়তো আমরাই একদিন বুক কেটে এই বিদেশে ফুটিয়ে ছিলাম বাংলাদেশের বিজয়ফুল। দেশ ও বিদেশে যা ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের সমান সুগন্ধ। এই অব্যাহত যাত্রায় আবদ্ধ আছি, বহুদিন চলেছি। আমি বাতাস, বর্ষা, আকাশ, আশপাশ, নতুন ফুল ও কুঁড়ির মদ্যপান করি আর এলপি হার্টলীর লাইন বলি 'দ্যা পাস্ট ইজ এ্যা ফরেন কান্ট্রি; দে ডু থিংস ডিফারেন্টলি দেয়ার।' আমাদের এ নতুন ভাবেই করতে হবে।

তিন দশকের বেশিদিন ধরে আমি বাংলা নয় ইংরেজি যেখানে লিংগুয়াফ্রাঙ্কা, সেখানে

আছি। কিন্তু লেখক বলেই, আর আমার লেখার মূল ভাষা এখনো বাংলা বলেই দেশের যোগাযোগ ধরে রেখেছি আমার প্রাকৃত আর প্রমিতে। লিখতে প্রমিত। বলতে প্রাকৃত। এই বিদেশে সারাক্ষণই বাইরে ভিন ভাষা হলেও মনে মনে বলে চলেছি একটাই ভাষা - সে বাংলাভাষা। তবে এই থাকা না থাকার কালে আমার ভাষার মধ্যে যা কিছু শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল তা ডায়াস্পোরার কুটো, কষ, ফুল, ফসফরাস, লেগুন ও লবঙ্গে ভরে ফেলেছি। যা লুট হয়েছে তা দিয়ে নতুন নির্মাণ করছি আর মৌখিক ভাষার বেলায় নিজের কানকেই করছি কলিজা। তাই দেশে গেলে ঢাকায় কাওরান বাজারে যেতে বেছে নিচ্ছি এমন ভাষার পোশাক যাতে সেখানে যাদের সঙ্গে কারবার তাদের কাছ থেকে আমাকে না বিশ্লিষ্ট করা যায়। এ নিয়ে আমাদের একজনের সঙ্গে আর একজনের মিল না থাকতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বুঝেই ভাষার প্রায়োগিক রূপ নিশ্চিত করার কথাটায় আমি গুরুত্ব দিই। কারণ এই শোনা থেকে বলা, বলা থেকে লেখা ও লেখা থেকে পড়া এবং আবার তা থেকেই বলা। এই চক্র থেকেই তো ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নেয়, আমরা তার সূচক তুলে নিই। এতে বিব্রত না হয়ে, বিক্ষিপ্ত না হয়ে ভাষার এই সব পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ করবার কথা আমাদেরই। আসুন, তাই করি। আমাদের প্রান্তজনের ভাষা স্বদেশে কি বিদেশে টিকিয়ে রাখি।

আমি যেদিন দেশান্তরী হই, তখন আমার মাতৃভাষায়ই জ্ঞাত ছিলাম তাবৎ পৃথিবীর তরিবৎ। সে বোধই ভাঙিয়ে মেখেছি, খেয়েছি, পান করেছি, দুঃখ দিয়েছি, দুঃখ পেয়েছি। সবই এক ও অনন্য বাংলা থেকে ভাষান্তরে, তার নানাবিধ ব্যবহারে, বহুবিধ প্রক্রিয়ায়। আমি করেছি গদ্য ও পদ্যে, কবিতা ও কানুনে, স্টোরিটেলিং ও স্টোরিরাইটিংয়ে, পারফর্মেন্স ও পিকেটিংয়ে, শিক্ষকতা ও সৃজনশীলতায়, নাটক লেখা ও দেখায়, উপস্থাপনা ও নির্দেশনায়, বাংলা ও ইংরাজীতে এবং আঞ্চলিক সিলেটিতে। বাংলাদেশ বসবাসের চল্লিশ আর বিদেশের ত্রিশ বছর মিলে সত্তর বছরের উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে মনে হয় বাংলা মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা করে শুধু মাতৃভাষা সম্বল করেই বেড়িয়ে পড়েছিলাম! কিন্তু তাও তো কম কিছু পাইনি। আসলে মাতৃভাষাটা মননে জাগিয়ে রাখলে যতটা যাওয়ার আকাঙ্খা থাকে - ততটাই যাওয়া যায়।

লন্ডন, যুক্তরাজ্য

শাহাব আহমেদ

শৈশব ও নাগেরহাটের অন্নদা পাগলিনী

নাগেরহাটে বড় ফুপুর ঘরের দরজার সামনেই ছিল বিরাট কদবেল গাছ, বাড়ি ভরে পাকা কদবেলের ঘ্রাণ। বেদানা গাছ নুয়েছিল লাল লাল ফুলে। ঘটোৎকচের বিশাল হাতের মুঠো-আটা বড় বড় বেদানাগুলো। একটি বাঁধানো কবর শুয়েছিল ছিমছাম নির্জন, কার কবর কে জানে, কিন্তু উঠানের ঠিক মাঝখানে। একটা কদমগাছ প্রচুর ফুল আর ছায়া দিত সেই তার শিয়র বরাবর।

বাড়ি থেকে নেমে খেতের আল ধরে কাঁসারু বাড়ির কাঁসার শব্দ শুনতে শুনতে পাশ কেটে হাঁটতাম। তার পাশেই বৈষ্ণব পাগল হরকুমারের স্মৃতি বিজড়িত ভিটা, শ্রী শ্রী রাধা-গিরিধারী আশ্রম ও মন্দির। সন্ধ্যার শঙ্খ বাজতো সেখানে, বড় মনোহর শব্দ সেই শঙ্খের। যেতে যেতে রাত হয়ে গেলে হাত-পা পেটের ভেতরে চলে যেতো 'ভুইট্টার পাড়ে'র কাছাকাছি এসে। আকাশ ভরা অসংখ্য তারা থাকলেও তারা ছিল ঈশ্বরের মতই স্বল্প আলোর, ভূত-প্রেত ও শয়তানের রাজ্য আলোকিত করার পর্যাপ্ত ক্যান্ডেলা তাদের ছিলোনা। জোনাকির আলো মূলত:ই মরীচিকার বিভ্রান্তি। চিতাখোলার একপ্রান্তে বিশাল ছাতা মেলে দাঁড়ানো বকুল গাছটা ছিল অন্ধকারে ভয় ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতির জন্ম দিতে অক্ষম। আর অন্যপ্রান্তে ঢ্যাঙ্গা শিমুল গাছটা অবয়বহীন দানব। দীর্ঘ ও একচোখা যে ভূতটা ওই জায়গায় আতঙ্ক ছড়িয়ে দাঁড়াত দুই গাছে দুই পা রেখে এবং তার রোমশ দুই উরু আকাশ-গামী ভেসালের মত উধাও হয়ে যেতো গহীনের অন্ধকারে। কত মানুষের ঘাড় যে মটকেছে সে, তার ইয়ত্তা নেই।

পাগল হরকুমার নাগেরহাটের সেই পুণ্যভূমিতে জীবন কাটিয়ে গেছেন।

তার স্মৃতি বিস্মৃতির খালে ডুবো ডুবো। নাগেরহাট বাজার থেকে কনকসার যেতে রাস্তার ডানপাশে পড়তো খাল। খালের পশ্চিম পাশে শ্মশান। হরকুমার ছোটকাল থেকে খাল, বিল, মাঠ এবং এই শ্মশানে সময় কাটাতেন।

সারাদিন টো টো করে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিস, যা স্নান করে আয়-মা বলতেন।

শ্মশানে শিব থাকে, এর মত পবিত্র স্থান আর নেই, সেখানে গেলে স্নান করারও প্রয়োজন নাই- হরকুমার বলতেন।

সংসারে ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে যখন বিয়ে করানো হল অন্নদা দাসীর সাথে, তারা 'রাত্রকে দিবা এবং দিবাকে রাত্র মনে করে' মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন এবং নৈশ নির্জন প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য দেখে 'ইহা ভগবানের বিভূতি' বোধে বিমলানন্দ অনুভব করতেন। শীতকালে ঘরে থাকতেন না। গ্রামের কোনো বাড়িতে হরিসংকীর্ত্তন হলে দুজনে উপস্থিত হতেন সবার আগে।

লোকজন আদর করে তাদের শিব-পার্বতী সম্বোধন করতো। কেউ কেউ প্রীতিভরে ডাকতো পাগল পাগলিনী। আদতে তারা ছিলেন সংসার বিবাগী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, ঈশ্বরের দুনিয়া ছিল তাদের ঘর এবং এরা তার রহস্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত সন্ত। যে অর্থে আমরা 'পাগল' বুঝি, তারা তা ছিলেন না, ছিলেন মানুষ ও বিশ্বসংসারের বিমুগ্ধ সন্ন্যাসী। মানুষ ছিল তাদের ভজনগুরু।

তাই কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথির গাঢ় অন্ধকারে মাঠে বের হয়ে জীবন-সংসারের অনিত্যতায় তিনি ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেন, 'অন্নদা! প্রিয়ে আমরা কোথায় ছিলাম? কোথায় আসিয়াছি? কোথায় যাইব? কিছুই যে স্থির হয় না।'
কিন্তু অন্তরে অনুভব করেন, 'অন্নদা-পাগলিনী ও আমি, আমরা এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব জুড়িয়া অবস্থান করিতেছি। সেই আনন্দাত্মক অখণ্ডভাব অব্যক্ত অর্থাৎ কেবলমাত্র নিজ বোধরূপ।'

অথচ অন্নদাকেও সেই একই প্রশ্ন বিচলিত করে, 'আমি কে? বলতে পারেন?'
'আমি কে? তাহাই আমি জানিনা, তুমি কে, তাহা কি করিয়া জানিব?'
'আমিই সেই মহাশক্তি' - অন্নদা বলেন।
'তবে আমাকে শক্তি সঞ্চার করো না কেন?'
'কি করি, মানবী হয়ে জন্মেছি যে, মানব-লীলা করতেই হবে।'
'তুমি কি সকলকেই সমানভাবে ভালোবাসো?'
'সকলকে সমান না ভালবাসিলে দোষ হয়। আমি যে জগৎ জননী। জগতের সকলই আমার সন্তান এবং আমি সকলের মা। আমি কেন ব্যক্তিগত ভালবাসিব? কেহ যদি মুখে আমাকে কটূক্তি করে সেও আমাকে দেখিবামাত্রই প্রাণে মাতৃ সম্বোধন করিবে। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-আধেয়, আমি আধার। আবার আপনি -আধার, আমি-আধেয়। আমি-আপনার; আপনি -আমার। আমাদের উভয়ের কদাপি বিচ্ছেদ-ভাব নাই।'

কোন একাডেমিক শিক্ষা ছিলনা, সনাতন ধর্মগ্রন্থ ছাড়া দর্শন শাস্ত্রের কোনো বই তারা পড়েছেন কিনা জানা নেই। ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকার রত্নসম্ভার তারা দেখেন নি বা স্পর্শ করেন নি, অথচ কি গভীরতা তাদের কথা ও উপলব্ধিতে! হ্যাঁ এই মহা-মানবেরা, হরকুমার ও অন্নদা, আমাদের লোকালয়ে হেঁটে গেছেন, সেখানেই মিশে আছেন মহামাতা ধরিত্রীর দেহের সাথে। আমরা লালনকে চিনি, হাসন রাজা, আব্দুল করিমকে চিনি কিন্তু ক' জন চেনে পাগল হরকুমার এবং অন্নদা পাগলিনীকে? অথচ

পাগল হরকুমারের লেখায়, বাণীতে রয়েছে জীবন সাগরে ডুব দিয়ে কুড়িয়ে আনা কত মণিমাণিক্য!

প্রায় ৭০-৮০ বছর অতিক্রম হয়ে যাবে, তার লেখার পাতাগুলো জীর্ণ হয়ে মহাকালে হারিয়ে যাবার উপক্রম হবে যখন, তারই শিষ্যরা ছুটে আসবে পদ্মায় বিলুপ্ত ঝাউটিয়া গ্রামের আর একজন প্রায় পাগলের কাছে, জাহান ফকির ওরফে অধ্যাপক শাহজাহান মিয়া, আমার বড় ভাই, বিক্রমপুরের ঐতিহ্য যার ধ্যানে জ্ঞানে, লেখাগুলো সম্পাদনা করে একসাথে সংগৃহীত করার জন্য।

'আমি তো মুসলমান, বৈষ্ণব সাধুর লেখা আমি কি সম্পাদনা করতে পারি?'

'আপনার চেয়ে যোগ্য কেউ নেই।'

'তার অন্যান্য শিষ্যরা রুষ্ট হবেনা?'

'কালের মুখগহ্বর থেকে এই মহামূল্যবান সম্পদের সংরক্ষণ আমাদের পবিত্র দায়িত্ব, আপনি কাজটি নিন।'

নাগেরহাটারে ইথারে কান পেতে আজও শোনা যায় সেই অতীতের কণ্ঠঃ

'স্ত্রীজাতি অবলা, সরলা; বিনাদোষে একটি পুষ্প দ্বারা আঘাত করলেও অপরাধ হইবে।'

'পতি-পত্নী অভিন্নাত্মা। তোমাকে সে ভক্তি করিলে তুমিও তাহাকে ভক্তি করিও।'

'ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি, পুণ্যস্থান; পুণ্য এই দেশের দেবতা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, গাভী এবং নদী।
'

সেই পুণ্যভূমির সন্তান আমি, পদ্মার কাদা ও এঁটেল মাটির মানব-অবয়ব। আমি নই কোনো পাঠান, মঙ্গোল বা আরব বেদুইন। আমার পূর্বপুরুষের কেউ তলোয়ার উঁচিয়ে বখতিয়ারের ঘোড়ায় চড়ে বাংলায় আসেনি।

তাই তো পাগল হরকুমার আমার সত্তায় অনুরণন তোলেন, যার দিব্য দৃষ্টি ও অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে জনশ্রুতি প্রচুর। একবার কাঁসারু পাড়ায় ভয়াবহ আগুন লেগেছিল, কোনোমতেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না। খবর আসে পাগলের কাছে, তিনি এক মুঠো বালু হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দিতেই ধীরে ধীরে আগুন নিস্তেজ হয়ে নিভে যায়।

গ্রামের হিন্দু-মুসলমান দুউ পরিবারের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা মারামারি হাতাহাতি ও লাঠালাঠির পর্যায়ে পৌঁছায়। পাগল হরকুমার তার আশ্রমের চালভাঙার ঢেঁকিটি হাতের তালুতে চক্রাকারে ঘোরাতে ঘোরাতে ঝগড়া-স্থলে উপস্থিত হন। ঝগড়ারত বেটে বামনেরা তড়িঘড়ি পালায়, দাঙ্গার হাত থেকে রক্ষা পায় গ্রাম।

শুধু তাই কি? তার শিষ্য সদানন্দকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন স্ব-অবয়বে নয়, শয়তানের আরশিতে মুখ ফিরিয়ে।সে যখন কোথাও কোনো অপকর্ম লিপ্ত হতো তা যতদূরেই হোক, তিনি দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেতেন।

একবার তিনি অন্নদাকে ডেকে বলেন, লোকজন নিয়ে এক্ষুনি খালের ঘাটে ছুটে যাও। সত্যি তারা ঘাটে গিয়ে দেখেন সদানন্দ কোনো এক কূলবধুর আঁচল ধরে টানাটানি

করছে। ধরে এনে জেরা শুরু হলে সে মিথ্যা বলে। কিন্তু পাগল হরকুমার খালের ঘাটে কি ঘটেছে তার হুবহু বর্ণনা দেন। সে তখন গুরুর চরণে লুটিয়ে পড়ে মাফ চায়। দীর্ঘদিন আশ্রমে থেকে সে গুরুর সেবা করে এবং তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসে। লেখাপড়া জানতোনা সে। গুরুমা অন্নদাকে একবার একটি চিঠি লিখে দিতে অনুরোধ করে।
'তুই নিজে লেখ!'- গুরুমা বলেন।
'মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমি কি লেখা-পড়া জানি?'
পাগলিনী তার মুখে ফুঁ দেন, 'যা চেষ্টা কর, তোর লেখাপড়া হবে।'
তাই হয়। সময়ে সে লেখাপড়া শেখে, ভাগবত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যায় বুৎপত্তি অর্জন করে। ভক্তিগীতি লেখে, সুর দেয় আর গান গেয়ে বেড়ায়।

বাড়ি বাড়ি করে পাগল
আসল বাড়ি কোথায় তাই জান না
শুধু নকল নিয়ে টানাটানি
আসলের নাই ঠিকানা....

অথবা

পেয়েছ মানব জনম, কর হরি ভজন রে মন, কর হরি ভজন....

তন্ময় হয়ে পড়ছি।

'আকাশ মার্গে বৃহৎকায় পাখী উড়িতেছে এবং তাহার নিম্নভাগে এক মহাসমুদ্র। ঐ সমুদ্রে একখানি নৌকা ডুবিয়া যাইতেছিল। ঐ জলমগ্ন নৌকার আগায় ও পাছায় এবং ঐ বৃহৎকায় পাখীর দুই পায়ে দৃঢ়রজ্জ বাঁধা রহিয়াছে। বৃহৎকায় পাখীটা ঊর্ধ্ব অভিমুখে উড়িয়া উড়িয়া, অতিকষ্টে, ধীরে ধীরে জলমগ্ন নৌকাখানি জল হইতে জাগাইয়া তুলিতেছেন।

ইতিমধ্যে ঐ মহাসমুদ্র, মহাকায় পাখী এবং সমুদ্রে জলমগ্ন নৌকা সবাই অন্তর্ধান। অন্নদা পাগলিনী প্রকাশ হইয়া আমাকে এই বলিলেন যে, আপনি যে নৌকা, পাখী এবং সমুদ্র দেখিতেছিলেন, আমিই ঐ পাখী; আমিই ঐ নৌকা। আপনি ঐ মায়া সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছিলেন, আমিই আপনাকে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে উত্তীর্ণ করিতেছি।'

মনে নেই অন্নদা পাগলিনী বলেছিলেন, 'আমি যে জগৎ জননী। জগতের সকলই আমার সন্তান এবং আমি সকলের মা?'
কে বলে আমি তার সন্তান নই?

ওকালা, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

শুভশ্রী নন্দী

শ্রীচরণেষু বাবা... ইতি তোমার শ্রেণীশত্রু কন্যা

একটা সময়ের ইতি।

উল্টোডাঙা দিয়ে ঢুকলে, সল্টলেকের প্রথম স্টপ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। বাস কন্ডাক্টাররা যাকে 'পি.এন.বি , পি.এন.বি' বলে চ্যাঁচায়। সেখানেই কয়েক ফুট দূরের 'বি.বি.ব্লক' আমার ভাগ্যনিয়ন্তক হয়েছিল। পাত্রপক্ষের দুর্বলতা 'শ্রীহট্ট ও শুকনো মাছ'। আর কন্যাপক্ষের পাত্রী, আমেরিকান গালিগালাজ অনুযায়ী 'গিক'। পড়া ও পড়ার সিলেবাসের বাইরে, - একজন নির্ভেজাল 'গ্রন্থকীট।এইসব অনেক উপাদান বা ফ্যাক্টরই 'সোহাগে 'সোনা' হয়েছিল না সোনায় 'সোহাগ' হয়েছিল, বলা মুশকিল। পাত্রের বাবার নাম নবকুমার নন্দী শুনে, যখনই তিনি আসতেন, আমার রসিক মাসীরা পাশের ঘরে আমায় খ্যাপাতো, "অয়ি কপালকুন্ডলে, নবকুমার এইবার পথ হারাইয়া নয়, পথ সুনির্বাচন করিয়া আসিয়াছে।"

পাত্রী দেখার সময় ও পরে দেখতাম, যতবারই দেখা হচ্ছে, দুষ্প্রাপ্য সব 'বই' উপহার পাচ্ছি। বার বার শুনছি, আশীর্বাদে নাকি আসবে রবীন্দ্ররচনাবলীর সবকটি সংখ্যা, তাও আবার সোনালী রঙে রবীন্দ্ররচনাবলী যেমন লেখা থাকে, তেমনি 'শুভশ্রী' লেখা থাকবে বইয়ের গায়ে। পাত্রীর উচ্চ মধ্যবিত্ত বাড়ি একটু চিন্তাগ্রস্ত। কন্যাপক্ষীয়রা আশংকিত যদি আশীর্বাদে কেবলমাত্র বই-ই আসে! হয়তো দেখা গেলো যে একের পর এক রবীন্দ্ররচনাবলী গাড়ি থেকে বেরিয়ে শীতল পাটি বিছোনো কন্যার মঙ্গলাচরণের আসরে পৌঁছে গেছে! মা 'ব্যাক-আপ'জোগাড়ে 'প্যাক-আপে' ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাড়তি একটা বেনারসী, বাড়তি এক সেট গয়না। সমাজের কাছে মুখরক্ষা করতে হবে তো!

পরে শুনেছি পুত্র কন্যা জন্মের পর বা বিবাহবার্ষিকীতে তিনি নাকি তৎকালীন এক/ দেড় ভরি সোনার মূল্যে এনসাইক্লোপিডিয়া-দশটি খন্ড বা 'ল্যান্ডস এন্ড পিপল'-এর ৭ টি খন্ড এবং 'পপুলার সাইন্স'-এর ১০-টি খন্ড জাতীয় বইয়ের সিরিজের সেট-ই দিতেন। যা বৃটিশ বা আমেরিকান পাবলিকেশনে আগে থেকে অর্ডার করলে, তবে পাওয়া যেত।

ছেলে চাকরি পাওয়ার পর উপহার পেল, 'এরাবিয়ান নাইটস' এর সুর সংকলনের ক্যাসেট গুলো।

নাতনির মুখ দেখে দু-ফুট বাই দু-ফুটের অক্সফোর্ডের বাঁধাই করা আটলাস বই, আর দেওয়ালে সেই আকারেরই পাহাড়-নদী ছুঁয়ে অনুভব করার মতো থ্রি- ডাইমেনশনাল ম্যাপ। এমন দেখনদার মানচিত্র ত্রিভুবনে আর দেখিনি। কন্যাপক্ষও তথৈবচ। বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়ে লোকে গাড়ী-বাড়ী দেখে। কন্যার পিতা ঘরের চার দেয়াল জুড়ে থাকা লাইব্রেরীর দুষ্প্রাপ্য বই দেখে মুগ্ধ। কন্যাকে বলেন, "লাইব্রেরীটা তোকে দিয়ে যাবে বলেছেন।"এই শর্তেই বিয়ে পাকা হয়ে গেল। কন্যার অবশ্য **১৯৯১** -র শুনশান দুপুরে বাড়ীর এ্যাকোয়েরিয়ামে ভাসন্ত জোড়া ডিসকাস মাছ, নিয়ন টেট্রা আর ফুল ঘেরা বারান্দার কোণে খাঁচায় পোষা ফিঞ্চ ও বদ্রী পাখীদের সাথে আলাপ করে নতুন শহর বেশ চেনাই শুধু নয়, আপন হয়ে যায়। হাত বুলিয়ে দেখে তাঁর বুক উচ্চতা সমান, এক সাহেবের কাছ থেকে কেনা সেগুন কাঠের কল-ঘোরান গ্রামাফোন রেকর্ড প্লেয়ার। এখন এ্যান্টিক, যেটা দেখলে তাঁর তখনকার বরাক নদী, বড়াইল পাহাড়ে ফেলে আসা জীবন মনে পড়ে যায়।

১৯৯১ সালে বৌভাতের শাড়ি এসেছিল 'বালুচরী'-তাও আবার ‘লাল -নীল-সবুজের মেলা’ নয়, যাকে বলে রাস্ট বা ইটরঙা । ব্যতিক্রমের বাড়ি। পাত্তর-ও তেমনি । কেউ হয় সুগায়ক, কেউ কবিতা পড়তে ভালোবাসে। এমনই তো শুনে এসেছি । পাত্র নাকি চাকরি থেকে বিয়ের মধ্যবর্তী সময়ের সাত বছরে সমস্ত সঞ্চয়-নয়ছয় করে, রাশিয়ান ক্যামেরা 'জেনিথ' নিয়ে হিমালয়ের কুমায়ুন আর গাড়োয়াল অঞ্চল চষে বেরিয়েছে । তাঁর ছবির ঝুলিতে 'ব্রহ্মকমল' যা নাকি **১৪,০০০** ফুটের ওপরই হয়। সালটি **১৯৯১**। জনসংযোগে তখনো দুর্বলতার প্রাদুর্ভাব, তাই ঐসব খবর বেশ চমকপ্রদ লাগতো।

'কিছু চাই না কিছু চাইনা ' এই সোচ্চারে 'এমনকি খাটও দিতে পারবেন না, এই বিয়েতে,-ব্যাচেলার খাট টি দেখে কন্যাপক্ষের আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হয়ে বিয়ে ভাঙার যোগার।

চল্লিশটি -ট্রে জুড়ে তত্ত্ব উঠছে তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে। তবু শ্বশুর মশায় খুশি নন । তিনি ঠিক 'পণ-বাজ' শ্বশুরের মতোই জোড়ে জোড়ে সবাইকে শুনিয়ে বলছেন, "এইসব দিয়ে কি হবে? বলেছিলে পি.এইচ.ডি.-র কথা, সেটা কোথায়?" আমি বুঝলাম যে এই ‘পণটি রক্ষা করতে না পারলে, দেনাপাওনার হিসাবজনিত জীবনের জটিলতা থেকেই যাবে।

নব পুত্রবধূকে নিয়ে যেতেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে । তখন সল্টলেক - আলিপুর মিনিবাসটির দুনিয়া ঘুরে পৌঁছুতে প্রায় একঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে যেত। সেই লাইব্রেরির ওপরতলার বিশেষ আসনে সদ্যজাত শ্বশুরমশাই সাথে মহাদেব সাহা, সাংবাদিক ও হোলটাইমার মুরারীবাবু, অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন আর নিচে ‘কমোনার্স’ হিসেবে ‘সদ্যজাত’বৌমা। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাট থেকে বাড়ীর পথ ধরে হেঁটে আসতেন এই লাইব্রেরীতে। ঠিক তিনটের সময় রুটি নিয়ে একসাথে

টিফিন খেতে বসতেন তাঁরা। আলিপুরের আগে ধর্মতলায় জবাকুসুম অফিসের গায়ে ন্যশন্যল লাইব্রেরী ছিল, তখন থেকেই সেখানে তাঁর যাতায়াত। দীর্ঘদিনের এই নিষ্ঠাবান 'বই-প্রেমী'-কে 'ন্যাশন্যল লাইব্রেরি' সম্মান জানায় সম্বর্ধনা দিয়ে, মাথায় 'পাগড়ি' পরিয়ে। সেই 'পাগড়ি'-ই হোক বা বক্তৃতারত সীতারাম ইয়েচুরির সাথে একই মঞ্চে বসে থাকা ছবির মত জীবনের সব মূল্যবান 'আর্টিফেক্ট' বা স্মারক তুলে দিয়েছেন রক্ত-সূত্রতা বিহীন তাঁর 'দামাল ছেলেকে সামাল দেয়া'- এই পুত্রবধূ নামের 'কন্যা'র হাতেই। সেই 'পাগড়ি' বুকে করে নিয়ে সযত্নে রাখা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাড়িতে, তাঁর 'গোকুলে বাড়িছে নাতজামাই-কে এ্যাসেট হিসেবে দেয়ার জন্য।

১৯৩০শে জন্মেছিলেন পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস পরিবারে। তাঁর ছাত্রজীবনে নতুন স্বাধীনতায় দেশ খানিকটা উদ্বেলিত। কলকাতায় মুজাফফর আহমেদের সাথে সাক্ষাতেই 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যয়' মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া। কলকাতার কলেজ অধ্যাপনার জীবনের শুরুর পর্ব থেকে পার্টির ছোটছোট ইউনিটগুলোর সঙ্গে দুর্যোগের সময়ে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা, পার্টি সংক্রান্ত গোপনীয় ব্যাপারে গোপন ক্লাস নেয়া -এই কাজগুলো করে গেছেন। প্রমোদ দাশগুপ্তের ব্যক্তিগত সচিব পরেশ সাহা-র মতে "পার্টি ভাগ হয়ে যাবার পর মুজাফফর আহমেদের কাছে তাঁর সরাসরি দীক্ষা হয় 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যয়' মন্ত্রে। মুজাফফর আহমেদ, সরোজ মুখার্জি এবং প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁদের জীবদ্দশার শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বস্ত গোপন খবর কেন্দ্রিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সরাসরি যোগাযোগ ছিল। তাই এইসব মানুষদের কাছে এত ঋণ থাকে, যে সব ঋণ কাগজে পত্রে ধরে রাখা সম্ভব হয়না আর সমাজ মানসিকতা এত পাল্টে গেছে, যে তা আজ আর কাউকে বোঝানোও সম্ভব না।"

কলেজ সার্ভিস বোর্ডের চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর অন্যতম বোর্ড অব ডাইরেকটার্স; আজীবন ছিলেন বিমান বোসের ডাকে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত।

দিল্লীর পার্টি অফিসের হেড মহাদেব প্রসাদ সাঁউ কলকাতা আসলে আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। 'গুগলমামা' তাঁর খবর জিজ্ঞেস করলে হাত উল্টে দেন।

অসুস্থতার সময় বিমান বোস আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে দেখতে আসেন।

ফোনের রিং-এর জবাব দিতে গিয়ে বলছি, "বাবা-কে দেব?" ওপারে কখনো বিমান বসু কখনো বা কেতা দুরস্ত লোক। এত ব্যাপ্তি ছিল তাঁর বন্ধুমহলের আলোচনার বিষয়ে, কিন্তু আক্ষেপ হত যে আড্ডার মহলটা বাড়ীতে বসতো না। এত দিকপাল আসতেন, চা দেবার সময় পরিচয়টুকু ছাড়া, সমুদ্দুরটি হাতের নাগালের বাইরেই রয়ে গেল। তার মধ্যেও নুড়ি কুড়নোর সময় কত মুক্তোই না হাতে এসে ধরা দিয়েছে। একদিন চা হাতে নিয়ে একজনকে বড় চেনা মনে হল। শিলচরের মঞ্চে তাঁকে দেখেছি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের দলে গান গাইতে। তাঁর স্ত্রী গৌরীয় নৃত্য নিয়ে অনেক মৌলিক কাজ করেন। তিনি বাবার ছাত্রী। আরেকজন আসতেন যিনি নব্বুইয়ের দশকে মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্বেও হোম মেকিং স্বামী। তাঁর স্ত্রী ছিলেন চাকুরীজীবি। কি চমৎকার কথা বলতেন! একদিন

বললেন, “নবদা, মিটিং মিছিলের জন্য আপনাদের সপ্তাহব্যাপী আয়োজন কোথায়, কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো কেমন করে ঠিক সময়মত জড়ো হয়? তাঁদেরতো কই বুঝিয়ে জোর করে আনতে হয় না!“ আরেকদিন বললেন, “একটা ঘর ভাড়া করতে লাগে মাসে দুহাজার টাকা, আর ৯ মাস জঠর ভাড়ার দাম কত হবে বলুন তো? ন্যায্য দাম দিতে পারছি না, অগত্যা ‘স্লেভ’ বানিয়ে রাখ।”

আর হালে প্রায়ই দেখতাম ‘স্পন্দন পিপলস্ থিয়েটার’ এর বাপী দাশগুপ্ত ও ‘কিশোরভারতী’ পত্রিকার প্রকাশক দিনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ‘পত্রভারতী’ প্রকাশক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়কে। এক ‘বন্দ্যোপাধ্যায়ের’ রবীন্দ্রবিষয়ক বিশেষ কিছু লেখা প্রকাশে কিছু প্রশ্ন ছিল আমার। কিন্তু চা বিস্কুট হাতে সে কি আর করা যায়? আবার সদ্য সদ্য পদবী-উহ্য আমার অন্যতম প্রিয়কবি আরেক ‘বন্দ্যোপাধ্যায়ের’ ‘মুখবই’ এর লেখাসংকলন নিয়ে বই প্রকাশ করার উদ্যোগে আমার সব গোঁসা জল হয়ে গেল। আরো আসতেন এবং এখনো দেখি চীনে জীবনাবসানের আগে অবধি প্রমোদ দাশগুপ্তের পি.এ. হোলটাইমার পরেশ সাহা। যার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের বিশাল গ্রন্থাগারের ঠিকুজী-ঠিকানা কণ্ঠস্থ। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করতেন যে তিনি সাথে থাকলে প্রমোদ দাশগুপ্তর চীনে এমন মহাপ্রয়াণ হতো না।

বাড়িতে আসতেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী যিনি নকশাল আমলে হারিয়ে গেছেন চিরতরে আর পরেশ চ্যাটার্জি যিনি আত্মরক্ষণার্থে ক্যানাডা পালিয়ে যান।

অনেক কলেজের শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন।

রবীন্দ্র পুরস্কার,দীনবন্ধু পুরস্কার ,বঙ্কিম পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার, বাংলা একাদেমি পুরস্কার ইত্যাদি সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কার নির্বাচন কমিটিতে ছিলেন।’আলোর ফুলকি’-র নির্বাচন কমিটিতেও ছিলেন। এগুলো ঘুণাক্ষরে আলোচনা করতেন না বলে আমরা জানতামও না। ৯০ বছরে তাঁর স্মৃতি এলোমেলো হয়ে যাবার অনেক পরে ‘কিশোর ভারতী’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক দীনেশ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র কলকাতা বইমেলার কর্ণধার ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়ের মুখেই শুনেছি।

বাবা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি শঙ্খ ঘোষের সহপাঠী। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সেই বিশেষ লবি-তে শঙ্খ ঘোষও থাকতেন। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বাবা উল্লেখ করতেন, ‘বুদ্ধ ভট্টাচার্য’-বলে। উনি যখন পডাতেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তখন ছাত্রআন্দোলনে জড়িত। তিনি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র। বসন্ত কেবিনে চায়ের দাম যখন তিন পয়সা, তখন থেকে যাতায়াত তাঁর সেখানে। বসন্তকেবিনের সেই আড্ডায় ডক্টর রবীন্দ্র গুপ্ত যেতেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বসন্ত কেবিনে দেখা হলেই বলতেন, “কাঁধের ঝোলাতে নতুন কি বই আছে, বার করুন তো, দেখি একটু! প্রতি বৃহস্পতিবার অনেক রাতে আড্ডা সেরে কল্যাণীতে ট্রেনে বাড়ি ফিরতেন তিনি।

কল্যাণীতে তাঁর আরেকটি আড্ডা ছিল ‘মৌমাছি’র বাডীতে। ‘মৌমাছি’ অর্থাৎ সাহিত্যিক বিমল ঘোষের বাড়িতে। দুই নাতনী ছিল তাঁর পুত্রের সহপাঠী। ‘মৌমাছি’

ছিলেন সেখানে মণিমেলার প্রতিষ্ঠাতা। দুই নাতনী ‘অনামিকা’ও ‘অনিন্দিতা’র নামের মণিমেলার শাখায় ছিল ছোটদের ভিড়। অনেক পরে কল্যাণীর বাগানবাড়ির নাম রেখেছিলেন ‘দার্শনীকি’। কল্যাণীর একটা বাড়ির নাম খুব করতেন, যে বাড়ির নামটি গ্রীক ভাষায় লেখা, যার মানে, ‘যে যেমন দেখে।

আর পরিতোষ ভট্টাচার্যের বাড়ির আড্ডায় যেতেন সেখানে নাকি আড্ডার বিষয় শুধুই থাকত ‘অঙ্ক’। ।সারা সন্ধ্যা অঙ্ক নিয়েই কাটাতেন তাঁরা।

এমনও হয়েছে প্লেন থেকে নেমেই জেটল্যাগ নিয়েও সটান হাজির হয়েছি কফিহাউসে তাঁর সাথে আড্ডা দিতে। ফিরেছি বইপাড়া থেকে কন্যাদের জন্য অগুণতি বই কিনে। এখানেই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতেন, তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলেজসার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর অন্যতম বোর্ড অব ডিরেক্টরও। হেগেল সহ দ্বন্দ্ববাদের মূল বইগুলো পড়ে, তার তাত্বিকদিক নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করতেন।

অথচ সকালে বাড়ির মেয়েদের ঘরের কাজে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও হাত লাগাতেন প্রতিদিন। এক টেবিলে বসে তরকারী কাটার বহু স্মৃতি রয়েছে। ফ্ল্যাটে মেয়েদের সাথে ঘরের কাজে হাতলাগানোর ব্যাপারে একটি বাড়িতে একসাথে এতজন পুরুষ কম দেখেছি। সকালে সেই বাড়ির খাবার টেবিলে নির্দ্বিধায় ধ্বজা তুলে রয়েছে ‘সাম্যবাদী’ চিত্র। মেয়েরা করছে ২২ টি তরতাজা লুচির মত ফুলে ওঠা নাদুস-নুদুস রুটি, তখন তখন ছানা কেটে রুটির তরকারী, আর ছেলেরা কেউ মিক্সিতে করছে বেদানার রস, কেউ ছাড়াচ্ছে মটরশুঁটি বা আকাশী (যা আকাশমুখী হয়ে থাকে গাছে) লঙ্কার বোঁটা বা ভরে চলেছে একোয়াগার্ডের আজকের দিনের জন্য টাটকা জল। বাবা করতেন সবচেয়ে কঠিন কাজগুলো, চিংড়ির শিরা বাছা বা কলার থোড়ের সূতো আঙুলে পেঁচিয়ে ছাড়ানো কিংবা কাঁঠাল ভাঙা। রান্নার লোক ছাড়াও আরো একটি লোক সাহায্যের জন্য এই এলো বলে জানাসত্ত্বেও।

সৌখিন হয়েও সকলের শখের সাথে মেলেনা শখ। বাড়িতে আসে ২৩ টি পত্রিকা ও খবরের কাগজ। ফ্ল্যাটবাড়ির ছাতে ২০০ টি টবে -গোলাপ চন্দ্রমল্লিকার বাগানের সাথে রয়েছে টবে বনসাই করে ধরে রাখা পেয়ারা ও বেদানা। বনসাইয়ের তালিকায় আরো রয়েছে হরেক রকম চমক। একটি বনসাই টব জুড়ে আদ্ধেক হলুদ রাধাচূড়া ও আদ্ধেক লাল কৃষ্ণচূড়া। আর কল্যাণীর বাগানবাড়ির চন্দন গাছটি পুরুলিয়ার শালবন থেকে আনা। বাগানের গা ঘেঁষে বাড়ির সামনে মখমলের মতো নরম বারমুডা ঘাস আর তার পাশেই ঘাসের সমান্তরালে পাথর বসানো এক জলাধার । যার বুকে ছুটছে অনেক রকমারি মাছ ও ভাসছে পদ্মপাতা। আমেরিকা আসার বহুযুগ আগে নিজের ভাবনাতেই তাঁর পুত্র ক্যাথিড্র্যাল সিলিং এর নকশায় তৈরী করেছে সে বাড়ি। কল্যাণীর বাগানবাড়িতে ফলানো, চেনা অনেক নামের সাথে অচেনা আমগাছের তালিকায় রয়েছে ‘আম্রপালী’, ‘বিশ্বনাথ’, শাহজাহানের আমলের আম: ‘কহিতুর’এবং ‘মোলায়েম জাম। কল্যাণীর বাগান যেন কবিরাজিখানার সূত্রধর। ভেষজ পথ্যের ঠিকানা-ঠিকুজি।

নামজপের মত আওড়ান বাবা, 'ডুমুর' থাইরয়েড প্রতিষেধক, 'রিঠা' 'কেশ-স্বাস্থ্যকারক', 'কুলত্বকলাই' কিডনি দেখভালে ভালো, 'মেথির খিঁচুড়ি' বসন্ত প্রতিষেধক, 'ব্রাহ্মিশাক' নার্ভশীতলকারক, 'কুলেখারা'রক্তসঞ্চালক ,'থানকুনি' পেট শান্তকারক। কল্যাণীর বাগানবাড়ি 'দার্শনিকী'র সূত্রেই জেনেছি শাকের শতনাম (বথুয়া, বন্জামি ইত্যাদি) আর তাঁর নিজের মুখে মাছের কোটিনাম। বিলাসের ব্যাপ্তি ওই অবধিই। তাঁরই লালনে অসাধ্য সাধন করে কল্যাণীর জমির মাটি। আমেরিকা থেকে নিয়ে যাওয়া এভোকাডোর চারটে বীজ ফুঁড়ে ওঠে চারটি চারাগাছ। দিনে দিনে শক্তপোক্ত কৈশরিক ও যৌবনোন্মুখ হয়ে ওঠে। শীতকালে টগবগ করে ফোটা বাড়ির কড়াতে উপচে পড়া কমলা রঙের টমেটোস্যুপের সব্জীগুলোর আমদানীর রসদও যোগাতো এই বাগান।

জল তো নয়, গাছের আরেক নাম জীবন। বইয়ের আরেক নাম শ্বাসপ্রশ্বাস। দৃষ্টিক্ষীণতায় নিজে আর লিখতে পারেননা, তবু মুখে মুখে বলছেন আর লিখে যাচ্ছে ছাত্র এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড স্বীকৃত বই সহ অসংখ্য বই।

সপ্তাহ ভাগ করে দিনগুলো ছিল এরকম: শনি থেকে সোম কল্যাণীর বাগানবাড়ি, মঙ্গলবার গোটা দিন ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি, বুধবার কলেজস্ট্রীট বইপাড়া ও কফিহাউস, বৃহস্পতিবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিট ও ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, আর শুক্রবার বই লেখা হচ্ছে শ্রুতি-র মাধ্যমে। ৮৮ বছর পর্যন্ত বাস-ট্রেন করেই।

পারিবারিক ডাক্তার মণিদি –ব্রাইট নার্সিংহোমে নাকি দেখা হবে। মন খুঁতখুঁত। কেমন হবেন কে জানে ! ও মা গিয়ে দেখি সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী 'টেস্টটিউব বেবী খ্যাত' বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর প্রথমা স্ত্রী। একসাথে তাঁরা লন্ডনে এফ.আর.সি.এস. করেছেন। মেধাবী মণিদি উচ্চমাধ্যমিকে হয়েছিলেন দ্বিতীয়। এমন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব কম দেখেছি। সেযুগের 'সিংগেল মাম', একাই চালান পার্কসার্কাসের একটা তিনতলা নার্সিংহোম। কন্যা প্রথম আলোর মুখ দেখবে তাঁরই হাত ধরে। এর চাইতে ভালো আর কি কিছু হতে পারে?

নাতনিদের জন্মের আগে ধোঁয়া ওঠা গরম গ্লাসের দুধে, কাশ্মীরি ফল 'মনাক্কা-শোয়ারা'ফেলে নরম করে খাবার জন্য সেগুলো আনতেন বাজার থেকে । আর মেয়ে হবার পরে জ্যান্ত মাগুরমাছ সাঁতরে বেড়াতো হাড়িতে। পরদিন নিজের হাতে কেটে দিতেন একটা করে আয়া সহ তিনজন কাজের লোক থাকা সত্ত্বেও। নাতনীদের বয়সোপযোগী মানসিক বিকাশের জন্য ঠিক হাতে করে নিয়ে আসতেন সময় মাফিক খেলনা। সেগুন কাঠ দিয়ে বিশেষ মিস্ত্রীকে দিয়ে বানানো হল 'কট্', ১৯৯৪ সালে বিশেষ আর্টিস্টকে দিয়ে মিকি মাউস ও ডোনাল্ড আঁকা নবাগতা ক্ষুদে সন্তাটির জন্য। বারান্দায় তাঁর স্নানের জন্য আলতো তাপে গরম হচ্ছে নিমপাতায় ভেজানো সূর্যের মুখ ভাসা আয়নার সোনালী জল। সেই মেয়েদের কলেজ ঢোকার সাফল্যের খবর প্রিয় পুত্র দিতে গেলে শুনেছে, "রাইয়ের জন্যই হয়েছে।"অথচ দু' বছরের প্রিয় পুত্র সোনার নিভের পার্কার কলম তাঁরই আস্কারায় চিবিয়ে খেলা করতো।

একবারই বাধ্য হয়ে এসেছিলেন এদেশে, বুর্জোয়ার দেশে আসার জন্য বন্ধুদের তির্যক কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। তাই আনার ব্যাপারে খুব উদ্যোগ নেইনি, তবে মেয়েদের

নিয়ে আপ্রাণ ছুটে ছুটে গেছি আর আড্ডা মেরে বুঝেছি তৎকালীন রাজনীতি যারা করতেন তাঁদের কি তুখোড় বুদ্ধি থাকতো। বাড়িতে লুঙ্গি আর খাদির ধুতি-পাঞ্জাবি আর ঝোলা ব্যাগের মূল্যবোধে বিশ্বাস করা প্রজন্ম হয়তো এঁদের সাথেই শেষ হয়ে গেলো। নিজে অংকে ও পদার্থবিদ্যায় ভালো থাকা সত্ত্বেও পড়েছেন দর্শন। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ছেলে পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর মত ছিল না ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সপক্ষে। একরকম বিরোধিতাই করেছিলেন সর্বশক্তি দিয়ে, চেয়েছিলেন ভালো করে অঙ্কটা শিখে অধ্যাপনা করুক।

মুখে যা বলেন, কোন আহাম্মক রাজনীতিবিদ তা কাজে দেখান? নিজের সন্তান স্থানাভাবে টেবিলের তলায় বসে পড়াশোনা করতো, বাড়ি ছিল উপচে পড়া জমজমাট আত্মীয় স্বজনে। দুই শ্যালিকা ও এক শ্যালক মানুষ হয়েছে তাঁর বাড়িতেই। এছাড়া সাময়িক বছর-দুবছর থেকে পড়াশুনো করেছে অনেক আত্মীয়স্বজন। নিজ হাতে কন্যাদান করেননি। পুত্রের বিয়েও হয়েছে রেজিস্ট্রেশন করে। ধূপ-ধুনো-দেবদেবীর মূর্তিবিহীন বিরল গোত্রীয় একটি বাড়িতে হঠাৎ করে পড়ে, তাঁদের আলোচনায় 'গোষ্ঠি-সমষ্টি' সব শব্দাবলী শুনে আমার মনে হত যে ভস্তকের সূত্রে যেমনটা পড়েছিলাম, বাড়ির পরিবেশ যেন রুশ পারিপার্শ্বিকতা বিষয়ের এক প্র্যাকটিক্যল ক্লাস। 'প্রলেতারিয়েত', 'বুর্জোয়া' এই শব্দাবলী আজ যতই ভবিতব্যহীন ইউটোপিয়ান হোকনা কেন, সেই প্রজন্মটি কিন্তু একটা স্বপ্নে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই একটা সাদা-মাটা জীবন, যেখানে বিলাসিতা বলতে শুধুই ঘাসপাতা।

একসময় 'কাঠের চেয়ারে' বীচ তোয়ালে, লেদার সোফাতে 'বেডকভার' দেখলে রক্তচাপ বেড়ে যেত যে আমার, আজ এই ভেবে গর্বানুভব হয় যে তাঁর সমসাময়িক সহযোদ্ধাদের বাড়ি তো এখন বিলাসে উপচে পড়ে!! তখন মনে হয়, বিশ্বাস আঁকড়ে ধরা এই প্রজন্মের হয়তো এখানেই যবনিকাপাত।

গুণগতমানের হীনতর শাড়ি পড়লে হীনমন্যতায় ভোগা স্বাভাবিক। কিন্তু একটু ভালো সিল্ক পড়লে শ্বাশুড়ি মাকে অস্বস্তি বোধ করতে দেখেছি। বাবা বলতেন, "আমরা যে কথা বলি, তাতে এ বিলাস মানায় না।"অথচ রুচি বা নেকনজরের ব্যাপারে কোন প্রশ্নই নেই। একটা গয়না কিনতে হলে, তার ঠিকানা হতে হবে 'চন্দ্রবাড়ী,' একটা কাঠের আসবাব হতে হলে, নিশ্চিত নিদেনপক্ষে হবে 'সেগুন', আর এক কাপ সোনা গলানো চা হাতে নিতে গেলে, শরণাপন্ন হতে হবে 'বইপাড়ার সুবোধভাইয়াদের'। বিলাসিতা বলতে এটুকুই।

'গণশক্তি' ও 'একসাথে' প্রাধান্যের বাড়িতে প্রায় 'একসাথে 'পত্রিকার শুরুর দিন থেকে লিখে আসছেন শ্বাশুড়িমা। গুগল যেখানে বিশ্বের মামাবাড়ি, সেখানেও এ সম্পর্কিত কোন হদিশ মিলল না। যেটুকু শুনেছি, আসল পত্রিকার শুরু হয়েছিল অন্য একটি নামে প্রিয়ংবদা দেবী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর হাতে। এরপর অনেকটা পথ চলা। সি.পি.আই এবং সি.পি.এম. ভাগ হয়ে যাবার পর সি.পি.এম.-এর কণক মুখার্জি 'একসাথে' নামে অনেকদিন চালান এটি। পত্রিকাটির ২৫ বছর বা রজত জয়ন্তী উপলক্ষে প্রখ্যাত অভিনেতা উৎপল দত্তের স্ত্রী শোভা সেন-কে জানানো হয় সম্বর্ধনা এবং

দীর্ঘদিনের লেখিকা হিসেবে স্বীকৃতি জানানো হয় অনেকের সাথে শাশুড়ি মা অতসী নন্দী-কেও। মেয়েরা লেখে, মেয়েরা পড়ে, মেয়েরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করেন। লালদুর্গ পতন হলেও, আজও ৮০ বছর বয়সে লাঠি নিয়ে লবণহ্রদের দরজায় টোকা মারেন 'টক্ টক্ টক্' 'একসাথে' হাতে। এই 'মল্ সংস্কৃতি'তে ডুবন্ত, ভোগবাদ আলিঙ্গন করা সাম্যবাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়া কোন দরজায় মাথা খোটেন তাঁরা, বাস্তব অগ্রাহ্য করে? ইতিহাসের তো কোন দায় নেই এ উত্তর দেবার!

ভুল ঠিক যাই হোক না কেন, এঁরা কিভাবে নিজের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রাখতেন, তার একটা নমুনা, আমার দেবর যার নাম শ্বেতকেতু, অনেকেই 'লালকেতু' বলে খ্যাপাতো, সে তাঁর শৈশব মনে করে বলে, " দাদার জন্য কিশোর ভারতী, দিদির জন্য সন্দেশ আর আমার জন্য...." আমি 'আনন্দমেলা' বলে উঠতেই সে বলে, " না না সে তো বুর্জোয়া পত্রিকা, বাড়িতে রাখতে দিতনা। আর গণশক্তিতে তখন ছিল ঐটুকু খেলার খবর। তাই পাশের বাড়িতে গিয়ে 'নিষিদ্ধ' বই পড়ার মত 'আনন্দমেলা' পড়তাম।"এ অবশ্য আশির দশক পর্যন্তের গপ্পো। ৯০-এর দশকে আমি মহানন্দে 'আনন্দবাজার পত্রিকা পড়েছি সে বাড়িতে। কি দেখে এনেছিলেন জানিনা, কিন্তু সে বাড়িতে আমি আমার মতই এসে, থেকে ও বেড়ে উঠছিলাম। হয়তো কিছুটা নয়, অনেকটা সংগ্রাম করেই।

মাঝেমধ্যেই নাতনীর স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে 'নতুন মা'ও 'নবজাত দাদু'র মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয় নবজাতিকাটির খাদ্যতালিকায় 'ছাগলের দুধ'এর সূচনা করার প্রসঙ্গ নিয়ে। বিতন্ডার অবকাশ নেই, পরিবারের 'মধ্যপদলোপী কর্মধারয়'টির কথা ভেবে।

এই 'খেতাব'টি দেয়ার কারণ, এ ব্যাপারে তাঁর কোন 'রায়' ও নেই, 'সায়'-ও নেই। তাই তাঁকে সিন্ থেকে 'লোপ 'করে দেয়াই শ্রেয়। মাঝেমধ্যেই মনকষাকষি, যা এইদুটি মানুষছাড়া কাকপক্ষীও টের পাবে না। বাক্যালাপ ছাড়াই 'আদরের পুটুলিটির ', একোল থেকে ওকোল বদল হচ্ছে। আর বাবা তাঁকে লুফে লুফে বলছেন, "দিদি, তুমি একটি 'ভজঘট, তুমি একটি 'ভজঘট'।"সেই 'ভজঘট'সন্ধ্যা হলেই ট্যাঁ ট্যাঁ চিৎকারে বাড়ী মাথায় করে। বাবা আবার নিদান দেন চূণের জল খাওয়ানো দরকার পেটব্যথা কমাতে। আমিও নিরুপায় হয়ে মোক্ষম অস্ত্র ধরি। বাবাদের বন্ধুদের আড্ডা "ক্রমে ক্রমে, আলাপ যখন (সবে) উঠল জমে," ভজঘট আবার ট্যাঁ ট্যাঁ, আমি হাটে হাড়ি ভাঙি, "কিছুতেই ব্যাথা কমছে না, বাবা বলছিলেন...."

অমনি বাবার বন্ধুদের হাঁই হাঁই করে 'মানছি না, মানব না'র গলার ভিড়ে তলিয়ে গেলেন বাবা। চূণ প্রসঙ্গের ইতি হল সেখানেই। আবারও চার চোখে চোখাচোখি হল, যা ওই চোখগুলো ছাড়া কোন কাকপক্ষীতে টের পেলনা।

পৃথিবীর সব যৌথপরিবারের গর্বায়নের মধ্যে যেমন অনেক 'সং' ও অনেকটা জুড়ে 'সার' থাকে, তেমনি আমার পঞ্চবার্ষিকী যৌথপারিবারিক জীবন অনেক 'সং' মেশানো হলেও, ছিল অনেকটা জুড়েই 'সারাৎসার'।

শেষ ফোনে আমায় বললেন 'তুমি তো আর শুধু আমাদের রাই না, তুমি তো শুভশ্রী নন্দী, তোমায় তো পড়ি বাড়ির কাগজে।' কিন্তু কোনদিন বলেননি 'গণশক্তি'র জন্য একটা লেখ। ছেলেমেয়েরা ডাকতো 'বাবু' আর আমি সেই 'বশ্যতা'ও 'প্রভুত্বের' ধারে কাছে না ঘেঁষে, সে রাস্তায় পা না মাড়িয়ে ডাকতাম 'বাবা' ও তুমি'। খুব উঁচু দরের সেমিনারে নিয়ে যেতেন, চাইতেন দেখি, শুনি, শিখি। আমি তো শুধু তাতে দমবার পাত্রী নই। দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে গেলে, হাতের ইশারায় বসতে বলতেন। কে শোনে কার কথা। চব্বিশ বছরের আমার 'ক্ষণা সত্তা' 'বরাহমিহির'-কে গ্রাহ্য না করেই প্রশ্ন করে চলে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটা প্রবন্ধের মন্তব্যকে খণ্ডন করে দেশ পত্রিকায় একটা চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল । খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন," লজিকটা ভালো শিখেছো"।

বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল এত খোলামেলা যে আদানপ্রদানের একটা বাতাবরণ ছিল। 'সাংসারিক'বাকচালের চাইতে 'বিশ্বজয়'ই হত বেশি। আবার ব্যক্তিত্বসংঘাতের সময় বহিপ্রকাশ ছিল, নিজের চোখে নিজেই ওষুধ দিয়ে দেয়া, নিজের হাতে মশারির খুঁটি টাঙিয়ে ফেলা ইত্যাদি, অর্থাৎ যে কাজগুলো আমার ছিল। সকলে যেন তাঁর বশ্যতা মানতেই অভ্যস্ত, শুধু আমিই আস্তে আস্তে সম্পর্ক তৈরীর জোরে "এটা উচিত নয়, কেন নয়" তক্কো জুড়তাম। এসবে তো অভ্যস্ত ছিলেন না, আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হতে শিখেছিলেন। আমারও সহজ হয়েছিল জায়গা করে নিতে তাঁর হৃদপিন্ডের চারটি অলিন্দের একটিতে।

আজ মনে হচ্ছে, 'অনেক শুনেছি', 'অনেক বলেছি' ছাপিয়ে 'উজ্জ্বল'হয়ে আছে পাল্লায় ভারী হয়ে 'অনেক পেয়েছি'।

আলফারেটা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

সেজান মাহমুদ

সমালোচনা সাহিত্যে উপন্যাসের অপরিহার্য উপাদান ও ইউলিসিসের শতবর্ষ: একটি মুখবন্ধ

সাহিত্য সমালোচনা এবং সমালোচনা সাহিত্যে যে কোন প্রবন্ধ লেখার আগে খোলাসা করা দরকার 'সমালোচনা' বলতে কী বুঝি। গত শতকে ইংরেজপ্রশ্রয়ে সাহিত্যের যে আধুনিকতার জন্ম, সাহিত্য সমালোচনায় এখনও সেই পশ্চিমের তত্ত্বকথা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের একটা দিগন্তরেখার স্পষ্টতা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমালোচনা সাহিত্যে কোন অস্পষ্ট কাঠামোও এখনও তৈরি হয়নি। একথা মানতেই হবে জ্ঞানতত্ত্বের পদ্ধতি, প্রণালীর ধারাবাহিকতা ইত্যাদি পশ্চিমারাই ধরে রেখেছে যদিও এই সূচনাটা এককভাবে তাদের হাতে ছিল না। যাক, সে কথায় পরে আসছি। একটু গোড়াতে তাকালে দেখতে পাই, যেসব আলোচনা-বিশ্লেষণ ছাপা হচ্ছে তাতে একবার মনে হচ্ছে সাহিত্য সমালোচনা অর্থ হলো:`

ক। পুস্তক পরিচিতি: হরহামেশা পত্রিকার পাতায় যা দেখা যায়, বইটি কে লিখলেন, গল্প বা কবিতা না উপন্যাস, কয় পৃষ্ঠার বই, প্রচ্ছদ কার আঁকা ইত্যাদির বিবরণ। বড়জোর বইয়ের মলাট থেকে কিয়দংশের উল্লেখ।

খ। বুক রিভিউ: পুস্তক পরিচিতির উপাদানের সঙ্গে সমালোচকের বিজ্ঞ মতামত, লেখকের ভাষা সবল-দুর্বল, ভোকাবুলারি কম-বেশি, আর বড়জোর নিজস্ব পারসেপশন-নির্ভর কিছু মন্তব্য।

গ। সাহিত্য সমালোচনা: পুস্তক পরিচিতি, রিভিউ এর উপাদানের সঙ্গে সমালোচক হয় চড়াও হয়ে খারিজ করে দিলেন লেখকের কর্মকে অথবা প্রশংসায় উচ্চ আসনে তুলে দিলেন, এমন কবিতা বা গল্প বা উপন্যাস লেখা হয় নি বিগত দশকে বা শতকে; এই লেখা লেখকের দ্রোহের প্রকাশ, আত্মজিজ্ঞাসার দলিল ইত্যাদি, ইত্যাদি বলে।

ঘ। সমালোচনা সাহিত্য: সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করে নতুন করে আবিষ্কার বা পাঠোদ্ধার করা, এক ধরনের মূল্যায়ন, কিন্তু তা সাহিত্যতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্য দিয়ে সাহিত্য-দর্শনের পদ্ধতি, সাহিত্যের সামগ্রিক গন্তব্য বা ঠিকানার নান্দনিক রূপ বিশ্লেষণ করা।

আমি এখানে সেই সর্বশেষ সংজ্ঞা বা সমালোচনা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলছি। অ্যারিস্টটল-এর 'পোয়েটিকস' (খ্রীস্টপূর্ব ৪ শতাব্দী) বা তাঁর সমসাময়িক ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' কে যথাক্রমে কবিতার আর ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের আদি সমালোচনা (ফরমাল) ধরে রেঁনেসা (ফ্রান্সিস বেকন এবং তৎসমুদয়), এনলাইটেনমেন্ট (ডেভিড হিউম, কান্ট, মেরি উলস্টোনক্রাফট এবং তৎসমুদয়), ঊনবিংশ শতাব্দীর সমালোচনা (হেগেল, মার্ক্স, নিটশে, জন স্টুয়ার্ট মিল, তলস্তয় এবং তৎসমুদয়), নব্য সমালোচনা (ফ্রয়েড, সোসার, ইয়াকবসন, সার্ত্র, সিমোন দ্য বোভোয়া, দেরিদা, ফুকো, বার্থ, লাকাঁ, দেলুজ, বাখতিন, ফ্রেই, চমস্কি, সাইদ এবং তৎসমুদয়) থেকে এই প্রতিকৃতি বর্তমানের এক বিমূর্ত-প্রয়োগবাদী-ভাষার-আন্তর্জাতিকরণী-দর্শনাশ্রয়ী সমালোচনার পর্দায় ফেলে আলোচনা করা সম্ভব। এই ধারার আলোচনায় বিশ্বসাহিত্য থেকে যদি একটি মাত্র আধুনিকতাবাদী উপন্যাস বেছে নিতে হয়, তা হবে জেমস জয়েসের মাস্টারপিস "ইউলিসিস"। আগামী ফেব্রুয়ারি ২, ২০২২ ইউলিসিসের শততম বার্ষিকী বলা যাবে। যদিও উপন্যাসটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত, কিন্তু প্রথম একক গ্রন্থাকারে প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২, ১৯২২ সালে। তাই ইউলিসিস কে আদর্শ উপন্যাস হিসাবে ধ'রে উপন্যাসের সমালোচনা সাহিত্যের একটি মুখবন্ধ সৃষ্টির প্রয়াস পাব।

ইউলিসিস তিনটি অংশে মোট আঠারো পর্ব বা এপিসোডের, দুইলাখ পঁয়ষট্টি হাজার শব্দের সুবিশাল মহাকাব্যিক উপন্যাস। অনেক সমালোচকের মতে এটি এতটাই নিরীক্ষাধর্মী যে প্রায় পাঠযোগ্য নয়। আসলে কি তাই? দু'টো মূল চরিত্র লিওপোল্ড ব্লুম এবং স্টিভেন ডেডালাসের ১৯০৪ সালের ডাবলিন শহরে একদিনের ঘটনাপঞ্জি যার গভীরতা, জটিলতা, অশেষ উদ্ভাবনী, গোলকধাঁধার মতো আখ্যানের নির্মাণ একাধারে উপকথাময় দুঃসাহসিক অভিযান, অন্যদিকে অন্তর্গত মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার অত্যাশ্চর্য প্রতিকৃতি হয়ে ওঠে। এভাবেই ইউলিসিস আমাদের সাহিত্য ও ভাষাকে উপলব্ধির এক বহুমাত্রিক জগতে নিয়ে যায়। ইউলিসিসের সারাংশ দাঁড় করানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবু যদি উপন্যাসের একটি অপরিহার্য উপাদান 'কাহিনি' কে ধরি, তা অবিশ্বাস্যরকমের সরল বা সাধাসিধা। মূল চরিত্র লিওপোল্ড ব্লুম একজন মধ্যবয়সী ইহুদি যার বসতি সাত নম্বর এক্‌ল্‌স্‌ স্ট্রিটে, যার দিনটি পার হয় স্ত্রী মলি ব্লুমের পরকীয়ার কথা চিন্তা ক'রে। সে মাংসের দোকানে গিয়ে কলিজা কিনে নেয়, একটি 'ফিউনারেল হোমে' অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নেয়, সমুদ্রতটে একটি তরুণীর দিকে নজর রাখে। অন্যদিকে স্টিভেন ডেডেলাস একজন তরুণ বুদ্ধিজীবী, যে একটি সংবাদপত্রের অফিস থেকে বেরিয়ে আসে, পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে শেক্সপীয়ারের হ্যামলেটের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে, হাসপাতালের প্রসূতি-যত্ন বিভাগে যায় যেখানে তাঁর জীবন মূল চরিত্র লিওপোল্ড ব্লুমের সঙ্গে সংযুক্তি পায়। ডেডেলাস তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় 'বার হপিং' বা পানশালার মদোন্মত্তায় অংশ নেয়ার জন্যে। দু'জনে মিলে সর্জনবিদিত এক যৌনকর্মশালায় উপনীত হয় যেখানে ডেডেলাস ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে কারণ, সে মনে করে তাঁর মায়ের প্রেতাত্মা তাঁকে

দেখতে এসেছে। শেষমেশ মাতালের মারামারি এবং নিক্ষিপ্ত হওয়া। শেষদৃশ্যে ব্লুম তাঁর স্ত্রী মলির সঙ্গে শুয়ে থাকে। সেখানে স্ত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে এক দীর্ঘ, চিন্তশীল, অসাধারণ স্বগতোক্তি শুনতে পাই আমরা।

এই কাহিনি সারাংশ কি ইউলিসিসের প্রতি সুবিচার করা? একেবারেই না। তাহলে উপন্যাসের কাহিনি একটি অপরিহার্য উপাদান হলেও তা সাদামাটা হতেও পারে কিন্তু আখ্যান সৃষ্টির মুন্সিয়ানা আর কথনের শিল্পিত মাধুর্য তাঁকে নিয়ে যেতে পারে ভিন্ন মাত্রায়। নর্থ্রপ ফ্রেই তাঁর 'এনাটিমি অব ক্রিটিসিজম' প্রবন্ধে উপন্যাসের প্লট, চরিত্র, কাহিনি, সময়কাল এবং ন্যারেটিভ বা বর্ণনারীতির প্রেক্ষিতে জনরা বা উপন্যাসের ধারার বিভক্তিকরণ করেছেন যা ই.ডি হিরশ আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে উপন্যাসের ঐতিহাসিক ধারাকে চিহ্নিত্ব করেন। প্রচলিত এইসব ধারার বাইরেও উপন্যাস রচিত হয়েছে। রিয়েলিজম, রোমান্স, মর্ডানিজম, পোষ্ট-মর্ডানিজম, স্ট্রাকচারালিজম, ম্যাজিক রিয়েলিজম, সাইকোএনালিটিক, সব ধরণের উপদান খুঁজে পাওয়া যায় ইউলিসিস উপন্যাসে।

নামের কথাই ধরি। ইউলিসিস হোমারের এপিক বা মহাকাব্য অডিসির নায়ক অডিসিয়াসের ল্যাটিন রূপ। এই নামের মধ্য দিয়েই উপন্যাসে একটি সমান্তরাল গঠন ও অভিজ্ঞতার সংযোগ তৈরি হয় ব্লুম এবং অডিসিয়াসের মধ্যে। লেখক জেমস জয়েস এবং কবি হোমার যেন একাকার হয়ে যান এই ইউলিসিসে। হোমারের অডিসি ২৪টা অধ্যায়ে বিভক্ত; ইউলিসিসের প্রতিটি এপিসোড বা পর্বের ভাব, গঠন, ও চরিত্রগুলোর যোগাযোগ একেবারে অডিসির অধ্যায়ের সঙ্গে মিলযুক্ত। ইউলিসিস উপন্যাসের কাল বিংশ শতাব্দীর আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে, হোমারের অডিসিয়াস ট্রোজান যুদ্ধের গ্রীক নায়ক যিনি ট্রয় থেকে ইথাকার নিজ ঘরে ফিরে আসছিলেন; অডিসিয়াসের পুত্র টেলেমেকাসের সঙ্গে মিলে যায় স্টিভেন ডিডেলাস, আর লিওপোল্ড ব্লুমের স্ত্রী মলি ব্লমের সঙ্গে পেনেলোপি। এই উপন্যাস রচনার জন্যে জেমস জয়েস সুইজারল্যান্ডের জুরিখে ১৯১৫-১৮ সালে গ্রীক ভাষা শিখেছিলেন যাতে হোমারের অডিসি মূল ভাষায় পড়তে পারেন। ইংরেজির শিক্ষক এরিক বুলসন তাঁর 'ইউলিসিস বাই নাম্বার' গ্রন্থে শুধু এই পর্বের এবং বিষয়ের মিলই দেখাননি, প্রতিটি পর্বের চরিত্র, শব্দসংখ্যারও অভূতপূর্ব মিল দেখিয়ে দিয়েছেন।

জেমস জয়েস শুধু হোমারের মহাকাব্যিক অনুষঙ্গকে ধারণ করেননি, আধুনিক উপন্যাস এমনকি উত্তর-আধুনিক উপন্যাসেরও অগ্রগামী উপাদান নিয়ে এসেছেন। মিখাইল বাখতিনের উপন্যাসচিন্তা এবং আখ্যানের নন্দনচিন্তা পশ্চিমা জগতে ঝড় তুলেছিল রুশ উপন্যাস, বিশেষ ক'রে দস্তয়েভস্কিকে নিদিষ্টভাবে পড়ে তাঁর শিল্পরূপ ও কথনের পাঠোদ্ধারের প্রয়াস নিয়েছিলেন যখন। লক্ষ করার বিষয় হলো বাখতিনের 'প্রব্লেমস অব দস্তয়েভস্কিস আর্ট' গ্রন্থটি মাত্র প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৯ সালে, অন্যদিকে ইউলিসিস প্রকাশিত ১৯২২ সালে। রাশিয়ার বিশাল ঔপন্যাসিক ঐতিহ্য আর ইউরো-মার্কিন সংঘাত শিল্প বিচারের বৈশ্বিক ধারাকেও প্রভাবিত করেছিল নিঃসন্দেহে। সেটার

লক্ষণ দেখা যায় মার্ক্সবাদী নন্দনতাত্ত্বিক আর ইউরো-আমেরিকান সাহিত্য সমালোচকদের সংঘাতের মধ্যে। মার্ক্সবাদী সাহিত্য সমালোচনার একটি ধারাই তৈরি হয়েছিল সমান্তরালভাবে যাঁদের মূলকথা ছিল যে সাহিত্যকর্ম মূলত ইতিহাসের সৃষ্টি যা সৃষ্টির সময়ের সামাজিক এবং মেটেরিয়াল বা বস্তুগত অবস্থান বিশ্লেষণ করেই বুঝতে পারা যায়। সুতরাং সাহিত্যের আখ্যানও একটি সমাজের উপরিকাঠামো ও অর্থনীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত।'আ ক্রিটিক অব মর্ডান টেক্সুয়াল ক্রিটিসিজম' গ্রন্থে জেরম ম্যাকগান ইউলিসিস-কে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর বিশ্লেষণ প্রমাণ করতে যে কীভাবে একজন লেখকের টেক্সটও নিয়ন্ত্রিত হয় প্রকাশনার ব্যবসায়িক প্রভাবে। মার্ক্সের সেই বিখ্যাত উক্তিটি আবারও স্মরণে নিয়ে আসি,

> "The mode of production of material life determines altogether the social, political, and intellectual life process. It is not the consciousness of men that determines their being, but on the contrary their social being, that determines their consciousness."

তার অর্থ লেখকের চৈতন্য এবং সত্তাও যেন সেই অর্থনীতির উৎপাদন পদ্ধতির ওপরে নির্ভরশীল। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রথম থেকেই সাহিত্য বিশ্লেষণের এই খণ্ডিত ধারণার বিপক্ষে ছিলাম। মানুষের চৈতন্য আসলে বস্তুজগতের বাইরে যেতে পারে বলেই মানুষ শিল্পী, তার সৃজনশীলতার অসীম ক্ষমতা।

ইউলিসিস উপন্যাস সেই বস্তুজগতে থেকেই জাগতিক বিষয়ের বাইরে এক অসীম সম্ভাবনার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার একটি উদাহরণ। একটি বিদ্রূপাত্মক, তীব্র আনন্দদায়ক উপাখ্যান যা দার্শনিক নৈতিকতার কোন ধার ধারে না। সে কারণেই কাহিনি সাধারণ কিন্তু মাত্রা ও ব্যাপ্তির বিশালতা তাকে সৃজনশীলতার অসীম সম্ভাবনায় উন্নীত করে। নবোকভ লিখেছিলেন,

> "Joyce can turn all sorts of verbal tricks, to puns, transposition of words, verbal echoes, monstrous twinning of verbs, or the imitation of sounds. In these, as in the overweight of local allusions and foreign expressions, a needless obscurity can be produced by details not brought out with sufficient clarity but only suggested for the knowledgeable."

ভাষার খেলা, শব্দের স্থানান্তর ও বিন্যাস, মৌখিক অনুরণন, ক্রিয়াপদের দৈত্যসুলভ পাকানো, ইত্যাদি শৈলী যে সেই খাসা-পাঠকদের জন্যে অস্পষ্টতার মধ্যদিয়ে নতুন অর্থ তৈরি ক'রে তা এখন অনিবার্যভাবে প্রমাণিত। একারণেই কি সাহিত্য সমালোচনায় কী বলা হচ্ছের চেয়ে কীভাবে বলা হচ্ছে জরুরি হয়ে উঠেছে? ক্লদিও গিয়েন-এর মতো সাহিত্য সমালোচকেরা সাহিত্যকে একটি সিস্টেম বা পদ্ধতির মতো মনে করেন। উনি বলেন যে গল্প সব রকমেরই বলা হয়েছে। এখন দেখতে হবে কীভাবে বলা হলো, কেন সেই গল্পটি ঘটলো? অনেকেই এই 'সব রকমের গল্প বলা'-কে সরলভাবে বুঝে ফেলেন, এবং প্রশ্ন করে, সব গল্প কীভাবে বলা হয়? এখানে সব গল্প বলা মানেই

হলো অনুভূতির ধরণ, রাগ, অভিমান, ভালোবাসা, দুঃখ, হতাশা, এরকম সব মানবিক অনুভূতির প্রকরণের কথা।

উপন্যাসের আখ্যান ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিক, এমন কি লেখকের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও তাই সাহিত্য সমালোচনার অংশ হয়ে ওঠে। ফ্রয়েডের 'আর্ট এন্ড সাইকো-এনালিসিস' নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন ভাইগতস্কি এই বলে যে 'ফ্রয়েড যেভাবে শিল্পের বিচার করেছেন যেখানে শিল্পের ওপরে সমাজের ভূমিকা খর্ব করা হয়েছে' (দ্য সাইকোলজি অব আর্ট, ১৯৭১)। ভাইগতস্কি নিজে ছিলেন একাধারে সাহিত্যের শিক্ষক, অন্যদিকে ভাষাবিদ এবং মনোবিজ্ঞানী। তার মতে শব্দ আমাদের শেখায় 'আমরা কী না, বরং আমরা কী হতে পারি তা'। মজার ব্যাপার হলো মিশেল ফুকো বা পল ডি মান এর মতো ভাষার দার্শনিকেরা কিন্তু এখান থেকে ধার নিয়েছেন; ফুকো তাঁর 'দা অর্ডার অব থিংস' (১৯৭৩) গ্রন্থে লেখেন:

> "This proper being of language is what the nineteenth century was to call the Word, as opposed to the Classical "verb", whose function is to pin language, discreetly but continuously, to the being of representation. And the discourse that contains this being and frees it for its own sake is literature." (উনবিংশ শতকে এসে ভাষার যথার্থ অস্তিত্ব ধ্রুপদী ধারার 'ক্রিয়াপদে' না খুঁজে 'শব্দে'র মাঝে খোঁজা হয়েছে, যার (শব্দের) কাজ হলো ভাষাকে রূপায়নের সত্তার সঙ্গে গ্রন্থিত করা, কৌশলী বিচক্ষণতার সঙ্গে, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে। আর যে ডিসকোর্স যা এই সত্তাকে ধারণ করে এবং নিজের জন্যই মুক্ত করে তা-ই সাহিত্য)।

পল ডি মানের কণ্ঠেও একই কথার প্রতিধ্বনি:

> "Here…consciousness does not result from the absence of something, but consists of the presence of a nothingness. Poetic language names this void with ever-renewed understanding and…it never tries to naming it again. This persistent naming is what we call literature. (এখানে…চৈতন্য কোন কিছুর অনুপস্থিতি থেকে তৈরি হয় না, বরং এক শূন্যতার উপস্থিতির মধ্যে সৃষ্ট। কবিতার ভাষা এই শূন্যতাকে চিরনতুন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে অভিধা দেয়,…আর কখনও তা পূনঃআখ্যায়িত করে না। এই অভিধা দেয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার নাম-ই সাহিত্য।)

জেমস জয়েস ইউলিসিস উপন্যাসে আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতা, কাঠামোবাদ, ম্যাজিক রিয়েলিম, সাইকোএনালিটিক সব রকমের উপাদান নিয়ে এসেছেন 'জিনিয়াস' লেখক হিসাবে। ২০০৮ সালে সালমান রুশদীর সঙ্গে এক সন্ধ্যায় তাঁর লেখার ওপরে প্রভাব নিয়ে বলেছিলেন,

'কিছু লেখককে পড়তে হয় এজন্য যে আমি তাদের মতো লিখতে চাই না, যেমন ড্যান ব্রাউন ('দ্য ভিঞ্চি কোড'-এর লেখক)। কিছু লেখকদের পড়তে হয় এজন্য যে আমি তাঁদের মতো লিখতে চাই, যখন বুঝতে পারি এই চাওয়াটাই অসম্ভব চাওয়া, তখন অনুপ্রাণিত হয়ে লিখি, যেমন জেমস জয়েস। নোবেলজয়ী জার্মান ঔপন্যাসিক

গুন্টার গ্রাস, কলম্বিয়ান ঔপন্যাসিক আরেক নোবেলজয়ী গাব্রিয়েল গার্সিয়া মারকেজ'। এখানে তিনি উল্লেখ করেন ইউলিসিসের নায়ক লিওপোল্ড ব্লুমের যিশুর মতো করে, প্রাচীন কালের হিব্রু প্রফেটদের মতো করে উড়ে যাওয়া, মার্কেজের অনিন্দ্য সুন্দরী 'রেমেদিয়োস দি বিউটি'র উঠোনে চাদর মেলতে মেলতে উড়ে যাওয়া আর তাঁর নিজের সেটানিক ভার্সেসের জিব্রিল ফারিস্তা এবং সালাদিন চামচার বিস্ফোরিত উড়োজাহাজ থেকে পড়ে যেতে যেতে জাদুর মতো বেঁচে যাওয়া সবই একসূত্রে গাঁথা। বলাই বাহুল্য জাদুবাস্তবতার এই উপাদান জেমস জয়েস, মার্কেজ, রুশদী ঘুরে ঘুরে নতুন মাত্রায় আমাদের মতো লেখকের হাতেও পৌঁছে গেছে।

ফার্দিনান্দ সোসার এবং বাখতিনের প্রসঙ্গে আবারো আসতে হয় – ভাষা নিয়ে যেহেতু সাহিত্যের কারবার। সোসার স্ট্রাকচারালিজম বা কাঠামোবাদের প্রবক্তা, বাখতিন অন্যদিকে স্ট্রাকচারালিজম-কে ভেঙ্গে দিতে চান। সোসারিয়াব অবস্থানের নিরিখে বাখতিনের অবস্থান যেন ভিন্নমুখী, স্ট্রাকচারালিজম-এর এন্টিথিসিস আর কী হতে পারে? সোসার ভাষাকে দেখতে চান বিমূর্ত এবং রেডি-মেড সিস্টেম হিসাবে, বাখতিন দেখতে চান শুধু মাত্র জলজ্যান্ত বাচনিক গতিময়তার মধ্যে (ডায়নেমিকস অব লিভিং স্পিচ); স্যস্যুর এর মতে ভাষা একজন বক্তার কাছে পরোক্ষভাবে তৈরি হয়, বক্তার ফাংশন বা অপেক্ষক নয়; সেকারণে এই পরোক্ষতা তাঁর কাছে এক ধরণের ছদ্মরূপ বা অনুকরণ, অন্যদিকে বাখতিনের কাছে তা

সংগ্রাম এবং বৈপরীত্যের প্রক্রিয়া; আর স্যস্যুর যেখানে ব্যক্তি এবং সমাজ কে দ্বি-মুখী করে দেখেন, সেখানে বাখতিন অনুমান করেন ব্যক্তি সমাজেরই সৃষ্ট একক, একারণে চেতনা হলো সংলাপ আর সমাজের 'অন্যান্য'দের পাশাপাশি বা সন্নিধির মধ্যকার ব্যাপার-স্যাপার। একারণেই বাখতিনের মতে পরোক্ষভাবে ভাষিক অর্থ অনুধাবনের মানে হলো আদপেই কোন অর্থ অনুধাবন না করা, এটা শুধুই অর্থের বিমূর্ত রূপ। আর এখানেই তিনি বলেন যে কোন সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ বা উপন্যাসের বয়ান থেকে পাকাপোক্ত অর্থ উদ্ধার না করে এরূপ বিমূর্ত অর্থ তুলে আনা এক ধরণের কানাগলিতে পৌঁছানোর মতো, যেখানে ভাষিক মানদণ্ডের বিমূর্ততাকে মূর্তিমান করে তোলা হয়, বাস্তবতায় টেনে নামানো হয়, এবং এক রকমের 'মডেল' তৈরি করে যা দিয়ে ভাষার আর কোন আলোচনা সম্ভব হয় না-আর এখানেই, বাখতিনের মতে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। বাখতিনের মতে ভাষায় যে উচ্চারণ ঘটে–তা একটি বিচ্ছিন্ন শব্দ, এমন কি পরিপূর্ণ সাহিত্য-রচনা, তা ঘটে একটি প্রাসঙ্গিকতার মধ্য দিয়ে, যাপিত সময়কালে। এ কারণে যতোই একটি উপন্যাসের বিষয়কে উপেক্ষা করতে চাই না কেন সেই বিষয় এবং বর্ণনার সামগ্রিকতা যা লেখকের সবচেয়ে শিল্পিত কাজ–তাকে শুধু ভাষার আঙ্গিকে সংকুচিত করা যায় না, বরং তা সামগ্রিকতার অবিচ্ছিন্ন অংশ, যেমন ভাষিক উপাদানগুলোও হয়ে ওঠে সামগ্রিক উচ্চারণের অবিচ্ছিন্ন অংশ।

কিন্তু ইউলিসিস নিয়ে সমালোচনার মুখবন্ধ ছাড়া এই স্বল্প পরিসরে আর কিছু লেখা সম্ভব না। এই মুখবন্ধে সবশেষে বলব, আমি মনে করি উপন্যাসের ব্যাপ্তির বিচার হবে

দু'ভাবে, হরাইজেন্টাল বা অনুভূমিক আর ভার্টিকাল বা উলম্ব পরিসরে। হরাইজেন্টাল বা অনুভূমিক হলো বিশাল সময়ের বিশাল ঘটনা নিয়ে বলা, আর ভার্টিক্যাল বা উলম্ব হলো অল্প বিষয়কে বা অল্প বলে কতটা গভীরে নিয়ে যাওয়া যায়। ইউলিসিস সেই অল্প বিষয়কে বিশাল গভীরতার ব্যাপ্তি দিয়েছে, দিয়েছে সাহিত্যের বিস্তৃত উপাদান। আমরা সাহিত্যতত্ত্বের নিরীক্ষায় নতুন নতুনভাবে সেইসব উপাদানের আস্বাদন করতে পারব, সেটাই হবে এই মুখবন্ধের পরবর্তী ধাপ।

অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

স্বপন বিশ্বাস

ভেগা সেন্ট্রাল ও নেরুদার কবিতাপাঠ

'অত:পর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন' – নির্মলেন্দু গুন

Despues De Dios esta La Vega। আগে ইশ্বর, পরে লা ভেগা। সান্তিয়াগোর সবচে বড় কাঁচাবাজারের আদর্শিক স্লোগান হলো এই। ঈশ্বরের পরে কোন নবী নয়, বরং একটি কাঁচাবাজার – ভেগা সেন্ট্রাল। এর একটা সাদামাটা ব্যাখ্যা দিয়েছে আমাদের বন্ধু ভ্যালেন্তিনা বারিয়স। আলো ঝলমল কোন শপিং মলের কথা বলা হচ্ছে না, কাঁচাবাজারও যে পর্যটকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে, এই প্রথম জানলাম। 'pais del poetas' বা 'কবির দেশ' নামে খ্যাত চিলের মানুষ ফি-বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। অতি বৃষ্টি ও বন্যা, খরা ও বন-দহন, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ, ভূমিকম্প – একটার পর আরেকটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসে মানুষের জীবনকে লণ্ডভণ্ড করে। আর বরাবরই ভুক্তভোগী মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় সেবার সংকল্পে মহীয়ান ও প্রবাদতুল্য এই কাঁচাবাজার – ভেগা সেন্ট্রাল। বাজার সতের হেক্টর জায়গা জুড়ে, আর এখানে আড়াই হাজার দোকান আছে বলে মনে করা হয়। বাজারের ইউনিয়ন বেশ শক্তিশালী; ঐতিহ্যগতভাবে সেবাটা আসে মূলত ইউনিয়নের তরফ থেকে। বাজারে বা আশেপাশে রয়েছে বহু রেস্তোঁরা, স্ন্যাকসের দোকান যা দোকানের মালিক-কর্মচারীদের বা সমাগত শত-সহস্র খদ্দেরদের তরতাজা ও সুস্বাদু খাবার জোগায় বছরে ৩৬৫ দিন ও দিনে ২৪ ঘন্টা। খুব কাছাকাছি আছে আরও তিনটি কাঁচাবাজার, যেমন লা ভেগা চিকা, টিরসো ডি মলিনা মার্কেট ও সেন্ট্রাল মার্কেট। কিন্তু ভেগা সেন্ট্রাল অনন্য এক সাংস্কৃতিক আইকন; স্থানীয়রা এর নাম দিয়েছে সান্তিয়াগোর 'পাকস্থলি'।

আন্দিজ পর্বতমালার গলিত বরফে তৈরি মপচো নদীর খরস্রোত সান্তিয়াগো নগরকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। লা চিম্বার উত্তরভাগে মপচোর গা ঘেঁষে ভেগা সেন্ট্রাল। নদী তো নয়, আমরা পদ্মা-মেঘনা-যমুনার দেশের মানুষরা মপচোকে বড়জোর একটি খরস্রোতা খালের মর্যাদা দিতে পারি। মধ্য চিলের উপত্যকায় যে শাক-সবজি ফল-মূল জন্মায়, ঔপনিবেশিক আমল থেকে চাষিরা ওগুলো লা চিম্বার মপচোর পাড়ে এসে বিক্রি করতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীর ওপর সেতু নির্মিত হওয়ার পর এই এলাকা ব্যবসার জন্য খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। নৌ যোগাযোগের সুবিধা থাকায় ঊনিশ শতকে গড়ে

ওঠে মপচো মার্কেট, যেখানে সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণাগার নির্মিত হয়। ১৮৯৫ সাল থেকে মপচো মার্কেট ভেগা সেন্ট্রাল নাম ধারণ করে। ভেগা সেন্ট্রালের টিনের ছাদসহ নতুন কাঠামো নির্মিত হয় ১৯১৬ সালে, একশ' বছরের ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে যা আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।

ভেগা সেন্ট্রালের খ্যাতির কারণ, কোনকালে পাবলো নেরুদা এখানে এসে কবিতা পাঠ করে গেছেন। আত্মস্মৃতিতে[১] নেরুদা বলেছেন, তাঁর সময়ের যুদ্ধ, বিপ্লব ও সামাজিক বিদ্রোহ কবিতা লেখার ভূমি তৈরি করেছে। কবিতাকে তিনি আক্ষরিক অর্থেই পথে, ঘাটে, মাঠে, ময়দানে, কল-কারখানায়, থিয়েটার ও লেকচার হল ও পার্কে নিয়ে গেছেন। চিলের আনাচে কানাচে তিনি কবিতার বীজ রোপণ করেছেন। ঠিক কবে নেরুদা

ভেগা সেন্ট্রালে এসেছিলেন, তার কোথাও উল্লেখ নেই। স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৬ সালে, শেষ হয় ১৯৩৯ সালে। এ সময়টা নেরুদা মাদ্রিদে চিলের দুতাবাসে কর্মরত ছিলেন। প্রথম বছরেই নেরুদার প্রিয় বন্ধু কবি লোরকাকে ফ্রাঙ্কোর সৈন্যরা গ্রানাডায় গুলি করে হত্যা করে লাশ গুম করে দেয়। প্রকাশিত হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে লেখা নেরুদার বই *Espanã en el Corazon* (আমাদের হৃদয়ে স্পেন)। ১৯৩৮ সালে তিনি মাদ্রিদ ছেড়ে আসেন। ধরে নেয়া যেতে পারে, ১৯৩৯ কি ১৯৪০ সালে তিনি ভেগা সেন্ট্রালে এসে কবিতা পাঠ করেন।

ভেগা সেন্ট্রালের কেউ একজন এসে তরুণ কবিকে গাড়িতে তুলে নেন। পথে যেতে যেতে কবিকে বলা হলো, কাঁচাবাজারের মজুর সমিতির হলে তিনি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। নেরুদার পকেটে ছিল তাঁর সদ্য প্রকাশিত বই *Espanã en el Corazon*। বাজারে এসে তিনি রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে চিলের রাজধানীর সবচে' বড় কাঁচাবাজার ভেগা সেন্ট্রাল দেখতে কেমন ছিল? একেবারে কাকভোর থেকে শুরু, আসছে শাক-সবজি-ফল-মূল নিয়ে ঠেলাগাড়ি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি, মালবোঝাই ট্রাক, খালি-পা, খালি-গা মজুররা মাল খালাস করছে। কর্মব্যস্ত নিম্ন আয়ের তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত মজুরদের নিরন্তর স্বাগত জানিয়ে চলেছে ফুটপাত দখল করা কফি স্টল, খোলা রেস্তোঁরা। বলা বাহুল্য, বহু দশকের ব্যবধানে চিলের মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে; আজ আর খালি গায়ে কেউ নেই। দোকানদাররা ব্রান্ডের টি-শার্ট পড়ে, চোখে রঙিন চশমা পরে, এমনকি দু-চারটা ইংরেজি সম্ভাষণে আপনাকে স্বাগত জানাবে যদিও তারা ভালো করেই জানে, বিদেশি

আগুন্তুকরা 'হে ক্ষণিকের অতিথি'; তারা কর্ন, ফুলকপি বা স্ট্রবেরি কিছুই কিনবে না। ভিনগ্রহ থেকে আসা এই আত্মীয়রা যে এসে পদধূলি দিয়ে গেল. তাতেই তারা খুশি ও গর্বিত। গরু বা ঘোড়ার গাড়ি চোখে পড়েনি; তবে মাল আনা-নেওয়ায় গাধার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

জরাজীর্ণ একটি হলঘরে ঢুকে কবি দ্বিতীয়বার চমকে গেলেন। একটা শীতল প্রবাহ তাঁর গা বেয়ে নেমে গেল। নেরুদা এই শীতলতাকে কলম্বিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি হোসে

এসান্চিয়ান সিলভা'র 'Nocturno' ২ কবিতায় থ' বনে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তারা-ছিটানো এক রাতে কালো আকাশের নিচে সিলভা তাঁর সদ্য লোকান্তরিত বোনের সমাধির পাশে বসে যে শিহরণ অনুভব করেছিলেন, তারই অভিব্যক্তি কবিতাটিতে আছে। নেরুদা দেখলেন, প্রায় জনা পঞ্চাশেক লোক তার সামনে; কেউ বসেছে কাঠের বেঞ্চিতে, কেউবা সবজি আনার কাঠের বাক্সের উপরে। কেউ ছেঁড়া গেঞ্জিতে, কেউ উদোম। জুলাইয়ের শীত উপেক্ষা করে কেউ কেউ শুধু কোমরে একটু ছালা জড়িয়ে রেখেছেন। কবির জন্য কোন মঞ্চ নেই; সামনে শ্রোতা, মধ্যখানে একটি টেবিল আর টেবিলের অপর পাশে বসেছেন কবি।

এ এক ভিন্ন ধরনের শ্রোতা; কয়লা-কালো চোখে তারা স্থির দৃষ্টিতে কবির দিকে তাকিয়ে আছেন। নেরুদা ঠিক ভেবে উঠতে পারছেন না, কীভাবে শুরু করবেন। ঠিক কোন বিষয়টা তাদের জীবনকে ছুঁয়ে যাবে? হাতে ধরা বইটি উল্টেপাল্টে তিনি বললেন, 'আমি সদ্য স্পেন থেকে ফিরেছি; ওখানে অনেক যুদ্ধ চলছে। মানুষের সেখানে অনেক কষ্ট।' কিন্তু স্পেনের দু:খ বলা যুৎসই মনে হলো না। তিনি ভাবলেন, কয়েকটি কবিতা পড়বেন ও দু'চার কথা বলে বিদায় নেবেন। এও সম্ভব হয়নি।

শুরু হলো কবিতা পাঠ। একটি, দু'টি এবং আরও অনেক। মনে হলো. কয়লা-কালো চোখের শ্রোতারা শোনছে কবিতা, দৃষ্টি নিবদ্ধ কবির দিকে, শুন-শান নীরবতায় যে ধ্বনি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠছে, শ্রোতারা তাতে আন্দোলিত হচ্ছেন। কবি ভাবছেন, তাঁর কবিতার জাদুকরী শক্তি এই 'সবার নিচে, সবার পিছে' মানুষের ঘুমন্ত রূপসী দু:খকে জাগিয়ে তুলেছে। কি এক অদৃশ্য সুতোয় তাদের পরিত্যক্ত আত্মার সঙ্গে যোজিত হয়েছে কবিতার মর্মবাণী।

কবিতা পাঠ চললো এক ঘন্টারও বেশি। শেষে, কোমরে ছালা জড়ানো এক বৃদ্ধ কবির দিকে এগিয়ে এলেন। বৃদ্ধ এসে কৃতজ্ঞচিত্তে কবিকে বললেন, 'মহাশয় তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমাকে এও বলা দরকার যে আমরা এর আগে কখনো এমনভাবে আলোড়িত হইনি।' বৃদ্ধের চোখে জল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরও ক'জন অশ্রুজলে সিক্ত। দু:খক্লিষ্ট একদল মানুষের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে গণমানুষের কবি পথে পা বাড়ালেন।

সহায়ক পাঠ

১. Neruda, Pablo (1977), *Memoirs*, Farrar, Straus and Giroux, pp. 253-255.
২. Silva, Jose Asuncion *Nocturno*, Bogota, Colombia. (Translated by Robert Fernandaz in 2015). কবিতাটি ১৮৯২ সালে রচিত ও ১৯০৮ সালে প্রকাশিত।

টরোন্টো, কানাডা